সামাজিক প্রবন্ধ।

সর্ব্বত্র সম্যবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥
মনুসংহিতা।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলি।
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
দ্বিতীয় বার
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

৬/

প্রাণাধিক—

শ্রীমান্ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়

তথা

শ্রীমান মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—

চিরজীবিষু!

প্রিয়তমেরা!

তোমরা দুই ভ্রাতা ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াও যে প্রকার গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান ও পরিজনের প্রতি প্রীতিমান, সেইরূপ আর্য্য-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন এবং স্বদেশীয় জনগণের প্রতি অনুরাগ-বিশিষ্ট। তোমাদের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় এবং যুবকদিগকে মানস-চক্ষে রাখিয়া সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ে স্বচিন্তার উদ্রেক করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। এই জন্য পুস্তক খানি আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে তোমাদের নাম সম্বলিত করিয়াই প্রচারিত করিলাম।

চুঁচুড়া।
৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯২।

লেখক।

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায় ইংরাজাধিকার।

পঞ্চম অধ্যায় - ভবিষ্যবিচার।

ষষ্ঠ অধ্যায়—কর্ত্তব্য নির্ণয়।

গ্রন্থের আভাস ।

এই সামাজিক প্রবন্ধগুলি ছয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে। এই কথার বিশেষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরোপ প্রচলিত সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন হওয়াতে যে যে ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধাণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে সেগুলির প্রকৃতি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংস্রব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, ইংরাজ আগমের পরবর্ত্তী ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমাদের সমাজের গতি, জাতীয় প্রকৃতানুযায়ী পথে রাখিবার নিমিত্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কথাগুলি হইতে অবশ্যই বোধ হইবে যে, একখানি সর্ব্বদেশ সাধারণ সমাজ তত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব্ব-বিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্ত্তব্য সূত্র অনির্দ্দিষ্ট, এবং কার্য্যকলাপ অব্যব-স্থিত হইয়া পড়িতেছে।

এই জন্য, ইংরাজ-রাজপ্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব্ব শান্তি-সুখের অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্ত্তব্য অবধারণ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধিজ্ঞান করিব।

লেখক।

সামাজিক প্রবন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

জাতীয় ভাব—উপক্রমণিকা।

কয়েক বৎসর হইল; বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একটী ইউরোপীয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য খুঁজিতে হয়—জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারান জিনিসটীর অনুসন্ধান নয়?

তিনি। কথাটি বেশ সূক্ষ্ম করিয়াই বলিলে বটে। ও কথার কোন সাক্ষাৎ উত্তর নাই—কিন্তু যাহা অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহা খুঁজিতে যাওয়া কি বৃথা পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করা নয়? ওরূপে আয়াস করা অপেক্ষা অন্যরূপ চেষ্টা করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। অন্য কোন্ দ্রব্যের জন্য অথবা অন্য কোন্ প্রকার চেষ্টা করিতে বলেন, তাহা বলুন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা যাহা খুঁজিতেছি তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহা ত জলে নামিয়া না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর যে জিনিসটা হারাইয়া গিয়াছে মনে করিতেছি,

তাহা যে পূর্ব্বে হাতে ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ও জিনিসটা এমন যে, উহা হারাইয়াছে, মনে করিলেই, উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়।

তিনি। তোমায় আমায় আর ওরূপ ছেঁদো কথায় কাজ নাই। আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিবে। আমার জন্মস্থান আয়র্লণ্ড দ্বীপ—আমার পিতা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—আমি ডব্‌লিন নগরে একটী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম—১৮৪৮ অব্দে সমুদায় ইউরোপ ব্যাপক যে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়র্লণ্ডে আসিয়া লাগে, এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েক জন সমাধ্যায়ীর সহিত ঐ উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্রেক হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ উপদ্রব শান্ত করিলেন। আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসিদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বহু বৎসর ঐ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ আইরিস জাতীয় ভাবটী, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিস জাতীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়াই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোন্মুখ ভারতবর্ষীয় ভাব ব্রিটীস জাতীয়ভাবে পর্য্যবসিত হওয়া বিধেয়!

আমি। তোমার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটী তথ্য উপলব্ধ হইল। এক তথ্য এই যে, তুমি আমাদিগের মনের ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারিবে যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া যাইতে চাহি না। বুঝিতে পারিবে না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহুকালের জন্য তাহা চাহি না। তোমাদের মনে যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করিয়া বৈস। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজ-বিদ্রোহ করিতে চাই না।—আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে থাকিয়া যদি চাকুরি করিতে হয় তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করি। মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া, পশ্চিমে লোককে মেড়ুয়া বলিয়া, দক্ষিণাঞ্চলবাসীদিগকে কদাকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দূষ্য মনে করি—আর সন্তান সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যত্ন করি।

তিনি। ঐ গুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। স্বজাতিবৎসল না হইলে কেহ স্বদেশবৎসল হইতে পারেন না। ঐ সকল কাজে জাতীয় ভাব বর্দ্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব উৎপাদনে উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে বিচার করিবার জন্য সভা স্থাপন করা—প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা—পুস্তিকা বিরচন করা, এই সকল কার্য্যের প্রতি তুমি কি আস্থা শূন্য?

আমি। ও সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে, তবে ও গুলির প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা আছে বলিয়া মনে করি, আমার আস্থা, বোধ হয়, তত অধিক নয়। ও গুলি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষা প্রসূত, এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য। আমি দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি, বক্তৃতাদি দ্বারা আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়। প্রথমটি সফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরাজ-ভূম্যধিকারিগণের পক্ষপাতী ব্যবস্থার বলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শস্যের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের প্রজা-সাধারণের উপকার হইবে, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কব্‌ডেন সাহেব সভা সংস্থাপন, প্রকাশ্যে বক্তৃতা প্রদান, এবং পুস্তিকা রচনাদি করাইয়া যৎ

পরোন্নতি প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। পরিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল অগত্যা তাঁহার মতানুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কথা. অর্থাৎ লাভের ভাগীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ, আবার তাহাতে একটি দুর্ভিক্ষের সমাগম। যদি এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে কি কবডেন সাহেবের কৃত আন্দোলনে কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী, একটী বিফল আন্দোলনের। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই জন্মভূমি আয়র্লণ্ড। এই আন্দোলনের কর্ত্তা কবডেনের অপেক্ষাও শত গুণে শ্রেষ্ঠ—বাগ্মিবর ওকোনেল সাহেব। আয়র্লণ্ডের কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি করিত—দুই দিন, চারিদিন, দশ দিনের পথ হইতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিত, তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলেই কাথলিক যাজকদল চতুর্দ্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে আনিত, ও লইয়া যাইত। তাঁহার অনুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।—তিনি সমস্ত আয়র্লণ্ডের একাধিপতির স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুলিশ হইতে যেমন পরওয়ানা বাহির হইল, অমনি লোকসমাগম থামিল—রাজ্যের উপদ্রাবক বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন—তিনি জেলে গেলেন—কয়েক-বর্ষ সেই খানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বল, বুদ্ধি, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বাগ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া বন্ধুবান্ধববিহীন পর রাজ্যে দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি। ওকোনেল নিজের দোষেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাগ্মিপ্রধান যদি তেমনি কার্য্যকুশল হইতেন, তবে আর দেশের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়র্লণ্ড অবশ্য স্বাধীনতা লাভ করিত।

এই কথা গুলি বন্ধুবর কিছু ব্যগ্রতা সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁহার নিজের মন হইতে জাতীয় ভাবটী অপনীত হয়

নাই। সেই যৌবনাবস্থায়—সেই ৪৮ অব্দের অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—উহা এত দিনের পর ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

জাতীয় ভাব—ইহার উপাদান।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে সরলচেতা, সাধুশীল, সত্যবাদী ইউরোপীয় মহাশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাতীয় আইরিস ভাবটী, তাঁহার জাতীয় ব্রিটিসভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি সরল মনে কথা কহিতে কহিতে স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রকৃত জাতীয় ভাবের মূলটি অক্ষুন্ন রহিয়াছে—উপরে যতই চাপা পড়ুক্ ভিতরে স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কিছু মাত্র ন্যূন হয় নাই।

বস্তুতঃ স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কাহারই কখন একেবারে যাইতে পারে না। অন্তঃকরণ বৃত্তির সংগঠন ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত বাহ্যবস্তুনিচয়ের বিভূতি সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ্য বস্তু সমূহের প্রকৃতিতে এক একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বাহ্য প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংসৃষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তিও একরূপ হইয়া যায়। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ এবং সেই কারণ পুরুষ পরম্পরাক্রমে কার্য্যকারী হওয়াতে, জাতীয় ভাবটী মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তর রূপেই অধিকার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কারণ সম্ভূত মৌলিক জাতীয় ভাবটী জনগণের অন্তঃকরণ গঠনের বিশিষ্টতায় এবং নানা বাহ্য সাদৃশ্যে প্রকট হয়। তাহার মধ্যে (১) আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য, (২) ধর্ম্ম এবং আচার সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণসাদৃশ্য, (৪) রাজ্য-শাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য—এই কয়েকটী অতি প্রধান। তদ্ভিন্ন পরিচ্ছদে, গৃহ-নির্ম্মাণে, গৃহোপকরণে,

ভোজনাদি সুবহু অনুষ্ঠানে এক জাতীয় লোকের মধ্যে অনেক প্রকার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। এই সকল প্রধান এবং অপ্রধান উভয় প্রকার সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং তজ্জনিত একটী বিশেষ সহানুভূতি, যে সকল লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সকল লোকের হৃদয়ে জাতীয় ভাব বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত হইয়া আছে, বলা গিয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা আছে! সাদৃশ্যের উপলব্ধি দুই প্রকারে হয়। উহা বিধিমুখেও হয় আর নিষেধমুখেও হয়। অমুক অমুকের সদৃশ, এরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে, আর অমুক অমুক হইতে যত বিসদৃশ, অমুক তত বিসদৃশ নয় এরূপেও সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে পারে।

এখন এই ভারতভূমির প্রতি উল্লিখিত সূত্রগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এতদ্দেশবাসীদিগের জাতীয় ভাবে, ঐ সূত্রগুলি খাটে কি খাটে না এবং কতদূর খাটে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্ব্বত, ঊষরভূমি, এবং উর্ব্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা, জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে—ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। ফলতঃ এইটীই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসীদিগের হৃদয়ে অনন্যদেশসাধারণ একটী বিশিষ্টভাবের অধিষ্ঠান হইয়া আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটী চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা, পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদিগের সর্ব্ব প্রদেশেরই সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ ভেদবুদ্ধির দোষ এবং উদারতার গুণকীর্ত্তন করেন। এই জন্যই ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব প্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, এক কপর্দ্দকও পাথেয় সম্বল না লইয়া, বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার বিকাশ, তাঁহাদিগের অতুদার ধর্ম্ম প্রণালীতে অতি সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের শাস্ত্রে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব একবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং অধিকারিভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার গোলযোগের মূল পর্য্যন্ত একেবারে নিরাকৃত হইয়া আছে। অপর কোন দেশের ধর্ম্ম প্রণালীতে অধিকারিভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই চরম দৃষ্টান্ত।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, আচার লইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বড়ই আঁটা আঁটি এবং ঝকড়া ঝাঁটি দেখা যায় বটে, কিন্তু দুই একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ ভিন্ন ইহার কোন বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের সহিত অন্য বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের পরস্পরে যতই আচারভেদ থাকুক, অপর জাতীয়দিগের সহিত যত, আপনাদিগের মধ্যে কুত্রাপি তত নয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু যখন সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা সমস্ত দেশে ব্যাপক হয়েন নাই তখন ভারতবর্ষে যত:ভাষাভেদ ছিল এখন আর তত নাই। এখনও যাহা আছে, তাহার প্রতি এক সংস্কৃত ভাষার শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিহিত করিতেছে। কোন এক খানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলেগু, কি হিন্দি, কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে আপনাপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকলগুলিই ভারতবর্ষীয় মাত্রের আশু বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণ প্রণালী সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নাই—এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়; তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের ব্যবহার হয় না বটে, প্রতি বর্গের আদ্যক্ষর দ্বারা তদ্বর্গীয় সকল বর্ণের কার্য্য সিদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে উচ্চারণের যেরূপ

পার্থক্য বুঝায়, তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে; সুতরাং কালক্রমে সে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের কতক শব্দের উচ্চারণ এরূপ যে সংস্কৃত বর্ণমালায় সেগুলি অবিকল লিখিত হয় না। কিন্তু খ এবং জ এই দুইটী মাত্র বর্ণ সৃষ্ট হওয়াতে সে ত্রুটি আর লক্ষিত হয় না। আর বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের কাব্য গ্রন্থাদিতে ঐ ত্রুটি তাঁহাদিগের নিকটেও ধর্ত্তব্য হইত না।

সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে ইংলণ্ডের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপেই জানিতেছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ দুঃখ আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশা, এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এত দূর না হউক, কখন কখন ভারতবর্ষের অতি সুবিস্তৃত ভূমিভাগ সকল একচ্ছত্রের অধীন হইত—মান্ধাতা, শ্রীরামচন্দ্র, যযাতি যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, অশোক প্রভৃতি আর্য্য নরপালগণ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন—আর আকবর সাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেকানেক প্রদেশ আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সকল সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগের পরস্পর সম্মিলনোপায় অনেক দূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর এক্ষণে যে অচ্ছেদ্য, অভেদ্য আয়সশৃঙ্খলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ দৃঢ় সম্বদ্ধ হইল—ইহার ফল আরও অনেক অধিক হইবে এবং সত্বরেই ফলিবে।

সামাজিক রীতি নীতি, আচার প্রণালীর ন্যায়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে সমপ্রকৃতিক তাহা অপর জাতিদিগের রীতি পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। অপর জাতিদিগের সহিত আমাদের সকলেরই পার্থক্য যত অধিক—নিজেদের মধ্যে পৃথক্ভাব তত নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই যাইবে, সর্ব্বত্রই ঘর দ্বারের শ্রীছাঁদ, খাওয়া দাওয়ার পারিপাট্য, ক্রিয়া কলাপের রীতি পদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকার দেখিতে পাইবে।

অতি সুবোধ এবং বহুদর্শী কোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অব্দে, এই সকল বিষয়ে, আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পৃথক্‌ভাব আছে, তাহা কোন্ বৃহৎ সাম্রাজ্যে নাই?—রুসিয়ার ভিতরে, অষ্ট্রীয়ার ভিতরে ইহা অপেক্ষা অধিক না হউক, ন্যূন নয়। এখন মৌলিক বর্ণভেদের পার্থক্য ধরিয়া ইউরোপে জাতি সংঘটনের কতক চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন্ লাটিন বংশীয় স্পেনীয় এবং ইটালীয়দিগকে ফরাসীদিগের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করাইতে চাহেন—রুস সম্রাট শ্লাভ বংশীয় সকল লোককে রুসের সহিত সম্মিলিত হইতে বলেন—টিউটন্ বংশীয় জর্ম্মনেরা প্রুসিয়ার অধিনায়কতা স্বীকার করিয়া ডেন্‌মার্ক এবং হলণ্ডের প্রতি অতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জাতীয়দিগের স্ব স্ব বর্ণাত্মকতা লইয়া অনেকটা লড়াই ঝকড়া, মারামারি, কাটাকাটি হইবে এবং ইউরোপীয়দিগের জাতি সংঘটনে কতকটা বর্ণাত্মকতা সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাব বর্ণাত্মকতাতেই নিবদ্ধ নয়। দেখ, মান্দ্রাজ প্রদেশীয় লোকেরা তোমার বর্ণের লোক নহে, সে বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা আমার সহিত তোমার মিল অধিক। কিন্তু মান্দ্রাজীদের সহিত তোমার ধর্ম্মে মিল, সামাজিক রীতিতে মিল, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, আর একটি বিষয়ে মিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সর্ব্বপ্রধান বিষয়টি কি? তিনি বলিলেন—"লোক সকলের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদকে নষ্ট করিয়া সম্মিলন এবং একতা জন্মাইবার অমোঘ উপায়, এক-রাজার শাসন এবং এক শাসনপদ্ধতি—এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসম্ভূত জনগণের মধ্যেও জাতীয় ভাব জন্মে, কারণ, এক শাসনপদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল, জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি; এবং তাহাই জাতীয় ভাব জন্মিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ, এবং ঐ ভাবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ"

তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতকটা অবিকল ফলিয়াছে। তাঁহার কথা যে ইউরোপ সম্বন্ধে আরও ফলিবে, তাহার অনেক চিহ্ন স্পষ্ট-

রূপে দেখা যাইতেছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও কি সুসিদ্ধ হইবে না? তাহারও কি অস্ফুট লক্ষণ দেখা যাইতেছে না? আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জাতীয় ভাব গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, ইহাদিগের পরস্পর সহানুভূতি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে, এবং তাঁহার অনুমান ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে।

জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান।

আদমসুমারীতে বলে ভারতবর্ষের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান, অর্থাৎ প্রায় করদ এবং মিত্র এবং স্বাধীন সকল রাজ্যগুলির লোক সংখ্যা সমান। ইহাঁদিগের শাস্ত্র, বেদ পুরাণ অথবা বেদপুরাণাদি প্রসূত কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নয়, ইহাঁদিগের সংস্কার-প্রণালী ভারতবাসী অপর সকল লোকের সংস্কারের রীতি হইতে বিশিষ্টরূপে পৃথক্‌ভূত। ইহাঁদিগের সামাজিক ব্যবস্থাও ভারতবাসী অপর সকল লোকের সহিত যতদূর মিলে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়দিগের সহিত যেন কিছু অধিকতর মিলে। ইহাঁরা কোন সময়ে ভারতবর্ষ জয় করিয়া এখানে সর্ব্বস্ব কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং আপনাদিগের সেই উন্নত অবস্থার স্মৃতি, এখন পর্য্যন্তও কতকটা জাগরূক রাখিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ নিবাসী অপর সকল লোকের পরস্পর সহানুভূতি অপেক্ষা কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়। সে দিন লর্ড রিপনের আমলে ইংরাজেরা যেমন সকলে একমনা হইয়া আপনাদিগের রক্ষণী সভা সংস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন, মুসলমানেরাও, তত শীঘ্র এবং তত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে না হউক কিয়ৎ পরিমাণে সেইরূপ-সভা সংস্থাপন করিলেও করিতে পারেন। কয়েক বৎসর মাত্র গত হইল, ভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমান, এমন কি তাঁহাদিগের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষোপজীবীরাও রুস-তুরস্কের যুদ্ধের সময়ে, তুরস্কের অর্থসাহায্য করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রাভদ্র অনেক মুসলমান লাল টুপি

পরিয়া আপনারা যে তুরস্কের পক্ষপাতী, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে যখন ইংরাজদিগের সহিত পঞ্জাবের পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী সিতানা প্রদেশে আক্রেদি প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত জাতিদিগের সংগ্রাম হয়, তখনও ভারতবাসী অনেক মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের অর্থসাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফল-কথা, ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকেই ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়ের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং সকলেই হয় তুরস্ক সম্রাট, নয় পারস্ত অধিপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্ম শাস্তা বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

ভারতবাসী মুসলমানদিগের এই ভাবের অনুরূপ বস্তু ইতিবৃত্তে নূতন নহে। প্রত্যুত ইহার দৃষ্টান্ত অনেকানেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়াই দেখ, ওখানকার অধিকাংশ প্রজা বিবিধ সম্প্রদায় সম্ভূক্ত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী, কিন্তু অনেকগুলি কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আছে। কাথলিকেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের অনেকটা ভিন্নরূপ অনুবাদ করে, এবং উহাদের সংস্কার প্রণালীও কিছু ভিন্নরূপ। উহারাও ইংলণ্ডের বহিঃস্থিত পোপ উপাধিবিশিষ্ট জনৈক যাজকপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার করে। তজ্জন্য প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ইংরাজেরা তাহাদিগকে বহুকালাবধি এক প্রকার রাজদ্রোহী মনে করিত, এবং বহু দিন গত হয় নাই, কোনরূপ রাজকার্য্যে তাহাদিগের নিয়োগ হইতে দিত না। কিন্তু আজি কালি আর সেরূপ নাই। ইংরাজদিগের মন হইতে ধর্ম্মবিদ্বেষরূপ মোহের অনেকটা লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যদিও প্রটেষ্টাণ্ট এবং কাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের ছোটলোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব আছে, এবং মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে, কিন্তু, সুভদ্র কাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্টের মধ্যে বিলক্ষণ সম্মিলন এবং সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও যেমন, ধর্ম্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে।

হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে তাহার সূত্রপাত অনেক দিন হইতেই

হইয়া আসিতেছে। রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের চিরাভ্যস্ত নিয়ম এই যে, উহারা যে রাজ্য জয় করে, সেই রাজ্যের স্ত্রীলোকদিগকে অধিক পরিমাণে বিবাহ করে। ভারতবর্ষেও তাহাই করিয়াছিল। তবে এখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্য নিবন্ধন অন্যান্য দেশে যে পরিমাণে ভদ্র ঘরের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিল এখানে তাহা পারে নাই; এখানে অধিক পরিমাণেই নিম্নবর্ত্তী জাতীয়দিগের কন্যা সকল গ্রহণ করিয়াছিল। এখানকার ষোল আনা মুসলমানের মধ্যে বার আনা মুসলমান ঐরূপে উৎপন্ন। অপর চারি আনা মুসলমানও যে একেবারে দেশীয়-সংস্রবশূন্য, তাহা নহে। কতক মুসলমান মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত আর্য্যগণের সন্তান, আর কতক আর্য্যজাতীয়া গর্ভসম্ভূত মুসলমান ঔরস। এই ব্যাপার বহুশতাব্দী হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়া এক্ষণে ভারতবাসী মুসলমানমাত্রকে, আফগান, পারস্য, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি সকল দেশের মুসলমান হইতে একটী বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে—ইহাঁরা আকার প্রকারে ভারতবাসী হিন্দুর যত সদৃশ হইয়াছেন, বহিঃস্থ কোন জাতীয় মুসলমানের আর তত সদৃশ নাই।

আকার ইঙ্গিতেও যেমন, আচার ব্যবহারেও সেইরূপ। ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান, জ্যোর্তিবিদ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান এবং সমাদর না করেন—যেখানে গোবধ করিতে এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দুদিগের পর্ব্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহাদি কার্য্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙ্গালার এবং দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই! কারণ ঐ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সঙ্কল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণ সজ্জনের অতিথিসৎকার করেন।

আরও দেখা যায় সামান্য মুসলমানদিগের মধ্যে পৈতৃক অধিকার সম্বন্ধে সুবহুস্থলে হিন্দুদিগের প্রথাই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল মুসলমানদিগের কন্যাগণ মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে যে স্ব স্ব পিতৃধনভাগিনী সে কথা আর মনেও করে না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিভিন্নতা জন্য তীব্র বিদ্বেষ বেশী দিন থাকে না। বর্ণভেদ প্রণালী গ্রাহ্য থাকায় এখানে বৈবাহিক বিষয়ে ও আহারাদিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া চিরাভ্যস্ত। জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটী বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পরন্তু এইরূপ সম্মিলন ব্যাপার যে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পায়, তাহা নহে। যদি আরবাদি মুসলমান রাজ্য হইতে কোন মৌলবী এদেশে আসিয়া অথবা এখানকারই তেমন ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত এবং বিদ্যাসম্পন্ন কোন বড় মৌলবী মুসলমানদিগের উত্তেজনা করেন, তবে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছু কালের জন্য যতদূর পারেন, হিন্দুর অনুকরণ ছাড়িয়া দেন। ১৮৪৮ অব্দের পর একবার ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ নামক একজন মৌলবী আসিয়া বঙ্গদেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস খাইতে, বিধবার বিবাহ দিতে, দেব পূজার দ্রব্য গ্রহণ না করিতে এবং হিন্দুর নিমন্ত্রণে না যাইতে শিখাইয়া ছিলেন। কিন্তু ঐরূপ উত্তেজনার ফল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। এবং দেখা যাইতেছে যে, ওরূপ উত্তেজনাও ক্রমে ক্রমে কালে দূরবর্ত্তী, এবং প্রসরতায় স্বল্পস্থলব্যাপী হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বর্দ্ধিত করিবার অপর একটী প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার কখন স্পষ্টাক্ষরে কখন ইঙ্গিতক্রমে অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনো

মধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটা গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমানজাতি এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বকালের পারস্যভাষায় সুশিক্ষিত, সদাচারসম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্দ্ধাংশ দেখা যাইত না! ছাপরা নগরবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটী সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উহাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক মুসলমানদিগের মধ্যে এমনি উদারচেতা পবিত্রকর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম "উও ইয়েঃ হ্যায়" আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে, আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী সর্ব্ব প্রদেশ সাধারণ-প্রায় হিন্দীভাষা-প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্ম্য শিল্প একটী উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুসংযুক্ত হইয়াছে এবং সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটি ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাখিবার জন্য কোন কোন ইংরাজ আর একটী উপায় অবলম্বন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে ঐরূপ কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, দুরভিসন্ধিতে রাজ্য পালনের উপায় নাই—তাঁহারা জানেন যে. রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি এতদুভয়ের পার্থক্য বাহ্য মাত্র, আভ্যন্তরিক নহে। এই প্রকৃত তথ্য বুঝিয়াই মহারাজ্ঞীর নীতিবিশারদ মন্ত্রিবর্গ এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা পুনঃ পুনঃ স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কাহার কি ধর্ম্ম এবং কাহার কি জাতি তাহা বিচার না করিয়া সমস্ত প্রজাকে সমভাবে পালন করা হইবে। কিন্তু স্বল্পদর্শী অনেকানেক ইংরাজ উল্লিখিত উচ্চতম রাজনীতিসূত্রটী বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে অতি যত্নপূর্ব্বক প্রাচীন রোমীয়দিগের ভাষা, সাহিত্য, ব্যবস্থাশাস্ত্র এবং রাজনীতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যত বিজিগীযু জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে রোমীয় জাতির রাজনীতিই বিশিষ্টরূপে দৃঢ় সম্বদ্ধ বলিয়া ঐ সকল ইংরাজদিগের সংস্কার হইয়া থাকে। সেই বাল্যসংস্কার বশতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, রোমীয়েরা যেমন শত্রুরাজ্যের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের সকলগুলিকেই জয় করিয়াছিল, সেইরূপ প্রজায় প্রজায় মনের মিল হইতে দেওয়াই বিজয়লব্ধ রাজ্য-পালনের বিধি। এই ভাবিয়া উহাঁরা সর্ব্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না হইতে পায়, তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন। এই রূপে ঐ সকল ইংরাজদিগের কখন এদিকে কখন ও দিকে ঝোঁক দেওয়াতে হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িতে পারে। ঐ সকল ইংরাজের এই কৌশলটী যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোমসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই।

অতএব ঐ রাজনীতি সর্ব্বতোভাবে দূষ্য। কিন্তু উহা যতই দূষ্য হউক ভারত-বর্ষীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়াই উচিত। ঐ সকল ইংরাজ, মুসলমানের আদর যতই করুন, মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া যতই কথা কহুন, আর পুস্তিকাদি প্রণয়ন করিয়া যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন—তাহাতে হিন্দুদিগের কোন মতেই ঈর্ষ্যা করা বৈধ নহে। ঈর্ষ্যা করিলেই উহাঁদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। আজি কালি মুসলমানের দিকে ঝোঁক পড়িতেছে। দুই চারিটি মুসলমানের ভাল চাকরী পাইবার পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে। আরও একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজ বিবিরা একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন মুসলমানেরা তাঁহাদিগের উদ্বাহযোগ্য। উহারা যদিও পেগম্বর মহম্মদকেই বিশিষ্টরূপে মান্য করে তথাপি ঈশাবেন মেরিয়ানকে একেবারে ফেলনা করে না। অতএব মুসলমানদিগের ভাগ্যে দুই চারিটী বিবি বিবা-হও ঘটিতে পারে!

আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজ, ভারতবাসীর মধ্যে যদি কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে। মুসলমানের হাত হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন এবং মুসলমানের মধ্যেই সম্মিলন-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অধিক আছে। বৈদেশিক রাজবলও মুসলমানদিগেরই পৃষ্ঠপূরক হইতে পারে। আর ভূতপূর্ব্ব সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে যদিও হিন্দু সৈনিকে-রাই বিদ্রোহ ঘটনার সূত্রপাত করে, তথাপি মুসলমানই সাম্রাজ্যাসনে বসিয়া-ছিলেন।

—•(০)•—

জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি।

সমুদায় ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় উনত্রিশ কোটী; খৃষ্টানের সংখ্যা আদম সুমারীতে সাড়ে বাইশ লক্ষ অর্থাৎ একশত ত্রিশ জনে একজন মাত্র হইল; সুতরাং জাতীয়ভাবের বিচারে উহারা নগণ্য।

কিন্তু সংখ্যাতে কম বলিয়াই যে উহারা নগণ্য তাহা নহে। উহাদিগের

ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের সহিত জাতীয়ভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। ইউরোপীয় জাতিদিগের সাম্যবাদ, যদি মুসলমানদিগের সাম্যবাদের ন্যায় কথায় এবং কাজে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে দেশীয় কৃতখৃষ্টানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থার একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু ইউরোপীয় পাদ্রিরা শুদ্ধ খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই ছাড়িয়া দেন; মুসলমান বাদসাহ, নবাব, প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুর জাতি মারিয়া তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক আপনাদের ভাল ঘরে বিবাহ দেওয়া এবং কোন জায়গীর কি চাকরী, কি তাহার অন্ন সংস্থানের কোন একটা উপায় করিয়া দেওয়া, কি তাহাকে লইয়া এক সঙ্গে খাওয়া বসা করা,, ইহার কিছুই করেন না। তবে আজি কালি হিন্দু এবং মুসলমানকে না দিয়া কৃত খৃষ্টানদিগকে সকের ফৌজ বা ভলণ্টিয়র হইতে দিবেন বলিয়াছেন। তাহাতে ফল কি হয়, পরে বুঝা যাইবে এ পর্য্যন্ত কৃতখৃষ্টানেরা প্রায়ই জাতীয় ভাব পরিচ্যুত হইতে পারেন নাই। উহাঁরা আর সামান্য ফিরিঙ্গিরা প্রায় একই ভাবাপন্ন হইয়া আছেন। উভয়েরই ইচ্ছা, ইউরোপীয়দিগের নিকট ঘেঁসিয়া বসেন, কিন্তু ইউরোপীয়েরা উহাঁদিগের ঘেঁস কিছু মাত্র সহিতে পারেন না। কখন পারিবেন বলিয়াও বোধ হয় না—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে ইউরোপীয় জাতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অপর জাতির প্রতি ঘৃণা একটী মৌলিক ধর্ম্ম। এমন ইংরাজ জাতির ভাষা শিখিলেই বা কি, আর তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই বা কি, আর তাহার পরিচ্ছদাদি ধারণ করিলেই বা কি—ইংরাজ কিছুতেই পরকে আপনার করিতে পারেন না। যদি ভারতবর্ষের রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত না হইয়া পোর্ত্তুগীজের কিম্বা ফরাসীর হস্তগত হইত, (কোন সময়ে তাহার উপক্রমও দেখা দিয়াছিল) তাহা হইলে ভারতবর্ষের সমূহ দুর্ভাগ্য হইত সন্দেহ নাই। উহাদিগের অধীন থাকিলে ভারতবর্ষের কৃত-খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত, সেই সকল স্বধর্ম্মত্যাগী লোকের কতকটা গৌরব হইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকার্য্য সকল

তাহাদিগেরই হস্তগত হইত, এবং উঁহারা একেবারেই ভারতবর্ষীয় ভাব পরিহার পূর্ব্বক জন্মভূমির বক্ষঃস্থলে শেলস্বরূপ বিদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু ইংরাজ এখানকার রাজা হওয়ায়, কৃতখৃষ্টানেরা কোন বিশেষ অধিকার পায় নাই, অপর সকল ভারতবাসী যে পরিমাণে ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত হইয়া আছে, উঁহারাও সেইরূপ আছে;—সুতরাং জাতীয়ভাব পরিচ্যুত হইতে পারে নাই।

আমি দেখিয়াছি, যাঁহারা স্বয়ং খৃষ্টান হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মধ্বজী হইয়া দেশীয় ধর্ম্ম প্রণালীর নিন্দা করতঃ যেমন সকলকে ভজাইবার চেষ্টায় মত্ত হইয়া বেড়ান, কিছু দিন অতীত হইলে, তাঁহাদের আর ততটা তেজঃ থাকে না, স্বজাতীয় লোকের মত নম্রস্বরে বিনা নিন্দাবাদে, খৃষ্টীয় গৌরব অন্তর্হৃদয়ের অন্তর মধ্যে নিহিত করিয়া দেশীয় লোকের সহিত এক পরামর্শী হইয়া বেশ চলিতে পারেন, এমন কি, গুরু-স্থানীয় পাদ্রি সাহেবদিগেরও স্বার্থ-চিন্তা এবং দাম্ভিকতার উল্লেখ করিতে পারেন। আর যাঁহারা কৃত খৃষ্টানদিগের সন্তান, তাঁহাদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম ভজাইবার চেষ্টা ত কখনই দেখিতে পাই নাই। উহাঁদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মজনিত পরধর্ম্ম বিদ্বেষ একেবারেই জন্মে না বলিলেও চলে। উহাঁরাও অপরাপর ভারতবাসীর ন্যায় আপনাপন পিতৃমাতৃধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়াছেন—উহাঁদের সহিত অপর সকলের ইতর বিশেষ থাকিবে কেন?

কৃত-খৃষ্টানদিগের সন্তান সন্ততি, বঙ্গদেশ বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা মধ্য প্রদেশ, এই সকল আর্য্যবহুল স্থানে যত দেখা যায় তাহা অপেক্ষা অনার্য্যবহুল মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং গোয়া নগরের সন্নিহিত পশ্চিমোপকূলে অনেক অধিক। ঐ সকল প্রদেশে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচার, কাথলিক যাজকবর্গের দ্বারা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। ঐ যাজকদিগের মধ্যে অনেক সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষি মুনি অথবা মহম্মদীয় ফকীর দরবেশদিগের ন্যায়, অতি বিনম্রভাবে পার্থিব বিভবশালিতা এবং ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন—যাহার ধর্ম্ম

নষ্ট করিতেন, সেই হিন্দু মুসলমানের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক গাড়িঘোড়া চড়িয়া বাবুয়ানা করিতেন না, গেরুয়া বস্ত্র পরিতেন, কুটীরে থাকিতেন, শাকান্ন খাইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যে সকল লোকের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহারাও সমধিক পরিমাণে অনার্য্যকুলসম্ভূত, ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচারে অপেক্ষাকৃত অসমর্থ। এই সকল কারণের সমবায়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলেই কৃতখৃষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়া আছে।

এক দিন পন্দিচেরি হইতে তাঞ্জোর নগরে যাইবার পথে একটি তদ্দেশীয় খৃষ্টানের সহিত রেলের গাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া চিনিতেই পারি নাই, তাঁহার পরিচ্ছদ তদ্দেশ প্রচলিত পরিচ্ছদ হইতে অভিন্ন, মাথায় উষ্ণীষ—উষ্ণীষ খুলিলে. দেখা গেল যে মাথার কিয়দ্ভাগ ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা পরিষ্কৃত এবং মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "সুব্রহ্মণ্য"—তাহার অগ্রপশ্চাৎ 'জন' কি 'মাইকেল' কিছুই শুনিলাম না। অতএব জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" উত্তর করিলেন "তা বই কি!" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা বই কি বলিলেন কেন?" তিনি বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ বংশ জাত কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; আমার প্রপিতামহ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, সেই অবধি আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন অপর জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নাই, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খৃষ্টান"। "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" "তাঞ্জোরের মহাদেবের মন্দিরে যে মেলা হইবে তাহাই দেখিতে যাইব। আমার মাতা, ভগিনী, পিতৃস্বসা প্রভৃতি পরিবারবর্গ অপর গাড়িতে আছেন।" "স্ত্রীলোকেরা কি দেবতার নিকট পূজাদি মানসিক করিয়া থাকেন?" "কখন কখন করেন—আমরা ধর্ম্মই বদলাইয়াছি, জাতি বদলাই নাই।"

ভারতবর্ষে কৃত-খৃষ্টান ভিন্ন অপর যত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আছেন তাহার মধ্যে ইঙ্গরেশীয় বা ফিরিঙ্গিরাই প্রকৃত প্রস্তাবে এতদ্দেশবাসী। উহারা প্রায় ৬০ সহস্র পরিমিত। উহাদের এক দল সম্প্রতি আহার, বিহার, গৃহ এবং

পরিচ্ছদাদি দেশীয় মুসলমানদিগের অনুরূপ করিবার কথা তুলিয়াছেন। পাদ্রি টৈলর সাহেবের ন্যায় কোন কোন ইউরোপীয়ের প্ররোচনায় যদি অতদূর করিয়া উঠিতে না পারেন, তথাপি উহাদিগের মধ্যেও যে জাতীয় ভাবের কথঞ্চিৎ প্রবেশ হইয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

খৃষ্টান ভিন্ন বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে সকল লোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে এক মাত্র পার্সি-ভিন্ন অপর সকলেই আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের শাখাবিশেষ বলিয়াই জানেন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সহানুভূতি সম্পন্ন।

এতদ্ভিন্ন এই মহাদেশ মধ্যে অপর কতকগুলি লোক আছে তাহাদিগকে আদিমনিবাসী বলা যায়; তাহাদের সমষ্টিসংখ্যা ৯২ লক্ষ। ইহারা ভারতবর্ষের কোন এক প্রদেশে নাই। বন পর্ব্বতময় ভূমিতে এই সকল লোকদিগের বিভিন্ন গোষ্ঠীয়েরা বাস করে। শুনা যায়, তাহাদের ভাষাসংখ্যা ১৫০ এর অন্যূন। ঐ বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের আকার, ভাষা ও আবাস সাদৃশ্যে প্রধানতঃ তিন দল ধরা যায়। এক দলকে হিন্দু-তাতার জাতীয় বলা যায়। ইহারা হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চলবাসী এবং খস, গারো, ডফ্‌লা, নাগা কুকি, মেক, লেপ্‌চা প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দল কোলেরীয়। ইহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতাঞ্চলবাসী এবং সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডার, জুয়াং, নামে অভিহিত। তৃতীয়, দ্রাবিড়ীয় দল দাক্ষিণাত্য পর্ব্বতবাসী ও গোন্দ, তোড়া, ধাঙ্গড় প্রভৃতি নাম বিশিষ্ট।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা এই তিন দলের ভাষা ভেদ নিরূপণ পূর্ব্বক উত্তরাঞ্চলবাসীদিগকে পৈশাচ ভাষী, মধ্য পর্ব্বতবাসীদিগকে প্রাকৃতভাষী এবং দাক্ষিণাঞ্চলবাসী আদিমদিগকে রাক্ষস-ভাষা-ভাষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীয় ভাবের অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই আদিমেরা ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অনুষ্ঠান বাহুল্য এবং অধিকারী ও জাতিভেদ স্বীকার নিবন্ধন সুবিস্তৃত ভিত্তি সম্পন্ন হিন্দুসমা

এই আদিমদিগকে সভ্যাবহ ও উন্নত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। হিন্দুসমাজ সেই উপযোগিতা এমন সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছে যে, ৯২ লক্ষমাত্র, এক্ষণে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে অবশিষ্ট আছে। মুসলমানেরা প্রকৃত আদিমদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এখন খৃষ্টান পাদ্রিরাও যে আপনাদের মতবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহাও বোধ হয় না। আদিমদিগের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদয় হিন্দুসমাজের ভিতর আসিয়াই হইতে পারে এবং তাহাই হইবে।

জাতীয়ভাব—ঐতিহাসিক প্রকৃতি ভেদ।

জাতিভেদে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়। নিরক্ষর বর্ব্বর জাতীয়েরা আর কিছু না পারুক, কয়েকটী কবিতা বিরচন করিয়া, আপনাদিগের জাতিসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনা গুলি স্মরণ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ ঐরূপ কবিতাই সকল দেশের ঐতিহাসিক শাস্ত্রের মূল। ঐ গুলির দ্বারা পূর্ব্বগত ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকে, সেই ঘটনাবলীর বিচার দ্বারা রাজনিয়মের এবং বীরতা, ধীরতা, চতুরতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ প্রদত্ত হইয়া লোকশিক্ষার বিশিষ্টরূপ সহায়তা হয়। ঐ গীতীতিহাসগুলি জাতীয় উন্নতি সহকারে পরিস্ফুট হইয়া জাতীয় প্রকৃতির অতি সুস্পষ্টরূপ অভিব্যক্তি করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিতেছি।

তাতার বা তুরাণীয় জাতিদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইতিহাস গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থ গুলিতে কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে—কিন্তু ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সময়ের পূর্ব্বাপর ক্রম ভিন্ন যে অন্য একটা গূঢ় বন্ধন আছে তাহা ঐ সকল ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ সময়ের পর-পূর্ব্বতা কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অতি স্থূল চিহ্নমাত্র। তাতারজাতীয় লোকেরা যেমন অনুকরণ-প্রবণ এবং শিল্প নিপুণ

কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিচারে তেমন সূক্ষ্মদর্শীও নয় এবং তদনুযায়ী কল্পনা-কুশলও নয়। তুরাণীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চীনীয় জাতির ইতিহাস গ্রন্থগুলি এইরূপে লিখিত—অমুক সম্রাটের রাজ্যকালে অমুক বর্ষের অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক প্রদেশে বিদ্রোহ হইয়াছিল, বা অমুক নদীর জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল বা সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হইয়াছিল। এরূপ ইতিবৃত্ত এক প্রকার পঞ্জিকা; এ গুলিকে পঞ্জিকেতিহাস বলা যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রত্যন্ত ভাগে, তাতার জাতীয় লোকের বসতি বা প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল সে সকল ভাগেও ঐরূপ পঞ্জিকেতিহাস বিরচিত হয়। যথা আসামে, নেপালে, কাশ্মীরে। কাশ্মীর দেশাগত রাজতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানিও ঐরূপ কোন পঞ্জিকেতিহাসেরই সংগ্রহ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তাদিগের ইতিহাস গুলিতেও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বোধের উপায়, পর পূর্ব্ব সময়ের নির্দ্দেশ মাত্র, আর কিছুই নহে। প্রত্যুত ঘটনাবলীর বিবরণে, ঐ সম্বন্ধের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সর্ব্বস্থলেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন কারণের নির্দ্দেশ করা যেন অবৈধ জ্ঞান করিতেন। অমুক সেনাপতি এমত বীর পুরুষ হইয়াও অমুক নগরটী জয় করিতে পারিলেন না, আর অমুক তাহা অপেক্ষা অল্পজ্ঞান এবং শান্তস্বভাব হইয়াও সেই কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারিলেন কেন? আরবীয় গ্রন্থকারের মনে, যদি কখন ওরূপ প্রশ্ন উদয় হইত, তিনি এক কথায় তাহার মীমাংসা করিতেন বলিতেন—আল্লার কোদরৎ। আরবেরা যে একান্ত স্বধর্ম্ম-নিরত এক-মনা জাতি তাঁহাদিগের ইতিহাস গ্রন্থও সেই ভাব সুব্যক্ত করে।

য়িহুদীতে এবং আরবে অনেকটা মিল আছে। উভয়েই সেমেটিক বংশীয় উভয়েই ঘোর একেশ্বরবাদী, উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্মনিরত, উভয়েই জাগতিক কার্য্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান স্বীকার করেন। উহাঁদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক আরব শিখিয়াছেন যে, মৃত্যুর

পর স্বর্গ নরক ভোগ আছে। য়িহুদী সে কথা জানে না। সুতরাং কোন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যদি দুঃখ, কষ্ট, পরাভব প্রাপ্ত হয়, আরব বলিতে পারেন যে, উহা সয়তানের কারসাজি; মৃত্যুর পর, ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার সমস্ত মঙ্গল হইবে। য়িহুদীর পক্ষে ঐ পথ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি যদি দুঃখে পতিত এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, ইতিহাসে তাদৃশ ঘটনা নিবদ্ধ করিতে হইলে য়িহুদী গ্রন্থকারকে একটী কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাকে বলিতে হয় যে, ঐ দৃষ্টতঃ পুণ্যবান ব্যক্তি অন্তরে পাপী ছিল। য়িহুদী অন্য কোন পাপের বড় একটা উল্লেখও করেন না—তাঁহার আপনার অভীষ্ট যাভেঃ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং ভয় যাহার কম বা নাই, সেই পাপাত্মা। ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়া, য়িহুদী আপনার ইতিহাস গ্রন্থকে "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়:" এই একটী সূত্রে সম্বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন য়িহুদীর ইতিহাস তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির দর্পণ স্বরূপ হইয়া আছে।

ভারতবর্ষীয়দিগেরও ইতিহাসের মূলসূত্র "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়:"—কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ সূত্রের গ্রন্থনপ্রণালী স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বোধে, পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা, অধিকতর নিপুণ। তাঁহারা ঐ সম্বন্ধের স্থূল লক্ষণ যে, কারণের "পূর্ব্ববর্ত্তিতা" তাহার অপেক্ষা ঐ সম্বন্ধের যে গূঢ়তর লক্ষণ "অনন্যথা সিদ্ধি" তাহা বিশিষ্টরূপেই উপলব্ধ করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ঐ সম্বন্ধের আরও অন্তর্ভেদ করিয়া দেখেন এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধেরও কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐশী শক্তির সর্ব্বব্যাপিতা এবং সর্ব্বময়তা উপলব্ধ করেন। সুতরাং ইহাঁদের হস্তে "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়: সূত্রটী ভিন্ন ভিন্ন দুইটী থাই সংযুক্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ দুইটী থাই-য়ের একটীর নাম "প্রাক্তন' অর্থাৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মকূট; দ্বিতী-য়টীর নাম 'পুরুষকার' অর্থাৎ ধর্ম্ম সহকৃত বর্ত্তমানকালবর্ত্তী বুদ্ধি বলাদি কর-ণের প্রয়োগ। ঐ দুইটীর অপর নাম "পূর্ব্বতপস্যা" এবং "বর্ত্তমান উদ্যোগ'। সুতরাং পূর্ব্ব তপস্যা এবং বর্ত্তমান উদ্যোগ উভয়ের সমবায় না হইলে ভারত বর্ষীয়দিগের লক্ষণে লক্ষিত 'ধর্ম্ম' হয় না এবং 'ধর্ম্ম' না হইলে জয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ঐ ধর্ম্ম সূত্রে সম্বদ্ধ এবং 'পুরাণ' নামে বিখ্যাত।

কোন কোন স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় নব্য পণ্ডিতের মতে, আমাদিগের পুরাণোক্ত ব্যাপার সমুদায় পার্থিব ভূত সমূহের অথবা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির, কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব সমুদায়ের, কবি কল্পনা মাত্র—প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। কিন্তু ঐ সকল পণ্ডিতের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। প্রাকৃতিক বস্তুতে এবং প্রাকৃতিক শক্তি সকলে বিশিষ্ট সজীবতায় এবং মানব ভাবের আরোপ হইবারও মূল, ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। কবিদিগের হস্তে প্রকৃত নর, নারী, বস্তু, ঘটনাদি আসিয়া উপস্থিত হইবার পর, সেই গুলি উপমা, অত্যুক্তি, রূপকাদি অলঙ্কারে ভূষিত এবং সরস হইয়া কাব্যেতিহাসরূপে প্রণীত হয়।

তবে কি, যাঁহারা সৌরাদি ভাবের কল্পনামাত্র বলিয়া পুরাণবর্ণিত ব্যাপার সকলের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের সকল কথাই অযৌক্তিক? তাহাও নয়। মূলে প্রকৃত ঘটনা থাকে, কালক্রমে লোকে সেই ঘটনার আনুসঙ্গিক অনেকানেক কথা বিস্মৃত হয়, তৎপরে কবিগণ, উহাদিগকে স্ব স্ব হৃদয়ভাবে রঞ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। কবি-হৃদয়ে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় কবির হৃদয়ে, প্রাকৃতিক ভাব সবিশেষ প্রবল। এই জন্য ভারতবর্ষীয় কবির প্রণীত কাব্যেতিহাস গুলিতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিশেষ সংস্রব হইয়াই আছে। এস্থলে একটী তথ্যের স্মরণ করা আবশ্যক—জাগতিক বস্তু এবং কার্য্য মাত্রেই এবম্ভূত যে, তাহার প্রত্যেকটীতেই সকলটী থাকে। এই জন্য যে-কোন ঘটনাই উপস্থিত হউক, কবির হৃদয়ে যে ভাব তৎকালে জাগরূক তাহাই ঐ প্রকৃত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পুরাণ গুলিকে অলীক কাব্য রচনা মাত্র মনে করা ভুল। উহারা কাব্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্য। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। পুরাণে কথিত আছে, ভগবান, বামনাবতারে বলি নামক অসুর রাজাকে পাতাল তলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ নগরের নিকট সাদ্রাস নামক স্থানে গিয়া দেখিয়া আইস, বলি রাজার পুরী সমুদ্রগর্ভস্থ হইয়া আছে। বামন=ত্রিবিক্রম=সূর্য্য; বলি=পূজার উপহার। ইহা প্রাকৃতিক তথ্য; পূজোপহারের সন্নিধানে

ভগবান বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার; নচেৎ পূজার সম্ভাবনা হয় না। ইহা আধ্যাত্মিক তথ্য। এই উভয় তথ্যের প্রকাশেই কবিবাঞ্ছনা লক্ষিত হয়। কিন্তু সুসমৃদ্ধ মহাবলিপুর যে সমুদ্রতলস্থ বা পাতালপ্রবিষ্ট এটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

ভারতবর্ষে কাব্যেতিহাসের প্রণয়ন বৌদ্ধদিগের সময়ে পূর্ণ হয় নাই—তবে ঐ সকল গ্রন্থ পূর্ব্বে যত শিথিল সম্বন্ধ হইত, বৌদ্ধ সময় হইতে তাহা অপেক্ষাও কিছু অধিকতর শিথিল সম্বন্ধ হইয়াছে, বোধ হয়। কিন্তু রচনা প্রণালী মূলতঃ একই রূপ আছে। রামায়ণের, মহাভারতের এবং বৃহৎ কথার কাঠাম ভিন্ন নয়—প্রাক্তনবাদ, পুরুষকার বাদ এবং পরকাল বাদ, এই ত্রিকালবাদিতা সকল গুলিতেই সমান। মুসলমানদিগের অধিকার কালেও যে কতকগুলি পুরাণ এবং উপপুরাণের রচনা হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐ সময়ে সংস্কৃত রচনা অনেক কম হইয়া আসিয়াছিল এবং হিন্দি প্রভৃতি প্রচল ভাষার বল বৃদ্ধি হইয়াছিল। হিন্দি ভাষার সর্ব্ব প্রধান যে কাব্যেতিহাস চাঁদকবির বিরচিত, তাহাও সর্ব্বতোভাবে পুরাণ লক্ষণাক্রান্ত। ইহার পর হইতে আর ঐ লক্ষণাক্রান্ত কোন বৃহৎ গ্রন্থের রচনা হয় নাই। যে দুই একখানি গ্রন্থ একাধিক প্রদেশব্যাপক হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকালের কথা লইয়া কাব্যগ্রন্থমাত্র, উহাদিগের কোনটীতে ঐতিহাসিক ভাব নাই। তবে দাক্ষিণাত্যে দুই একখানি ঐতিহাসিক কাব্য মুসলমানদিগের পরেও প্রণীত হইয়াছে। ইংরাজদিগের অধিকারের সময় ওরূপ গ্রন্থাদি কি সংস্কৃতে কি কোন চলিত ভাষায় আর প্রণীত হয় না, শুদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ অথবা অনুবাদ সদৃশ ইংরাজী ছাঁচে ঢালা পুস্তক বিরচিত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলিতে গ্রীকদিগের, এবং তদনুকারী রোমীয়দিগের ইতিহাসই বুঝেন; আর আপনাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া, য়িহুদী দগের গ্রন্থকেও ইতিহাসের বহির্ভূত করেন না—কিন্তু

য়িহুদীদিগের গ্রন্থেও সন তারিখের কোন উল্লেখ থাকে না। গ্রীক এবং রোমীয়েরা বিশিষ্টরূপেই স্বদেশবৎসল ছিল। স্বদেশবাৎসল্যই তাহাদিগের মুখ্য ধর্ম্ম। তাহারা ঐ সূত্রে আপনাদিগের ইতিহাস মালিকা সমস্ত অতি সুন্দররূপেই গ্রথিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু-উহাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য, স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) গ্রীক গ্রন্থকার লিখিলেন, মারাথনের যুদ্ধক্ষেত্রে দশ সহস্র পরিমিত গ্রীক সৈন্য, তিন লক্ষাধিক পারসীক সৈন্যের পরাভব করিয়াছিল। আমরা বাল্য-কালে উহা পাঠ করিলাম, গ্রীক গৌরবে মুগ্ধ হইলাম, এবং ওরূপ ঘটনার কারণও শুনিলাম যে, গ্রীকেরা প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীর অধীন থাকাতেই ওরূপ অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল। বয়স হইলে, পারসীক দিগের বিরচিত ইতিহাসে ঐ ব্যাপারের কিরূপ বর্ণনা আছে, দেখিবার যত্ন করিলাম। কিন্তু "মারাথনের" এবং ঐরূপ অত্যদ্ভুত যুদ্ধ ব্যাপার সমস্তের, কোন উল্লেখ পাইলাম না। (২) গ্রীক গ্রন্থকার স্পার্টা নগরের ব্যব-স্থাপক লাইকর্গসের চরিত্র বর্ণন করিলেন। কি অত্যদ্ভুত চরিত্র! মানুষ কি অমন সাধুশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে? মানিলাম, গ্রীকেরা সত্য সত্যই দেবপ্রকৃতিক ছিল। পরে জানিলাম, জর্ম্মন ঐতিহাসিকেরা বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, লাইকর্গস নামা কোন ব্যক্তি কখন স্পার্টানগরে জন্মিয়াছিল কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই! এই রূপে গ্রীক এবং রোমীয় ইতিহাস বিবৃত ঘটনা সমস্তের সত্যাসত্য বিচার অতি কঠিন ব্যাপার, এবং সর্ব্বতোভাবে সন্দেহসঙ্কুল। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হয় যে, যেমন গ্রীকদিগের শিল্পকার্য্য সমূহে মানুষভাবের প্রাধান্য, প্রাকৃতিকভাবের অপ্রা-ধান্য, ইতিহাসেও তদ্রূপ। অসত্য ঘটনা গুলিও ঠিক সত্যের অনুরূপ করিয়া বর্ণিত। সেগুলি প্রাকৃতিকভাবে রঞ্জিত হইয়া অমানুষরূপ গ্রহণ করে নাই।

নব্য ইউরোপীয় জাতীয়দিগের ইতিহাস গ্রন্থ সকল গ্রীক এবং রোমীয়-দিগের হইতেই অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত। এই জন্যই উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ অল্প। নব্য ইউরোপীয়দিগের ইতিহাস প্রায় সকলগুলিই একই

ধরণের। আর উহাঁরা পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক, এই জন্য উহাঁদিগের ইতিবৃত্তে অসত্য বর্ণনাও কিছু কম হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ফরাসী, জর্ম্মণ, ইংরাজ প্রভৃতির ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি ঠিক একই ভাবে লিখিত নহে। চিনীয়দিগের কাল-নিষ্ঠতা, আরবদিগের ঈশ্বর পরায়ণতা; ইহুদী-দিগের ঐহিক নিষ্ঠতা, ভারতবর্ষীয়দিগের কার্য্যকারণ-প্রবণতা এবং গ্রীক-দিগের স্বদেশ-বাৎসল্য. যেমন ঐ ঐ জাতির বিশিষ্টভাব ব্যক্ত করে, কতক পরিমাণে জর্ম্মণদিগের অনুসন্ধিৎসা, ফরাসিদিগের নিপুণতা এবং ইংরাজদিগের কার্য্যপরতা তত্তজ্জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলিতেও বিশিষ্টরূপেই প্রকট হয়।

ফলতঃ সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দর্শন শাস্ত্রাদি তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রদর্শন করে। অধিকারিভেদ ও বর্ণভেদ অপর কোন ধর্ম্মে বা সমাজে স্বীকৃত হয় না, সে জন্য কি আমাদের ধর্ম্ম বা সমাজ নাই বলিবে? সেইরূপ ভারতবাসীদিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় গ্রীক বা ইউরোপীয়দিগের ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, একথা অসঙ্গত। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থ না থাকিলে যে জাতীয় ভাবের অসদ্ভাব বুঝায় সে কথা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না। আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাস আছে। কোন সুবোধ ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদিগের গ্রন্থগুলি পৃথিবীর অপর সকল জাতির গ্রন্থ হইতে বিচিত্র—ইহাই তোমাদিগের জাতিত্বের অনপনেয় চিহ্ন—যতদিন রামায়ণ থাকিবে, তত দিন হিন্দুজাতিও থাকিবে।"

——:*০*০*:——

জাতীয় ভাব—উহা সম্বর্দ্ধনের পথ।

কর্ম্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করায় ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাবসিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্দ্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।

কিন্তু নিষ্কামতা যদিও মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী এবং শিক্ষণীয় এবং শাস্ত্র-সম্মত, তথাপি সকামতাই মনুষ্যের মনে অত্যন্ত প্রবল। সদুপদেশ এবং সুশিক্ষার বিশেষ বল না পাইলে, আমরা কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতে চাই না। যে কাজটী করিব, তাহা সফল হইবে কি না হইবে তাহা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখি. এবং ভাবিয়া যদি মনে মনে বুঝিতে পারি যে, কার্য টী সফল হইবে, তাহা হইলেই তাহাতে হাত দিয়া থাকি। জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের চেষ্টায় আমরা সফল হইতে পারিব কি না, উহার যে সকল ব্যাঘাত এবং অন্তরায় উপস্থিত হইয়া আছে বা হইতে পারিবে, তজ্জন্য বিফল প্রয়াস হইব কি না—এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, এবং উহার সদুত্তরপ্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক। চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা বোধ হইলেও, আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবশ্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হইবে বটে—কিন্তু যদি উহা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর আনন্দ এবং উৎসাহ জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অতএব একবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে, কালক্রমে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ এবং দৃঢ়তর ও গাঢ়তর হইতে পারিবে ; না উহা এখন যতদূর আছে তাহাই থাকিবে ; না আরও শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্বায়ী হইয়া যাইবে।

ভবিষ্যৎকালে কোন্ বস্তুর অবস্থা কি হইবে, তাহার অনুমান করিতে হইলে, দেখিতে হয় যে. যাহা আছে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সেইটির অনুকূল কি প্রতিকূল। প্রকৃতিই চিরস্থায়ী ; সুতরাং উনি যাহার অনুকূলে তাহার স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধি. এবং উনি যাহার প্রতিকূলে তাহারই ক্ষয় এবং বিনাশ। প্রকৃতি-শক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের জাতীয়-ভাবের অনুকূলে না প্রতিকূলে ? কোন্ জাতি সম্বন্ধে প্রকৃতির ভাব কিরূপ, তাহা জানিবার উপায় সেই জাতির ইতিবৃত্ত। বিভিন্ন জাতির ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী, তত্তজ্জাতীয় লোকের প্রতি প্রযুক্ত যাবতীয় প্রকৃতি শক্তিরই ফল। অতএব ভারত-বর্ষের অতীত ইতিবৃত্ত হইতেই, ভবিষ্যতে আমাদিগের জাতীয়-ভাবের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সুব্যক্ত হইতে পারে।

ইতিবৃত্ত বলেন—এই মহাদেশে, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, কোলেরীব, দ্রাবিড়ীয়, তাতারীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসম্ভুক্ত বিভিন্নাকার লোক সকল বাস করিত, উহাদিগের মধ্যে ভাষার ভেদ বহু শতাধিক ছিল, এবং উহাদিগের ধর্ম্মভেদেরও পরিসীমা ছিল না—গোষ্ঠী ভেদে উপাস্যদেবতার ভেদ ছিল।

ইতিবৃত্ত বলেন যে, উল্লিখিত বিভেদ সমুদায়, আর্য্য জাতীয়দিগের সংসর্গ প্রভাবে অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুলোম বিবাহ প্রণালীর বলে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসি জনগণের মধ্যে পরস্পর আকার বৈলক্ষণ্য ন্যূন করিয়া দিয়াছে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যদিও ততটা হয় নাই, কিন্তু সেখানেও অনেক দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অসংখ্য ভাষা ভেদ ছিল, তাহাও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এক্ষণে যে দশটী বা দ্বাদশটী প্রদেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সে গুলিও সর্ব্বক্ষণ সংস্কৃতের প্রভাবে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। আর পূর্ব্ব পূজিত বিভিন্ন প্রকৃতিক দেবদেবীসমূহ, আর্য্য শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক রূপ গুণে সংঘটিত হইয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। মৌলিক বর্ণভেদ এক্ষণে জাতীয় সম্প্রদায়ভেদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

ইতিবৃত্ত বলেন—উপরিউক্তরূপে অযোধ্যা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলিতে কতকটা আকারাদির বৈলক্ষণ্য ন্যূন হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যুত্থিত হইয়া অহঙ্কারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্ম্মকাণ্ডের দোষোদ্ঘোষণ, এবং জ্ঞানের উপাসনার গুণকীর্ত্তন করেন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ সম্রাটদিগের অধীনে একচ্ছত্র প্রায় হইয়া একবার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য্য এবং প্রভাবশালিতা এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতিবিদ্বেষ যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। যেটুকু সম্মিলন জন্মিয়াছিল; তাহা স্থায়ী হইল না।

ইতিবৃত্ত বলেন—শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী কর্ত্তৃক বৌদ্ধনিরসন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করি-

য়াছিল, যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্য্যে সম্পাদিত হইবার বিষয় হয় নাই। এই জন্য বৌদ্ধ স্বয়ং হীনতেজঃ হইয়া বিনষ্ট হইল। কিন্তু শঙ্কর স্বামী বৌদ্ধবাদের মূলকথা যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান এবং তপস্যা প্রধান, তাহার অন্যথা করেন নাই, স্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণেতর লোকদিগেরও জ্ঞানমার্গে অধিকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইতিবৃত্ত বলেন—মুসলমানেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইহারই কেন্দ্রীভূত ভাষাটিকে সর্ব্বপ্রদেশে প্রচলিত প্রায় করিয়া দিয়া এই মহাদেশের একতা সাধনের উপায় করিয়াছেন, আর সাম্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অন্ত্যজ জাতীয়দিগেরও অপর সকলের সহিত সাদৃশ্য লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও স্বজাতি-বিদ্বেষ দোষে দূষিত হয়েন নাই, এবং হিন্দুদিগের মধ্যে যে পানদোষ ছিল না, মুসলমানেরা সে দোষ বিন্দু মাত্রও বর্দ্ধিত করেন নাই। ঐ সকল বিষয়ে এবং স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি একান্ত সহানুভূতি সম্বন্ধে উহাঁরা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়া আছেন।

ইতিবৃত্ত বলেন—বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, ইহাও একটী সুলক্ষণ যে, ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত না হইয়া ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের একতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে বই ন্যূন হয় নাই।; শুদ্ধ রাজা এক হইয়াছে বলিয়া নয়—দেশময় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নয়—সর্ব্বস্থান আয়সশৃঙ্খল স্বরূপ লৌহবর্ত্ম যোগে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও নয়—ইংরাজ ভারতবাসী সকলকেই নির্ব্বিশেষে সমান পরিমাণে দূরস্থ করিয়া রাখেন, সুতরাং সকলেই আপনা আপনি সংযত হইবে, তাহা বলিয়াও নয়—ইংরাজ রাজনীতি বিষয়ে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির আদর্শস্থলীয়, ইংরাজ শুদ্ধ বিচার মার্গ অবলম্বন করিয়া যাহা ভাল বা উচিত, তাহা করেন না, প্রকৃত যোগ্যতার প্রমাণ না পাইলে কাহার বন্ধন অল্প পরিমাণেও শিথিল করিয়া দেন না, আবার যোগ্যতার প্রমাণ পাইলেই দেন—সুতরাং ইংরাজের সংসর্গ রাজনীতি শিক্ষার উপায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সমাজের বল পোষিত এবং সুসবর্দ্ধিত না হইতে

হইতে ইংরাজাধিকারে কোন অসাময়িক চেষ্টারও সাফল্য সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই অতি প্রধান ঘটনাগুলির সমালোচনায় দেখা গেল যে. প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটী যেন একটী স্থির লক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বাঁকিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু নদীও সাগর-সঙ্গমে যাইতে, বাঁকিয়া চুরিয়া যায় —গাছও আকাশ-মুখে উঠিতে মোড় খাইয়া উঠে—ছেলেরাও বাড়িবার সময় একবার মোটায় একবার রোগায়—সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই ঐরূপ।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে সম্মিলন-প্রবণতা এবং বিচ্ছেদ-প্রবণতা উভয় শক্তিরই কার্য্য হইয়া আসিতেছে—এবং তন্মধ্যে সম্মিলন প্রবণতাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-বল হইতেছে। ইতিহাস হইতে ইহাও দেখা যায় যে হিন্দুদিগের মধ্যে স্বজাতি বিদ্বেষ দোষটী অতি প্রবল এবং ঐ দোষেই ইহাদিগের বিচ্ছেদ-প্রবণতা এবং পরাধীনতা জন্মিয়াছে। ইংরাজের দৃঢ় মুষ্টির ভিতরে পড়িয়া অবধি তার বিচ্ছেদ-প্রবণতা তাদৃশ প্রকট হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু স্বজাতিবিদ্বেষের ভূরি ভূরি লক্ষণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ সমুদায় ভারতবর্ষকে এক শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে সকল ভেদের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ রাখিবার জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা প্রজ্বলিত করিবার জন্য, হিন্দু সমাজের অন্তরমধ্যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করিবার জন্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুদ্ধ স্বার্থ জন্মাইবার জন্য, দলাদলির রাজনৈতিক সূত্রে পরিষিক্ত-হৃদয় কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্নশীল বলিয়াই বোধ হয়। অতএব যেমন ইংরাজ থাকিতেই এক পক্ষে সম্মিলন প্রবণতার বৃদ্ধি হইতেছে, আবার পক্ষান্তরে, তাহার কোন কোন কার্য্যের ফলে ঐ বিচ্ছেদ-প্রবণতার বীজ গুলিতে কিছু কিছু বারি সিঞ্চন হইতেছে। অতএব প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান ইংরাজের কার্য্য উভয়ই আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—যথা,

(১) জাতীয়ভাব সংরক্ষণার্থ হিন্দুসমাজকে আত্ম প্রকৃতি বুঝিয়া [illegible] [illegible]।

(২) ভারতবর্ষের একতাসম্পন্ন ইংরাজের অধীনতাকেই সম্ভব; অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি এবং রাজভক্তি করিতে হইবে।

(৩) ইংরাজের স্থানে আত্মসমাজের প্রতি উপচিকীর্ষা তাঁহাদের মধ্যে দলাদলির ভাব পরিবর্জ্জিত করিয়া শিখিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরাজ সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাঁহাদের দলাদলিতে মিশিত হইবে না এবং তাঁহাদের মুখাপেক্ষিতা যতদূর সম্ভব পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতে হইবে।

(৪ হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতীয় সহানুভূতিকেই পরম ধন জ্ঞান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু সমাজ

ভারতবর্ষ মহাদেশে যে জাতীয় ভাবটী আর্য্য সমাগম কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত এবং অঙ্কুরিত হইয়া মুসলমান প্রবেশে অসঙ্কুচিত, প্রত্যুত প্রবলীকৃত হইয়াছে এবং ইতিহাসাদিতে যাহার মহীয়সী ছায়া দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কল্পবৃক্ষের সুমহৎ কাণ্ড হিন্দু সমাজ।

এই সমাজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান বলিয়াই গণ্য। ভূমণ্ডলস্থ সমগ্র মনুষ্য সংখ্যা যত, এক হিন্দুসমাজেই তাহার অষ্টমাংশ; আর যদি ধর্ম্ম প্রণালীর এবং নীতিশাস্ত্রের সাদৃশ্য লইয়া গণনা করা যায়, তবে স্থূলতঃ হিন্দু প্রকৃতির এবং মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মের লোক পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার দশ আনারও অধিক হইয়া উঠে, সমস্ত ইউরোপীয় জনগণের সমষ্টি চারি আনার বেশী হইবে না। কিন্তু বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এই ভারতভূমির অন্ত-

বিশিষ্ট হিন্দু সমাজ কিরূপ বস্তু তাহাই একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

সমাজমাত্রেই অতি গুরুতর বস্তু। বৌদ্ধেরা সমাজকেই 'সংঘ' বলিয়া এবং কোমটিষ্টরা 'হিউমানিটী' বলিয়া অতি পূজনীয় পদার্থই বিবেচনা করেন যুক্তি এবং শাস্ত্রমতেও সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ, প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজটী অতি গৌরবেরই বস্তু। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধন প্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র, এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও অটুট এবং অটল। ইহার অন্তরে কোন অতি উচ্চতম সনাতন তথ্য না থাকিলে ইহা কি এত দিন স্থায়ী হইত?

কিন্তু সমাজ যেমনই হউক, মানুষ সমাজ গঠন করিতে পারিয়াই মানুষ হইয়াছে; সমাজসভুক্ত না থাকিলে, বন্য পশু হইত। যিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় পালিত হইয়াছেন, তাঁহার শরীর যেমন সে দেশের জল বায়ুর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তেমনি যে ব্যক্তি যে সমাজে জন্মিয়া তন্মধ্যে পালিত হয়েন, তাঁহার মনের গঠনও সেই সমাজের প্রকৃতি গ্রহণ করে। সকল সমাজের প্রকৃতি একরূপ হয় না, যেমন প্রতি ব্যক্তির একটী বিলক্ষণতা আছে, তেমনি প্রতি সমাজেরও এক একটী বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তদন্তর্গত লোক সকল বিশিষ্টরূপেই তল্লক্ষণাক্রান্ত হয়। কোন সমাজের লোক শ্রমশীল এবং কার্য্যনিপুণ, কোন সমাজের লোক দানশীল এবং আড়ম্বর-পরায়ণ। সকল প্রকার লোকই সকল সমাজে থাকে, কিন্তু সমান পরিমাণে থাকে না; আর যে সমাজের যেটি মূল-প্রকৃতি তাহা প্রায়ই সমাজান্তর্গত সকল লোককে কিছু না কিছু রঞ্জিত করিয়া রাখে। এইজন্য সমাজতত্ত্বানুসন্ধায়ী-দিগের কর্ত্তব্য কোন্ সমাজের মূল প্রকৃতি কি, তাহা নিরূপণ করিবার যত্ন

করেন। কোন সমাজের মূল-প্রকৃতি অবধারিত হইলে, ঐ সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি কোন মুখে যায়, এবং উহাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কি প্রকার জীবন-যাত্রার আদর্শ গ্রহণ করে, তাহা বিশিষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহা বুঝিতে পারিলেই কোন্ সমাজ কোন্ মুখে চলিলেই ভাল চলিতে পারিবে, তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের মূল-প্রকৃতি কি? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানের চেষ্টা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক করাই আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজ বহুকালাবধি পরজাতীয় লোকের অধীন হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে ইংরাজের তাহার পূর্ব্বে মুসলমানের অধীন ছিল। ইংরাজের অধীন কিরূপে হইয়াছে, তাহার বিশেষজ্ঞ একজন সূক্ষ্মদর্শী ইতিহাস-বেত্তা বলেন যে, ইংরাজেরা অস্ত্রবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, এটি মিথ্যা কথা; ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে আপনারাই জয় করিয়া ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ইহাই সত্য কথা। মুসলমানদিগের বিজয় ঠিক ওরূপ ব্যাপার নহে। উহারা আপনারাই অস্ত্রবলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগ সকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও যে পারিয়াছিল, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অন্তর্ব্বিবাদে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং যুদ্ধ কার্য্যটীকে আপনাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। যখন ওরূপ করে নাই, অর্থাৎ যখন যুদ্ধ করা প্রজা সাধারণের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, তখনই মুসলমানেরা পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল; শিবজীই মহারাষ্ট্র দেশে ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অতি বিশ্বস্ত পারিষদ, যিনি সিংহগড় বিজেতা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সেই টানাজী মালশ্রীকে বিজয়পুর-রাজ সেনাপতি একদা জিজ্ঞাসা করেন তোমাদিগের সৈন্য কোথায়? মালশ্রী লাঙ্গলবাহী কৃষকদিগকে দেখাইয়া বলেন, ইহারাই আমাদিগের সৈন্য। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের কৃষিজীবী এবং কারুকার্য্যব্যবসায়ী সাধারণ প্রজাবর্গ কখনই সংগ্রাম কার্য্যে ব্যাপৃত হইত না এবং সেইজন্যই ভারতবর্ষে রাজ্য জয় করা অপরের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইত। প্রসিদ্ধি আছে যে, ব-

জাতীয়ের মধ্যেই হউক, আর বিদেশীয়দিগের সহিতই হউক, যখন ভারত-বর্ষের মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজ্জলিত, তখনও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য অবাধে সম্পাদিত হইতে থাকিত। যে সমাজ অন্তঃশাসনে শাসিত, সুতরাং ভাবিতে পারে যে, রাজ-শক্তি এক হাত হইতে অন্য হাতে গেলেই সমাজের ব্যাঘাত হয় না, সেই সমাজেই সংগ্রামকার্য্যটি সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আর ইহাও বলা যায় যে, যথায় সংগ্রামকার্য্যটী সম্প্রদায় বি-শেষের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে, তথায় জনসাধারণের মধ্যে শান্তি-প্রবণতা জন্মে। ইউরোপীয় ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যখন ঐ খণ্ডের বিভিন্ন দে-শীয় সমাজ সকল দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া উঠিল, তখনই যুদ্ধকার্য্যটী একটী ব্যবসায় বিশেষের ন্যায় হইল; তবে ইউরোপে ভৃতিভুক সেনাদল জন্মিয়াছিল, ভা-রতবর্ষে সেরূপ অস্ত্রপিশাচিকা কখন জন্মে নাই, সমাজবন্ধনের গুণে পূর্ব্বা-বধিই এখানে বীরধর্ম্মা ক্ষত্রিয় জাতীয়েরা যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ফলতঃ হিন্দু সমাজের এই লক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা অন্তঃশাসনে শাসিত এবং শান্তি-প্রবণ। সমাজের এই অন্তঃশাসন এবং শান্তি প্রবণতা গুণেই অত্যল্প সংখ্যক ইংরাজ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন এবং এই রাজ্য আপনা-দের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা সিপাহি হইয়াছিল বলিয়াই ইংরাজের জয় হয় নাই—হিন্দু সমাজ-বন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফল যে, অন্তঃশাসন শীলতা এবং শান্ত-প্রকৃতিকতা, তজ্জন্যই ওরূপ হইয়াছিল। সে দিন গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব জাঁক করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে এক একটী ইংরাজ এক একটী বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতেছেন, অতএব ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বেতন অধিক এ কথা মনে করিতে নাই। ইংরাজ নিজের গুণ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না, হিন্দুসমাজবন্ধনের গুণেই যে দেশে শান্তি রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাইলেন না, আপনার মহিমাই দেখিলেন। এই স্থলে যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, যে সমাজবন্ধনে এমন সর্ব্বনেশে শান্তপ্রকৃতিকতা জন্মে, সে সমাজবন্ধন ভাল নয়। তাঁহাকে দুইটি কথা বলিব। এখানে কোন্ সমাজ ভাল কে মন্দ তাহার বিচার হইতেছে না। আর কোন সমাজ

অন্য কর্ত্তৃক বিজিত হইলেই যে তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহাও নয়। মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল, অসভ্য মাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল, বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল, অসভ্য বর্ব্বরজাতীয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, পাশুপাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসামদেশ অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে, সেই হীন, এটা গোঁয়ারের কথা—বিচক্ষণ লোকের কথা নয়। হিন্দুরা তাঁহাদের ভালর জন্যই হউক, আর মন্দের জন্যই হউক, গুণের জন্যই হউক, আর দোষের জন্যই হউক, অতিশয় শান্তপ্রকৃতিক। দেখ দুর্ভিক্ষ পীড়ায় পীড়িত হইয়াও ইঁহারা কখন রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়েন না। অন্য দেশে ইহার শতাংশ হইলেও চুরি ডাকাইতি এখানে যত বাড়ে তাহার শতগুণ বাড়িয়া যায়, বড় মানুষের গৃহাদি ভগ্ন করা হয় এবং অতি ভয়ানক রাজদ্রোহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। এখানে কোন উচ্চবাচ্য হয় না বলিলেই চলে। লোক সকল না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়—রাজার দোষ দেয় না—কাহারও দোষ দেয় না, আপনাদের কর্ম্মফল বলিয়া সকল দুঃখই সহ্য করে।

অন্য সমাজের লোকের কাছে তাহাদিগের ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের নিন্দা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মারিতে উদ্যত হয়। এই সে দিন, একটী গ্রন্থকার, পয়গম্বর মহম্মদের তাদৃশ গুণ কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া বোম্বাই নগরের মুসলমানেরা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া ফেলিল, আর বাঙ্গালী মুসলমানেরা ঐ প্রকার একটা কথা লইয়া কতই বকাবকি করিলেন। মিসরে, অষ্ট্রীয়াতে, ইটালীতে, আয়র্লণ্ডে ঐরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষজনিত কতই ঝকড়া ঝঁটির কথা সর্ব্বদাই শুনা যায়। কিন্তু হিন্দু সমাজের বুকে বসিয়া কত লোকে কত দেবতার নিন্দা, শাস্ত্রের নিন্দা এবং কত প্রকারে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে—হিন্দুরা কিছুই বলেন না। পরকালের উপর নির্ভর করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের কথায় এবং আচারে দৃক্‌পাতও করেন না। ইউরোপীয় সমাজের লোকেরা সহিষ্ণুপ্রকৃতিক নয়, এই জন্য ইংরাজেরা হিন্দুদিগের সহনশীলতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন

না; আর দেশীয় ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও কতকটা ইংরাজদিগের অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ইউরোপীয় সমাজগুলিরই কিছু কিছু বিবরণ জানেন, আর কিছুই জানেন না; সুতরাং স্বদেশীয়দিগের সহনশীলতা কেমন ধর্ম্মনিষ্ঠতার চিহ্ন, তাহা বুঝিতেই পারেন না। উহা বলহীনতার লক্ষণ মনে করেন।

ভারতবাসী অতি দরিদ্র ইহাদিগের মধ্যে চারি পাঁচ কোটি লোক একাশনে দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু তাহা কেহ জানিতেও পারে না—দৌরাত্ম্য নাই—কাতরোক্তি নাই—আপনার কর্ত্তব্যপালনে যথাশক্তি ত্রুটিও নাই। অন্য কোন সমাজে, এত দুঃখ যন্ত্রণা এমন নিঃশব্দে সহ্য হইতে পারে না। অন্য কোন সমাজে, এতটা দুঃখসত্ত্বে' এত দানশীলতাও থাকিতে পারে না। ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেশের এই দুরবস্থা কিছুই না বুঝিয়া এবং নিতান্ত মমতাশূন্য হইয়া আতসবাজী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি তামসিক ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনবান লোকদিগের দান কার্য্যের মুখ ফিরাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আজি কালি যেন ঐ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি একটু খুলিতেছে। এখন অধিক প্রকাশ্য সভায় চাঁদা তুলিয়া যে সকল দান কার্য্য চলিবে, তাহার সমস্তই ইংরাজ রাজপুরুষের সন্তোষ সাধনার্থই ব্যয় হইবে না—যেন কতকটা দেশের লোকের উপকারেও লাগিবে। "জুবিলী" উপলক্ষে যে দান হইল, তাহার অনেকটা শিল্প-শিক্ষালয়ের নিমিত্ত হইয়াছে। কলিকাতায় রাজপৌত্রের শুভাগমন উপলক্ষে যে চাঁদা উঠিয়াছে তাহার কতক টাকা কোন স্থায়ী হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবার কথা উঠিয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচারে পবিত্রতা, ধর্ম্মভীরুতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি শান্তিময় ঋষিচর্য্যা শিক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দুসমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অন্তঃশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি—শান্তি। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। একজন বহুদর্শী ইংরা-

জ্ঞের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল; অপর সকল সমাজের ছোট লোকেরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদিগের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্য ভাবাপন্ন।" * * "কিন্তু ভারতবাসীর সুখ কৈ?" * * * "সত্য সত্যই জগতে সুখের পরিমাণ অধিক নয়—আর মানুষের সুখ, বাহ্য বিষয় লইয়া অধিক, না আন্তরিক ভাবের অবস্থা লইয়া অধিক? ঐ তাড়িখানায় তাড়ি খাইয়া যাহারা গোলমাল করিতেছে, তুমি কি তাহাদিগকে বিশেষ সুখভাগী মনে কর? কিন্তু উহারাও ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের অপেক্ষা অল্প দুর্ব্বৃত্ত—সুতরাং অল্প দুঃখভাগী।"

কোন সমাজের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সেই সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট কতকগুলি লোককে ভাল করিয়া দেখিলেই এক প্রকার মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। সমাজের মূল-প্রকৃতি এমনই প্রবল বস্তু যে, উহা বহির্ভাগেও উঠে। কিন্তু উহা ভিতরেই গাঢ়তর রূপে দৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের মূল-প্রকৃতি যে অন্তঃশাসন এবং শান্তি, তাহা হিন্দুদিগের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থাতে যেমন দেখা যায়, ঐ সমাজের নিয়ামক শাস্ত্র সমূহের মূল বিচার প্রণালীতে তাহা স্পষ্টতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ

মানুষ এই বাহ্য জগতের এবং তাহার নিজের অন্তর্জগতের সম্বন্ধে মনে মনে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই সকল প্রশ্নের উত্তরসম্বলিত গ্রন্থের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে উল্লিখিত মানস প্রশ্ন সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। একটী মানস প্রশ্ন এই—"জগতে এত বৈষম্য কেন? মানুষে মানুষেই বা এত বৈষম্য কেন?" কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অনুশীলনতৎপর আর্য্য ঋষিগণ বলিলেন—কাল ত্রিধা বিভাজিত; অতীত, বর্ত্তমান

ও ভবিষ্যৎ; বর্ত্তমানে যাহা দেখা যায়, তাহা অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই ফল, আর বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে, ভবিষ্যৎ তাহারই ফল প্রসব করিবে। এটী আমগাছ এবং ওটী তেঁতুল গাছ কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? এটী আমের আঁটি হইতে হইয়াছে, তাই আমগাছ, আর ওটী তেঁতুলের বীজ হইতে হইয়াছে, তাই তেঁতুল গাছ। মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য উপলব্ধ হয়, তাহার প্রতিও ঐরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নির্দ্দেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, পূর্ব্বগত ঔৎপত্তিক কারণ সমূহের ভেদ বশতঃই কোন মানুষ এক প্রকার, কেহ অপর প্রকার। এই পূর্ব্বগত কারণ সমূহের নাম "প্রাক্তন।" ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধেও ঐ বিচার প্রণালী চলিল এবং সেই ভবিষ্যতের নাম হইল "পরকাল।"

এই ভিত্তিমূলের উপর হিন্দুদিগের নীতিশাস্ত্র সংস্থাপিত। সেই শাস্ত্র শিখাইলেন যে, বর্ত্তমানে প্রাক্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্ত্তমানের ফলভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্লবিত হইয়া সমাজস্থিত জনসমূহকে একটী সান্ত্বনার এবং একটী উত্তেজনার বাক্য বলিল—প্রাক্তনের সুকৃত থাকে, বর্ত্তমানে ভাল থাকিবে, দুষ্কৃত থাকে, ভাল থাকিতে পারিবে না, আর বর্ত্তমানে সুকৃত করিতে পার, পরকালে ভাল থাকিবে, সুকৃত না করিতে পার, ভাল থাকিবে না। এখন দেখ, প্রাক্তনবাদী হিন্দুর পক্ষে কোথাও অসন্তোষের কারণ রহিল না। তাঁহার প্রাক্তনবাদ তাঁহাকে শান্ত করিল; কারণ নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে চলিবে কেন? আর পরকাল ইহ কালের আয়ত্ত হওয়াতে চেষ্টা শক্তিও যথোচিত উত্তেজিত হইল। এইরূপে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলানিবদ্ধ হিন্দুর নীতিশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইল। ইহাতে ধৈর্য্য, ক্ষমা, নিরহঙ্কারতা, উদ্যোগ—সকলেরই স্থান হওয়াতে এবং কার্য্য কারণ চিন্তার দিকে মনের প্রবণতা হওয়াতে বিদ্বেষাদিভাব বিনষ্ট হইয়া সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

বৌদ্ধ শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্রেরই সন্তান। ঐ শাস্ত্রেও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার বিচার; হিন্দুশাস্ত্রের বিচারের ন্যায়—অতি দৃঢ় সম্বন্ধ। তবে বৌদ্ধেরা

নিকৃষ্টাধিকারীর অর্থাৎ মোগলাদি বর্ণসভূক নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থদিগের উপযোগী করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রেরই বিচার প্রণালীকে আধ্যাত্মিক অংশে সংকুচিত করিয়া বলিল যে কার্য্য দেখিলেই, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে ইহা দেখিলেই তাহার কারণের অনুমান করা আবশ্যক, নচেৎ যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এইরূপ মনে করাই ভাল। বৌদ্ধেরা কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে যান না, আবার জাগতিক কার্য্যে আত্মারোপ পূর্ব্বক এক অচিন্ত্যানন্ত মহাশক্তির অনুভব করেন না। উহাঁরা যদি কোথাও একত্ব দেখেন, তাহা আকাশে। উহাঁরা জগতে যত কার্য্য দেখেন তাহাতে রূপান্তরতা মাত্র দেখেন, এবং তাহা দ্রব্যশক্তি হইতেই হয় বলেন বৌদ্ধেরা জগতের সাদিত্ববাদ পরিহার করেন। ফলতঃ আর্য্যজাতীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিচারশক্তি এবং কল্পনাশক্তি, এই উভয়ের যে সামঞ্জস্য আছে মোগলজাতীয় লোকদিগের হৃদয়ে সেই সামঞ্জস্যের অভাব। উহাদিগের চিন্তাশক্তি যেমন দ্রব্যনিষ্ঠ তেমন ভাবনিষ্ঠ নয়। এই জন্যই হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উহাঁদিগের পরিগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে উহাঁদিগের নীতিশাস্ত্রও প্রাক্তনবাদ স্বীকার বশতঃ হিন্দু নীতিশাস্ত্রের ন্যায় শাস্তিপদ। কিন্তু দ্রব্যশক্তি হইতেই কার্য্য হয়, মানুষও দ্রব্য, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রে মানুষশক্তির অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য। উহাতে পুরুষকারের তেজ প্রবলতর। চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি বৌদ্ধদেশীয়দিগের মধ্যে হীনাবস্থ লোকেরাও শান্তশীল এবং সৌজন্যপূত। তাহারা স্ব স্ব জাতীয় রাজকবর্গের শাসনে সুশাসিত, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নেতৃবর্গের বশীভূত থাকিয়া বিশ্বস্ত মনে তাঁহাদিগের অনুজ্ঞাত কার্য্য সকল সাধন করে। এই শান্তশীলতা এবং বশ্যতার গুণে এবং পুরুষকারের প্রাধান্যবোধ নিবন্ধন, চীনীয়, জাপানীয়, শ্যামীয় প্রভৃতি বৌদ্ধ জাতীয়েরা অতিশয় কার্য্য সাধনশীলরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, এবং সাধনশীলতা বা স্বাতন্ত্রিকতা ঐ সকল জাতীয়দিগের মূল প্রকৃতি বলিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রত্যুত, একজন ফরাসী সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উল্লিখিত বৌদ্ধজাতীয় সমাজ গুলিকেই পৃথি-

বীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে ঐ গুলিতে শান্তি এবং স্বচেষ্টা দুইই যথা পরিমাণে আছে। উহাদিগের শান্তি আছে, অতএব ইউরোপীয়দিগের ন্যায় ঈর্ষ্যানলে এবং সুখলালসায় জ্বলিত হইয়া আপন আপন সমাজ মধ্যে সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিবাদ করে না, এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র মার কাট করিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না; আর স্বচেষ্টা আছে বলিয়া যখন যাহা করা প্রয়োজনীয় বোধ হয়, তাহা সত্বরে সম্পন্ন করিয়া লইতে পারে। ফরাসীরা আনাম প্রদেশ হইতে বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া উঠিল, অমনি চীনীয় সৈন্য এমন সুশিক্ষিত হইয়া দাঁড়াইল যে, ফরাসিদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিল। রুসীয়, আমেরিক, ইংলণ্ডীয় যুদ্ধ জাহাজ সকল সময়ে সময়ে জাপানে যাইয়া উপদ্রব করিতে লাগিল, অমনি জাপানীয় ভূম্যধিকারীরা সকলে একমত হইয়া উঠিলেন, ভূমিসম্পত্তির লভ্যাংশ রাজা মিকাডোর হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা সুশিক্ষিত সৈন্যদল এবং সুবৃহৎ পোতবাহিনী প্রস্তুত করাইলেন। চীন, জাপান এবং কিয়ৎপরিমাণে শ্যামদেশও অতি স্বল্পকাল মধ্যে ইউরোপীয় প্রবল জাতীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল হইবার হেতু, ঐ সকল জাতীয়দিগের মূল প্রকৃতি স্বাতন্ত্রিকতা বা সাধনশীলতা।*

---

* হিন্দু জাতির সহিত উহাদের পার্থক্য দুই বিষয়ে। হিন্দুরা ইচ্ছাশক্তি এবং প্রাক্তন মানিয়া পুরুষকারের গৌরব একটু অল্প করিয়াছে, আর এক্ষণে উহাদের ন্যায় স্বজাতীয় অধিনায়কের অধীনে নাই। বিজাতীয় অধিনায়কের অধীন হইয়া রহিয়াছে। যদি ভারতবর্ষ আজি রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত না হইত, তবে কি ইঁহারও সুশিক্ষিত সৈন্য, সুদৃঢ় পোতবাহিনী এবং ইউরোপীয় বিষয় বিদ্যায় সুবিদ্বান লোক সকলের অভাব থাকিত? কিছুরই অভাব থাকিত বলিয়া বোধ হয় না। কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিবার সম্বল অপহরণ করিলে, কাজ করিতে পারি না বলিয়া অনুক্ষণ ভৎর্সনা এবং অবজ্ঞা করিলে, কাজ করিবার উপক্রম মাত্র মাথার উপর বসিয়া টিক টিক করিলে কেহই কোন কাজ করিতে পারে না। আজি হিন্দুরা সেই জন্যই শুদ্ধ শান্তশীল হইয়া আছেন, সাধন-

যেমন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়দিগের মূল প্রকৃতি এক বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল, সেইরূপ খৃষ্টমতানুযায়ী বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিদিগেরও স্থূলতঃ এক প্রকৃতিকতা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম যে মূল হইতে উৎপন্ন, খৃষ্টধর্ম্ম সে মূল হইতে উঠে নাই। উহা প্রাক্তন মানে না। মনুষ্য আপনার আত্মত্বারোপশক্তির প্রয়োগ দ্বারা জগৎকার্য্যে যে ইচ্ছাশক্তির উপলব্ধি করে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সেই ইচ্ছাশক্তিকেই জগতের এবং জাগতিক-সমস্ত কার্য্যের কারণ বলিয়া মানে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সাদিবাদী এবং একেশ্বরবাদী। তাহারা অদ্বৈতবাদী বা ব্রহ্মবাদী নহে। উহারা প্রাক্তন মানে না, সুতরাং শান্তিপ্রবণ বা সন্তুষ্টচিত্ত নহে। উহাদিগের সমাজগুলি তদন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুদ্ধক্ষেত্রস্বরূপ। উহারা যে সম্বদ্ধ এবং সংঘট্ট হইয়া এক একটী প্রবল জাতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বাহিরের চাপে যত হইয়াছে, আন্তরিক সহানুভূতির বলে তত হয় নাই। প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতিকে আপন আপন চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী অপরাপর জাতীয়ের সহিত অনুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইয়াছে এবং তাহা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব অন্তর্ভেদ অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়াছে। সামরিক হইয়া থাকিতে হইলেই দলবন্ধন দৃঢ় করিতে হয়; এবং দল দৃঢ় করিতে হইলেই কতকগুলি নীতিসূত্রের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—যথা নেতার বশ্যতা, নিজদলের মুখাপেক্ষতা, নিজ দলস্থের পক্ষপাতিতা ইত্যাদি।

খৃষ্টানেরা পরকাল মানে। কিন্তু উহারা যেরূপে পরকাল মানে তাহাতে নীতিসূত্রের সমধিক পোষণ হইতে পারে না। উহারা পরকালের সুখ দুঃখকে ইহকালের সুকৃত দুষ্কৃতের অবশ্যম্ভাবী ফল বলে না। সে সুখ দুঃখও ঈশ্বরের

হীন হইয়া উঠিতেছেন না। হিন্দুর অপেক্ষা কোন গুণই চীনার জাপানীয়, জার্ম্মান প্রভৃতির নাই। উহারাও যেরূপ অবলীলাক্রমে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা গ্রহণ করিয়াছে, ছাড়া থাকিলে হিন্দুরাও সে সমকক্ষতায় নামিয়া আসিতে পারিত সন্দেহ নাই। নামিয়া আসিতে পারিত বলিবার কারণ এই যে; ইউরোপীয় সমাজগুলির প্রকৃতি হিন্দু সমাজের প্রকৃতি অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিকৃষ্ট।

[illegible] শিরোদেশে উৎকৃষ্ট [illegible] পরিধানে [illegible]—তার সে অনুগ্রহ নিগ্রহ পুণ্য পাপের বিচারতন্ত্রিত না হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস বশতঃই হয়।

ইহলৌকিক যাবৎ বৈষম্যের কারণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরেচ্ছা—এরূপ মতবাদের সূক্ষ্ম এবং গূঢ় তাৎপর্য্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিরা যাহাই বুঝুন, কিন্তু সাধারণ অবিজ্ঞ, অবুদ্ধি, অল্পসত্ত্ব লোকের মনে উহা অবশ্যই স্বৈরাচারের* প্রবর্ত্তক এবং পরিবর্দ্ধক হইবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সাধারণ ইউরোপীয় লোকের মনে স্বৈরাচার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলীয়সী। উহাদিগের মত অশিষ্টাচার, দুর্দ্দান্ত, অবিমৃশ্যকারী, স্বার্থপরায়ণ লোক পৃথিবীর আর কোন সমাজে নাই। উহারা স্ব স্ব দেশেই ত বিবাদ, বিসম্বাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, নরহত্যা স্ত্রীহত্যা, সন্তানহত্যা করিয়া থাকে—ইউরোপীয়েতর জাতির প্রতি উহাদের ব্যবহার নিষ্ঠুরতা এবং শঠতায় পরিপূর্ণ—অন্যের পীড়ন এবং ধর্ষণ করায় উহাদিগের অন্তরাত্মা যেন আনন্দাভিষিক্ত হয়। সাধারণ ইউরোপীয়গণ যে ভাবে চলে, তাহা দেখিলেই উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অনেকেই জলদস্যু ছিল, এবং নির্ভীকহৃদয়ে সমুদ্র ভেদ করিয়া আসিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ গুলিকে লণ্ডভণ্ড করিত, সেই সকল কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। তাহারা রোম সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং সেই সাম্রাজ্যে যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাই কুড়াইয়া লয়। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকৃত না থাকায় খৃষ্টধর্ম্ম উহাদিগের দস্যু-

* ঈশ্বর স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মানুষ মানুষে বিষম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ বিনা কারণে কাহাকেও সুখভাগী কাহাকে দুঃখভাগী করিয়াছেন, এ কথা বলিতে গেলেই তাঁহার ন্যায় [illegible] নষ্ট হয়, কিন্তু ইউরোপীয়েরা ঐ কথাটি বলে। মানুষ আপনার স্বভাবে যে সকল ধর্ম্মাভাব অনুভব করে তাহা [illegible] করিয়া তাঁহার প্রকৃতি গঠন করিয়া থাকে [illegible] পরতন্ত্র অঙ্কুর থাকিত তাহা হইলে উহারা ঐ প্রকার অন্যায়কারী ঈশ্বরের [illegible] করিত না।

ভাব দমনে সমর্থ হইতে পারে নাই। সমর্থ না হইবার অপর কারণ উহাদিগের ঔৎপত্তিক ধৃষ্টতাও বটে আর উহাদিগের পরিগৃহীত রোমীয়দিগের ব্যবস্থা-শাস্ত্রের দোষও বটে। অধস্তন রোমীয়দিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ধনের গৌরব এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব বিশিষ্টরূপেই সমর্থিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবস্থাশাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং ধনের অত্যধিক গৌরব করিতে শিখে। যাহারা ধর্ম্মশাসনে অশাসিত, অথবা অল্প শাসিত এবং অর্থলোভে আকৃষ্ট তাহাদিগের যে প্রকৃতি হয়, সাধারণ ইউরোপীয়দিগের সেই প্রকৃতিই হইয়া আছে। তাহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ এবং আত্মসুখান্বেষী হইয়াছে। উহারা বল প্রয়োগ এবং প্রাণিবধে অসঙ্কুচিতচিত্ত এবং সুখলালসা তৃপ্তির জন্য অপরিসীম ধনাকাঙ্ক্ষী। উহাদিগের শাস্ত্রের আদেশ—পৃথিবীর সকল লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত কর—কিন্তু উহারা ধনলাভ করিবে বলিয়াই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে। পূর্ব্বপুরুষদিগের জলদস্যুতা এখন বাণিজ্যপরতা দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র। ইউরোপীয়দিগের মূল-প্রকৃতি ধৃষ্টতা এবং সুখলালসা।

খৃষ্টধর্ম্ম যে ইহুদিধর্ম্ম হইতে রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিস্তৃতির সময়ে জন্মিয়াছিল; মুসলমান ধর্ম্মও সেই ইহুদিধর্ম্ম হইতে রোম সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় জন্মে—উভয়েই প্রাক্তন বাদ নাই, এবং জগতের আদিত্ব, একেশ্বর বাদ, এবং ইচ্ছা শক্তির সর্ব্বময়তা স্বীকার আছে। সুতরাং উভয় সমাজই মূলতঃ শান্তিবিহীন এবং স্বেচ্ছাচারনিরত। প্রভেদ এই, মুসলমানেরা রোম সাম্রাজ্যের ব্যবহার শাস্ত্র গ্রহণ করে নাই—আর রোমের বিশিষ্ট ভগ্নদশায় অভ্যুত্থিত হইয়াছিল বলিয়া রোমের উপধর্ম্মমিশ্রিত ভোগসুখপরতাও প্রাপ্ত হয় নাই। উহারা নষ্ট প্রকৃতিক গ্রীক এবং লাটিন পণ্ডিতদিগের সংশয়বাদও কাণে স্থান দেয় নাই। উহারা স্বধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য যখন আরবদেশ হইতে বাহির হইল, তখন ঐ সুযোগে আপনারা লুট পাট করিয়া ধনশালী হইবে বলিয়া মনে করে নাই। আজিও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অনেকানেক মুসলমান কাহাকেও টাকা ধার দিয়া তাহার সুদ খান না। মুসলমানেরা ধর্ম্মোন্মাদে মত্ত, অর্থপিশাচও নয়, আর রক্তপিপাসুও নয়। আরবেরা স্বধর্ম্মে এতই বিশ্বাসবান্ এবং ভক্তি

মান হইয়াছিল যে, মনে করিত তাহাদের বীজমন্ত্র গ্রহণমাত্রে মানুষের সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত তাহারা অমনি তাহাকে আপনাদিগের সমতুল্য জ্ঞান করিত, তাহাকে আপনদের সৈনিক দলভুক্ত করিত অথবা রাজকার্য্য প্রদান করিত—কোনরূপে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিত না। স্বধর্ম্মে সুগভীর ভক্তিমূলক এই যে উদারতা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্ব্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ। উহারা পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে যে কাজ করিয়াছে, আর কোন বিজিগীষু জাতি তেমন অল্পকাল মধ্যে তেমন কাজ করিতে পারে নাই। উহারা ত মূর্খতম তুরস্ক জাতিদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছে, আবার সুসভ্য পারসীক, মিসরীয়, সিরীয় প্রভৃতি খৃষ্টান এবং অখৃষ্টানী অনেকানেক জাতিকে তাহাদিগের স্ব স্ব ধর্ম্ম গ্রন্থ এবং আচার পদ্ধতি ছাড়াইয়া আপনাদিগের কোরাণ এবং হদীস ধরাইয়াছে। সাম্যবাদের একটী অতি মনোহর শক্তি আছে। মুসলমান ধর্ম্ম সেই সাম্যবাদবলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যধর্ম্মী। ফলতঃ মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা। অতএব দেখা গেল যে—

(১) প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তিপরায়ণ, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত।

(২) ঐরূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু দ্রব্যগুণবাদ তৎপর বৌদ্ধজাতীয়েরা শান্ত, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং সাধনশীল।

(৩) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খৃষ্টধর্ম্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল এবং ভোগসুখলিপ্সু।

(৪) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী মুসলমান অশান্ত, স্বৈরাচার এবং সাম্যধর্ম্মী।

সামাজিক প্রকৃতি—ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

ইউরোপ খণ্ডে বিজ্ঞান চর্চ্চার বড়ই বাহুল্য, এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলও ইউরোপীয়েরা বিশিষ্টরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে ফল লাভ হয়, তাহার সমাদরও বেশী। এই জন্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সামাজিক তত্ত্ব বিচারেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে ভালবাসেন।

কিন্তু বিজ্ঞান বলিলেই বিজ্ঞান হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ হওয়াতে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সূত্র নির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক বিচার প্রচলিত হওয়াতে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে বেকনের স্থানে সমষ্টীকরণ বা সূত্রনির্দ্ধারণ প্রণালী নূতন করিয়া শিখিতে হইয়াছিল, আবার যেন সেইরূপ নূতন শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিতেছি মনে করিয়া অনেকানেক ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা আপনাদিগের কল্পনাশক্তিকেই বিশেষ করিয়া খাটাইয়া লইতেছেন। বিশেষতঃ এখনকার ইতিবৃত্ত রচনা প্রণালীতে অনেক পরিমাণে ঐ দোষের আশ্রয় হইয়াছে। একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক বিভিন্ন জাতীয় লোকের প্রকৃতি বর্ণন করিতে গিয়া তাহাদিগের মৌলিকবর্ণ, ধর্ম্ম গ্রন্থ এবং নীতিশাস্ত্রের কোন উল্লেখ করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। তাহাদিগের দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিচার করিয়াই সেই সেই জাতির স্বভাব এবং দোষ গুণ সমুদায় স্থির করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন সকল স্থলে বাস্তবিক করা হয় কি? দেশের ভৌগোলিক অবস্থা জানা আছে, দেশের লোকের প্রকৃতিও, যাহা হউক, একটা মনে করা আছে; কল্পনার বলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একটা কার্য্যকারণ ভাব ঘটাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। ওরূপ করায় কোন প্রকৃত তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না, কোন কুসংস্কার দূর করা হয় না, অজ্ঞের অজ্ঞতা বৃদ্ধি করা হয়। মানুষের চেষ্টা শক্তিকে খর্ব্ব করা হয় এবং সংস্কারের পথ একেবারে রুদ্ধ করা হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—ঐতিহাসিক বলিলেন স্পেন দেশবাসীয়েরা অতিশয় উপধর্ম্মিক। তাহার কারণ, কাথলিক ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব অথবা পূর্ব্বকাল হইতে মুরজাতীয়দিগের সহযোগে কল্পনা-প্রবণতা কিম্বা বিগত প্রাধান্যের সহিত বর্ত্তমানের পতিত দশার তুলনায় দৈবোপদ্রবের প্রতি বিশ্বাস

স্থাপন, এ সকল কিছুই বলিলেন না। ও গুলি বলিলে, ঐতিহাসিক কার্য্য কারণের অভিব্যক্তি হইত। তিনি বলিলেন, স্পেনে ভূমিকম্পের আতিশয্য এই জন্যই স্পেনের লোকেরা ঔপধর্ম্মিক। কিন্তু জাপানেও স্পেন অপেক্ষা ভূমিকম্প অনেক অধিক, এমন কি গড়ে প্রতিদিন একটী। কিন্তু জাপানীয়েরা ঔপধর্ম্মিক হওয়া দূরে থাকুক, কিছুমাত্র দৈববল স্বীকার করে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তার মনের প্রকৃত কথা কি এই নয় যে, স্পেনীয়েরা ঔপধর্ম্মিক বলিয়া আমি জানি, আর তাহাদের দেশে যে ভূকম্প হয়, তাহাও জানি। আমি ঐ দুয়েতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব।

এ প্রণালীর ইতিবৃত্ত রচনা অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি ওরূপে বিচার না করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশে অধিক ভূকম্প হয় তাহা জানিতে পারিতেন, এবং সেই সেই দেশবাসী সকল লোকের স্বভাব জানিতেন, এবং সেই সেই স্বভাবে কোনও একটী বিষয়ে মিল দেখিতেন, এবং তাহা দেখিয়া ভূকম্পনের আধিক্য তাদৃশ স্বভাবের কারণ হইতে পারে কি না চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে কতকটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচার হইল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিত। ফলকথা, এখনও ঐতিহাসিক বস্তুজ্ঞান অনেক বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। যখন তাদৃশ বস্তুজ্ঞান জন্মিবে, তখন কোন একটী জিলায় একটী পাহাড় থাকাতে বা একটী বালুকাময় নদী থাকাতে সেখানকার লোকের মতিগতির কি বিশিষ্টতা জন্মিয়াছে, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারিবে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এখন ঐ অবস্থার স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র।

ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয় শিখর—ইহাঁর বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সদৃশ শুভ্রসলিলা স্বর্ণদী—ইহাঁর পদতল সমুদ্রের দুইটী বাহু প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস নিবন্ধন হিন্দু জাতীয়দিগের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়। ইহাঁদিগের ধীশক্তি অনগ্রচারিণী—ইহাঁদিগের নীতি সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন—কিন্তু এইরূপ সাধারণ মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইলেও এই মহাদেশের

এবং এই মহিমশালী সমাজের মধ্যে প্রত্যেক সামাজিক নিয়মাদির সম্বন্ধে ভৌগোলিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ নিরতিশয় গবেষণা ব্যতিরেকে করিতে যাওয়া কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত? তাহা নয়।

কিন্তু নব্য ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানের যে সকল সূত্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রযুক্ত হয় তাহার ভাব অন্যরূপ। ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা করাই সেই সকল সূত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে, ঐ সকল সূত্রে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করিলেই যে, মানুষের বা মনুষ্য সমষ্টি সমাজের কার্য্যগুলিকে, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করা হয়, এমত নহে। জাগতিক সকল ব্যাপারই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অন্তর্ভূত। তবে মানব এবং মনুষ্য সমাজের কার্য্যকলাপ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম অশেষবিধ শক্তির ফল। সুতরাং স্থূল দর্শনে সে সমুদায় শক্তি নির্ব্বাচিত এবং অবধারিত হয় না। ইউরোপীয়দিগের ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এখনও অতি শৈশবাবস্থ। উহাতে কয়েকটা স্থূল সূত্রমাত্র আছে, এবং সেই স্থূল সূত্রগুলিও গ্রীকশিষ্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণের স্ব স্ব জাতিগৌরব-সূচকমাত্র। সেই জন্য সূত্র গুলিতে ব্যভিচারের স্থলও অশেষ।

এই নব্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতবর্ষ বড় গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, অতএব এখানকার লোকেরা অলস প্রকৃতিক হইবে। গ্রীষ্মাতিশয্যে শারীরিক শ্রম যে অপেক্ষাকৃত ক্লেশকর হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু আরব দেশও গ্রীষ্মপ্রধান, চীনের দক্ষিণাংশও গ্রীষ্মপ্রধান। ঐ সব দেশের লোকেরা ত অলসস্বভাব নয়। আর শীতপ্রধান ইউরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী জর্ম্মণেরাও ত পূর্ব্বকালে অধিক শ্রমশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিল না। ইংরাজদিগের আদি পুরুষেরা ত খুব পেট ভরিয়া মদ্য মাংস খাইত, এবং সলোম পশুচর্ম্মাদি আচ্ছাদিত হইয়া খুব ঘুমাইত। অতএব গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক হইলেই অলস হয়, এবং শীতপ্রধান দেশের লোক হইলেই শ্রমশীল হয়, এই সূত্র ধরিয়া ভারতবাসীকে অলস প্রকৃতিক বলা একটা অপসিদ্ধান্ত। সমাজবন্ধনের গুণে এবং সামাজিক শিক্ষার গুণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও আলস্য দোষের পরিহার হইয়া থাকে।

ঐরূপ আর একটা কথা শুনা যায়। ভারতবর্ষের ভূমি অধিক স্থলেই অতিশয় উর্ব্বরা—এখানে অতি অল্প পরিশ্রমেই জীবিকার অর্জ্জন হয়, এই জন্য এখানকার লোকেরা অল্পমাত্র পরিশ্রম করিয়া সন্তুষ্ট থাকে—অধিক পরিশ্রমে মন দেয় না। এটাও একটা মিছা কথা। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মাত্রেই ভারতবর্ষীয় কৃষিজীবীদিগকে পরিশ্রমশীল বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চীনীয়দিগের শ্রমশীলতা ইউরোপীয় এবং আমেরিকদিগের ভীতিজনক হইয়াছে। মিশরের কৃষকেরাও অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব উর্ব্বর দেশনিবাসী হইলেই অল্প পরিশ্রমী হয়, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ফলতঃ উর্ব্বর-দেশবাসীরা দেশের-উর্ব্বরতা নিবন্ধন পরিশ্রমে কাতর হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অর্জ্জনস্পৃহার বিরুদ্ধ কথা এবং একান্ত অশ্রদ্ধেয়। তবে যদি উর্ব্বর দেশবাসীর সামাজিক নিয়ম অথবা রাজনিয়ম এমন হয় যে, তাহার পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ নিজ ভোগে না আইসে, তাহা হইলে তাহার শ্রম-বিমুখতা সমাজেই জন্মিয়া যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে সময়ে সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশে নূতন বন্দোবস্তের তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র সকল অনাবাদী এবং পতিত করিয়া রাখা লোকের অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে বটে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, উর্ব্বরদেশবাসীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল হইতে পারে। দেশের উর্ব্বরতা নিবন্ধন অধিক অন্নোৎপত্তি হয়। অন্নোৎপত্তি অধিক হইলেই প্রজার সংখ্যা বাড়ে। প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই সুব্যবস্থিত সমাজে আরও অন্নবৃদ্ধির প্রয়োজন উপস্থিত হয়, এবং সেই প্রয়োজন সাধনার্থ অধিকতর শ্রম সহকারে অন্নোৎপাদনের আবশ্যকতা হয়। চীন এবং ভারতবর্ষবাসীরা যে শ্রমশীল তাহার কারণ ঐরূপ।

আরও একটী কথা আছে। সে কথাটাতে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান কিছু গাঢ়তর। ভারতবর্ষবাসীরা ভাত খায়—ভাতের শরীর-পোষণশক্তি কম, এই জন্য ভারতবাসীরা দুর্ব্বল এবং শ্রমবিমুখ। কিন্তু ভারতবাসীরা সকলে ভাত খায় না—সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অর্দ্ধেক লোকের কিছু অধিক লোকে ভাত খায়

নচেৎ গোধুম জনায় এবং অপরাপর শস্যই অধিক লোকের খাদ্য। তবে গোধুমের রপ্তানি বাড়িয়া অবধি দিন দিন ভাত খাওয়া বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। ভারতবাসী দুর্ব্বলও নয় আর শ্রমবিমুখও নয়। তবে আজি কালি অনেকে অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে বলিয়া যাহাই হউক।

ঐরূপ আর একটা কথা এই :—ভারতবাসীরা মাংস খায় না বলিয়াই, বলহীন এবং সাহসহীন। কিন্তু স্পার্টানেরা মাংস খাইত না—অথচ গ্রীক-দিগের মধ্যে উহারা অপর সকল লোকের অপেক্ষা বলবান ছিল। ভারতবর্ষে নিরামিষভোজী ভোজপুরীয়েরা, অযোধ্যাবাসীরা ও পঞ্জাবী জাঠেরা পৃথিবীর মধ্যে অতি বলশালী লোকের সমকক্ষ। ইউরোপখণ্ডের সকল লোক ত ইংরাজদিগের সমান মাংসাশী নয়—জর্ম্মণ ও ফরাসিরা ইংরাজের অপেক্ষা কম মাংস খায় ; কিন্তু জর্ম্মণ এবং ফরাসিরা ইংরাজের অপেক্ষা হীনবল নয়, যদিও ফরাসিরা কিছু কম হয়, জর্ম্মণেরা ত কম নহে। আর যদি মাংস না খাইলে বল কম হইত, তবে কি একজনও ইংরাজ মাংস বর্জ্জনের যে নব-বিধান হইতেছে, তাহাতে যোগ দিত ? ফলকথা, যে দেশে শস্যোৎপত্তি অধিক হয়, সেখানকার লোকেরা অধিক শস্য খায়—মাংস অল্প খায়। হিন্দু সমাজেও তাহাই হয় ; শস্য খাওয়া অধিক হয়, মাংস খাওয়া কম হয়। শূক-রের বসা খাওয়া হয় না বটে কিন্তু ঘৃত ভোজন হয় ; মাংস খাওয়া হয় না বটে, দুগ্ধ খাওয়া হয়। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ডাক্তরের এক্ষণে মত এই যে, তৈলবৎ স্নেহ দ্রব্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্য আর কিছুই নাই অন্যের কথা কি, আর্য্যশাস্ত্রেই লিখিত হইয়াছে "আয়ুর্বৈ ঘৃতং"।

একজন ইংরাজ একদিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন "তোমাদিগের দেবদেবীর এত অধিক হাত কেন, তাহা এতদিনে আমি বুঝিয়াছি।" * * "কি বুঝিয়াছেন ?" * * "বুঝিয়াছি, যে এক একটী নদীতে অনেকানেক উপনদী আসিয়া পড়ে, তাই দেখিয়াই দেবদেবীর শরীরে বহুহস্ত কল্পিত হই য়াছে" * * আমি বলিলাম, "গ্রীক জাতীয় দেবদেবীগুলির সকলেরই দুইটী করিয়া হাত, গ্রীস দেশের নদীগুলির বুঝি উপনদী নাই।" ভোগো-

লিক তথ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ ভ্রম-সঙ্কুল এবং উপহাসাস্পদ।

সামাজিক প্রকৃতি নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আর এক প্রকার বিচার আছে। ইহা মনুষ্যের মৌলিক বর্ণভেদ অবধারণের দ্বারা হইয়া থাকে। এ বিচারের সার্থকতা আছে। এ বিচারে পূর্ব্ব পুরুষের প্রকৃতি হইতে পরবর্ত্তী পুরুষের প্রকৃতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয়। সুতরাং ইহা প্রকৃতরূপে বিজ্ঞান-মূলক। ভারত-বর্ষীয়দিগের প্রতি ঐ বিচার সূত্র প্রযুক্ত হইয়া জানা গিয়াছে যে, এই এই জাতির অনেকগুলি লোক ককেসীয় বর্ণসম্ভূক্ত আর্য্য, আর কতক লোক অনার্য্য—অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয়, কোলেরীয়, তাতারীয় প্রভৃতি অপরাপর বর্ণ সম্ভূক্ত। ঐ আর্য্য এবং অনার্য্যের মিশ্রণে এক্ষণকার হিন্দুজাতি—এবং তাহার মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলায় এবং উপবীত ধারণ করে বা করিবার যোগ্য, তাহাদিগের শরীরে আর্য্য শোণিত অধিক—এবং ব্রাহ্মণের শরীরে ঐ শোণিত বিশিষ্টরূপেই অধিক। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুমানের অবিমিশ্র অথবা অবিমিশ্রপ্রায় আর্য্যের সংখ্যা, দেড় কোটির অনধিক, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই দেড় কোটি এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয় স্থানীয় বর্ত্তমান রাজপুত এবং প্রাচীন বৈশ্য স্থানীয় বর্ত্তমান বণিকাদি জাতীয়েরা আর্য্যের মধ্যে গণ্য এবং অনেক সদ্বংশোদ্ভব মুসলমানও আর্য্যজাতীয়, তখন ভারতে আর্য্যের সংখ্যা অত অল্প হইতে পারে না। আর্য্য জাতীয় লোকের বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান চাতুর্য্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং সেই আর্য্যলোকই হিন্দুজাতির সারভূত, এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনার্য্যেরাও সমাজশাসনের গুণে অনেকানেক ম্লেচ্ছদিগের অপেক্ষা আচারপূত এবং ধর্ম্মভীরু হইয়াছে। অতএব প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে ভারতবাসিগণ যে জাতি উচ্চপ্রকৃতিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

—•◦◦◦•—

সামাজিক প্রকৃতি—উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ।

ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব একটী নূতন শাস্ত্র। ইহার অতি স্থূল সূত্রগুলিও এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ সমাজগুলিকে এক একটী সুবৃহৎ পরিবারের স্বরূপ মনে করিয়া সমাজ সম্বন্ধে তদনুযায়ী বিচার করেন, কেহ কেহ বা সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যেন কখন একটা বিশেষ চুক্তি ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া বিধি ব্যবস্থা দেন, আর কেহ কেহ বা ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রকেই সমাজতত্ত্বের মূল বলিয়া তদনুযায়ী নিয়ম সকল স্থাপন করিতে চান। আবার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচার প্রণালীর বিশেষ ভক্ত তাঁহারা সমাজ পদার্থটীর নিদান কিরূপ তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈবাহিক প্রণালীকে সমাজ বন্ধনের মূল সূত্র বিবেচনা করিয়া প্রতিপরিবারকেই সমাজের মৌলিক অণুস্বরূপ ভাবেন। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বিরা সমাজ মধ্যে বিশ্বসিত সর্ব্ব প্রকার মতবাদের এবং সমাজকর্ত্তৃক পরিগৃহীত সর্ব্বপ্রকার আচারের হেতু প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু যতই হউক, এখনও পণ্ডিতদিগের মধ্যে মত ভেদ অনেক; এখনও সমাজতত্ত্বের বিচারে উপমাত্মক ন্যায়ানুযায়ী বিচার, অতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় অতি বড় বড় নব্য-পণ্ডিতেরাও অনেক সমাজ শরীরকে প্রাণিশরীরের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীর যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুসকলের সমষ্টি, সমাজশরীরও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুল পরিবারের সমষ্টি—তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরাবস্থিত সকল অণু গুলিতেই জীবধর্ম্ম আছে, সমাজ শরীরাবস্থিত প্রতি পরিবারও জীবনী শক্তি সম্পন্ন—তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন প্রাণিশরীর হইতে অণু সকল নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এবং নূতন অণু সকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ সমাজ শরীর হইতেও লোক সকল

মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, আবার নূতন লোক সকল জন্মিয়া সমাজের পোষণ করিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সাদৃশ্য উপলব্ধ হওয়াতে পণ্ডিতেরা উপমাত্মক প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সমাজ-শরীর অবিকল প্রাণিশরীরের তুল্য, ঐ দুইটীতে কোন ইতর বিশেষই নাই।

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই সামাজিক নিয়মাদির উল্লেখ হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতগুলি—(১) সকল সমাজেরই জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়, জরা, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কারণ, প্রাণিশরীরের ঐ সকল দশা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। (২) সমাজ সংস্কারের সাময়িক প্রয়োজন আছে, কারণ বাল্যের পরিধেয়, যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় খাটে না। (৩) সমাজ জীবৎ শরীর; আহারের ন্যায় যাহা উপযোগী উহা তাহাই গ্রহণ করে, যাহা অনুপযোগী তাহা ত্যাগ করে।

এইরূপ অনেকানেক কথা আছে, এবং সে কথাগুলি উপমাত্মকন্যায়-মূলক বলিয়া এমনি পিচ্ছিল যে, অনায়াসেই লোকের গলাধঃকৃত হইয়া যায়। কিন্তু প্রাণিশরীরের সহিত সমাজশরীরের অনেকানেক মৌলিক বিষয়ে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। (১) প্রাণিশরীরের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী; তাহার কারণ, প্রাণিশরীর যে বলে জীবিত থাকে, তাহার প্রতিকূল বল সর্ব্বদাই ঐ শরীরকে নষ্ট করিতে চায়। চিরস্থায়ী প্রতিকূল শক্তি সকলের কার্য্যকারিতাগুণে প্রাণিশরীরের বিনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু ওরূপ কোন চিরস্থায়ী শক্তি, সমাজশরীরের প্রতিকূলরূপে কার্য্য করিতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয় না। মানুষের সাহজিক স্বার্থপরায়ণতা সামাজিক অবস্থার প্রতিকূল বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নয়। সমাজ বন্ধনের গুণে স্বার্থপরতাও সুসংস্কৃত হইয়া ঐ বন্ধনের অনুকূল বই প্রতিকূল হয় না। মানুষ সমাজসম্বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বার্থসাধন করিতে পারে, সমাজচ্যুত হইলে তেমন পারে না। তদ্ভিন্ন, সাহজিক সহানুভূতি সমাজ বন্ধনের অনুকূল শক্তি। এই জন্য সমাজ

বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী কোন স্থায়ী কারণই নাই। তবে পৃথিবী যদি কোন কালে মানুষের বাসোপযোগী না থাকে, (যেমন লোমশ হস্তী প্রভৃতি যুগান্তরজাত জীবদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে) তাহা হইলে মনুষ্যজাতির বিধ্বংসের সহিত সমাজেরও বিলোপ হইবে।

সময়ে সময়ে সমাজের কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। নিয়মগুলি সমাজের অন্তর্ভূত বস্তু, পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় বাহির হইতে আনীত বস্তু নয়। উপমার দ্বারা উহাদিগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও ঐ গুলিকে সমাজরূপ গৃহের কড়ি, বরগা, ইষ্টকাদির ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। কোনটী মচকাইলে বা ক্ষত হইলে বা লোনা ধরিলে বদলাইতে হয়, কিন্তু সেরূপ দূষিত না হইলে, শুদ্ধ বদলাইতে হয়, মনে করিয়া বদলাইতে যাইতে নাই। আর বদল করিবার সময়েও খুব সাবধানে ঠেকো দিয়া এবং কোন-রূপ বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় করিয়া তবে বদলাইতে হয়। প্রাণিশরীর হইতে সমাজ শরীরের বিশেষ পার্থক্য এই, উহা আপনার বহির্ভাগ হইতে আহারের ন্যায় কিছুই গ্রহণ করে না। উহার পোষণ উহার আপনার ভিতর হইতেই হয়। বাহির হইতে কিছু আনিয়া সমাজের গাত্রে লাগাইয়া দিলে, উহা প্রাচীরে ঘুঁটে দিবার ন্যায় গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রাচীরের বিস্তৃতি কিছুই বাড়ায় না। এই জন্য সামান্য অনুকরণ জাত সমাজ সংস্কার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়।

ফলতঃ যদি উপমার দ্বারাই বুঝিতে হয়, তবে সমাজশরীরকে প্রাণিশরীর না ভাবিয়া উহাকে দেবশরীর মনে করাই শ্রেয়ঃ *। দেব শরীরের আদ্যা-রম্ভ নাই, তেমনি কোন্ সমাজ পৃথিবীতে কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। যেমন দেবতারা চির কাল যৌবনাবস্থ, তেমনি সমাজও চিরকাল যৌবনাস্থ। আপনা হইতে সমাজের জরা বার্দ্ধক্য, মৃত্যু

---

* "Society is a moral individual essentially different from a physical individual"—Vattel.

নাই। যেমন দেবতাদিগের এক একটী বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান, তেমনি প্রত্যেক সমাজ আপনাপন মূল প্রকৃতি লইয়াই চিরকাল চলিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, আর্য্য শাস্ত্রকারেরা দৈব, পৈত্র্য এবং আর্ষ বলিয়া মানুষের যে তিনটী ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দৈব ঋণটী আত্মসমাজের নিকটেই ঋণ; উহা যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ সমাজান্তর্গত ব্যক্তি সকলের সুখ সম্বর্দ্ধনের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যশাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগের বিবিধ গূঢ় ভাবব্যঞ্জক শাস্ত্রে, যেমন সমস্ত লোক সমষ্টিকেই কোথাও ব্রহ্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি সমাজ বস্তুটীকেই দেবশরীর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

দেবশরীরের সহিত সমাজশরীরের আরও একটী সাদৃশ্য আছে। দেব শরীর আপনা হইতে নষ্ট হয় না; সমাজও আপনা হইতে মরে না। কিন্তু দেবশরীর যেমন দৈত্য দানবাদিকর্তৃক বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধঃপাতিত হইতে পারে, সমাজ-শরীরও সেইরূপ অন্য সমাজের প্রতিকূল বলে বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধীনীকৃত এবং হতপ্রভ হইতে পারে। আড়াই শত বৎসর গত হইল, পেগু প্রদেশ জয় করিয়া বর্ম্মিরা অনুজ্ঞা করিল যে, পেগু দেশীয়রা আপনাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না—আর ধর্ম্ম ব্যবস্থাও ব্রহ্মের প্রধান ফুঙ্গীর স্থানে লইবে। পেগুর আর স্বাতন্ত্রিকতা রহিল না। এই সে দিন, পোলণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিয়া রুষিয়া আজ্ঞা করিল, কোন বিদ্যালয়ে পোলদিগের ভাষা শিক্ষিত হইবে না, আর হাটে বাজারে কেহ কোথাও প্রকাশ্যভাবে পোল ভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে না। রুসিয়া অপরাপর ইউরোপীয় রাজ্যের ভয়ে বলিতে পারিল না যে, পোলদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থাও আর রোমন কাথলিক থাকিবে না, রুসীয় প্রজাদের ন্যায় গ্রীক সম্প্রদায়ের অনুযায়ী হইবে। ঐটী পারিলেই, বর্ম্মিরা যাহা, পেগু প্রদেশে করিয়াছিল, তাহা করা হইত, এবং ধর্ম্মলোপ ও ভাষালোপ এই দুইটী করিতে পারিলেই সমাজের যে বিশিষ্টরূপ অধঃপতন হয়, নব্য ইউরোপে তাহার একটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইত।

ইউরেপীয় পণ্ডিতেরা উপমাত্মক ন্যায়ের প্রয়োগ দ্বারা আর একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সমাজের রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, সে সমাজেরও ধ্বংস হইয়াছে মানিতে হয়। তাঁহাদের মতে রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হইবার চিহ্ন, সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে অধিকার লোপ। কিন্তু ইহা কোন প্রকৃত কথা নয়। যদি ইহা সত্য হইত, তবে সমাজ পদার্থটী অজর অমর না হইয়া নিতান্তই ঠুনকো জিনিস হইত। তাহা হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্য মাত্রকেই অন্তঃশাসন লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, অথবা সাম্রাজ্যবন্ধন কথন ভগ্ন হইতে পারিত না। তাহা হইলে, রুসিয়াকে পোলণ্ড লইয়া, ইংলণ্ডকে আয়র্লণ্ড লইয়া, তুরস্ককে তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া চিরকাল বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত না এবং অষ্ট্রীয়াকেও হঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইতে হইত না। রাজশক্তি গেলেই সমাজ যায় না—আর সমাজ থাকিলেই রাজশক্তি লাভের আশা এবং সম্ভাবনা থাকে। ইটালী এবং গ্রীস্ যে আবার এক একটী স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল, তাহার মূল কারণ উহাদিগের সমাজ ছিল এবং সেই জন্যই মাথা গজাইল। সমাজ লোপের সহিত ধর্ম্মের লোপ, ভাষার লোপ, এবং জাতিরও লোপ হয়।

ইহাতেই বোধ হইবে যে, কোন সমাজ প্রাণিশরীরের ন্যায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী বিধ্বংসের নিয়মাধীন নয়। সমাজের অনিষ্ট, তাহার বহিঃস্থিত অপরাপর সমাজের সম্বন্ধ জন্যই হইতে পারে। স্মবহু স্থলেই সেই সম্বন্ধ, অরি-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেখানে মিত্র সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়, তথায়. কারণ বিশেষ, যথা কোন সাধারণ শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ দুইটী বা ততোধিক বিভিন্ন সমাজকে কিছু কালের জন্য মিত্রতাসূত্রে সম্বদ্ধ রাখে। অথবা যেমন একটী দেবশরীর অপর দেবশরীরে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ কোন কোন স্থলে একটী সমাজ অপর সমাজের সহিত মিলিয়া ক্রমে দুইটীতে এক হইয়া যায়। ভারতবাসী অনার্য্য লোক সকল আর্য্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক হিন্দু সমাজ হইয়াছে। ইংলণ্ডবাসী, ওএলস প্রদেশবাসী এবং স্কটলণ্ড নিবাসী লোক সকল ক্রমে ক্রমে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একজাতিত্ব

প্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাধারণতঃ অরি-সম্বন্ধ থাকিলেও তত্তৎ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় এবং সৌহার্দ্দ জন্মিতে পারে। কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মানুষে মানুষে স্বভাবতঃ শত্রু সম্বন্ধই বলবৎ—একজন আর এক জনকে দেখিলে মনে মনে বিতর্ক করে, আমি উহাকে খাইতে পারি, না ঐ ব্যক্তি আমাকে খাইয়া ফেলিতে পারে! বাস্তবিক তাহা নয়, মনুষ্যাদিগের মধ্যেও মনুষ্য-জাতিত্ব নিবন্ধন বিশেষ একটি সহানুভূতি আছে। বোম্বাই নগরে যখন প্রথম কাপড়ের কল বসিল, তখন একজন গম্ভীর প্রকৃতি ইংরাজকে আমি সত্য সত্যই সুখী হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি।

কিন্তু ওরূপ যতই হউক, স্থূল কথা এই যে, বিভিন্ন সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ, অরি-সম্বন্ধ। এইরূপ হইবার মূলকারণ, ভূমণ্ডলব্যাপক অতি মহান্ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মের প্রভাবে এক প্রকার উদ্ভিদ অন্য জাতীয় উদ্ভিদকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষেত্র অধিকার করে, এক প্রকার জন্তু অপর প্রকার জন্তুর স্থান লয়, এক সমাজের মনুষ্য অন্য সমাজের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এ নিয়মটীও সমাজ মাত্রের সাহজিক বৃদ্ধি বই আর কিছুই নহে। মানুষ যদি সমাজবদ্ধ হইয়া না থাকে, তবে পৃথিবীতে মনুষ্য বিনাশের কারণ এত বহুমুখ, যে মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়িতে পায় না; রোগে, অনাহারে, হিংস্র জন্তুগণের দৌরাত্ম্যে, আর পরস্পর যুদ্ধে, অনেকে মারা যায় কিন্তু সমাজ বন্ধনের গুণে শ্রমবিভাগের প্রথা জন্মে, তাহাতে খাদ্য সামগ্রী বৃদ্ধি হয়, অকাল এবং অপঘাত মৃত্যু ন্যূন হয়, মানুষ সংখ্যায় বাড়ে, এবং সংখ্যায় যত বাড়ে, অনায়াসে তদুপযুক্ত আহার পায় না, এই জন্য বিস্তৃত হইয়া অপর সমাজের অধিবাসভূমিতে প্রবেশ করে। সমাজে সমাজে অরি সম্বন্ধ জন্মিবার এইটীই মূল কারণ। অন্য কারণও আছে; যথা, কোন সমাজের অর্থলোভপ্রবণতা—কাহার বিজিগীষা—কাহার অহঙ্কার, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কারণ, ঐ মূল কারণেরই সহায় বা প্রকটরূপমাত্র, মূল কারণ না থাকিলে, উহারা কার্য্যকারী হইত না।

সামাজিক প্রকৃতি—ব্যবস্থাসূত্র।

মানুষ সমাজ-সম্বদ্ধ হইয়া থাকিলেই সংখ্যায় বাড়িয়া যায়। সংখ্যায় বাড়িলেই, আর অযত্নসম্ভূত বন ফল মূলাদি কিম্বা মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষীর মাংস হইতে আহার্য্য প্রাপ্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। এই জন্য সমাজবন্ধন হইলেই আহার্য্য বৃদ্ধির উপায় করা আবশ্যক হয়, এবং সেই আবশ্যকতা হেতু সামাজিক ব্যবস্থা সকল জন্মে।

শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যাদিতে স্বত্বাধিকারের জ্ঞান, পূর্ব্ব হইতেই ঈষন্মাত্রায় জন্মিয়া থাকে। সেই জ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হয়, এবং তাহা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। কারণ স্বত্বাধিকার সংস্থাপিত হইলে, দ্রব্যাদির অপচয় নিবারণ এবং তাহাদিগের সমধিক উৎপাদন, উভয় কার্য্যই জনগণের স্বার্থসাধক হইয়া উঠে। এই জন্য সকল সমাজেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি ভেদে বিশেষ বিশেষরূপ ধারণ করিয়া ব্যবস্থিত হইতে থাকে। প্রথমেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার প্রতিব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া উহা গৃহস্বামীতে অথবা গোত্রস্বামীতে একান্ত নিষ্ঠ থাকে। যিনি বাটীর বা গোত্রের প্রধান, তিনি সেই বাটী বা গোত্রস্থ সকল নরনারীরও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। বাটীর বা গোত্রের দ্রব্যাদি তাঁহার বই আর কাহার হইবে? এই অবস্থাটীর প্রকৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অনেকেই একটীকে দাসত্বের অবস্থা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক, সমাজের ঐ অবস্থায় দাসত্বের আধিক্য হয় বটে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যাহাকে দাসত্ব বলিয়া বুঝেন, সে দাসত্বে এবং এ দাসত্বে অনেক প্রভেদ। ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব অতি ভয়ানক বস্তু। সে দাসত্বে ভিন্নধর্ম্মা এবং ভিন্নজাতীয় দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি; অর্থলালসা-প্রদিগ্ধ অতি প্রবলতর মনুষ্য, পশুবৎ এবং পিশাচবৎ নৃশংস ব্যবহার করে। এ দাসত্বে বলবান মনুষ্য, দুর্ব্বল মনুষ্যকে নিজ গোত্র বা নিজ পরিবারসম্ভুক্ত করিয়া, তাহাকে বহিঃশত্রু হইতে এবং নিরন্নদশা হইতে রক্ষা করে। সে দাসত্বে দাস ক্রীতপশু

অপেক্ষাও হীন, এ দাগত্বে দাসে এবং পুত্রে বা কনিষ্ঠভ্রাতায় নির্ব্বিশেষ। ইউরোপীয়ের দাস, কাফ্রি জাতীয় টম, তাহার মনিব তাহার বুকের মাংস সাঁড়াশি দিয়া ছিঁড়ে; এসিয়াখণ্ডে মুসলমানের দাস সবক্তগিন্ কুতবুদ্দীন আলতমস, যাহারা আপনাপন প্রভুর জামাতা এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী।* চীনীয়দিগের দাসেরা মনিবদিগের শিং উপাধি প্রাপ্ত হয়; ভারতবর্ষে আর্য্যের দাসেরা নিম্নতর বর্ণে ব্যবস্থাপিত হইলেও আর্য্যের গোত্রাধিকারী। দাসত্ব দশাটী সমাজ সম্বর্দ্ধনের একটী মুখ্য উপায়। উহা যথাকালে অর্থাৎ গোত্রস্বামীর সর্ব্বাধিকারিত্বের সময়ে, গোত্রসম্বর্দ্ধকরূপেই প্রচলৎ হইয়া থাকে। এক জন অতি বড় ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিৎ দাসত্ব দশার উপকারিতা স্বীকারে বাধ্য হইয়া বলিয়াছেন—"দাসত্বদশাও ভাল; কারণ, দাসত্বের প্রবৃত্তি হওয়াতে নর মাংস ভোজনটার নিবৃত্তি হয়।" এরূপ নরচিত্তানভিজ্ঞতা নৃশংস স্বভাব লোকেরই উপযুক্ত। ফলতঃ মানুষ মানুষকে পাইলে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে চায়, তাহাকে পুষিতে চায়, খাইতে চায় না।

দাসাদি গ্রহণ দ্বারা সমাজ সম্বর্দ্ধিত এবং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ হইলে, স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা সূত্রের একটী অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। গৃহস্বামী বা গোত্রস্বামীর সর্ব্বাধিকারিত্বের অভ্যন্তরে নূতন একটী ভাব সঞ্চরিত হইতে থাকে। তিনি যেন পরিবারটীর বা গোত্রটীর প্রতিভূস্বরূপ বলিয়াই সর্ব্বাধিকারিত্ব উপভোগ করেন, এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া যায়। ঐ প্রতীতি হইতে সম্মিলিত স্বত্ব ও স্বত্বাধিকার এবং তাহার বাহ্যরূপস্বরূপ সম্মিলিত পরিবার দেখা দেয়। সর্ব্বাধিকারিত্বের সময়েও সম্মিলিত পরিবার এখনও তাই, কিন্তু সর্ব্বাধিকারিত্বের সময় সম্মিলিত পরিবারগুলি যত দৃঢ়সম্বদ্ধ এখন আর সেরূপ নহে। এ সময়েও দাস ব্যবহারের প্রথা প্রচলৎ থাকে। কিন্তু কুলগুলি পূর্ব্বেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় দাসেরা আর কুলবর্দ্ধকরূপে গৃহীত হয় না। উহারা ক্ষেত্রসংসৃষ্ট পশুবৎ গণ্য হয়। উহাদিগকে অপকৃষ্ট স্বতন্ত্রাবাস প্রদত্ত হয়। কোথাও কোথাও যথা অধস্তন রোমীয়দিগের মধ্যে, উহারা দিবাভাগে ক্ষেত্রে খাটে, রাত্রিতে কারাগৃহে নিরুদ্ধ থাকে।

চীন সাম্রাজ্যে এবং ভারতবর্ষে এবং প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশে দাসদিগের কখনই ওরূপ দুরবস্থা হয় নাই। ঐ সকল দেশে সর্ব্বাধিকারিত্ব একবারে নষ্ট হয় নাই। কিন্তু অধস্তন রোমীয়দিগের মধ্যে পৃথক স্বত্বের প্রাদুর্ভাবে সম্মিলিত স্বত্বের ভাবও বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কৃষিপ্রধান অবস্থাতেই কিছু কিছু শিল্প এবং বাণিজ্যেরও অঙ্কুরোদয় হয়, যেথানে শিল্পের এবং বাণিজ্যের বিশেষ আধিক্য হয়, তথায় সম্মিলিত স্বত্বাধিকারের নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে না—পৃথক স্বত্বের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া উঠে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং অধস্তন রোমীয়দিগের স্থানে লব্ধ ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র উভয়েই এই পৃথকস্বত্বের বিশেষ পক্ষপাতী। এত পক্ষপাতী যে, ইউরোপের মধ্যে কোথাও কোন একটী জিনিস অস্বামিক থাকিতে পায় না। ইংলণ্ডে গোচারণ স্থানগুলি বহুকাল অস্বামিক ছিল। কিন্তু আর নাই বলিলেই হয়। ঐ অস্বামিকতা পরিহারের চেষ্টায় ভারতবর্ষেও বনভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অধিকার-সম্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং গরিব লোকেরা একটী পাতা কুটা কাঠি কুড়াইতে গেলেও রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক নিবারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যাহাই হউক, স্বত্ব পার্থক্যের এত দূর বাড়াবাড়ি হওয়াতে ইউরোপে একটী তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে। জাগতিক কোন বস্তুতেই নশ্বর মানুষদেহধারী কাহারও সম্যক্ স্বত্ব হইতে পারে না, এই ভাব অনেক লোকের মনে উঠিয়াছে, এবং তাহারা মানুষমাত্রেই সকল দ্রব্যের ভোগে সমান অধিকারী হইবে, এইরূপ সমাজনিষ্ঠ স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে চাহিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল দ্রব্যেরই মূল্য সমাজের অস্তিত্বনিবন্ধন হয় এবং অনেকানেক স্থলে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বও শুদ্ধ বলাৎকার অথবা বঞ্চনার ফল; ইহা ভাবিয়া দেখিলে একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব অপেক্ষা বরং সমাজনিষ্ঠ স্বত্বই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যদিও ঐ মতানুযায়ী কোন বিশেষ কাজ এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় ঐ মতানুগামী লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

সম্প্রতি এই সমাজনিষ্ঠ স্বত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে স্বত্বাধিকারেরএই ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয় অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারিত্ব, সম্মিলিতাধিকারিত্ব আর পৃথগধিকারিত্ব। এই তিনটীরই কিছু কিছু চিহ্ন সকল সমাজেই থাকে। সমাজের প্রকৃতিভেদে কাহার কোনটী কোথায় প্রবল কোনটী দুর্ব্বল হয়। সর্ব্বাধিকারিত্বের প্রধান চিহ্ন জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা। সম্মিলিতাধিকারের প্রধান চিহ্ন অবিভক্ত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। আর পৃথগধিকারের প্রধান লক্ষণ, বিভাজিত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। যেখানে জ্যেষ্ঠাধিকার, যথা ঊর্দ্ধতন রোমীয়দিগের মধ্যে এবং (ফরাসিবিপ্লবের পূর্ব্বে) ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আর রুসিয়ার ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে, তথায় যুদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল। যেখানে অবিভক্ত ধনাধিকার, যথা চীনে এবং ভারতবর্ষে তথায় কৃষি কার্য্যের বিশেষ প্রাধান্য। বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠাধিকার ছিল, শূদ্রদিগেরই সমাধিকার ছিল; কিন্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণশূদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেরই মধ্যে সমাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যথায় বিভাজিত ধনাধিকার যথা মার্কিন এবং ফরাসী এবং ইটালীয় প্রভৃতি নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে তথায় বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সমাদর। ইংলণ্ডে ভূমি সম্পত্তি সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা, অপর সকল সম্পত্তিতে পৃথক এবং সমাধিকারের ব্যবস্থা।

যেমন সমাজের প্রকৃতিভেদে স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হয়, সেইরূপ সমাজের প্রকৃতিভেদে বৈবাহিক ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া থাকে। স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকারের বিধি ব্যবস্থার দ্বারা আহার্য্য সামগ্রীর বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সমাজসম্ভুক্ত জনসংখ্যার যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, কালক্রমে খাদ্য সামগ্রীর সম্বর্দ্ধন সে পরিমাণে হইয়া উঠে না।* মানুষ সমাজসম্বদ্ধ হইয়া থাকিলেই সংখ্যায় অতি সত্বরে বাড়িয়া যায়। এই জন্য সকল সমাজের প্রথমাবস্থায় জনসংখ্যাসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যতটা উৎসাহ থাকে, কালে সেই উৎসাহ হ্রাস হইয়া আইসে, এবং জনসংখ্যা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত নানা সমাজে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবধারিত হইয়া

থাকে। আমার বোধ হয়, মনু-সংহিতার সময় এবং তাহার পূর্ব্ব হই-তেও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা সঙ্কোচ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কতকটা চেষ্টা হইয়াছিল। স্পষ্টতঃ কোন শাস্ত্রকারই জনসংখ্যা কমাইতে হয়, এরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অনেকানেক কথার তাৎপর্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। বেদে উক্ত হইয়াছে, উপর্য্যুপরি অধিক সন্তান হইলে তাহাদের অনেকে অকালে মারা যায়। মনু বলিয়াছেন, প্রথমজাত পুত্রই পুত্র. পরবর্ত্তীরা কামজাত. অতএব অপ্রশস্ত। তিনি একথাও বলিয়াছেন, বিনা পুত্রোৎপাদনেও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। এক দিকে গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা পক্ষান্তরে এই সকল কথা, উভয়ের মীমাংসা করিয়া দেখিলে তাৎপর্য্যার্থ এই হয় যে, বিবাহ করিয়া গৃহী হইবে, সমাজকে আপনার শিষ্টা-চরণের জামিন দিবে, কিন্তু অধিক সন্তান জন্মাইয়া সমাজকে দুঃস্থ করিবে না. এবং সেই প্রীতিভাজনদিগের অকালমৃত্যু দর্শনযন্ত্রণা হইতে স্বয়ং মুক্ত থাকিবে।

সমাজের প্রথমাবস্থায় বৈবাহিক নিয়ম অতি সামান্যরূপই থাকে অথবা, ও বিষয়ে কোন নিয়মই থাকে না বলিলেও হয়। আর যে নিয়মগুলি ঐ অবস্থায় প্রচলিত হয়, তাহাদিগেব মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পরিবার এবং বিভিন্ন গোত্রদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া সমাজশরীরকে বিস্তৃত এবং দৃঢ় করা, জনগণকে শান্তশীল করা, এবং তাহাদিগকে গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভি নিবিষ্ট করা। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা যাহাতে অতিবর্দ্ধিত হইতে না পায়, তৎপ্রতিও দৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রথমে একপত্নীকত্বের প্রশংসা, অনন্তর একপত্নীত্ব নিয়ম হয়; কোথাও শাস্ত্রশাসনের দ্বারা হয়, কোথাও কার্য্যতঃ হইয়া যায়। তাহার পর, ব্যবস্থার দ্বারা বিবাহযোগ্য বয়স উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়—কোথাও এত উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়, অথবা হইয়া উঠে যে, চারি পাঁচটী সন্তান হইবার বয়স অতিক্রান্ত না হইলে আর কন্যাকাল গত হইয়া বিবাহযোগ্যতা জন্মে না। সাধারণতঃ বয়োধিক বিবা-

হের নিয়ম, যুদ্ধবৃত্তি এবং বণিকবৃত্তি প্রধান সমাজের মধ্যেই সমধিক প্রচলিত হয়। যে সকল কৃষিপ্রধানদেশে ব্যবস্থাতঃ অথবা ব্যবহারতঃ সম্মিলিত স্বত্বাধিকারের প্রথা প্রচলিত থাকে; সে সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অধিক সন্তান জননের প্রতিবন্ধক নিয়ম সকল ব্যবস্থাপক এবং পণ্ডিত বর্গের প্রমুখাৎ নির্গত হইতে থাকে। কোথাও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় (যথা, শাস্ত্রতঃ ভারতবর্ষীয় উচ্চজাতীয়দিগের মধ্যে এবং ব্যবহারতঃ চীনীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে) কোথাও (যথা ইউরোপীয়দিগের মধ্যে) উদ্বাহকার্য্য বয়োধিকে নির্ব্বাহিত হয়, কোথাও মৃতপত্নীক পুরুষের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ নিন্দিত হয় (যথা, রুষীয় যাজকদিগের মধ্যে,) কোথাও চিরকৌমার ব্রতধারণের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় (যথা, ভারতবর্ষে, বৌদ্ধদেশমাত্রে, কাথলিক খৃষ্টানদিগের মধ্যে,) আর কোথাও এক পত্নীর বহুপতিত্ব ব্যবস্থাপিত হয়, (যথা, তিব্বত, ভোট, সিকিম এবং কানেরা প্রদেশে)।

বিবাহ প্রণালীর সংকোচ ভিন্ন, লোকসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার উপায় আর কিছুই নাই। কিন্তু সে উপায়ও সম্যক্ কার্য্যকারী বলিয়া বোধ হয় না। নর-পশুদিগেরও ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি বলবান। সুতরাং বিনা বিবাহবন্ধনে যৌবনাবস্থা অতিবাহিত হইতে দিবার নিয়ম, সামান্যতঃ নানা দোষের আকর হইয়া উঠে। মানুষ বিবাহিত হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক জীব হয়, নচেৎ অনেক উচ্ছৃঙ্খল এবং দুষ্ট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রাচীন সমাজগুলির ব্যবস্থাপকেরা সামান্যতঃ বিবাহ প্রতিষেধের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং সেই জন্য প্রাচীন সমাজ মাত্রেই একটী অতি ভয়াবহ দুষ্ট প্রথার প্রবর্ত্তনা হইয়া গিয়াছিল। প্রথাটি এই—সন্তানের প্রাণবিনাশ করিত।

পিতা মাতা আপনাদিগের সন্তানকে মারিয়া ফেলে—এটী বড়ই লোমহর্ষণ ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই, যে সমাজে

সাক্ষাদ্রূপে অথবা পরোক্ষভাবে ঐ কার্য্য না হইয়াছিল, এবং এখনও না হইয়া থাকে। ইউরোপে অনূঢ়াবস্থায় অনেক সন্তান জন্মে। সে গুলিকে মারিয়া ফেলে বলিয়া ঐ খণ্ডের সকল দেশেই "ফৌণ্ডলিং হস্পিটাল" নামে গূঢ়জাবাস সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আবাস গুলির সংখ্যা তত অধিক নহে। এক একটী প্রদেশের মধ্যে এক একটী বই নয়। ঐ প্রদেশীয় সকল গূঢ়জ সন্তান কি ঐ এক আবাসে আনীত হয়, না তথায় স্থান পায়? তদ্ভিন্ন; কেহ মারিয়া ফেলুক আর নাই ফেলুক, শিশু সন্তান সামান্য যত্নের অভাবে মরে কত? ইংলণ্ডে, প্রতি শতে একুশটী শিশু আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত আফিমের জল খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে। আফিম, শিশুশরীরের অতিশয় অনুপযোগী বস্তু। কিন্তু গরিব দুঃখী লোককে খাটিয়া খাইতে হয়, ঘরের কাজ কর্ম্ম দেখিতে হয়, ছেলে কাঁদিলে সে কিছুই করিতে পারে না, তাই একটু একটু আফিমের জল মুখে দিয়া রাখে, ছেলে বেশ ঘুমাইয়া থাকে। তবে উহার যে আয়ুঃ শেষ হয়, বাপ মা তাহা জানেই না।

গ্রীক এবং রোমীয় বড় বড় ব্যবস্থাপকেরা এবং পণ্ডিতেরা যথা, সোলন, লাইকর্গস, প্লেটো, আরিষ্টটল, নুমা, সিসিরো প্রভৃতি সকলেই ভ্রূণহত্যার এবং শিশুহত্যার বিধি প্রদান এবং প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। তবে আরিষ্টটলের মতে শিশুহত্যাটী দোষ, কিন্তু গর্ভধারণের চারি মাসের মধ্যে ভ্রূণহত্যা করা অবৈধ নয়। পক্ষান্তরে, রোমীয় প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুহত্যা অবৈধ।

হিন্দু সমাজেও ছেলে মারা ছিল। তবে যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি এ স্থলেও হিন্দু সমজের পন্থা ভিন্নরূপ। হিন্দুরা যদি ছেলে মারিত, তাহা দেবোদ্দেশে; অধিক ছেলে রাখিব না, দুর্ব্বল ছেলে রাখিব না, পালনে কষ্ট হইবে, সমাজে দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইবে, দরিদ্রতা জন্মিবে, এ সকল

স্বার্থসম্বন্ধবিশিষ্ট কোন কারণে নয়। আপনাদিগের সুখবৃদ্ধি কিম্বা দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে গেলেই তাহার পাপ গুরুতর হয়। সমাজের হিতসাধন মনে করিলে তাহাও স্বার্থসম্বন্ধশূন্য হয় না। এই জন্য দেবতার উদ্দেশে সমাজের হিতসাধন প্রচ্ছন্ন করিয়া হিন্দুর ব্যবস্থা। চীনীয়দিগের মধ্যেও ছেলে মারা আছে। তথায় কোন কোন হ্রদ এবং নদীর ধারে সাইনবোর্ডের ন্যায় প্রস্তরফলকে লেখা থাকে,—"এই স্থানে ছেলে ডুবাইয়া মারিবে না।"

এইরূপে সকল সমাজই কতকটা জ্ঞাতসারে এবং কতকটা অজ্ঞাতসারে জন-সংখ্যার সংকোচ চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে।

যে প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া ঐরূপ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে অনেক দিন গত হইল, একটী ফরাসি ডাক্তারের সহিত আমার কথোপ-কথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"পৃথিবীতে সুখ অধিক নয়, দুঃখই অধিক। যেখানে সুখবোধ হয়, সে সুখও ভ্রমমূলক; প্রকৃত জ্ঞান হই-লেই আর সুখবোধ থাকে না। মনে কর, একটা গারদে পাঁচ শত লোক বদ্ধ আছে। তাহাদের খাবার সামগ্রী ঐ পাঁচ শতেরই উপযুক্ত। সেই গারদে প্রতি মাসে পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ করিয়া নূতন নূতন কয়েদী প্রবিষ্ট করা যাইতে লাগিল, কিন্তু খাবার সামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া গেল না। ঐ কয়েদীদিগের দশা কেমন হয়!—পৃথিবীতে মনুষ্যের, মনুষ্য বলি কেন, জীব মাত্রের কি সেই দশা নয়?—আর সেই কয়েদী সমূহের বুভুক্ষাজনিত ক্ষিপ্তাবস্থায় কুকার্য্য সকল দমন করিয়া রাখিবার উপায়ের নাম কি দণ্ডবিধি নয়?" আমি বলিলাম—"শুদ্ধ দণ্ডবিধিরই উল্লেখ করি-লেন কেন, দানের বিধিও ত আছে।" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"দানের নিয়ম আছে বটে, কিন্তু উহা কি?—উহাতে মানুষ যে প্রকৃতির দোষ নিবারণে উন্মুখ, ইহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু মানুষ যে তাহা পারে, ইহার ত প্রমাণ হয় না। কয়েদীদিগের মধ্যে একজন আর একজনকে এক মুঠা ভাত দিল, তাহার প্রাণ বাঁচাইল, কিন্তু গারদের ভিতরে ত ঐ

ভাত মুষ্টি বাড়িল না! দানবিধি, ধর্ম্মবিধিই থাকা উচিত—উহাকে সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে আনিতে নাই।"; আমি বলিলাম—"আপনার উপমাটী বেশ চৌচাপটে লাগে বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবী কয়েদীর জেলখানাই হউক, আর বিলাসীর আবাস নিকেতনই হউক, আর ধর্ম্মাত্মার কর্ম্মক্ষেত্রই হউক, বাহির হইতে ইহার ভিতরে কিছুই আইসে না। আপনি যাহাদিগকে কয়েদী বলিলেন, তাহারাই বিলক্ষণ জানিয়া শুনিয়া আপনাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহারা যদি ভোগসুখের বৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে না করিয়া, ধর্ম্মবৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, এবং ধর্ম্মের অতি প্রধান অঙ্গ যে ইন্দ্রিয় সংযম, তাহা সম্যক্ অভ্যস্ত করে, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ কষ্ট কম হয়, অত্যাচার এবং পাপাচার কম হয়, দারিদ্র্য যন্ত্রণা কম হয়, পরপীড়ন এবং পরস্বাপহরণ কম হয়, দণ্ডবিধি এবং দান বিধি উভয়েরই প্রয়োগস্থল কম হয়, অকাল মৃত্যু ঘটনা কম হয়, যুদ্ধের প্রয়োজন কম হয়, অস্ত্র বিদ্যার চর্চা কম হয়, এবং মনুষ্য ধর্ম্মচর্য্যায় এবং জ্ঞানচর্য্যায় নিরত হয়। যে সমাজ ইন্দ্রিয় দমন করিতে শিক্ষা দেয়, সেই সমাজই উৎকৃষ্ট।—তোমাদের ফরাসি জাতি বিনা রাজব্যবস্থার সাহায্যে যে স্বদেশে লোক সংখ্যার অযথা বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক সচ্ছলতারূপ কতক ফললাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি উহারা ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া পবিত্র শিক্ষার প্রভাবে চলিতে পারিত, তাহা হইলেই উহাদিগের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইত, এবং ফরাসি জাতিই ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বপ্রধান জাতি হইত।" কিন্তু ফরাসীরা স্বধু ঐহিক সুখ সাচ্ছন্দ্যের লোভে সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধি নিবারণ জন্য পাপাচরণেও সঙ্কুচিত না হওয়াতে কয়েক পুরুষের মধ্যেই এই ফল হইয়াছে যে, উহাদের মধ্যে সন্তানের সুপালন জন্য কঠোর ব্যবস্থা প্রণয়নের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এবং দেশে জন সংখ্যা বৎসর বৎসর হ্রাস হইতে আরম্ভ হওয়ায় ভবিষ্যতে জাতীয় অস্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ দাঁড়াইতেছে।

সমাজের মধ্যে যত প্রকার বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহার একমাত্র মূল জন-সংখ্যার সহিত তাহাদিগের উপজীব্যের সামঞ্জস্য বিধান। ঐ কারণ হই-তেই স্বত্বের উৎপত্তি, ভূম্যধিকারের নিয়ম, পৈতৃক ধনাধিকার, বৈবাহিক ব্যবস্থা, সন্তান পালনের বিধি এবং দণ্ডবিধি ও দানবিধি। কিন্তু এই সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াও কোন সমাজ সর্ব্বতোভাবে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, এবং এক সমাজের লোক অন্য সমাজের অধি-কারে প্রবেশ করিতে যায়।

কোন সুচতুর ইংরাজ গ্রন্থকার রুসীয়দিগের সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, কৃষিজীবী বলিয়া উহাদিগের নূতন নূতন কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন হয়; এই জন্যই রুসীয়রা নিরন্তর আপনাদের ভূম্যধিকার বিস্তৃত করিয়া চলিতেছে। গ্রন্থকার এই কথাটীকে একটী নূতন কথার ন্যায় করিয়া এবং উহা রুসীয়দিগের প্রতিই খাটে, এমত ভাবে লিখি য়াছেন। কিন্তু পাশুপাল্যোপজীবী তাতার জাতীয়দিগের সম্বন্ধেও অবি-কল ঐরূপ বলা যায়। তাহাদের পশু চারণের নিমিত্ত নূতন নূতন ভূমিখণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয়; এবং তাতারীয়রাও সেই নিমিত্ত আপনাদের অধি-কার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। অপরন্তু, বাণিজ্য ব্যবসায়ী জাতীয়েরাও আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার স্থান খুঁজিয়া বেড়ান, এবং সেই জন্য পৃথিবীর অতি দূর দেশসকলেও গিয়া অধিকার এবং উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। প্রকৃত কথা এবং স্থূল কথা এই যে, প্রধান উপজীবিকা যাহাই হউক, সমাজমাত্রেই আপনাপন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে চায়, এবং তজ্জন্য অপরাপর সমাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করে।

পরন্তু, সকল সমাজের সংঘর্ষ-প্রবণতা সমান নয়। কোন কোন সমাজ এমন সুব্যবস্থিত এবং ধর্ম্মশাসনে সুশাসিত যে, আপনার নিবাসভূমি অতি-ক্রম করিয়া গিয়া অন্যের প্রতি উপদ্রব করে না। হিন্দু সমাজ কখন ভারত-বর্ষের বহির্ভাগে অধিকার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কিন্তু চীনীয়েরাই এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। উহারা একবার মাত্র

তিব্বত, তাতার, আনাম এবং ব্রহ্মদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য বাহির হইয়াছিল, আর কখন স্বদেশের বহির্ভাগে, যদিও প্রয়োজন পড়িলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কিন্তু দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হয় নাই। উহাদিগের মধ্যে লোকসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় নাই। এক চীন সাম্রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসি সংখ্যার পঞ্চমাংশ। কিন্তু লোক সংখ্যার বৃদ্ধির ফল এই হইয়াছে যে দেশের ভিতর কোথাও অনাবাদী ভূমি পড়িয়া নাই—পাহাড়ের শিরোভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়াছে—অনুর্ব্বর স্থান সকল জল সঞ্চারের দ্বারা শস্য-শালী এবং মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, এবং অন্যান্য সমাজে গবাদি পশু-দিগের দ্বারা যে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, চীন দেশে তৎসমুদায় কার্য্য অধিক পরিমাণে মনুষ্যের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে, এবং পশুর পালন বিশিষ্টরূপেই ন্যূন হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপখণ্ডে ইহার ঠিক বিপরীত কার্য্য হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয়দিগের শিল্পের এবং বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যন্ত্রাদির প্রয়োগ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের শ্রম করিবার স্থল অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের একটা কলে এক জাহাজ লোক খাটে—কিন্তু বিশ হাজার লোক খাটিয়াও যত কাজ না করিতে পারিত, তত কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং লোক সকল বেকার হইয়া পড়ে, আপনাদের আহার্য্য সংস্থান করিতে পারে না, এবং ভূরি পরিমাণে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীর অপরাপর সমাজের প্রতি আক্রমণ করিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয়েরাই অতি-শয় সংঘর্ষশীল। কিন্তু খাস ইউরোপের ভিতর যদিও যুদ্ধাদি ব্যাপারের প্রসঙ্গ অনুক্ষণই হইয়া থাকে, তথাপি ঐ যুদ্ধগুলি ঠিক সমাজ সংঘর্ষের লক্ষণাক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ যুদ্ধগুলি সকল স্থলেই ভূম্যধিকারের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরিসমাপ্ত হয় না। তাহার কারণ, ইউরোপখণ্ডের বিভিন্ন জাতীয় জনগণের মধ্যেও একপ্রকার ব্যবস্থাশাস্ত্র চলে। ঐ শাস্ত্রের মূল কথা—বিভিন্ন রাজ্যের বল সামঞ্জস্য, অর্থাৎ কোন একটী সমাজকে তাহার পার্শ্বস্থ অপর সকল

সমাজ অপেক্ষা এমন অতি-প্রবল হইতে না দেওয়া যাহাতে অপরের বিশেষ শঙ্কা জন্মে। কিন্তু কিছুকাল হইতে ইউরোপে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ঐ ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মৌলিক বর্ণ সাদৃশ্য লইয়া জাতি সংঘটনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। রুসিয়া সকল স্লাভবর্ণের লোককে ফরাসিয়া সকল লাটিন জাতীয়দিগকে, প্রুসিয়া সমুদায় জর্ম্মণ জাতীয়দিগকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে যুদ্ধাবসানে ভূম্যধিকার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সেই সকল পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় বিভিন্ন সমাজের আপনাপন দলের পোষণ ইচ্ছা মাত্রই বুঝায়।

পৃথিবীর যে যে ভাগে কতকগুলি সমপ্রকৃতিক বিভিন্ন রাজ্য এক সময়ে জন্মিয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই এক এক প্রকার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও জন্মিয়া যায় এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোকদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দেয়। গ্রীসদেশে রোমের অত্যুৎকট প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ইটালীতে, ভারতবর্ষে,ঐরূপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জন্মিয়াছিল। নব্য ইউরোপে ঐ ব্যবস্থার অনেক শাখা পল্লব বাহির হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ঐ ব্যবস্থাশাস্ত্র লইয়া অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ইউরোপের বহির্ভাগে এবং ইউরোপীয়েতর জাতিদিগের প্রতি ঐ সকল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োগ হয় না। তবে আজি কালি চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের বল বর্দ্ধিত হইয়া অবধি ঐ দুইটি জাতির সহিতও ইউরোপীয়দিগের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক দাঁড়াইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজ থীবা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি সহ একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গছাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্ষিপ্রকর্ম্মা ইংরাজ তাঁহাকে উহা করিতে দিলেন না। ফল কথা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, এক সমাজের প্রতি অপর সমাজের দৌরাত্ম্য কতকটা নিবারণ করিয়া রাখে।

কতকটা করিতে পারে, যদি পূর্ণমাত্রায় পারিত, তাহা হইলে বিভিন্ন সমাজগুলি আপনাপন অধিকার মধ্যে সুস্থির হইয়া থাকিত, এবং যে যেরূপে যতদূর পারিত, জনসংখ্যার সঙ্কোচ এবং আহার সামগ্রীর সম্বর্দ্ধন

করিত। আর সকলেই ধর্ম্মসঙ্গত বাণিজ্যকার্য্যদ্বারা পরস্পরের ভোগ সুখ বৃদ্ধি করিত।

যদি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপ্রণালী পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা যে বাণিজ্য ব্যাপারের সূত্র ধরিয়া পৃথিবীস্থিত অপর সকল দেশকে উদ্বেজিত করিতেছে, তাহা করিতে পারিত না। বাণিজ্য পদার্থটী কি? কোন দ্রব্য আমি চাই, কোন দ্রব্য তুমি চাও, যেটী আমি চাই, তাহা তোমার আছে, যাহা তুমি চাও তাহা আমার আছে, এস দুই জনে বিনিময় করি, উভয়েরই ভোগ সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ইউরোপের সহিত বাণিজ্য সেরূপ সহজ ব্যাপার নয়। ইউরোপীয় বলে, তুমি চাও আর নাই চাও, তোমাকে আমার জিনিস লইতে হইবে, আর আমি যাহা চাই তাহা তোমার স্থানে লইব—এ বন্দোবস্তে সম্মত না হও, যুদ্ধং দেহি। ইউরোপীয় বলে, তুমি ভিন্ন দেশের রাজা, অবশ্য স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু তুমি হীনবল আর ইউরোপীয় নও, অতএব অসভ্য; তোমার দেশে আমার যে সকল লোক বাণিজ্য ব্যাপার করিতে আসিয়া থাকিবে, তাহারা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, তুমি তাহাদিগের দোষাদোষ বিচার করিতে পাইবে না, সে কর্ম্ম আমার নিয়োজিত কর্ম্মচারীরাই করিবে। আর আমাদের ধর্ম্ম প্রচারকেরা তোমাদের ধর্ম্ম-প্রণালীর এবং সামাজিক রীতি নীতির নিন্দা করিবে এবং তোমাদের লোকসকলকে ভজাইতে থাকিবে। এ সব কেবল গায়ের জোর বই আর কিছুই নয়, সুতরাং ধর্ম্ম বিচারের একান্ত বহির্ভূত। এই জন্য সামান্যতঃ সমাজে সমাজে সংঘর্ষ হইয়া কি হয়, তাহার বিচার কোন এক দেশীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাশাস্ত্র হইতে হইবার যো নাই—ইতিবৃত্ত হইতেই সে বিচার করা আবশ্যক।

প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক প্রভৃতি জাতীয়েরা এক এক সময়ে খুব প্রবল হইয়াছিল। তাহাদিগের রাজারা অথবা সেনাপতিরা অপর দেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিত। কিন্তু জয় করিয়া আর কিছু

করিত না, তাহাদিগের ধন ধান্যাদি, গো মহিষাদি, রত্ন সুবর্ণাদি লুঠ করিয়া স্বদেশে আনিত। কখন কখন ঐ বিজিত রাজ্যের রাজাদিগকেও বন্দী করিত এবং বিজিত দেশে আপনাদিগের মতানুগামী কোন কোন ব্যক্তিকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত এবং তাহার স্থানে বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু কর লইত। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বিজয় ব্যাপার আরও সরল ছিল। বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী অমাত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক সকলকে জিজ্ঞাসা করা হইত, যুদ্ধে পরাভূত রাজকুলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজধর্ম্ম পালনের যোগ্য। যিনি যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন, তাঁহাকেই রাজাসন অর্পিত হইত। বিজেতা কিছু কর গ্রহণ করিতেন, স্থাপিত রাজার সহিত কোন কোন নিয়ম অবধারণ করিতেন—কিন্তু বিজিত রাজ্যের ধর্ম্ম প্রণালী আচার ব্যবহার, রীতি নীতি কিছুতেই হস্তার্পণ করিতেন না। তাহা করা হিন্দুর আন্তর্জাতিক শাস্ত্রানুসারে দোষ বলিয়া গণ্য হইত।

এই সকলের পর অতি প্রধান বিজিগীষু লোক রোমীয়েরা। ইহারা পররাজ্য জয় করিয়া তাহার উপর কর সংস্থাপন করিয়াই ছাড়িয়া দিত না। বিজিত রাজা এবং রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া আপনাদিগের লোক জন দিয়া বিজিত দেশের রাজকার্য্য চালাইত, স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করিত, আপনাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিত, এবং বিজিত জনপদের ধর্ম্মব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রণালীর অন্তর্ভূত করিয়া লইত।

রোমীয়দিগের পর মুসলমানেরা বিশিষ্টরূপেই প্রবল হয়। ইহারা যে দেশ জয় করিত, সে দেশের ধর্ম্ম এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র উঠাইয়া দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র চালাইত। উহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহই কোন রাজকার্য্য পাইত না। বিশেষ কারণে মুসলমানদিগের এই নীতি ভারতবর্ষে অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের পর নব্য ইউরোপীয় জাতীয়েরা। তন্মধ্যে পূর্ব্বে স্পেনী

য়েরা এবং সম্প্রতি ইংরাজেরা প্রধান। স্পেনীয়দিগের প্রণালী অনেক পরিমাণে মুসলমানদিগের সদৃশ। উহারাও বিজিত জনপদবাসীদিগকে স্ব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে পীড়ন করিত, এবং বিজিত দেশে আপনাদের বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিত। ইহারাও মুসলমান দিগের ন্যায় এক জন যাজক-নরপালের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বিদেশ জয় করিতে যাইত।

ইংরেজেরা কোন রাজা বা যাজকের কথায় দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েন না। ইহাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে অথবা বাণিজ্য করিতে বাহির হয়েন। যেখানে উপনিবেশ করেন, সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগের সমূলোচ্ছেদ করেন। যেথানে বাণিজ্য করেন, সেখানে শুদ্ধ আপনাদের লাভ ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যদি বহুজনপূর্ণ মহাদেশ ইহাঁদিগের করতলে আইসে, তাহার ধর্ম্মের প্রতি ইহাঁরা কোন সাক্ষাৎ অত্যাচার করেন না। সে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাদির প্রতিও কোন সাক্ষাৎ ব্যাঘাত করা হয় না। কিন্তু রাজকর্ম্ম সমুদায় আপনা-দের হাতেই রাখেন। ইহাঁরা বিজিত দেশ হইতে ধন শোষণ করিতে পাইলেই তুষ্ট। ইংরাজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া অবিকল ঐ পথানুবর্ত্তী হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিয়োজিত গবর্ণর ডল্‌হৌসী সাহেব দেশীয়দিগের সর্ব্ব প্রকার অধিকার নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। অনন্তর যথন সিপাহী বিদ্রোহের পর দেখা গেল যে, এই রাজনীতি ভারতবর্ষের যোগ্য নয়, তখন মহারাজ্ঞী এই সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সময় ঘোষণা প্রদান করিলেন যে, ইংরাজ এবং দেশীয় লোক নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্য সমাপন করিবেন, ব্যব-স্থাপক সভায় দেশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে স্থান দিবেন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হিতসাধন করাই রাজকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ইহাদিগের কোন অধিকারে হস্তার্পণ করা হইবে না। ইংরাজ 'কি ভাল বা উচিত, তাহা সামান্যতঃ বিচার করিয়া কাজ করেন না এবং অন্যের

পক্ষে কি ভাল কি মন্দ, তাহা আদবেই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যেখানে যোগ্যতা দেখেন সেই খানেই আপনার প্রকৃতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারেন এবং যে সকল অনুষ্ঠানে আপনার ভাল হইয়াছে মনে করেন, অন্যের পক্ষেও তাহাতে ভাল হইবে মনে করিয়া তাহাদের জন্য কিয়ৎপরিমাণে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইংরাজ স্বার্থপর এবং সহানুভূতিশূন্য হউন, কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। তিনি সক্ষমের সমাদর করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—•(০)•—

পাশ্চাত্যভাব—ইংরাজসমাগম।

হিন্দু সমাজের প্রকৃতি শান্তি-প্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগসুখানুসন্ধানে কার্য্যতৎপরতা। হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপজীবী, ইংরাজ প্রধানতঃ শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী, হিন্দুসমাজ মিলিতস্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক্ স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী। হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত, ইংরাজ সমাজে বয়োধিকে বিবাহই নিয়মিত। হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্ব্বস্ব করিতে উন্মুখ—ভারতবর্ষে এই দুইটী পরস্পর ভিন্নধর্ম্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ কার্য্যতৎপর, কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী এবং লোভী; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচেতা। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয়।

কিন্তু তাহা হয় না। শিক্ষাকার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ। অনুকরণ করিতে গেলে, দোষ এবং গুণ দুইই অনুকৃত হইয়া যায়। তবে দোষের

অনুকরণই সহজ। এই জন্য হিন্দু, ইংরাজের স্থানে সাহঙ্কার ব্যবহার শিখিতেছে, এবং আপনার জাতিসুলভ নম্রতা পরিত্যাগ করিতেছে। হিন্দুর সন্তুষ্টচিত্ততাও তিরোহিত হইয়া ইংরাজ সাহচর্য্যে লোভপারবশ্য জন্মিতেছে। হিন্দুর হৃদয়ে পরার্থজীবনতা যতদূর উঠিয়াছিল, পৃথিবীর অপর কোন জাতির হৃদয়ে উহা তত দূর উঠে নাই, ইংরাজের হৃদয়ে স্বার্থপরতা যেমন বলবান পৃথিবীতে আর কোন জাতির হৃদয়ে উহা তত প্রবল নয়। আবার বলি, এরূপ দুইটী সমাজের পরস্পর সংস্রবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্ত্ত না ঘটিয়া যদি ইংরাজের স্বভাবেই পরিবর্ত্ত ঘটিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে পরার্থচিন্তা তিরোহিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দুর হৃদয় স্বার্থচিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। আমি ইংরাজী কলেজে শিক্ষিত কোন যুবাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মহাশয়! অমুক কার্য্যটীতে আমার স্বার্থ আছে, তবে আমি ঐ কার্য্যটী করিব না কেন?" * * * "করিবে না এই জন্যই যে, ঐ কাজটী করায় পরার্থ নষ্ট হয়" * * * "পরার্থ রক্ষা করিয়া চলায় আমার ইষ্ট কি?" * * * "ঐ পরার্থ রক্ষাই তোমার ইষ্ট" * * * পরার্থ রক্ষায় পরের ইষ্ট, তাহাতে আমার ইষ্টসিদ্ধি নাই।" বিচার ফুরাইল। বুঝিলাম, এত কাল ধরিয়া পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষার মহিমায় হিন্দুর হৃদয়ে যে পরার্থজীবনের ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে ভাব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে! আর এক দিন একটী নব্য উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা যে, এক জন অযোগ্য ব্যক্তিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটু তর্ক উপস্থিত হইল। উকীল বাবু স্বীকার করিলেন যে, পাত্রটী অভিনন্দনের যোগ্য নহে। অনন্তর বলিলেন, "আমরা ত সত্য সত্যই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রণোদিত হইয়া অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছি না। উহাঁকে তুষ্ট করিলে আমাদের একটী স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে—তাই এ কার্য্য করিতেছি"। এ স্থলেও বিচার ফুরাইল।

বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী ভাষায়

অনভিজ্ঞ দুই প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ প্রস্তাব করিলেন—"সভার কার্য্য বিবরণ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হউক"। অমনি একজন 'কৃতবিদ্য' গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য সহকারে ঐ কথার প্রতিবাদ পূর্ব্বক ইংরাজীতে বলিলেন—"বাঙ্গালা ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, দেশটী দুই সহস্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইবে"। ভাবিলাম, এখনকার দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ত সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সন্নিহিত সময়—সে সময়ে পঁহুছিলে দেশটী পাছু যায় না আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশয়ের অগ্র পশ্চাৎ বোধটী বড় সুপরিষ্ফুট হয় নাই।

কোন জিলায় একটী "কৃতবিদ্য" মুনসিফ হইয়া তথাকার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব এবং এঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটী বাটী গিয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ঐ নগরে যে একটী মহারাজা থাকিতেন, তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় কোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিক রূপে ঐ কথার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—"রাজা বেটা কি করিতে পারে?—আর দেশীয় লোকে কেই বা কি করিতে পারে?"—"কৃতবিদ্যটীর" সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্য বোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম।

ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি অগ্র পশ্চাৎ বোধশূন্য, চিত্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্য বোধ বিরহিত এবং ব্যবহার অবিনীত হয়, তাহার কারণ কি ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংরাজী শিক্ষিতেরা মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনেও আপনাদের মন না বুঝিতে পারিয়া যাহা ভাবুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অপরিসীম ইংরাজভক্ত। তাঁহাদিগের ভক্তিটী মুখের ভক্তি নহে—অন্তরের অন্তস্তলভাগের ভক্তি। এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। রোম জাতীয় বাগ্মিপ্রধান সিসিরো কোন সময়ে সিলিসিয়া নামক একটী প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া রোম নগরে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার কোন বিপক্ষ ব্যক্তি সেনেট্ সভায় বলিয়াছিলেন যে; সিসিরো একটি

প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পাইয়া কোন কাজই করিতে পারেন নাই, একটী যুদ্ধও জয় করেন নাই, একটি শত্রুও বিনাশ করেন নাই। সিসিরো তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন—"আমি সিলিসিয়া প্রদেশে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রদেশবাসীরা চিরকালের জন্য রোমের দাসানুদাস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা (লাটিন) শিক্ষার নিমিত্ত এক শত চল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একেবারে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের ন্যায় হইবে, কখন রোমীয় ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনাদের আদর্শস্থলীয় মনে করিতে পারিবে না।" সেনেট সভা সিসিরোর বাক্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। অতএব কেবল মাত্র ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে যে, ইংরাজই হিন্দুজাতীয় যুবকদিগের আদর্শ স্থলীয় হইয়া উঠিবে, ইহা সাধারণমনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ। কয়েক বর্ষ গত হইল ইংরাজীতে অতি ব্যুৎপন্ন কোন বন্ধুবরের বিরচিত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখাইয়াছেন, যে উহা ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত মিলে। গ্রন্থকর্ত্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ। অতএব ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে, ইংরাজ আমাদিগের আদর্শ পুরুষ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয় তাহা হইলে কতকটা কিছু কম লাগিতেও পারে। আমি দেখিয়াছি আজি কালি কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি আপনাদিগের পুত্র কন্যার শিক্ষায় ঐ পথ অবলম্বন করিতেছেন—উহাদিগকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া লয়েন, এবং সংস্কৃতে চর্চ্চা ইংরাজী শিক্ষার সহিত বরাবর প্রচলিত রাখেন।

আর এক প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিলেও ইংরাজের প্রতি অযথা ভক্তি কিছু কম হইতে পারে। ইংরাজ তাঁহার বৈজ্ঞানিক উন্নতির অন্যূন বার আনা ভাগ অপরাপর জাতীয়দিগের স্থানে পাইয়াছেন। তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, তাঁহার সামরিক উপকরণ ফ্রান্স হইতে, তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ড হইতে,—এইরূপ প্রধান প্রধান সকল যন্ত্র তন্ত্র অস্ত্র শস্ত্রাদি. ইংরাজ অন্যের স্থানে পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া যে, ঐ সকল জাতির কিছুমাত্র গৌরব করেন তাহা নহে। আমরা যদি ঐ পথ অবলম্বন করিতে পারি, অর্থাৎ ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির স্থানে যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ কৌশল এবং প্রয়োগ বিধান শিখিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে অনেকটা অযথা ভক্তির হ্রাস হয়। এইজন্য হ্রাস হয় যে, যন্ত্রাদি প্রয়োগ এত বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ থাকে না, প্রত্যুত অতি স্থূল ব্যাপার বলিয়াই প্রতীতি হয়, এবং তাহা হইলেই বাহ্য চৈক্কণ্যে এবং বাহ্য উন্নতিতে এতটা মোহ জন্মে না। মনুষ্যের দুইটি কর্ম্ম আছে—বাহ্য জগৎকে জয় করা আর অন্তর্জগৎকে জয় করা; সে দুইটি কার্য্যের মধ্যে যাহা ইংরাজেরা করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্য জগতের উপর কতকটা প্রাধান্য লাভ, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়। এই প্রকৃত তথ্যের জ্ঞানোদয় হইলেই আর ইংরাজের অনুকরণেচ্ছা অতি প্রবলা হইতে পারে না, ইংরাজ আর আদর্শস্থলীয় থাকে না, এবং তাহার রীতি চরিত্রের সংসর্গদোষে ভোগসুখেচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া জনগণকে স্বার্থপর করিয়া তুলে না। চীনীয় এবং জাপানীয়েরা ইউরোপীয়দিগের স্থানে কল কৌশল এবং অস্ত্র শস্ত্রাদির নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিতেছে, কিন্তু ইউরোপকে আপনাদের আদর্শস্থলীয় মনে করে না। আমরা ইংরাজ রীতির প্রতি অতি ভক্তিমান হইয়াছি, এবং ভারতবর্ষকে কিরূপে ইংলণ্ড করিয়া তুলিব তাহা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রবিদেরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, ইউরোপ নিতান্ত অসুখময় হইয়া উঠিয়াছে, ওখানে একটা অতি ভয়ানক সমাজবিপ্লব অবশ্যই ঘটিবে। সেই বিপ্লব

নিবারণার্থ কোম্‌টী হিন্দু সমাজের ন্যায় যাজক প্রধান সমাজ সংঘটনের পরামর্শ দিয়াছেন, আর সোপেন্‌হৌর ভারতবর্ষীয়দিগকেই ইউরোপের আদর্শ-স্থানীয় করিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় দার্শনিকমহোদয়দিগের কথা যেরূপ, সাধারণ ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের কথা সেরূপ নহে। উহারা ইংরাজ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই শতমুখ—উহারা ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বলিতেছে, ইংরাজ তাহাদিগকে কত কি শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছে, এবং ইংরাজ প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য মহান্ ভাব সকলের প্রভাবে ভারতবর্ষ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। দেশীয় "কৃতবিদ্যেরা" ও ঐ সকল কথা কণ্ঠস্থ করিতেছেন, এবং আপনাদিগকেই পাশ্চাত্যভাবের অধিকারী জানিয়া সেই সকল ভাবের ভাবে একান্ত গদ্‌গদ হইতেছেন।

কোন ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে একটী আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছেন—"কি আশ্চর্য্য গো! লোকটার মস্তিষ্কে একটাও পাশ্চাত্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না"—

আমি স্বয়ং যত দূর ভাবিয়া বা অন্যের সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাব গুলির সকলই এদেশে সম্পূর্ণ নূতন কি পুরাতনেরই বেশ পরিবর্ত্তন মাত্র, এবং উহারা স্বতঃই কতদূর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, আমাদের সমাজের উপকার বা অপকার করিবার যোগ্য, জাগতিক নিয়মাবলীর সহিত কত দূর সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট, এই সকল বিষয় প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিবার বিশিষ্ট প্রয়োজনই আছে বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্যভাব বলিয়া যে গুলির উল্লেখ হয়, তাহা নিম্নবর্ত্তী পদার্থের মধ্যে কোনটী না কোনটী হইয়া থাকে, যথা,—

(১) স্বার্থপরতা (২) উন্নতিশীলতা (৩) সাম্য (৪) ঐহিকতা (৫) স্বাতন্ত্রিকতা (৬) বৈজ্ঞানিকতা (৭) শাসনকর্ত্তার সমাজ প্রতিভূত্ব।

পাশ্চাত্যভাব—স্বার্থপরতা।

অহং জ্ঞানটী সকল সংজ্ঞার মূলে অবস্থিত। কীটাণু হইতে মহর্ষি পর্য্যন্ত যাহার সংজ্ঞা মাত্র আছে, তাহারই আত্মবোধও আছে। শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, আত্মজ্ঞানটী "প্রতিবোধবিদিত" অর্থাৎ সকল বোধের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু অহং জ্ঞানটী যেমন মৌলিক বস্তু "নাহং" জ্ঞানটীও তেমনি মৌলিক। বস্তুতঃ ঐ দুইটী বোধ পরস্পর সাপেক্ষ। উহাদিগের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব আছে বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। নাহং বোধ ব্যতিরেকে অহং বোধ হয় না, আর অহং জ্ঞান না জন্মিলেও নাহং বোধ হইতে পারে না। উহারা যমজ প্রায়। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা স্বার্থে এবং পরার্থে অভেদ বুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বার বার ভুরি ভুরি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি কি এবং আমি কি নই, কিছু দূর পর্য্যন্ত এই বিচার লইয়া গেলেই দেখা যায় যে, অহং এবং মমতার ভাব ক্রমশঃই অতিব্যাপক হইয়া, অবস্থা, শিক্ষা এবং সংস্কার গুণে সমুদায়কেই আমি এবং আমার করিয়া দেয়, স্বার্থে এবং পরার্থে ভেদ রাখিতে দেয় না, এবং যাহা পরার্থ নয় তাহাতেও আর স্বার্থ বোধ থাকে না। কিন্তু ঐ অত্যুচ্চ শাস্ত্রীয় বিচার ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় যে, অজ্ঞানান্ধ শিশুর স্বার্থ যেমন সংকুচিত পদার্থ, বয়োধিকের স্বার্থ তেমন ক্ষুদ্র বস্তু নহে; এবং যাহার জ্ঞান যেমন অধিক তাহার স্বার্থও তেমনি সুবিস্তৃত হয়। তদ্ভিন্ন, প্রায় সর্ব্ব স্থানেই দেখা যায় যে, মানুষ যখন আপনার সুখ, গৌরব এবং ঐশ্বর্য্যানুসন্ধানে বড় নিবিষ্টচিত্ত, তখনও আপনাকে অন্যের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য এবং গৌরব অন্যের চক্ষুতে না দেখিতে পারিলে কিছুই থাকে না, সুখেরও ভোগ অন্যের সহানুভূতি হইতেই অধিক পাইতে হয়।

হিন্দুর স্বার্থ অতি সুবিস্তৃত বস্তু। হিন্দু জানেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হিন্দু জানেন "সর্ব্বভূতময়ো হি সঃ।" হিন্দু প্রধানতঃ বৈদান্তিক অতএব একাত্মবাদী। হিন্দুর আত্মপর নাই। ইংরাজের স্বার্থ বড়ই সংকীর্ণ পদার্থ—ইং-

রাজের বিষয়জ্ঞতা অধিক, ইংরাজ নানা দিগ্দেশে গমন করেন, নানা প্রকার সমাজ দেখেন, বিবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্তু তিনি যেমন আপনার রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে একান্ত দৃঢ়সম্বদ্ধ, এমন আর কোন জাতি নয়। তিনি নিজেও কাহার হইতে পারেন না, কাহাকেও আপনার করিতে পারেন না।

ফরাসী পণ্ডিত নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে নীতি শিখাইলেন—"পরার্থে জীবন যাপন করিবে।" ইংরাজ দার্শনিক ঐ কথার খুঁত ধরিয়া বলিলেন "আত্মার্থে জীবন ধারণ না করিলে জীবন থাকে কৈ?—অতএব আত্মার্থেই জীবন ধারণ করিবে"। ফরাসী পণ্ডিতের তাৎপর্য্য এই—"এরূপ করিয়া জীবন ধারণ কর যে, জীবনের সমস্ত কার্য্যই যেন পরের উপকারে আইসে; যাহাতে পরের উপকার তাহাতেই আপনার প্রকৃত উপকার।" কিন্তু ইংরাজ দার্শনিক ও সকল তাৎপর্য্য ভাবিয়া বুঝিতে অশক্ত। ইংরাজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী।

কিন্তু ইংরাজের স্বার্থপরতায় একটী অদ্ভুত বৈচিত্র্য আছে; এবং সেই জন্য, অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যায় অনেক স্থলেই স্বার্থপরতার সকল দোষ ইংরাজকে স্পর্শ করে না। সে বৈচিত্র্যটী এই। ইংরাজের স্বার্থবোধ অতি গাঢ়তম তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাঁহার মনের যাবতীয় ভাব ঐ স্বার্থবোধে নিমজ্জিত। যেটীতে তাঁহার স্বার্থ, সেটী তাঁহার মনে চিরকাল ধর্ম্ম জ্ঞানের অবিরোধিরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে, ইংরাজ একেবারেই সহানুভূতি শূন্য। তিনি বুঝিতেই পারেন না যে, যাহাতে তাঁহার স্বার্থ সেটী কেমন করিয়া ধর্ম্মব্যাঘাতক অথবা অপরের অনিষ্টজনক হইতে পারে। তিনি যাহাতে সুখী সমুদায় জগৎ তাহাতেই সুখী নয়, কেন?—এইরূপ একটী বালসুলভ মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান। যাঁহারা ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথাগুলির ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ইংরাজ যতক্ষণ উপকার বা সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, ততক্ষণই খুব ভাল বাসেন, আর যেই উপকার প্রাপ্তি থামিয়া গেল মনে করেন, অমনি পুর্ব্বোপকৃতি স্মরণ করিতে

অশক্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজের ইতিহাসে ঐ স্বার্থপরতার এবং কৃতোপকার বিস্মৃতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কথার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া ইংরাজের যে প্রগাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন স্বার্থবোধের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই দুই একটী উদাহরণ দিব।

১৮১৫ অব্দ হইতে গ্রীক জাতীয় লোকের অধ্যুষিত আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংরাজের অধীন ছিল। পরে ১৮৩০ অব্দের পর গ্রীসদেশ স্বাধীন হইয়া উঠিলে আইওনীয় দ্বীপনিবাসী গ্রীক জাতীয় লোকেরাও গ্রীসের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিল। ইংরাজ ওরূপ ইচ্ছার হেতু বুঝিতেই পারিলেন না। তিনি বলিলেন "আমার অধীনতা ত্যাগ করিতে চাহিবে কেন?—এত সুখ আর কোথায় পাইবে?" ইংরাজ বলেন, "আফ্‌গান জাতীয়েরা আমাকে ভাল বাসে। আমি তাহাদের দেশে প্রবেশ করিয়া অনেক উপদ্রব করিয়াছি বটে, এবং উহারাও আমার অনেক লোক জনকে যুদ্ধ করিয়া এবং প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছে বটে, কিন্তু আফগান তবু আমাকে ভাল বাসে। আমার গুণ কত! আর কেহ কি আমার সঙ্গে তুলনার যোগ্য!"

ইংরাজ আপনার দেশ হইতে যত দুর্বৃত্ত দস্যু প্রভৃতি অপরাধীকে অষ্ট্রেলিয়া অথবা কেপে প্রেরণ করিত। ওখানকার লোকেরা যতই নিষেধ করুক কিছুতেই শুনিত না; বলিত, ও সকল আপত্তি দুই চারি জন দুষ্ট লোকের রটনা মাত্র। পরে যখন ঐ সকল স্থানের ঔপনিবেশিকেরা জাহাজ হইতে ঐ প্রকার ইংলণ্ডের ময়লা স্বদেশে নামাইতে দিল না, তখন ইংরেজ বুঝিল, তাই ত সত্য সত্যই যে উহারা ময়লা লইতে অস্বীকৃত, তবে আর দিয়া কাজ নাই।

ইংরাজ কানেডায় উপনিবেশ করিল। ওখানে পূর্ব্ব হইতে ফরাসীর উপনিবেশ ছিল। সুতরাং ফরাসী ও ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের পরস্পর মনোমালিন্য নিবন্ধন রাজকার্য্যের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজ সে সকল কথায় বিশ্বাস করিল না। ইংরাজ যাহা করে তাহাতে কি কোন ত্রুটি বা দোষ থাকিতে পারে! পরিশেষে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল—একটি

ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটিল, কতকটা রক্তপাত হইল। ইংরাজের চেতনা হইল, বুঝিল উপনিবেশগুলিকে অত দৃঢ় বন্ধনে রাখিলে চলিবে না। উহাদিগকে আভ্যন্তরিক বিসংবাদ সামঞ্জস্য করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার ক্ষমতাই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ইংরাজ বলেন, ব্রহ্ম দেশীয়েরা আমাকে পাইবার জন্য ঊর্দ্ধবাহু হইয়াছিল। যাই ব্রহ্মরাজ থীবা পদচ্যুত হইল, আর উঁহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বর্ম্মিদিগের মধ্যে যাহারা আমাকে চায় না, তাহারা বিদ্রোহী, দস্যু, ডাকাইত। অপরাপর লোকে ইংরাজের ঐ সকল কথাকে ভণ্ডতা মনে করিতে পারেন, এবং রাজনীতিজ্ঞ বড় লোকদিগের পক্ষে এবং হৃদয়বান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ওগুলি ধূর্ত্তপনাই বটে, কিন্তু ইংরাজ জাতি সাধারণ যদি একান্ত স্বার্থ-বিমুগ্ধ না হইত, তবে রাজনৈতিক কৌটিল্যও ঐ পথ অবলম্বন করিত না। ফরাসীরা আলজিরিয়া এবং টুনিস্ প্রদেশ মুসলমানদিগের স্থানে লইয়াছে। রুসিয়রাও মধ্য আসিয়াখণ্ডে তুর্কিমানদিগের স্থানে অনেক ভূমি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকের রাজনৈতিকেরাও বলিয়া বেড়ান না যে, মুসলমানেরা এবং তুর্কিমানেরা আমাদিগকে পাইবার নিমিত্ত বড়ই আগ্রহান্বিত ছিল এবং আমাদিগকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

ইংরাজ সত্য সত্যই মনে করেন যে, যে সৌভাগ্যক্রমে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে. সে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। ইংরাজের হৃদয় স্বার্থপরতায় পূর্ণ; উহাতে অপরের হইয়া চিন্তা করিবার একটুকুও স্থল নাই। একজন একটা পায়রা ধরিয়া লইয়া যাইতে ছিল। দেখিয়া কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পায়রাটা লইয়া কি করিবি?" সে উত্তর করিল "পুষিব।"—"আহা কৃষ্ণের জীব হত্যা করিবি কেন? আমাকে দে, আমি পোড়াইয়া খাব।" ইংরাজের মনের ভাবটি যেন অবিকল এইরূপ। তিনি পোড়াইয়া খাইলেও হত্যা হয় না—অন্যে পুষিবার চেষ্টা করিলেও হত্যা করিতেছিল বলেন। ইতিহাসে ইংরাজের একটা অস্বার্থপর কার্য্যের উল্লেখ আছে এবং ইংরাজ

গ্রন্থকারেরা সর্ব্বদাই সেই কার্য্যটির ব্যাখ্যা বাহির করিয়া থাকেন। ১৮৩২ অব্দে ইংরাজ নিজ ঘর হইতে দুই কোটি টাকা খরচ করিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের কাফ্রিজাতীয় লোকগুলির দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। কাজটি খুব উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ কাজটির প্রবর্ত্তক ইংরাজ নহেন। ১৮২২ অব্দ হইতে ব্রেজিল দেশে কাফ্রি জাতীয় দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই অবধি প্রতি বর্ষে তথায় রাজস্বের ষষ্ঠাংশ ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইবে এবং ১৮৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য চলিলে দাসত্বমোচন সম্পূর্ণ রূপে সমাধা হইবে এইরূপ স্থির থাকে। কিন্তু ব্রেজিল সাম্রাজ্যে ঐ মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া যে, ইংরাজকৃত কার্য্যটীর মাহাত্ম্য একে বারে নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে টাকা খরচ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে অধিক যায় নাই, অর্থাৎ স্বজাতীয় চিনি-করদিগের হাতেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্যও কাজটীর মাহাত্ম্য কমে না। ইংরাজ আমেরিকায় অপদস্থ হইয়া অবধি আপনার ঔপনিবেশিক-দিগের প্রতি যে যত্ন করিতে শিখিয়াছেন উল্লিখিত দাসমোচন কার্য্যটী তাহারই একটী অঙ্গ বলিয়া অবশ্য ধর্ত্তব্য হইতে পারে।

আর দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে, ইংরাজের স্বার্থ-পরতা অতি ঘোর তমোগুণে একান্ত সমাচ্ছন্ন। হিন্দুর হৃদয়ে কি ওরূপ তমোগুণের প্রাবল্য জন্মিতে পারে? হিন্দু জাতির সহজাত গুণ পরচিত্তজ্ঞতা এবং পরের ইষ্টানিষ্ট বোধ। হিন্দুর মন কোন সময়েই সম্যক্ বিমূঢ়তা চায় না। * হিন্দু মৃত্যুও সজ্ঞানে হয়, ইহার প্রার্থী। আমি জানি, কোন ব্যক্তির অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে ক্লোরোফরম্ শুঁকা ইয়া অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতে চাহিয়াছিলেন। পীড়িত ব্যক্তি বলিলেন সাহেব! যদি কাটা ছেঁড়া করিতে করিতে মরিয়া যাই।" সাহেব উত্তর করিলেন—"মরণ যাতনাও জানিতে পারিবে না" * * রোগী বলিল—

* সেই জন্য হিন্দু কোন কালেই তেমন মাদকসেবী হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার শাস্ত্রের বিধি তাঁহার স্বভাবেরই অনুযায়ী।

"তাহাতে আমার কোন লাভ নাই—আমি সজ্ঞানে মরিতে চাই—তুমি অস্ত্র চালাও আমি সহ্য করিব—আমি অজ্ঞানাবস্থায় মরিব না।" অস্ত্র চিকিৎসা সজ্ঞানেই হইল; একবারও কাতরতার চিহ্ন প্রকটিত হইল না। দেখিলাম, বাঙ্গালীর মধ্যেও রেগুলস্ আছেন। কথা হইতেছে এই যে, হিন্দুর একান্ত জ্ঞানলোলুপ হৃদয়ে কি ইংরাজের ন্যায় অশেষ স্বার্থপরতার স্থান হইতে পারে? কখনই পারে না। সুতরাং ইংরাজ সংসর্গে, যদি হিন্দুর স্বার্থপরতা বর্দ্ধিত হয়, তবে সে স্বার্থপরতা ইংরাজের স্বার্থপরতার ন্যায় একান্ত অন্ধ হইবে না। হিন্দু যেমন পরচিত্ত বুঝিতে পারে তেমনি আপনার চিত্তও বুঝিতে পারে। স্বয়ং স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কি করিতেছে তাহা হিন্দুর চক্ষে ঢাকা থাকে না, সুতরাং হিন্দু স্বার্থপর হইলে, জেনে শুনেই স্বার্থপর হইবেন। তাঁহার পাপ, জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—উহার অবশ্যম্ভাবি ফল অধঃপতন।

কিন্তু ইংরাজের স্বার্থজ্ঞানে একটু সতেজ রজোগুণের মিশ্রণ আছে। ইংরাজ আপনার জাতির স্বার্থে এবং নিজের স্বার্থে অনেকটা অভিন্নতা দেখিতে পায়। কোন জেলায় একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দেশী ছুতারেরা কাজে দেরী করে ও খারাপ কাজ করে বলিয়া কোন ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টর কোম্পানীকে কার্য্যভার দিলেন। কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী আসিল এবং স্থানীয় ছুতার দ্বারাই কার্য্যনিষ্পন্ন করিল। দেরী এবং কাজের ধরণ পূর্ব্ববৎই হইল, কিন্তু বিল হইল দ্বিগুণ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু বলিলেন তা হউক, টাকাগুলা ভদ্র লোকের হাতে যাইতেছে, হাভাতে কেহ ত পাইল না!" ইংরাজ সর্ব্বদাই স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানে মনোযোগী, স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ ও উদ্যত প্রহরণ। তাঁহার চরিত্র হইতে এই স্বজাতি বাৎসল্যটা শিখিতে পারিলে ভারতবর্ষে ইংরাজের সমাগম হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্মবর্দ্ধক হইতে পারে। ইহার কতকটা বাহ্যলক্ষণও সম্প্রতি দেখা দিতেছে। ঐ লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ জন

গণের হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেলে ভারতবাসীর অনেক দুঃখ ঘুচিবার পথ মুক্ত হইবে। যাহাকে ইংরাজের উন্নতি বলা যায় তাহার হেতু ইংরাজের স্বার্থপরতা নয়, ইংরাজের স্বজাতিবাৎসল্য। ইংরাজের যদি অবনতি হয় তাহা ঐ স্বার্থপরতার জন্যই হইবে। অতএব ইংরাজের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া কাজ নাই। ওরূপ স্বার্থপরতা আমাদের স্বভাবের বিপরীত। হিন্দু যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতি-দোষ প্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা।

নব্য ইউরোপীয়েরা বলেন, মনুষ্য উন্নতিশীল। পশু পক্ষ্যাদি পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তাহাদিগের কাহার আকারগত, আবাস-গত, উপভোগগত কোন কোন একটী বিষয়েও পূর্ব্বাপেক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষ হয় নাই, মনুষ্যের তাহা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, মানুষ ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে ও করিবে এবং এখনও যে সকল কাজ মানুষের অসাধ্য হইয়া আছে, কালে সে সকল কাজও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।

এইরূপে মনুষ্যজাতি সাধারণের ক্রমোৎকর্ষের কথা বলিয়া ইউরোপীয়েরা বলেন যে, আমরাই পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য জাতি অপেক্ষায় অধিক উন্নতিশীল ;—অর্থাৎ মনুষ্য, পশু পক্ষ্যাদি হইতে যে গুণে বড়, আমরা অপর সকল মনুষ্য হইতে সেই গুণেই বড়। সুতরাং, অপর কাহাকেও উন্নতি-শীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

নব্য ইউরোপীয়দিগের এই মতবাদের পৃষ্ঠপূরক স্বরূপ, যদি কতকগুলি বাহ্য-বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, এবং বার্ত্তাশাস্ত্রিক কথার উল্লেখ না হইত, তাহা হইলে উহাঁদিগের এই মতবাদের বিচার করিবার প্রয়োজন হইত না। গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় এবং চীনীয় প্রভৃতি জাতীয়েরা যেমন অপর সকল লোককে "বর্ব্বর" "ম্লেচ্ছ" এবং "প্রান্তবাসী অন্ত্যজ" বলিয়া গালি দিয়াছেন,

ইউরোপীয়দিগের "অনুন্নতিশীল" শব্দটীও সেইরূপ, অপর জাতিদিগের প্রতি গালি দান বলিয়াই ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী ইউরোপীয় শুদ্ধ গালি দান করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না; তিনি যাহা বলেন তাহার প্রমাণার্থ যুক্তি প্রদর্শনও করিতে চেষ্টা করেন।

সুতরাং সেই যুক্তিগুলির বিচার করা আবশ্যক। ইউরোপীয় বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের আধুনিক প্রচলিত মত পরিণামবাদ। পরিণামবাদ বলেন যে কি সজীব, কি নির্জীব সকল প্রকার পদার্থই আপনাপন পরিবৃতির প্রভাবে নিরন্তর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণিশরীরেও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধন হইয়া এক প্রকার শরীর অন্য প্রকার হইয়া উঠিতেছে। বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের এই প্রচলিত মতবাদটীকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পূর্ব্বকালের নিকৃষ্ট দেহসম্পন্ন মনুষ্য হইতে এখনকার উৎকৃষ্ট দেহসম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্মিয়াছে। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যথা, যে সকল মনুষ্য বহুপূর্ব্বগত "প্রস্তর যুগে" জন্মগ্রহণ করিয়া ভূগর্ভ বা পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে বাস করিত, তাহাদিগের মৃত শরীরের কঙ্কাল দেখিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, ইহারা এখনকার ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা খর্ব্বকায়, দুর্ব্বলাস্থি, এবং ক্ষুদ্রতর করোটি বিশিষ্ট ছিল। সুতরাং উহারা বলবীর্য্যে, আয়ুষ্মত্তায় এবং বুদ্ধিমত্তায় হীন ছিল।

কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্র, উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। বিজ্ঞান বলেন, যাহার যেরূপ পরিবৃতি সে ক্রমশঃ সেই পরিবৃতির যোগ্য হইয়া আইসে। পরিবর্ত্ত হইলেই যে উৎকর্ষ হয়, এমন কথা বিজ্ঞানে নাই। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার খর্ব্বাকার, দুর্ব্বলাস্থি, এবং ক্ষুদ্র করোটি বিশিষ্ট মনুষ্যের কঙ্কাল প্রস্তর যুগের বলিয়া পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ আকার প্রকারের মনুষ্য এখনও পৃথিবীর সর্ব্বত্রে আছে। তৃতীয়তঃ অতি বৃহৎ-শরীর ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও বৃহত্তর শরীরের কঙ্কাল অতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও কোথাও কোথাও পাওয়া গিয়াছে। চতুর্থতঃ পর্য্যাটকেরা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন কোন ভাগে ইউরোপীয়দিগের হইতেও বৃহ-

স্তর শরীর সম্পন্ন লোক সকল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্য শরীরের ক্রমোৎকর্ষশীলতার যে বৈজ্ঞানিক মূল বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, সেরূপ কোন বৈজ্ঞানিক মূলই বাহির হয় নাই। প্রত্যুত অতি ঘোর পরিণামবাদী একজন ইউরোপীয় দার্শনিক ইহার বিপরীতমতবাদই খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এইরূপ।—"অপরাপর প্রাণি-শরীর যেরূপে পরিণত হইয়া কাহার কশেরুর সংখ্যার বৃদ্ধি, কাহার বা কশেরুর দীর্ঘতা বৃদ্ধি, কাহার বা এক-শফত্ব গিয়া দ্বি-শফত্ব, কাহার বা অঙ্গুলির উদ্গম কাহার বা দন্ত লোমাদির বিলোপ, কাহার বা পক্ষোদ্গম, কাহার বা চর্ম্মাবরণ হইতে শল্কসম্ভূতি ইত্যাদি ইত্যাদি পরিণতি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত জীবের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহাই হউক, কিন্তু ঐ দেহ প্রাপ্তির পর হইতে আর তেমন কিছু হয়ও নাই, হইতে পারেও না। কারণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত বুদ্ধির প্রাথর্য্য, এতদূর জন্মিয়া গিয়াছে যে, পরিণতির পথ ঐ দিকেই অর্থাৎ মস্তিষ্কের অন্তশ্চক্রের বৃদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সম্বর্দ্ধনের দিকেই, উন্মুক্ত হইয়াছে; সুতরাং দেহের সম্বন্ধে পরিণতি একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" অতএব অতি ঘোর পরিণামবাদীও বলিতে পারেন না যে মস্তিষ্কভাগ ভিন্ন মনুষ্য শরীর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বা করিতে পারে। যতদিন যায়, মনুষ্য ততই শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করে এরূপ কোন নিয়ম বিজ্ঞানে নাই।

ক্রমোৎকর্ষের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বটে, যে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন মিসরীয়, পারশীক, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে ওরূপ কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমে ধর শারীরিক বলবীর্য্য;—সে সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সকল প্রাচীন জাতীয়দিগের সৈনিকেরা অতি গুরুভার বর্ম্ম এবং অস্ত্রাদি ধারণ করিত এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে প্রত্যহ বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ চলিতে পারিত। নব্য ইউরোপীয় সৈনিকে-

রাও উহা অপেক্ষা অধিক পারে না। নব্য ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাও তাহাই পারে। অথচ এখনকার ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা বলবীর্য্যে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে করেন না। কখন শুনা যায় নাই যে, ইংরাজের গোরা ফৌজ, সিপাহীদিগের অপেক্ষা অধিক বেগে বা অধিক দূর পর্য্যন্ত গিয়া সিপাহীদিগকে পাছু ফেলিয়াছে। সেনাপতি লেক সাহেব কোন সময়ে বড়ই দৌড়কুচ করিয়াছিলেন—গোরা এবং সিপাহী বরাবর এক সঙ্গে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ সৌষ্ঠব;—সে বিষয়েও বলিতে পারা যায় যে. প্রাচীন জাতীয়দিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়েরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। প্রত্যুত যদি গ্রীক জাতীয়দিগের চিত্র-পট এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি তজ্জাতীয় লোকসকলের শরীরাদর্শ হইতে জন্মিয়াছে মনে করা যায়, এবং তাহা করাই ন্যায্য, তাহা হইলে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন গ্রীকদিগের অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠবে কমিয়াছেন বই বাড়েন নাই। তাঁহার পর বুদ্ধিমত্তার কথা;—সে বিষয়ে তুলনা করিতে গেলে মনে রাখা আবশ্যক যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে, সমাজ সংঘটনে, গ্রন্থাদি বিরচনে এবং অন্যান্য প্রকারে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনাই বুদ্ধিমত্তার স্থায়ী এবং উচ্চতম আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক প্রভৃতির রচনা প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে নব্য লেখক মাত্রের আদর্শ হইবার যোগ্য এবং তাহাই হইয়া আছে। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয়;—এই বিষয়ে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক তন্ন তন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালের অপেক্ষা এখনকার লোকেরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তখনকার লোক-দিগের মধ্যে কেহ কেহ পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় এত উচ্চ হইয়া উঠিতেন যে, এখন কার অত্যুচ্চ ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের সমকক্ষরূপে গণ্য নহেন। তাঁহার মতে প্লেটো আরিষ্টটল আর্কিমিডিস এবং আণ্টানাইনসের সমান লোক নব্য ইউ-রোপে জন্মে নাই, আর জন্মিতে পারেও না; কেন না তখনকার শিক্ষা সর্ব্বা ঙ্গীন হইত, এখনকার শিক্ষা ঐকদেশিক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকের

মধ্যে সামান্য একটু শিক্ষার বাহুল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহাদিগের স্বভাবের উন্নতি বা ধর্ম্মের বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।

অতএব কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কেহই দেখান না যে, নব্য ইউরোপীয়েরা মনুষ্যজাতির যেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কথা বলেন সেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। এক্ষণে সমাজতত্ত্ব, অথবা ইউরোপীয় মতে সমাজতত্ত্বের অস্থিকল্প বার্ত্তাশাস্ত্র,* কি বলেন দেখা যাউক। ইউরোপীয় বার্ত্তাশাস্ত্র বলেন, সমাজ বন্ধন যত দৃঢ় হয়, সমাজ মধ্যে শ্রম বিভাগের নিয়ম ততই বিস্তৃত হইয়া উঠে। শ্রম-বিভাগের গুণে ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া উঠে, এবং সেই জন্য সমাজের কতক লোক দৈহিক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু গতানুগতিকতা ও অর্থলোভ, আর বিভিন্ন সমাজের পরস্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন শ্রমবিভাগের শুভময় ফল যে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব তাহা শ্রমজীবীদিগের ভাগ্যে কিছুই ফলে না। দেখ ইউরোপে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার কি ফল হইয়াছে? যে শ্রমবিভাগের গুণে প্রথমাবস্থায় অবসর লাভ, বিদ্যাচর্চ্চার উপায়, এবং ধনের বৃদ্ধি হইয়াছে, পরে সেই শ্রমবিভাগেরই প্রভাবে মানুষ একেবারেই অবকাশ-শূন্য, জ্ঞান-চর্চ্চায় অশক্ত, মনুষ্যত্ববিহীন যন্ত্র স্বরূপ এবং কতকগুলি লোক অপরিসীম ধনী এবং অধিকাংশ লোক সর্ব্বতোভাবে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ ভীষণ বৈষম্য হইতে অতি তীব্র অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষের অবশ্যম্ভাবী ফলে সমাজের উপপ্লব আসন্ন হইয়াছে। যাহাতে সমাজের বৃদ্ধি, তাহা হইতেই উহার যেন বিনাশেরও সূত্রপাত হইতেছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্য্যের অপরাপর সকল স্থলে যে লক্ষণ, * মনুষ্যের সমাজ তত্ত্বেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান। সৃষ্টিশক্তি

* বীজ হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে ক্রমে বীজ দেখা দেয়, কিন্তু যে প্রাকৃতিক কার্য্যের মাহাত্ম্যে বীজ অঙ্কুর রূপে এবং অঙ্কুর বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়" অবিকল সেই প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রভাবেই বৃক্ষ অন্তঃসারশূন্য, শুষ্কমূল এবং পতনপ্রবণ হয়: যে প্রাকৃতিক কার্য্য শিশু শরীরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার দেহযষ্টিকে দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে এবং যৌবন কালের শোভায় বিভূষিত এবং প্রৌঢ় বয়সের বলে বলীয়ান করিতেছে, অবিকল সেই প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রভাবেই বৃদ্ধ বয়স আসিতেছে

স্থিতিশক্তি এবং লয়শক্তি—এ তিনটী বিভিন্ন শক্তি নয়—এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সুতরাং কোথাও ঋজু রৈখিক পথ নাই—সর্ব্বস্থলেই বৃত্তাকার পথ, চক্রনেমির পরিবর্ত্ত।

অতএব বিজ্ঞানশাস্ত্রও যেমন ক্রমোৎকর্ষের নিয়ম দেখায় না, তেমনি ইতিহাসও তাহা দেখিতে পায় না, এবং ইউরোপীয় বার্ত্তাশাস্ত্র তাহার বিপরীত ভাবই প্রদর্শন করে—মনুষ্যের ক্রমোৎকর্ষের পথটীকে বিলক্ষণ বক্র হইয়া অপকর্ষে পরিণত হইতে দেখায়।

পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা।

(২)

তবে কি মনুষ্যজাতির ক্রমোৎকর্ষের কথা সর্ব্বতোভাবেই মিথ্যা—ঐ কথার কি কোন মূলই নাই?—আমার বোধ হয় উহা নিতান্ত অমূলক নয়। প্রাকৃতিক সমুদায় পদার্থ হইতে মনুষ্যের একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রকৃতির অপর কোথাও পরিস্ফুট আত্মবোধ নাই—মানুষে সেই আত্মবোধ এবং তজ্জনিত একটী চেষ্টাশক্তি * আছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্য্যের সর্ব্বস্থলে যে চক্রনেমি ক্রম দেখা যায় যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম সম্ভবে, তাহা মানুষের কার্য্যে, এবং তাহা মানুষের ঐ আত্মবোধ জনিত বিশের চেষ্টা শক্তির যথাযথ প্রয়োগেই জন্মিতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত বার্ত্তাশাস্ত্রীয় সূত্রে ঐ আত্মবোধ জনিত বিশেষ চেষ্টাশক্তির প্রয়োগে কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। যদি ইউরোপীয়েরা মনে করেন যে, শ্রমবিভাগের এবং যন্ত্রাদি প্রয়োগের শুভময় ফলই ফলাইব, ইহার অশুভ ফল ফলিতে দিব না, তাহা হইলে তাহারা সমুদায় পৃথিবীময় বল ছলের প্রয়োগে আপনাদের শিল্পজাত বেচিয়া বেড়াইবার

এবং অস্থি কঠিন, স্থিতিস্থাপকতাশূন্য এবং ভঙ্গ প্রবণ হইতেছে। পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহ নক্ষত্রাদির যে তাপবিকীরণ গুণে জীবনশালিতা ও জীবনোপযোগিতা জন্মিতেছে, সেই তাপবিকীরণ গুণেই উহারা চন্দ্রাদি উপগ্রহের ন্যায় শীতল, জলবিহীন বায়ুবিহীন ও জীবশূন্য হইতেছে।

* আত্মবোধ বিকাশের সাক্ষাৎ ফল কি তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বদেশের ব্যবহারের ও সরল বাণিজ্যের জন্য যাহা উপযোগী সেই পরিমাণমাত্র শিল্পজাত প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর লোকেও উদ্বেগ পায় না, এবং তাঁহাদিগের কারিগরেরাও দুই চারি ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করিয়া অব্যাহতি পায়; এবং অবসর কালটী বিদ্যার চর্চ্চায় নিযুক্ত করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব সাধন করিতে পারে। চীনীয় মহামহোপাধ্যায় মেনসিয়স্ এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের ক্রমোন্নতি সংযম এবং ধর্ম্মের পথে, লোভ এবং অধর্ম্মের পথে নয়। অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে চিরস্থায়ী উন্নতি হয় না। প্রবৃত্তি যদি নিবৃত্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে যে উন্নতি জন্মে তাহা স্থায়ী হইতে পারে।

বস্তুতঃ মনুষ্যের ক্রমোন্নতির নিয়ম যাহা আছে তাহার পথ একমাত্র মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব বিচারের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইতে পারে। মনুষ্য অনেকগুলি সম প্রকৃতিক বস্তু দেখিয়া তাহাদিগের সকলগুলির গুণবিশিষ্ট এবং সকলগুলির দোষবিরহিত একটী চিত্তাদর্শ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন। শুদ্ধ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন এমত নহে। সেই চিত্তাদর্শের প্রতি তৎস্রষ্টা মনুষ্যের প্রীতিও জন্মে, আর সেই প্রীতিও বহুকাল বন্ধ্যা থাকে না, প্রায়ই সে চিত্তাদর্শের অনুরূপ বাহ্য ব্যাপারের জননী হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিনির্ম্মিত ঐরূপ অনেকগুলি চিত্তাদর্শ প্রত্যক্ষীভূত হইলে, আবার তাহাদিগের প্রত্যেকের হইতে উৎকৃষ্টতর একটী চিত্তাদর্শ জন্মে। সেরূপ আদর্শের অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া গেলে, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর আদর্শ জন্মিয়া যায়। এইরূপ বহুকাল ধরিয়া চলিতে পারে এবং তাহা চলিলেই ক্রমোৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু এই কথার প্রতি একটী প্রতিবাদ আছে। মানুষের উৎকর্ষবোধটী সকল সময়ে একরূপ থাকে না। সুতরাং অবস্থাভেদে চিত্তাদর্শের প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া যায়, এবং যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট তাহাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ না হইয়া অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্তুকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষার কোন সমীচীন উপায় নাই। তবে যাহা যাহা পূর্ব্বাগত তাহার প্রতি দৃঢ়ভক্তি এবং যাহা অভিনব তাহাকে সেই

পূর্ব্বাগতের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে তুলনা করিয়া দেখিলে, চিত্তাদর্শের হঠাৎকারে অপকর্ষ জন্মিতে পারে না।

ইহাকেই রক্ষণশীলতা বলা যায়, এবং এই কার্য্যটী সংস্কার কার্য্য হইতে স্বল্পতর যত্নসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। একটী সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটীকে আরও কিছু স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিব। এখনকার ভাগ্যবান লোকদিগের বৈঠকখানায় গিয়া দেখ, প্রায়ই দেখিতে পাইবে, ইউরোপজাত বেলজিয়ান গালিচা সকল বিছান আছে। কিন্তু ওগুলি কি পারস্যদেশজাত গালিচার সমতুল্য, না জব্বলপুর নগরেও যে গালিচা সকল প্রস্তুত হইতেছে সেগুলিরও সমান? বাস্তবিক বেলজিয়ান গালিচা জব্বলপুরী গালিচা হইতেও শত গুণে নিকৃষ্ট। এইজন্য যে বাটীতে ঐ উৎকৃষ্টতর বস্তু দুই এক খানি থাকে, সেখানে বেলজিয়ান গালিচার প্রবেশ হইতে পারে না। সেখানে গৃহস্বামীর সঙ্গতি বৃদ্ধির সহিত পারস্য অথবা জব্বলপুরী গালিচারই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

উচ্চতর বিষয় লইয়া আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। যে বাটীতে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা থাকে, যেখানে গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রীর চিত্তক্ষেত্রে, শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর চিত্র স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া আছে, সে বাটীর ছেলেরাও ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজকে আপনাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করিতে পারে না। কারণ তাহাদিগের চিত্তাদর্শ ইংরাজ প্রদর্শিত সকল আদর্শ অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর।

তবে কি প্রাচীন আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে মনুষ্যের উন্নতির পথ মুক্ত থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচনা পূর্ব্বক অথবা অনুকৃতিপরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন নূতন ভাব আইসে, তাহা ঐ প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। যদি ঐ ভাব তাহাতে সম্মিলিত করিলে পূর্ব্ব চিত্তাদর্শের জ্ঞান চক্ষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়, তবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। বাল্মীকি কর্ত্তৃক চিত্রিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র ভবভূতির হস্তে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থার প্রকারভেদ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা কোন জাতিকে নিকৃষ্ট সভ্যাবস্থ বলেন, কাহাকেও বা অসম্পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ সভ্যাবস্থ বলেন, কাহার সভ্যাবস্থা স্থগিত-গতি বলেন, আবার কাহার অর্থাৎ আপনাদিগের সভ্যাবস্থাকে উন্নতিশীল বলেন। বিভিন্ন জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থার এরূপ ইতর বিশেষ কি জন্য জন্মে, এই প্রশ্নের উত্তরও নানাবিধ হইয়াছে। কোন ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, সংশয়বাদের বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার উন্নতি শ্রদ্ধা ভক্তির বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার অবনতি! একজন মার্কিন জাতীয় বলিলেন, সাম্য রক্ষাতে সমাজের সভ্যাবস্থা বর্দ্ধিত হয়, বৈষম্য দেখা দিলে উহার অবনতি জন্মে! এক জন ফরাসী গ্রন্থকর্ত্তা বলিলেন, শান্তিরক্ষাপূর্ব্বক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এ কথাটী বেশ বটে; কিন্তু কিরূপে ঐ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে তাহার কোন উপদেশ ইউরোপীয় পণ্ডিত দেন নাই।

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গ বিভিন্ন প্রকার সভ্যাবস্থার যে বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন সেই নামগুলি হইতে কি প্রকৃত তাৎপর্য্যের বোধ হওয়া উচিত তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহা না করিলে ওগুলি কেবল কথাই থাকিয়া যায়। আমার বিবেচনায় কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির উপর সভ্যতার তারতম্য বিচার করা অবিধেয়। কেহ মনোমধ্যে একটি উচ্চ আদর্শ গঠন করিয়া অথবা প্রাপ্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় প্রবেশ করিল। তাহার মনে যদি ঐ আদর্শই প্রোজ্জ্বল থাকে অথবা উহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ প্রস্তুত হয় এবং তৎপ্রতি প্রীতির খর্ব্বতা না হইয়া তৎসাধন চেষ্টা প্রবল থাকে তবে সে ব্যক্তি উন্নতিশীল হইয়া উঠে। যদি আদর্শ অপকৃষ্ট হয় অথবা মনটি ভিন্ন দিকে প্রধাবিত হওয়াতে উহার প্রতি স্থির লক্ষ্য না থাকে কিম্বা কোন কারণে চেষ্টাশক্তির হীনতা হইয়া যায় তবে সে ব্যক্তি উন্নতিশীল থাকে না; সামান্য লোকের মত পশুজীবন ধারণ করে অথবা দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া পৈশাচিকবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ হইতে দেখা যায়। গ্রন্থাদি হইতে, বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল হইতে আদর্শ নরনারীর চিত্রগুলি বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। ঐ সকল আদর্শ যাহার যত উৎকৃষ্ট সে জাতির উদ্দেশ্য তত উচ্চ হইয়া থাকে। ঐ আদর্শগুলির প্রতি যে জাতির যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি সে জাতি তত ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়। ঐ আদর্শগুলির অনুরূপ হইবার জন্য যে জাতীয় লোকের যত চেষ্টা সে জাতি তত উন্নতিশীল হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে. জাতীয় চিত্তাদর্শের উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়া বিচার করিলেই শ্রেণীবিভাগ অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে। যথা—

(১) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ অল্প সংস্কৃত সে জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থা হীন।

(২) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শের উৎকর্ষ আংশিক সে জাতির সভ্যাবস্থাও পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইতে পারে না। তাহার সভ্যাবস্থা আংশিক।

(৩) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ সুসংস্কৃত তাহাদিগের সভ্যাবস্থা উৎকৃষ্ট।

(৪) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ অপরের সংস্রবে বা অন্য কারণে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার সভ্যাবস্থা উন্নতিশীল।

(৫) যাহার চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন থাকিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ এবং তাহার সাধন চেষ্টা থাকে, সে জাতির সভ্যাবস্থা সজীব।

(৬) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ ন্যূন হইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতন প্রবণ।

(৭) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা মলিন হইয়া যাইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনশীল।

(৮) যে জাতির চিত্তাদর্শ সুসংস্কৃত এবং তৎপ্রতি অনুরাগও বলবান কিন্তু তাহার সাধন চেষ্টা কম, সে জাতির সভ্যাবস্থা উৎকৃষ্ট কিন্তু স্থগিতগতি।

জাতীয় চিত্তাদর্শের উৎকর্ষ এবং পূর্ণতার তারতম্য, তৎপ্রতি অনুরাগের

তারতম্য এবং তৎসাধন চেষ্টার তারতম্য এই তিনটী তারতম্যের বিচার করিয়া জাতীয় সভ্যাবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। কেহ আপনাকে উন্নতিশীল বলিলেই সে উন্নতিশীল ইহা প্রমাণ হয় না।

ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের আদর্শ বলিয়া যদি যীশু এবং মেরিকে ধরা যায়, তবে বলিতে হয় যে, আদর্শ দুইটি অতি অসম্পূর্ণ। যীশু এবং মেরির প্রতি ইউরোপীয়দিগের যে এখন আর বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহাও বোধ হয় না। উহাঁদিগের জীবন অনুকরণীয় বলিয়া ইউরোপীয়-দিগের কখনই বোধ হয় নাই। কেমন করিয়াই বা হইবে? যীশুর জীবন যাত্রা তাঁহার যৌবনদশাতেই নিঃশেষিত, তাঁহার বিবাহ হয় নাই। কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করেন নাই। তাঁহার জীবনবৃত্ত সাধুশীলের জীবন বটে, কিন্তু কোন গৃহস্থাশ্রমী সামাজিকের আদর্শীভূত হইতে পারে না। যীশুর জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ একান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া ইউরোপীয়দিগের কোন পবিত্রজীবনাদর্শ নাই। তাঁহারা লোভাদি রিপুবর্গের বশ। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টাশক্তি অতি প্রবলা, সুতরাং তাঁহাদের সভ্যতা অসম্পূর্ণ হইলেও অতি ত্বরিতগতি। নরজীবনের উচ্চচিত্তাদর্শ না থাক দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে উচ্চচিত্তাদর্শ তাঁহাদের আছে এবং দ্রব্যসামগ্রী গঠন করায় তাঁহাদের ক্ষমতা কম নয়। এই জন্য বাহ্যদৃশ্যে উহাঁদের সভ্যাবস্থা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি আসল জিনিসের দিকে দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে, ইউরোপে সভ্যাবস্থা পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সূত্রের অন্তর্গত। উহা আংশিক ও পতনপ্রবণ।

হিন্দুজাতি সাধারণের আদর্শ নরনারী শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতা। হিন্দু-জাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং শিরোভূত ব্রাহ্মণদিগের আদর্শ মহর্ষি বশিষ্ঠ। ঐ আদর্শগুলির অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীর আর কোন দেশে কোনকালে সৃষ্ট হইয়াছে কি? কোথাও হয় নাই। অতএব হিন্দুর সভ্যাবস্থা সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট বলিয়াই অবধারিত হইল। হিন্দুর হৃদয় হইতে ঐ আদর্শের প্রতি ভক্তি

শ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হইয়াছে কি? কিছুই হ্রাস হয় নাই। অতএব হিন্দুকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়াই স্বীকার করা উচিত। হিন্দুরা আপনাপন কার্য্যে ঐ আদর্শের অনুকরণ চেষ্টা করেন কি? আমার বোধ হয় আজ কাল অতি অল্পই করেন। হিন্দুর চেষ্টাশক্তির খর্ব্বতা হওয়াতে হিন্দু অতি উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থ এবং পরম ধর্ম্মশীল হইলেও তাঁহার সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যাবস্থা অষ্টম সূত্রের অন্তর্গত; অর্থাৎ উহা উৎকৃষ্ট কিন্তু স্থগিতগতি। কিন্তু কোন সমাজই স্থগিত-গতি হইয়া অধিক কাল থাকিতে পারে না। হয় চতুর্থ বা পঞ্চম সূত্রের অন্তর্গত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে নচেৎ ষষ্ঠ বা সপ্তম সূত্রের অন্তর্গত হইয়া হীন হইয়া যায়।

মুসলমান জাতিদিগের সম্বন্ধে দেখা যায় যে মহম্মদ এবং আয়েসা অথবা আলি এবং ফতেমার চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর ন্যায় পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ না হইলেও ঐ চরিত্রগুলিতে অনেকটা উৎকর্ষ আছে। অতএব তাঁহাদের সভ্যতাও উচ্চসভ্যতা বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ঐ আদর্শ চরিতের প্রতি মুসলমান দিগের প্রীতি ভক্তিও অতি তেজস্বিনী এবং তাঁহাদের চেষ্টাশক্তিও নিতান্ত অল্প নয়। এই সকল কারণে মুসলমানজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা পঞ্চম সূত্রের দ্বারা বিচার্য্য—উহা সজীব।

বৌদ্ধজাতীয়দিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে যে জাপানীয়েরা ইউরোপীয়ের সংসর্গে ও অনুকরণে চিত্তাদর্শ ছোট করিয়া ফেলিতেছে। জাপানীয় সকলেই একবাক্যে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এরূপ কথাও উঠিতে পারিয়াছে! চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত প্রভৃতি দেশেও এখন আর বুদ্ধদেবের উন্নতচরিত্র অবিকৃতভাবে চিত্তাদর্শস্বরূপ নাই। সুতরাং বৌদ্ধ জাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা তৃতীয় ও সপ্তম সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কিন্তু পতনশীল।

যদি কেহ মনে করেন যে, ক্রমোৎকর্ষের যে হেতু নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা সমাজগত নহে শুদ্ধ ব্যক্তিগত, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক যে, প্রতি

ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সূত্র খাটে, ব্যক্তি সমষ্টি সমাজের সম্বন্ধেও সেই সূত্র অবশ্য খাটিবে। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ। সামাজিক ব্যবস্থায় শান্তির প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, উন্নতির চেষ্টা ব্যক্তিগত করিতে হয়। ব্যক্তিগত উন্নতি কিয়ন্মাত্রায় উঠিলেই সমাজ আপনা হইতেই উন্নত হইয়া উঠে।

উপসংহারে বলি। সমাজ মনুষ্যের সম্মিলন-জাত। সুতরাং অন্তঃসম্মিলন যত দৃঢ় হইবে সমাজ ততই সবল হইবে এবং উহার ক্রিয়াশক্তিও ততই বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে সহানুভূতির বৃদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে। অতএব যেখানে যত দিন যতদূর ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়া থাকে। সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ কলকৌশলের সৃষ্টিতে হয় না, শুদ্ধ সস্তা দরে উপভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারিলেও হয় না, আর ধনের অতিশয় বৃদ্ধিতেও হয় না, মৌখিক সাম্যভাবের বিস্তারেও হয় না, আর আত্মমুখে আত্মগরিমা খ্যাপন করিলেও হয় না। যে সমাজে মনুষ্যের চিত্তাদর্শ যত উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎ-সাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত চেষ্টা সে সমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যা-বস্থ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, এবং উন্নতিশীল।

পাশ্চাত্যভাব—সাম্য।

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি ধর্ম্মপ্রণালীর মূল, প্রকৃতির পর্য্যালোচনা। এই গুলিকে প্রকৃতিমূলক বা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা যায়? অপর কতকগুলি মনুষ্য মনের ভাব পর্য্যালোচনা হইতে সম্ভূত। এই গুলিকে ভাবমূলক বা ভাবিক বলা যায়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরব্রহ্মে মানুষের আত্মত্বারোপ অল্প হয়, ভাবমূলক ধর্ম্মে ঐরূপ আত্মত্বারোপ অধিক হয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পর-ব্রহ্ম নির্গুণ—অর্থাৎ তাঁহাতে দয়া, মমতা, ক্রোধ প্রভৃতি মনুষ্য হৃদয়ের ভাব

সকল আরোপিত হয় না। ভাবমূলক ধর্ম্মে পরব্রহ্ম সগুণ—অর্থাৎ মনুষ্য হৃদয়ের যাবতীয় পরস্পর সাপেক্ষ ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষপথ, ভাবমূলক ধর্ম্মে ভক্তিই মুক্তির উপায়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম। ভাবমূলক ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্থল খ্রীষ্টীয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কঠোর, ভাবমূলক ধর্ম্ম কোমল। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে একমাত্র কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া সুখ প্রাপ্তির এবং দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখিতে হয়। ভাবমূলক ধর্ম্মে উপাসনার পথ সুবিস্তৃত, ইহাতে অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের ভয় করিতে হয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে স্বর্গ নরকাদি সুখদুঃখব্যঞ্জক পদার্থ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মূলক কর্ম্মফলভোগ মাত্র। ভাবমূলক ধর্ম্মে উহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সমুদ্ভূত। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে দুষ্কৃতি করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল হয় দুঃখ। ভাবমূলক ধর্ম্মে দুষ্কৃতির সাক্ষাৎ ফল হয় ঐশ বিরাগ এবং সেই বিরাগের ফল হয় দুঃখ। ফলকথা, প্রাকৃতিক ধর্ম্মে কারণ এবং কার্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী সংকল্প বিকল্পাত্মক ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। *"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা?" ভাবমূলক ধর্ম্মে তাদৃশ ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বে সর্ব্বা। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরমাত্মার অপাপবিদ্ধত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হয়। ভাবমূলক ধর্ম্মে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ ব্যাখ্যাত হয়।

ধর্ম্মপ্রণালীর এই মৌলিক ভেদ যদিও খুব স্পষ্ট এবং কোথাও কখন সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না, তথাপি উভয় প্রণালীই যেন কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর সম্মিলন প্রবণ বলিয়া বোধ হয়। সকল প্রকার প্রাকৃতিক ধর্ম্মেই পরমাত্মার অবতার অথবা তাদৃশ কোন পদার্থের স্বীকার আছে। আবার ভাবমূলক ধর্ম্মেও ঈশ্বরস্বভাবে মনুষ্যের আত্মত্বারোপ যে অন্যায্য এবং অবৈধ, তাহাও মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু, প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালীতে যে অবতারাদি স্বীকৃত হয়, তাহার মূল, ধর্ম্মনীতির অনুরোধ মাত্র। ধর্ম্মনীতি দেখেন যে, শুদ্ধ বিধিনিষেধের দ্বারা যে কার্য্য হয় দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের দ্বারা তাহা

* God is but he is not the Christian God. He is not the arbitrary dispenser of grace—Mazzini

অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর ফলদায়ক হয়। এই জন্য যেন ধর্মনীতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই প্রাকৃতিক ধর্ম গ্রন্থে অবতারাদির অবতারণা হইয়া থাকে। ভাবমূলক ধর্ম্মে যে ঈশ্বরে মনুষ্যের আত্মত্বারোপ পরিত্যাগ করিবার কখন কখন চেষ্টা হয় তাহার কারণ সত্যের অববোধমাত্র। প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে অবতারাদির ভক্ত হইতে শিখেন, সেই পরিমাণে তাহাদিগের মনের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে হয়। তাঁহারা আর বিধি নিষেধের সূত্র সকল খাটাইয়া আপনাদিগের চরিত্র সংঘটন করিতে পারেন না। তাঁহাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, বুঝা যায়। ভাবমূলক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে আত্মত্বারোপ পরিহারের চেষ্টা করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের প্রকৃতি সতেজ হইয়া উঠিতেছে অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করমতবাদ এবং স্মার্ত্তাচার যত ন্যূন হইয়া রামানুজাদিব্যাখ্যাত দ্বৈতবাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতির প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছে, ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতেছে। আর মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদ (সুফি মত) এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যেও নির্গুণবাদ (আগনষ্টিক মত) যতটুকু বিস্তৃত হইতেছে, ততই উহাঁদিগের চিত্তের বল অনুভূত হইতেছে। জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তি মার্গে যাওয়া কিম্বা প্রাকৃতিক ধর্মপ্রণালী ছাড়িয়া ভাবিক ধর্মপ্রণালীতে পদার্পণ করা, ইহা উন্নতির চিহ্ন নয়, অবনতির লক্ষণ।

অতএব স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী ভাবিক ধর্মপ্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর। কিন্তু একটী স্থলে আপাতদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ধর্ম প্রণালী হইতে ভাবমূলক ধর্ম্মপ্রণালী যেন উৎকৃষ্টতর বলিয়াই বোধ হয়। ঐ স্থলটী সাম্যবাদ বিষয়ক এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়।

জগতের কোথাও সাম্য নাই। গাছের একই ডালের দুইটী পাতাও পরস্পর সমান হয় না। একটী বালুকারেণুও অপর কোন বালুকা রেণুর সমান নয়। একটী বৃষ্টিবিন্দুও অপর কোন বৃষ্টিবিন্দুর সমান নহে। জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে মনুষ্য হৃদয়ে সাম্য-

জ্ঞানের উদ্বোধ হইয়া যায়। গাছের দুইটী পাতা লইয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটী যদি অপরটী হইতে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলেই দুইটীতে ঠিক সমান হইত। সাম্যজ্ঞান এইরূপ প্রত্যক্ষীভূত সাদৃশ্যমূল হইতে জন্মিয়া সাদৃশ্যবোধ হইতে ভিন্ন অপর একটী ভাব রূপে লক্ষিত হয়।

ভাবমূলক ধর্ম্ম প্রণালীতে এই সাম্যবোধের বিলক্ষণ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। মানুষের হৃদয়সম্ভূত সাম্যভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া শুদ্ধ জগৎ কার্য্যের মীমাংসায় গোলযোগ বাধাইয়া দেয় এমত নহে. ঈশ্বরকেও যেন বিচারের অধীন করিয়া তুলে। সেই জন্য ভাবিকদিগকে অনেক কষ্ট কল্পনা করিয়া মনুষ্যের সমীপে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষের পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার ন্যায়পরতা সাব্যস্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে হয়। সাম্যভাবের আরোপ নিবন্ধন ঈশ্বর এমন করিলেন কেন, ঈশ্বর তেমন করিলেন কেন, এক্ষে আর ওতে এত পৃথক করিলেন কেন, এইরূপ প্রশ্ন সকলের দ্বার অবারিত হইয়া থাকে, এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভাবিকগণকে ঈশ্বরের সকল অভিপ্রায় কল্পনাবলে জানিয়া রাখিতে হয়।

সাম্যবাদের আরোপ নিবন্ধন ধর্ম্মবিচারে এই সকল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সাম্যবাদীরা বলেন, উহার দ্বারা জনসমাজে সমূহ উপকার দর্শিয়াছে। মানুষে মানুষে সমান, এই ভাব হইতে পরপীড়নের হ্রাস হইয়াছে, সাধারণের অবস্থার উৎকর্ষসাধনচেষ্টা অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে সকলের হৃদয়ে আপনাপন উন্নতির আশা প্রদীপ্ত হইয়াছে, এবং সমাজের চেষ্টাশক্তি জাগরিত হইয়াছে। সাম্যবাদের যে কতকটা ঐরূপ শুভ ফল আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং উহার ঐ সকল শুভ ফল আছে বলিয়াই দুঃখজীবী জনসাধারণের কর্ণে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। উহা এত মধুর যে, যথায় উহা সত্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই সেই ইংরাজের মুখেও উহা আজি কালি ভারতবাসীর মনোহরণ করিতেছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সাম্যবাদের যেমন এক পক্ষে পীড়ন নিবারণ প্রবণতা আছে,

উহা তেমনি পক্ষান্তরে দয়াবৃত্তির সংকোচ প্রবণ। যেমন সকলের মনে স্ব স্ব উন্নতি বিষয়ক আশার আলোক প্রকাশ করিতে পারে, তেমনি ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং দুরাকাঙ্ক্ষার অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্র দগ্ধ করিতে থাকে। যেমন সমাজে অধ্যবসায় বর্দ্ধিত করে তেমনি সন্তোষাদি গুণের বিলোপ করিয়া দেয়।

সাম্যবাদ হইতে সমাজের মধ্যে আর এক প্রকারে অসন্তোষ এবং অসুখের কারণ উপস্থিত হয়। মুখে যিনিই যাহা বলুন, সামান্যতঃ মানুষ মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়। অতএব এক পক্ষে সাম্যধর্ম্ম পালন, পক্ষান্তরে অন্য মানুষ অপেক্ষা আপনি বড় হইবার প্রয়াস, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে না। সাম্যবাদটা কথায় মাত্র থাকে, ব্যবহারে বড়ই বৈষম্য উপস্থিত হইয়া যায়। যে সমাজে সাম্যের ভান নাই, সে সমাজে বৈষম্য রক্ষার জন্য নিরন্তর যত্নও অধিক নাই। মার্কিনেরা চাকরদিগকে চাকর বলেন না, সহায় বা সাহায্যকারী বলেন, কিন্তু মার্কিনদিগের মধ্যে ধনবত্তার গৌরব ইংরাজদিগের অপেক্ষাও অধিক। ইংলণ্ডে তবু কতকটা বংশমর্য্যাদা আছে, আমেরিকায় ধন ভিন্ন আর কিছুরই মর্য্যাদা নাই। বিদ্যার গৌরবও অতি অল্প। ভাবিক সাম্যবাদটা যেমন অপ্রকৃত বস্তু, তেমনি উহা কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য। ইহার একটী জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ—দাস নিয়োগ। মুসলমানেরা সাম্যবাদী, কিন্তু উহাঁদিগের কেনা গোলাম থাকে। খৃষ্টান জাতীয়েরা সাম্যবাদী। কিন্তু অল্পকাল গত হইল উহাঁদিগেরও সকলের দাস রাখা ছিল। সম্প্রতি দাস রাখিবার প্রথাটা অনেক উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহা বাকী আছে, তাহাও উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা উঠাইবার প্রকৃত কারণ সাম্যবাদ নয়। বার্ত্তা শাস্ত্রের একটী সূত্র এই যে, দাসদিগের শ্রম অধিক ব্যয়সাধ্য। ইউরোপীয় সমাজে শ্রমজীবী লোকেরা যে অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে দাস অপেক্ষা উহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য ন্যূন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সাম্যবাদের সম্মিলন হওয়াতেই, দাস ব্যবসায় বর্জ্জন সম্বন্ধে সাম্যবাদ কার্য্যকারী হইতে পারিয়াছে।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মেও সাম্যবাদ আছে। কিন্তু সে সাম্যবাদ অতি ঘোরতর বস্তু। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ মৌলিক একত্ব-বোধ মূলক। উহা নিবিষ্টচেতা-জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে স্বতঃই উদ্ভূত হয়। উহা সমস্ত জগৎকে একেরই বিভূতি স্বরূপে প্রতীয়মান করিয়া কোথাও কোন মৌলিক ভিন্নতা লক্ষ্য করে না। প্রাকৃতিক সাম্যবাদে শুদ্ধ মনুষ্য মনুষ্যের সমান, এই কথা বলে না, সকলেই সকলের সমান, এই কথা বলে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিতে এবং কুক্কুরেতে সেই একমাত্র শক্তি বিরাজমান দেখিয়া উভয়ের সমতা অনুভব করে, কোথাও কোন পার্থক্য দেখে না। উহা যে ভিন্নতা দেখে তাহা ব্যবহারিক ভিন্নতা এবং সংসার যাত্রার উপযোগী—পারমার্থিক ভিন্নতা অথবা কোন চিরস্থায়ী বস্তু বলিয়া মনে করে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যে ভিন্নতা দেখে তাহা কর্ম্ম প্রসূত বলিয়া জানে এবং বল ছলাদি প্রয়োগদ্বারা তাহার উচ্ছেদ চেষ্টা অবিধেয় বলিয়া মনে করে। ভাবিক ধর্ম্ম মৌলিক একতা দেখিতে পায় না—উহা কর্ম্মসূত্রেরও তাদৃশ বিস্তৃতি অনুভব করে না—উহা সাদৃশ্য দর্শন হইতে সাম্যের ভাবমাত্র গ্রহণ করে এবং ভিন্নতার প্রতি বিরূপতাব-লম্বন করাকেই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রাকৃতিক সাম্যবাদে মৌলিক তথা নিহিত এবং ভাবিক সাম্যবাদে মৌখিক সাম্য প্রকট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ বলেন সকলই মূলতঃ এক, কর্ম্মভেদে পৃথকভূত। ভাবিক সাম্যবাদ প্রত্যক্ষের অপনয়ন করিয়া বলেন সকলেই জন্মতঃ সমান সামাজিক ব্যবস্থাদির পক্ষপাত দোষে পৃথক্-কৃত। এইজন্য প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সমাজের মধ্যে অপকৃত এবং অশান্তি কর সাম্যবাদের প্রবেশ হইতে দেন না। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, সমাজের মধ্যে বড়ছোট থাকিবেই থাকিবে। * সমাজের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সেই উচ্চাবচ ভাবটি লোকের গুণানুসারিণী করিবার জন্যই সকল সমাজে চেষ্টা হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় ব্যক্তিগত মান্যস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যক্ত হইয়াছে—

* সমাজের অন্তর্গত যে সাম্য তাহা কর্ত্তব্য সাধনে সম্বন্ধ অর্থাৎ কি উচ্চ কি নিম্ন পদস্থ সকলেই আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে সমানরূপে বাধ্য।—ম্যাজিনি।

বিত্তংবন্ধুর্বয়ঃকর্ম্মবিদ্যাভবতি পঞ্চমী
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োষদ্যদুত্তরং।

বিদ্যাবত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; তাহার নীচে কর্ম্মশালিতা, তাহার নীচে বয়োধিক্য; তাহার নীচে সম্পর্ক অথবা আভিজাত্য; তাহার নীচে ধনবত্তা। এই পঞ্চবিধ মান্যস্থানই সকল সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজভেদে এই পাঁচটীর মধ্যে কোনটির প্রতি বিশেষ সমাদর হয়। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, নব্য ইউরোপে ধনবত্তার গৌরব বাড়িতেছে। এদেশেও ইংরাজ সমাগম হইয়া তাহাই হইবার কতকটা উপক্রম হইয়াছে। এই দুই এর মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সাহজিক গুণবত্তার প্রতি বিশেষ আস্থা বশতঃ মনে করেন যে, সামাজিক বৈষম্যের ব্যবস্থা বংশমর্য্যাদানুসারিণী হওয়াই ভাল, বিভবানুসারিণী হওয়া ভাল নয়। বিভবানুসারিণী বৈষম্য যদিও চেষ্টা-শক্তির উত্তেজক, তথাপি লোভ, ঈর্ষ্যা, শঠতা, অস্থৈর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক দোষের আকর।

আমি দেখিয়াছি, আমাদিগের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকর্ত্তাও সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় ভেদটী পরিষ্কার রূপে না বুঝিয়া যীশু এবং মহম্মদের সহিত বুদ্ধদেবকেও সাম্যবাদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতবাদ ভাবিক নয়, প্রাকৃতিক; সুতরাং উহাতে সামাজিক সাম্যবাদের বীজ মাত্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ক্রমোৎকর্ষ এবং ক্রমাবনতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মনুষ্যের মধ্যে সাহজিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধ মতবাদে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া আছে, এবং এদেশে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ করিলেই সাম্যবাদ রক্ষা করা হইতেছে বলিয়া অনেকে বোধ করেন। নব্য গ্রন্থকর্ত্তৃগণ ঐরূপ ভ্রমে পড়িয়াই বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া থাকিবেন।

যাহাই হউক, ভারতবর্ষে যে সামাজিক বর্ণভেদের ব্যবস্থা আছে, তাহার

প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা অতি উদার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, জাতিভেদটা কেবল গৃহস্থাশ্রমের মধ্যেই প্রবল; গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে জাতিভেদ মানিতে হয় না। অপরাপর আশ্রমের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশেষ এই যে, গার্হস্থাশ্রমে বিবাহ আছে, অন্যান্য আশ্রমে বিবাহ নাই। আর একটী বিশেষ এই যে, গৃহস্থাশ্রমে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ব্যবসায় অবলম্বন আছে, অপরাপর আশ্রমে তাহা নাই। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। অথচ জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অপ্রায়শ্চিত্তিক কোন দোষ হয় না। জাতিভেদ প্রথা মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া আছে। বিবাহ প্রতিষেধ দৃঢ় সম্বদ্ধ করিবার জন্যই খাওয়া দাওয়ার বিষয়েও আঁটাআঁটি হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবাহ-প্রতিষেধক বর্ণভেদ প্রথার নৈসর্গিক কারণ আছে। উহা এদেশে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই এখানে জন্মিয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে সে কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ধনের গৌরবটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না। জাতি ধনের আয়ত্ত নয়। সুতরাং যে সমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা থাকে, সে সমাজে ধনই সকল সম্মান এবং গৌরবের আস্পদ হয় না। ধনের প্রতি লোভ যে কারণেই হউক, কিছু কম হইয়া থাকিলে সমাজ ভালই থাকে, লোকের প্রকৃত সুখও অধিক হয়।

তৃতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্প কার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়া আছে, এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহা তুলনা রহিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ জাতিভেদ থাকায় লোকেরা আপনাপন অভিলাষানুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না বলিয়া একটা কথার কথা মাত্র আছে। মনুসংহিতার মতে "বৃত্তি কর্ষিত" হইলে, একমাত্র ব্রাহ্মণের ব্যবসায় ভিন্ন অপর

সকল ব্যবসায়ই সকলে অবলম্বন করিতে পারে, এবং তাহাই চিরকাল করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষক। শিক্ষকের মস্তিষ্কে পৈতৃক ব্যবসায় জনিত দোষও পরিহার করা বিধেয়।

পঞ্চমতঃ একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা অন্য বর্ণের লোকেরা আপনাদিগকে তেমন অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না। বাঙ্গালার নবশাখেরা আপনাদিগকে কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতি নিবন্ধন নিকৃষ্ট মনে করে না। মান্দ্রাজের পারিয়া নামক অস্পৃশ্য জাতীয়েরা বলে যে, তাহারা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, সুতরাং আপনাদিগকে হেয় জ্ঞান করে না। বোম্বাই প্রদেশীয় মাড়েরা তথাকার অস্পৃশ্য জাতি। কিন্তু উহাদিগেরও আত্মগৌরব আছে। উহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতি অপেক্ষা শুচি এবং শুদ্ধ বলিয়া জানে।

ষষ্ঠতঃ জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই অনেকটা আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পরাধীন জাতির পক্ষে এই প্রথা বিশেষ শ্রেয়স্করী।

পাশ্চাত্যভাব—ঐহিকতা।

অতি বালককালে একবার শিকারী পাখীর শিকার শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতে ছিল এবং এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেই মাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকরে বসিয়াছিল, সে বোধ হয়, আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং তাহার শিকরেকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকরে গিয়া টিয়ার উপরে পড়িল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল যে, টিয়াটী পোষা। সে একটী শীশ দিল, শিকরে অমনি টিয়াকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপরে

[illegible] চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল—স্কে বলিবে যে এই শিকরে সেই শিকরে।

বাল্যকালের ঐ অদ্ভুত দর্শন চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কখন অপনীত হয় নাই। অতএব বয়োধিক হইয়া যখন প্রবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট কি নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাহ্মণ সন্তানের হৃদয়ে এই বিচার স্বতঃই উত্থিত হইল, তখন জর্ম্মণদেশীয় রিথ্‌টর নামক একজন গ্রন্থকর্ত্তার শোন পক্ষীর শিকার সম্বন্ধীয় উপমাটি বড়ই মিষ্ট লাগিল, এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসাও সেই উপমাটীর বলে সম্পাদিত হইয়া গেল। রিথ্‌টর বলেন শোন পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে শিকারের প্রতি ধাবমান হয়, আবার ইঙ্গিত মাত্রে ফিরিয়া আইসে, মনুষ্যের মনও সেইরূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিধি বা কর্ত্তব্য জ্ঞান যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবে, মানুষ তাহাই একান্ত মনে এবং সর্ব্ব প্রযত্নে সম্পন্ন করিবে, আবার বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে সেই বিষয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। সমুদায় আর্য্যশাস্ত্রের শাসনও ঐরূপ। ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযত এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিয়ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ। ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান হইয়া দুঃখের হ্রাস, চিত্তের প্রাসর্গ্য, এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে। ইহাই ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনোপায়। ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহঃ"।

কিন্তু শাস্ত্রের মত এই রূপ পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও, আমা-[illegible] ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির [illegible] মিলাইয়া যে, উভয় লোক হিতকরী ব্যবহার [illegible] যাহা এখন আর তেমন যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহ্যজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্য্যকারী তাহা একেবারে বিস্মৃত হওয়া হই-

য়াছে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, যাহারা প্রবৃত্তির পথে যাই-তেছে, তাহারা ক্রমে অধোগত হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহারা নিবৃত্তির পথে যাইতেছে মনে করে, তাহারাও অনেকে ভ্রষ্টাচার এবং স্বার্থ-পর হইয়া পড়িতেছে।

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটী পা স্থির থাকে, অপরটী অগ্রসর হয়, আবার সেইটী স্থির হয়, পূর্ব্বেরটী অগ্রবর্ত্তী হয়। অতএব গমন রূপ একটী কার্য্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটীই বিদ্যমান থাকে। জীবনবর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি প্রভাবে ভ্রমণ, নিবৃত্তি প্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবং থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চরিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্ত প্রবহণ ব্যাপারে সঙ্কোচন এবং প্রসা-রণ রূপ বিপরীত উভয় কার্য্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষাও ঐ প্রকারে হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ম্মরূপে বহির্ভাগে আইসে। ফলতঃ জগতের সকল বস্তুতেই দুইটি পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে। আকর্ষণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষণ বা তাপের প্রভাবে পরমাণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইত, আবার বিপ্রকর্ষণ বা তাপ যদি কিছু মাত্র না থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যের বিস্তৃতি সম্ভবে না, সংঘাতের অশেষ বলে সকলেই একেবারে রূপ বিহী[illegible] পড়ে। অতএব দুইটী বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্তির যুগপৎ অবস্থানই [illegible] প্রতীয়মান হয়, একমাত্র শক্তির কার্য্য কোথাও স্থূলদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয় [illegible]

কিন্তু বাহ্যীভূত জগতের নিয়ম এইরূপ হইলেও, শাস্ত্রকারেরা দেখি[illegible] যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উভয় শক্তির মধ্যে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির [illegible] অধিক। ভগবান ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন। * [illegible]

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ"

জন্য তাঁহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবলা —নিবৃত্তি দুর্ব্বলা। শাস্ত্রকারেরা উহাদিগের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশে যেটী দুর্ব্বলা, উপদেশাদি দ্বারা সেইটীর সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অপরাপর জাতির শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা নিবৃত্তি পক্ষের শিক্ষাদানে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন, যে তাঁহারা কেবল মাত্র নিবৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানেই পটু। এরূপ ভ্রমানুমানের আরও একটী কারণ আছে। আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, যথা ভগবান শঙ্করস্বামী, নিবৃত্তি মার্গের চরম ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আর্য্যশাস্ত্রের মূলীভূত অধিকারীর ভেদ বিচার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতা প্রযুক্ত, অনেকেই আর্য্যশাস্ত্রকে ঐহিকতার বিরোধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদিগের শাস্ত্রের শিক্ষা লোকধর্ম্মের শুভসাধিনী—শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতি সাধিনী নহে।

কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাস্ত্র শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রস্তুত হইতে পারে না। কোন দূরদর্শী শাস্ত্রকারের চক্ষে পারলৌকিক সুখসমৃদ্ধি ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেও পারে না। অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ নরকাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া "ইহৈব নরকং স্বর্গঃ" এই কথা লইয়াই যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও সংসার মধ্যেই পূর্ব্বলোক, বর্ত্তমান লোক এবং পরলোক তিনটী লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের পূর্ব্বগত পুরুষেরা আমাদিগের পূর্ব্বলোক, আমরা বর্ত্তমানলোক, এবং আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা পরলোক। যদি বর্ত্তমানের লোকেরা দৈহিক এবং মানসিক গুণে উৎকৃষ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষেরা বর্ত্তমান লোকদিগের অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারিবেন না।

ফলতঃ পরোক্ষপ্রিয়, দেবস্বভাব আর্য্য শাস্ত্র, বর্ত্তমান লোককে ভাবী বা পরলোকের সাক্ষাৎকারণ স্বরূপ জানিয়া এবং সেই পরলোকের প্রতি বিশিষ্ট

রূপ স্নেহবান হইয়া তাহারই হিতার্থে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শম দম যমাদির উপদেশ পরোক্ষদৃষ্টিমূলক, কিন্তু উহা ইহলোকেরও হিতসাধক। উহাদিগের উপদেশে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া আছে।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবাসী কিম্বা চীনদেশবাসীদিগের ব্যবহারের এবং কথাবার্ত্তার সহিত ইউরোপীয় জাতীয় লোকের ব্যবহারাদি এবং বাক্যালাপের তুলনা করিয়া দেখিলে ইউরোপীয়েরা যে সত্য সত্যই পরকালে বিশ্বাস করেন, তাহা বোধহ হয় না। তাঁহাদিগের মধ্যে চিরকালাবধি ঐহিকতার প্রাবল্য; আজি কালি উহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এখন তাঁহাদিগের মধ্যে যে মতবাদ সাধারণো পরিগৃহীত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সারভাগ এই—

সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখ প্রাপ্তির কাল বর্ত্তমান। সুখ প্রাপ্তির স্থান এই পৃথিবী।*

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে অবিকল ঐরূপ ঐহিকতা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছিল। চার্ব্বাক বা লোকায়তিক মতের সারাংশ সংগৃহীত হইয়া উক্ত হইয়াছে—

স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, পারলৌকিক আত্মাও নাই।* * যত দিন বাঁচিবে সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে। শরীরটা পুড়িয়া ভস্ম হইলে উহার আর প্রত্যাগমন কোথায়?

অতএব ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যভাবের অবয়বীভূত ঐহিকতার প্রবেশে

---

* Happiness is the only good.
The time to be happy is now.
The place to be happy is here.

‡ নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
* * * *
যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ ঋণংকৃত্বাঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

কোন একটা নূতন ভাবের প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখনকার ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ সংসর্গ পূর্ব্বকালের সেই লোকায়তিক মতবাদের পুনঃ প্রাবল্যসাধন করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে যত গুলি ব্যাপার সংস্কার কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত এবং আন্দোলিত হইতেছে, তাহার একটীও মনুষ্যের চিত্ত শুদ্ধির অনুকূল, নহে। সকল গুলিই অত্যধিক পাশবভাবের অনুকূল একটীও দিব্যভাবের অনুকূল নয়। একটীও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের পক্ষ নহে। সকলগুলিই ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদক।

এক জন অতি প্রধান মুসলমান মৌলবীর সহিত কথোপকথন কালে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে ইংরাজিনবিসেরা যত সংস্কার কার্য্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটিও কঠোর ব্যবহারের অনুকূল হয় না কেন? হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান গুণই এই যে, এই জাতীয় লোকেরা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় দমনে সুশিক্ষিত—ইহারা কখনই নিতান্তই ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ হয় না। এই গুণ থাকাতেই হিন্দু জাতি এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই গুণ থাকাতেই মুসলমানদিগের ভগ্নাবস্থা হইলেও হিন্দুদিগের ভগ্নাবস্থা হয় নাই; তাহারা পুনর্ব্বার তেজ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই বারে বুঝি হিন্দুর সেই চিরসঞ্চিত গুণের লোপ হইবে—হিন্দু একান্ত ঐহিকতার দাসত্ব পাইবে। ইন্দ্রিয়দমনমূলক না হইলে প্রকৃত সংস্কারকার্য্য হয় না।” কথাটী অনেক দিনের, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের অনুরূপ। বোধ হয় সেই জন্য এখনও মনে রহিয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্যভাব—স্বাতন্ত্রিকতা।

সকল সমাজেই দুইটী বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার একটীর নাম সামাজিকতা, অপরটীর নাম স্বাতন্ত্রিকতা বলা যায়। যে শক্তির প্রভাবে সমাজান্তর্গত পরিবার সমূহ পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন এবং

কিয়ং পরিমাণে এক প্রকৃতিক এবং একাকার হইয়া যায় তাহার নাম সামাজিকতা। আর যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক পরিবার আপনাপন সুখ দুঃখ, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার পূর্ব্বক পরস্পর পৃথক্‌ভূত থাকে, এবং যাহার প্রাবল্যে কখন কখন সমাজবিধির পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যায়, তাহার নাম স্বাতন্ত্রিকতা।

সমাজভেদে ঐ দুইটী শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হয়। সময়ভেদে কোন সমাজে সামাজিকতার আধিক্য, আর কোন সমাজে স্বাতন্ত্রিকতার আধিক্য হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজে বহুকালাবধি সামাজিকতার সবিশেষ প্রাবল্য ছিল। ঐ সকল লোকেরা জন্মভূমি এবং আত্মসমাজকেই সমুদায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং প্রেমের আস্পদ স্বরূপে জানিত। উহাদিগের হৃদয়ে আত্মসমাজটীই যেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্থানীয় হইয়াছিল। ইহাদিগের বিবেচনায় সমাজের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্মকার্য্য আর কিছুই হইতে পারিত না এবং উহাই অক্ষয় স্বর্গলাভের এবং পুরুষার্থ সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইত। উহাদিগের আরাধ্য এবং উপাস্য দেব দেবীগুলিও সমাজান্তর্গত বিশেষ বিশেষ শক্তির অথবা স্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রতিরূপ স্বরূপ ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কোন বিচক্ষণ দার্শনিক স্থির করিয়াছেন যে, উহাদিগের সামাজিকতাই শক্তি দৃঢ়ীভূত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নব্য ইউরোপীয় সমাজগুলির গঠন কতকটা গ্রীক এবং রোমীয়ের ছাঁচেই হইয়াছে—কারণ নব্য ইউরোপের শিক্ষা গ্রীস এবং রোম হইতে। কিন্তু নব্য ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র ইউরোপের বাহির হইতে আসিয়াছে। ঐ শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিজ সমাজপ্রসূত বা তাহারই ছায়ীভূত নহে। উহা রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের চরম দশায় প্রাদুর্ভূত এবং সর্ব্বজনীন প্রায় এই জন্য ইউরোপীয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেমের পদার্থ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বস্তুতেই নিবদ্ধ হয় নাই। গ্রীক এবং রোমীয়ের চক্ষে আত্ম সমাজই যেমন সর্ব্ব প্রধান এবং অতিব্যাপকরূপে প্রতিভাত হইত, নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে,

সমাজ সেরূপে প্রতিভাত হয় না। উহারও দোষ গুণ বিচার করিবার উপযোগী একটা মানদণ্ড, নব্য ইউরোপীয় পাইয়াছেন এবং সেই জন্য সমাজের সংস্কারকার্য্য তিনি আপনার সাধ্যায়ত্ত জ্ঞান করেন। গ্রীক এবং রোমীয় মনে করিতেন যে, সমাজ আপনার নিদানভূত সকল ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বক্ষণ কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং ব্যক্তিবিশেষের সুখ, সমৃদ্ধি, জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সংরক্ষণ এবং পুষ্টিসম্বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে সমাজের ততটা অধিকার সম্যক্ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য ইউরোপীয় সমাজ গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সমাজ অপেক্ষা স্বাতন্ত্রিকতার অধিকার সমধিক বিস্তৃত।

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তৃবর্গ তাঁহাদিগের প্রাচীন এবং নব্য সমাজের মধ্যে এই প্রভেদটী লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সকল প্রাচীন সমাজের প্রকৃতিই গ্রীক এবং রোমীয়দিগের কতকটা অনুরূপ হইবে, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজেও সামাজিকতার অত্যাধিক্য এবং স্বাতন্ত্রিকতার অতি ন্যূনতা অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সেই জন্যই বলিতেছেন যে, ইংরাজ সমাগমে ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের সমূহ উপকার হইতেছে।

উল্লিখিত গ্রন্থকর্তৃবর্গের কথাটি দুই দিক হইতে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। এক দিক এই—সামাজিকতা এবং স্বাতন্ত্রিকতার পরস্পর মর্য্যাদা কিরূপ? অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে কোন একটা সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে [illegible] কি না? অন্য দিক এই—ভারতবর্ষে ঐ দুই শক্তির মধ্যে কোনটী [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে কি না? যদি থাকে সেটী কোন শক্তি? এই দুইটী কথা বিচার করিলেই ইংরাজ সমাগমে আমাদিগের সামাজিকতা এবং [illegible] কিরূপ [illegible] হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

[illegible] ণীয়দিগের মধ্যে উদার- [illegible] হয় নাই। উহারা জানিত যে, আপনাপন সমাজের হিতসাধনার্থে সকল কাজই করিতে পারা যায়—অর্থাৎ অপর সমাজের হানি

করায় কোন দোষ হয় না। গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঐজাতীয় লোকেরা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগের দেশাচার ও কুলাচার এবং দেশব্যবহার ও কুল ব্যবহারকেই ধর্ম্মের নিদানভূত বলিয়া মনে করিত এবং ঐ আচার এবং ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিলেই তাহারা আপনাদিগকে সাধিত পুরুষার্থ বলিয়া জানিত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ঐ কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও উহার কতকটা যাথার্থ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ হইয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভেও মনুষ্যের অবস্থা সেইরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া প্রথমতঃ কুলাচারে পরে দেশাচারে এবং সামাজিক বিধিতে নিবদ্ধপ্রায় লক্ষিত হয়। ধর্ম্মজ্ঞানের উদ্বোধক প্রীতি। সম্যক্‌ ন্যায়পরতার বিকাশও প্রীতিমূলক। প্রীতিটি প্রথমে স্বজনদিগের প্রতিই সঞ্চরিত হইয়া থাকে। উহা আত্মপরিবার, গোত্র এবং সমাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। আজি পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ঐ অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে নাই। নিজ সমাজের বহির্ভূত বর্ব্বর জনগণের প্রতি গ্রীকেরা এবং প্রাথমিক রোমীয়েরা যেরূপ নির্দ্দয় আচরণ করিত, নব্য ইউরোপীয়েরাও কি ইউরোপীয়েতর জনগণের প্রতি কতকটা সেইরূপ আচরণ করেন না? কিন্তু তাহা করিলেও নব্য ইউরোপীয়দিগের মনে ধর্ম্মবুদ্ধির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি এবং উদারতা জন্মিয়াছে এবং যে পরিমাণে তাহা জন্মিয়াছে সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের সমাজতন্ত্রতাও কিছু শিথিল হইয়াছে। পরবর্ত্তী বন্ধনের বলে পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধনের দৃঢ়তা ন্যূন হয়। অতএব উদারতর সহানুভূতির উদ্গমে পূর্ব্বাবস্থায় তীব্রতর সহানুভূতি স্তিমিততেজঃ হইয়াছে। এখন লোকে কুলাচার বা দেশাচার বা সমাজবিধি লইয়াই ন্যায়ান্যায় বিচারের পরিসমাপ্তি করিতে পারে না—ঐ সকলের পরেও একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মবোধ দেখিতে পায় এবং কতকটা তাহার অনুযায়ী হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে

গ্রীক এবং রোমীয়ের সুদৃঢ় সামাজিকতার অভ্যন্তরে একটু স্বাতন্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়া নব্য ইউরোপীয় সমাজকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর করিয়া তুলিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয় সামাজিকতা কি গ্রীক বা রোমীয়দিগের সমাজতন্ত্রতার ন্যায় অতি দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং আপনার অন্তর্নিবিষ্ট জনগণ ভিন্ন অপর সকলের প্রতি সহানুভূতি শূন্য? এ কথা মুখেও আনিবার যো নাই। সর্ব্বময় ব্রহ্মবাদপরায়ণ হিন্দু—অপর দেশীয় মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সকল জীবের প্রতিই সহানুভূতি বিশিষ্ট। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি, দেশাচারের প্রতি এবং কুলাচারের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা ভক্তি অতি প্রোজ্জ্বল বটে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ঐ গুলিতেই সম্বদ্ধ নহে। ঐ গুলি তাঁহার মূল ধর্ম্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়াই উহারা ধর্ম্ম এবং পালনীয়। মনু ধর্ম্মের লক্ষণে সদাচার এবং শাস্ত্রীয় বাক্যেরও অতীত একটী পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি র্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥

ঐ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বিশেষণটীর দ্বারা শাস্ত্রশাসনের এবং সাধু আচারের ঊর্দ্ধবর্ত্তী ধর্ম্মলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং অপর বিশেষণগুলির দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণ হইল। যে কেহ আপনার হৃদয় কর্ত্তৃক কোন কার্য্যে অভ্যনুজ্ঞাত হইলেই যে তাহা ধর্ম্মকার্য্য হইবে না একথাও বলা হইল। ফলতঃ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বলায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব ধর্ম্মতত্ত্বের উন্নতি প্রভাবে সামজিকতার বন্ধন যতটুকু শিথিল থাকার প্রয়োজন তাহা হিন্দু সমাজে হইয়া আছে। সুতরাং স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অনুদার কোন ধর্ম্ম মতবাদের সংশ্রবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

অন্ত সমাজ মধ্যে স্বাতন্ত্রিকতার আর একটি স্থল আছে। কুলাচার,

দেশাচার এবং সমাজ বিধির বশীভূত থাকিতে থাকিতে ঐ গুলি এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আর উহাদিগের হেতুর বা তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান হয় না। এরূপ হওয়াতেও এক প্রকার অন্ধ সামাজিকতা জন্মে। শাস্ত্রে ইহা দোষ প্রখ্যাপিত হইয়া উক্ত হইয়াছে "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে"। ভারতবর্ষে যখন দেশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল, তখন যে প্রদেশে যেরূপ প্রয়োজন পড়িত, তদনুযায়ী নূতন নূতন ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্র-বর্গের দ্বারা প্রণীত ও রাজাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। কোন কোন স্থলে নব নব সংহিতাও জন্মিত; কিন্তু অধিক স্থলেই পুরাতন সংহিতারই নূতনরূপ ব্যাখ্যা হইত। আর কখন বা মহাত্ম-ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া বহুপ্রদেশব্যাপক ব্যবস্থার পরিবর্ত্ত এবং নূতন বিধির প্রণয়ন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর ঐরূপ হইতে পায় না। এখন এদেশের বিধি ব্যবস্থা ইংরাজ রাজেরই ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। তাহাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা জন্মিতে পারে না। যদি দেশীয় জনগণের প্রয়োজনা নুরূপ সামাজিক ব্যবস্থাপন কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সমাজের মুখাপেক্ষী মহানুভব ব্যক্তিদিগের সম্মিলন এবং চেষ্টাসম্ভূত হয় এবং সেই সকল বিধি জন সাধারণ কর্ত্তৃক সমাজ শাসনের বলেই পরিগৃহীত এবং প্রতিপালিত হয় তাহা হইলেই সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার জীবদ্ভাব বিদ্যমান হইতে পারে। এক্ষণে যেরূপ হইতেছে তাহাতে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।

পরন্তু যাঁহারা ইংরাজ সমাগমে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে বলেন, তাঁহারা সামাজিকতার অন্তর্ভূত উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বাতন্ত্রিকতার মধ্যে কোনওটির কথাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে ভিন্ন জাতীয় রাজার অধিকারে অবস্থিত হইয়া আত্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি ব্যবহারাদির প্রতি অব্যাঘাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন, সেই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ঐ স্বাতন্ত্রিকতাটা অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। সকল সমাজেই আহার, বিহার, লোকলৌকিকতা,

রীতি ব্যবহারাদির এক একটা পদ্ধতি পড়িয়া যায়। ওগুলি প্রায়ই তত্তদ্দেশের যথাযোগ্য হইয়া থাকে। ওগুলির পরিহারে বা পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকার নাই। প্রত্যুত পরিহার এবং পরিবর্ত্ত চেষ্টায় সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ হয় মাত্র, এবং সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবে ধর্ম্মবুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত হইয়া যায়। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি সহানুভূতি হইতেই উদ্গত এবং সহানুভূতির প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মসমাজ। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ত পানভোজনাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি নিষেধ প্রচলিত নাই। তথাপি উহারা স্ব স্ব সমাজ প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করেন না। কোন ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া পাগড়ী চাপকানের ব্যবহার করেন না; অথচ তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, পাগড়ী চাপকানই এদেশের যোগ্যতর পরিচ্ছদ। মদ্যপান স্বাস্থ্যের হানিকর জানিয়াও প্রায় কোন ইংরাজ তাহা ভোজকালীন পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ সমাজ প্রচলিত নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া চলাই ভাল।

স্বাতন্ত্রিকতার যেরূপ প্রবৃত্তিতে সামাজিকতার ব্যাঘাত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ত্তমান জাপানীয়দিগের ব্যবহার দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানীয়রা এক্ষণে ইউরোপীয় অনুকরণে রত। কিন্তু উহাঁরা যে ইউরোপীয় ব্যবহারের অনুকরণ করেন, তাহা প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্রাট্ এবং সচিব সভার অনুমোদিত হইলে, তবে অনুকরণ করেন। যাহার মনে যাহা আসিবে সে তাহাই তৎক্ষণাৎ অনুকরণ করিবে, জাপানীয়দিগের মধ্যে এ প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জাপানীয়দিগের ইচ্ছা হইল যে, ইউরোপীয়দিগের ন্যায় টুপি ব্যবহার করে; তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিল, সম্রাট তদর্থে অনুমতি পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইউরোপীয় অনুকরণে টুপির ব্যবহার তাঁহার অনভিমত নহে। তাহার পর জাপানীয়রা ইউরোপীয় ধরণে টুপি পরিতে লাগিল। এইরূপে স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ। প্রতি ব্যক্তিকৃত অনুকরণে সমাজের অবমাননা হয়, সমাজকৃত অনুকরণে অনেক স্থলে তাহার সজীবতাই বুঝা যায়।

চীনীয়দিগের মধ্যেও কখন কখন সমাজ বিধির প্রয়োজনোপযোগী অন্যথা করা হয়। কিন্তু তাহাও সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাসম্ভূত হয় না। চীনীয় সম্রাট্ সকল বিধির বিধাতা। তিনি স্বশরীরে সমুদায় সমাজশক্তি ধারণ করেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমাজ বিধির পরিবর্ত্ত হইতে পারে। দেবতাদিগের পূজাবিধিরও তাঁহার আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভাও প্রচলিত সমাজবিধির অন্যথা এবং নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ।

প্রত্যুত সকল সমাজেই কোথাও না কোথাও একটী শক্তির স্থান আছে। পরাধীনতা নিবন্ধন ভারতবর্ষে সেই শক্তি আর সমস্ত সমাজ ব্যাপক হইয়া নাই—উহা সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে ভারতবর্ষীয় সমাজের স্বাতন্ত্রিকতা অতি বিস্তৃতরূপ হইয়া সমাজের পূর্ণ সজীবতার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি কখনই অপকারক বই উপকারক হইতে পারে না। এখন সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে বশ্যতা, পরস্পর সহানুভূতির আধিক্য এবং সম্মিলনই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতা অবশ্য পরিহার্য্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই (১) যথায় সামাজিকতা নিবন্ধন অপরাপর সমাজান্তর্গত লোকের প্রতি সদ্ব্যবহারাচরণ হয় তথায় ধর্ম্মজ্ঞান প্রণোদিত স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। (২) যে সামাজিকতার প্রভাবে সামাজিক নিয়মগুলির মূলীভূত হেতুসমূহ সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদিগেরও মন হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায় তথায় হেতুবাদ প্রকট করিয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক নিবারণ করা আবশ্যক। (৩) সমাজবিধির পরিবর্ত্ত, সমাজের প্রতি পূর্ণসহানুভূতি সম্পন্ন, দূরদর্শী মহাত্মাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। অপর সকলের সমাজ সংস্কার চেষ্টায় পাশবভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি হয়, সামাজিক নিয়ম এবং দেশাচারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকটিত হয় এবং লোকের মুখাপেক্ষতার প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়া ধর্ম্ম বুদ্ধির ক্ষীণতা জন্মায়।

এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল যে, প্রথম সূত্রের উল্লিখিত যে স্বাতন্ত্রিকতা তাহা হিন্দুর যেমন আছে, ইউরোপীয়দিগেরও তেমন নাই। ইংরাজ প্রদত্ত শিক্ষায় পুরাতন প্রথার প্রতি অশ্রদ্ধা সঞ্চারে ঐ সকল প্রথার মূলীভূত হেতু সমূহ প্রকট হইতেছে না। অন্ধ-অনুকরণ-স্রোতমাত্র চলিতেছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতারই বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রোল্লিখিত প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক হইতেছে না।

পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।

বিজ্ঞান অতি প্রধান বস্তু। ইউরোপীয়েরা বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রভাবে ধন এবং বলের বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য অপেক্ষা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। মিশর যুদ্ধের সময় একজন ইংরাজ আপনাদিগের রণপোত বাহিনীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"এসিয়া এবং আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যে এমন একটীও জাতি নাই, যাহা কর্ত্তৃক এই রণতরীগুলির আক্রমণ সহ্য হইতে পারে।" বস্তুতঃ পৃথিবীর অপর কোন ভাগের লোকেরাই আর ইউরোপীয়দিগের প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ নহে। দেখ, একমাত্র ষ্টান্লী সাহেব, তিনি কোন দেশের রাজা বা রাজপ্রতিভূ কিম্বা প্রধান রাজপুরুষ কিছুই নহেন তথাপি কয়েক শত ইয়ুরোপীয় সখের ফৌজ সঙ্গে লইয়া আফ্রিকাখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই ভূভাগকে ওতপ্রোত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যেও দুইজন পাঁচজন ইউরোপীয় বা তদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি অকাতরে চলিয়া যায়—আদিম নিবাসীদিগের বৃহৎ বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি সম্মিলিত হইয়াও তাহাদিগের গতিরোধে সমর্থ হয় না।

যুদ্ধে যেমন অপ্রতিহত প্রভাব, বাণিজ্য ব্যাপারেও ইউরোপীয়েরা তদ্রূপ। তাহাদের সার্থবাহ বণিক্‌ এবং বাণিজ্যপোত ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, এবং যেখানে যাইতেছে সেই দেশেই প্রভুত্বলাভ করি-

তেছে। ইউরোপের এক একটী বণিক্ সম্প্রদায় অপরাপর দেশে রাজচক্রবর্ত্তী। ইহার উদাহরণ, এক ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আধিপত্য শুদ্ধ অপরাপর মানুষের উপরেই হয়, এমন নহে। উহারা বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে যেন ভূতলকে নূতন করিয়াই গড়িতেছে, সুয়েজ প্রণালী দ্বারা আফ্রিকা খণ্ডকে একটী দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, প্যানেমা প্রণালী দ্বারা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে দ্বিভাজিত করিতেছে, সেনিসের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া অল্পস্ পর্ব্বতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছে, আর সাহারা মরুতে একটী অভিনব সাগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া ঐ বালুকাময় ভূভাগের প্রকৃতি পরিবর্ত্ত করিবার উদ্যম করিতেছে। বাষ্পীয় তরী, বাষ্পীয় শকট, এবং তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা দূরত্ব এবং কালের ব্যবধানও অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছে।

কিন্তু ইউরোপের বাহিরে ইউরোপীয় মহিমা যে উৎকটভাব ধারণ করে, ইউরোপের অভ্যন্তরে উহাঁর ভাব তেমন বিস্ময়ব্যঞ্জক নহে। ইউরোপের বহির্ভাগে জনকয়েক ইউরোপীয় সম্মিলিত হইলেই এক একটী জাতিকে পদদলিত করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের ভিতরে কোন এক জাতীয় লোক অপর জাতীয় লোক অপেক্ষা তেমন প্রবল হইতে পারে না। সেখানে যদি কোন দেশ দুইখানি রণতরী অথবা দুই পাঁচ সহস্র সৈনিকের বৃদ্ধি করিয়া তুলে, অমনি অপর সকল দেশকে সাবধান হইয়া আপনাপন বলবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। তুরস্কও যদি কিছু সেনার বৃদ্ধি করে, রুসিয়া ও অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে তজ্জন্য সতর্ক হইতে হয়। আর আজি কালি দৃষ্ট হইতেছে যে, ইউরোপের বহির্ভাগেও যদি কোন জাতি ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে, ইউরোপীয়েরা তাহাকেও কিছু ভয়, ভক্তি, এবং সম্মান করেন। চীন ফরাসী যুদ্ধে বিলক্ষণ সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ইউরোপীয়েতর জাতিরাও ইউরোপের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সংগ্রামস্থলে ইউরোপের সমকক্ষ হইয়া উঠে। চীনেরা ফরাসী সৈন্যের পরাভব করিয়াছে। ইংরাজ কর্ত্তৃক শিক্ষিত সিপাহীরাও পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরো-

পীয়দিগের কল আনাইয়া বোম্বাইয়ের পারসি এবং হিন্দু বণিকের চীন, জাপান মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে ইংরাজ বণিকদিগের অপেক্ষাও সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতেছে।

ফলতঃ ইউরোপের যে প্রকার প্রাধান্য তাহা উহার শিক্ষা এবং কল কৌশল হইতে জন্মে। সেই শিক্ষা এবং কল কৌশল সমস্তই বিজ্ঞানমূলক সুতরাং বিজ্ঞান অতিশয় আদরের এবং গৌরবের বস্তু। যত্নপূর্ব্বক উহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যদি ইংরাজের সংস্রবে আমাদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান বিদ্যালাভ হইয়া থাকে, এমন হয়, তবে অনেক লাভই হইয়াছে স্বীকার করা যায়।

প্রথমে দেখা যাউক, বিজ্ঞানটী কি, পরে দেখিব উহা আমরা পাইতেছি কি না।

মনুষ্য আপন হৃদয়ে যে পরাৎপর আদর্শ পুরুষের অনুভব করে, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞতার আধার বলিয়াও ভাবে। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয় 'সর্ব্ব'। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল এবং যাহা হইবে, মানুষ তৎসমুদায়ই জানিতে চায়। জানিবার উপায়ের নাম প্রমাণ। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ভেদ অনুসারে প্রমাণেরও একটা স্থূল ভেদ হয়। যাহা আছে, তাহার প্রমাণ একরূপ, যাহা হইয়াছিল, তাহার অন্যরূপ, এবং যাহা হইবে তাহার প্রমাণও ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু প্রমাণের ত্রিবিধতা এইরূপে মনোগত হইলেও প্রমাণ বস্তুতঃ ত্রিবিধ নহে। যে প্রমাণ অতীত বিষয়ে খাটে তাহা অপর দুই স্থলেও খাটে—যাহা বর্ত্তমানে খাটে, তাহাও অপর দুই স্থলে খাটে, এবং যাহা ভবিষ্যতে খাটে তাহাও অপর দুই স্থলে খাটে। শুদ্ধ তাহাও নয়, সকল প্রমাণ গুলিরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে একমাত্র মূল, এবং ভূত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্য সকলই একমাত্র সূত্রে গ্রথিত। সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের মূল এবং উপজীব্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত অতি বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ যে প্রমাণ তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

শরীরের পোষণ যেমন ভক্ষ্যগ্রহণের দ্বারা হয়, তেমনি জ্ঞানের পোষণও

প্রত্যক্ষের দ্বারা হয়। সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া জ্ঞানের উপায়ান্তর কিছুই নাই। প্রত্যুত অনুমানাদি অপর যে সকল প্রমাণ বা জ্ঞানসাধণোপায়ের নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার একটীও বিনা প্রত্যক্ষে কার্য্যকারী নহে। প্রমাণের সংখ্যা দর্শন এবং শাস্ত্রকারেরা জনগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রত্যুত সকল গুলিরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ এবং সকলগুলিরই নির্ভর এক মাত্র প্রত্যক্ষের উপর।

যেমন রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ব্বেরটীর উপরে পরেরটী ব্যবস্থিত, যেমন একতলার উপরে দোতলা, তাহার উপর তিনতলা, উপর্য্যুপরি প্রতিষ্টিত, কিন্তু সকলগুলির চাপই ভিত্তি মূলের উপর, সেইরূপ অনুমান, শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সাম্ভবিক, ঐতিহ্য প্রভৃতি যতগুলি বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের নাম হইয়া থাকে, তাহারা কেহই স্বতন্ত্র নয়—প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত, তাহাদিগের কাহার অন্য কোন ভিত্তি নাই। এই জন্যই কোন দর্শনকার উহার মধ্যে কোন কোনটীকে ছাড়িয়া দিয়াও আপনার শাস্ত্রীয় মতবাদ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। রেখাগণিতের মধ্যে যদি কোন একটী বা দুইটী বা ততোধিক প্রতিজ্ঞাকে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও মূল হইতে ধরিয়া লইয়া তাহাদিগের পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলির প্রমাণ হইতে পারে। এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব যখন দেখা যায় যে, কোন শাস্ত্রকার অষ্টপ্রমাণবাদী, * কেহ বা তিন প্রমাণবাদী, কেহ বা দুই, কেহ বা একমাত্র প্রমাণবাদী, তখন ইহাই বুঝিতে হয় যে, উহাঁরা সকলেই সকল প্রমানই মানেন, তবে কেহবা কোন গুলিকে অপরের অন্তর্নিবিষ্ট মনে করায় অধিক সুবিধা বোধ করেন মাত্র। এস্থলে সংক্ষেপতঃ একটীমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্যদর্শন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং শাব্দ এই তিন প্রমাণ স্বীকার করেন; তিনি ন্যায় দর্শনের স্বীকৃত উপমান নামক প্রমাণটীকে অনুমানে-

* প্রত্যক্ষমিতি চার্ব্বাকাঃ, অনুমিতিরপীতি ক্যণাদবৌদ্ধৌ, উপমিতিরপীতি নৈয়ায়িকৈকদেশিনঃ, শব্দোপীতি নৈয়ায়িকাঃ, অর্থাপত্তিরপীতি প্রাভাকরাঃ, অনুপলব্ধিরপীতি ভাট্টবেদান্তিনৌ, সাম্ভবৈকৈতিহ্যকারপীতি পৌরাণিকাঃ চেষ্টাপীতি তান্ত্রিকাঃ।

রই অন্তর্ভূত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শাব্দ প্রমাণও যে, অনুমানেরই অন্তর্গত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। শাব্দ প্রমাণের তাৎপর্য্য আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস। কিন্তু কোন বাক্য বিশ্বাসযোগ্য আর কোন বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ বা ভূয়োদর্শন বই আর কিছুই নাই। অতএব প্রত্যক্ষ দ্বারাই প্রথমে আপ্তবাক্যতা সিদ্ধ হয়. তাহার পর একটী অনুমান এইরূপ হয় যে, যে বাক্য সর্ব্বস্থলে বিশ্বাসযোগ্য, সে এই বিশেষ স্থলেও বিশ্বাসযোগ্য। এইরূপে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই শাব্দ প্রমাণ সর্ব্বতোভাবে সংস্থাপিত। সুতরাং উহার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে যে, বিচারে দোষ হয়, এমত নহে। আবার দেখা যায় যে, অনুমান-প্রমাণও ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শন বা প্রত্যক্ষ জনিত। অতএব অনুমানও প্রত্যক্ষ হইতে স্বতন্ত্র নহে। ফলকথা সকল প্রকার প্রমাণের প্রত্যক্ষতন্ত্রতা অতি বিস্পষ্ট এবং তাহা আর্য্য দার্শনিকেরাও স্বীকার করিতেন। শুদ্ধ তাহাই স্বীকার করিতেন এমত নহে. তাঁহারা ইহাও মনে করিতেন যে, যে প্রমাণটী প্রত্যক্ষ হইতে যত দূরবর্ত্তী সেটী তত অল্পবল, এবং তাহা বিষয়বিশেষেই নিবদ্ধ। সকল প্রকার প্রমাণ সমপরিমাণে সবল নহে।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রমাণগুলি অষ্টম সংখ্যা পর্য্যন্ত যে ভাবে পর পর উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহারা যে ক্রমশঃ হীনবলরূপেই এবং বিষয় ভেদেই গ্রাহ্য এইরূপে শাস্ত্রকারদিগের প্রতীত হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। নবম প্রমাণ "চেষ্টা" বা স্পন্দন সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে উহা প্রথম প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত। *

---

* পূর্ব্বকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে ইহার গণনা হয় নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষের মধ্যে গ্রহণ না হওয়াতেই উহা তান্ত্রিক মতবাদিগণ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বাংশে উক্ত হইয়াছে, বোধ হয়। ফলতঃ আকাশ, কাল, শক্তি, অহং, এই চারিটী বোধ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া যে গোলযোগ হইয়া আছে, যদি শারীর চেষ্টা সম্পাদনকে পূর্ব্বাবধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ন্যায় বোধের একটি স্বতন্ত্র পথ বলিয়া ধরা হইত, তাহা হইলে সেরূপ গোলযোগ হইত না। ঐ গুলি লইয়া কি এদেশে কি ইউরোপে অসাধারণ কষ্ট কল্পনা এবং অদ্ভুত কল্পনা সকল হইয়াছে।

কিন্তু যদিও মূল দার্শনিকদিগের বিবেচনা এইরূপ যথাযথ হইয়াছিল বোধ হয়, তথাপি তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী টীকাকার এবং নব্য ব্যাখ্যাতৃবর্গ যেন বিভিন্নসংজ্ঞক প্রমাণগুলিকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রমাণকেও গ্রহণ করিতে তেমন সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

সাধারণতঃ ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ওরূপ করেন না। প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষের বিরোধী কোন প্রমাণই তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। অপর একটী রূপেও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রত্যক্ষের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সামান্য ইন্দ্রিয়বোধকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না।* যেমন মোকদ্দমায় সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর একটীমাত্র কথা শুনিয়াই মীমাংসা করিলে অর্থাৎ তাহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে এবং অন্য সাক্ষীর কথার সহিত মিলাইয়া না বুঝিলে বিচার ঠিক হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের মৌলিক এবং সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেও বিশিষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্য্যে অতিশয় পটু। তাঁহারা সর্ব্বদা সমূহ যত্নে প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর স্থানে তৎকর্ত্তৃক বক্তব্য সমস্ত কথা শুনিয়া লয়েন, এবং বহু প্রকারে তাহার প্রতি জেরা করেন। এই কার্য্য প্রণালীকে পরীক্ষা বিধান বলে। ইহাতেই প্রত্যক্ষের স্থানে প্রকৃত সদুত্তর প্রাপ্তি হয়, এবং ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকতা জন্মে। ভারতবর্ষীয়েরা বাহ্য জাগতিক ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা স্বল্পতর পরীক্ষা বিধান করিয়াছেন, কিন্তু আন্তর্জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাদের পরীক্ষা বিধান অধিকতর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাদৃশ পরীক্ষাবিধান হইতেই হঠযোগ এবং রাজযোগের সূত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা ও গুলিকে কাল্প-

* আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রেও সামান্য ইন্দ্রিয়বোধে এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষে ভেদ করা আছে। কিন্তু তাহা দুইটী বিশেষণ দ্বারা করা হইয়াছে। সামান্য প্রত্যক্ষকে "নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ" এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষকে "সবিকল্প প্রত্যক্ষ" বলা হইয়াছে।

মিক বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করেন মাত্র। যোগ সাধনাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অনুশীলন হয়।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার অভ্যান্তরে আর একটী সূক্ষ্মতর বিষয় আছে। সেটীও প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃতিনিষ্ঠ। প্রত্যক্ষ কার্য্যটী নিতান্ত অবিমিশ্র সরল ব্যাপার নহে। যেমন ভক্ষ্য গ্রহণ হইতে ভক্ষিত পদার্থের শোণিতে পরিণতি পর্য্যন্ত বহুবিধ শারীর কার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যক্ষের প্রারম্ভ হইতে তজ্জনিত ভাবাদির উদ্বোধ পর্য্যন্ত বহুপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার সাধন হয়। খাদ্যদ্রব্য মুখবিবরস্থ হইলেই খাওয়া হয় না। উহার চর্ব্বণ, লালা-মিশ্রণ এবং উদরস্থ হওয়া আবশ্যক। বস্তুও ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলেই প্রত্য-ক্ষীভূত হয় না। উহার ইন্দ্রিয়গোচরত্ব এবং উহার দেশকালাদি সম্বন্ধে অবস্থান, পরিমাণ প্রভৃতির অনুভব সহকৃত চিত্তাগামিত্ব সম্পন্ন হওয়া আব-শ্যক। এই চিত্তাগামিত্বের কার্য্যগুলিকেই মনোযোগ বলে; কারণ, ঐ কার্য্যগুলির দ্বারা ইন্দ্রিয়বোধের সহিত মানসিক কার্য্যের সংযোগ বুঝায়। তাহার পর যেমন খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে উহাতে শরীরস্থ নানা প্রকার রসের সংযোগ হয় এবং উহা ক্রমশঃ কাহার সহিত সম্মিলিত কাহার হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া সর্ব্বশেষে শোণিতরূপে নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় চিত্তস্থ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি প্রভৃতির যোগে সমষ্টীকৃত এবং ব্যষ্টীকৃত হইতে থাকে এবং পরিণামে ভাবরূপ (বৌদ্ধেরা ইহাকে বিজ্ঞান বলেন) ধারণ করে। শারীর কার্য্যটীর নাম পরিপাক, মানস কার্য্যটীর নাম জ্ঞান-লাভ বা ভাব-গ্রহ। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শোণিতও যেমন ভক্ষিত দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ভূত, সেইরূপ ভাবগুলিও তাহাদিগের উদ্বোধক বাহ্য বস্তু হইতে পৃথক্‌ভূত। শোণিতেও যেমন শরীরজ রস অনেক মিলিত, সেইরূপ মনোভাবেও মানব ধর্ম্মের যথেষ্ট বিমিশ্রণ। প্রত্যক্ষ ব্যাপারটী ভাবের উদ্বোধক মাত্র, উহা স্বয়ং ভাব নহে। ভক্ষিত দ্রব্যও শোণিত জননের উপযোগী, উহা স্বয়ং শোণিত নয়।

এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুতে এবং তৎকর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ মনোভাবে যে

পার্থক্য, তাহা ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে সুপরিস্ফুটরূপে বিবেচিত না হওয়ায়, পদার্থবোধ সম্বন্ধে এক প্রকার দোষ জন্মিয়াছে—যেন ভাবের সহিত দ্রব্যের গোল বাঁধিয়া গিয়াছে। ইউরোপেও অন্যরূপে গোল বাঁধিয়া মনোভাব সংঘটনে মনের যে কার্য্যকারিতা আছে, সমুদায়ই যে ইন্দ্রিয় গোচরত্ব মাত্রেই নহে, এই তথ্যের অনেকটা বিস্মৃতি হইয়াছে। শেষের দোষটী আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ব্যাঘাতক হইলেও উহা বাহ্যবৈজ্ঞানিকতার তত হানিকর হইতে পারে না। প্রথম দোষটী বাহ্য বিজ্ঞানের হানিকর; শেষোক্ত ভ্রমসত্ত্বেও বাহ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্করণে সামর্থ্য থাকিতে পারে; কারণ উহা দ্রব্যের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাতক হয় না। প্রথম দোষে দ্রব্যের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হইয়া মনোমধ্যে যেন স্বপ্নময়তার একটা ছায়া পড়িয়া যায়।

এইরূপ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে বক্তব্য এই যে, বৈজ্ঞানিকতা বলিলে মনের এমন ভাবটী বুঝিতে হয়, যাহাতে—

(১) প্রত্যক্ষই সকল প্রমাণের মূল বলিয়া স্বীকৃত।

(২) প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া প্রমাণান্তর গৃহীত।

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমগ্রভাবে গ্রহণের জন্য পরীক্ষা-বিধানে আবশ্যকতা স্বীকৃত।

(৪) ব্যবহারিক বিষয়ে যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচারে ভাবপদার্থে এবং দ্রব্য পদার্থে বিবেক সংরক্ষিত।

এইরূপ মনের ভাব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংরক্ষিত না হওয়ায় আমাদিগের বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকাংশেরই উন্নতি বহুকাল হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিতরূপ বৈজ্ঞানিকভাব উদ্রিক্ত হওয়াতেই নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বাহ্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন হইতেছে।

——০(০)০——

পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।

(২)

প্রত্যক্ষের এবং তাহারই অঙ্গীভূত পরীক্ষা-বিধানের সহিত নিরন্তর ঘনিষ্ঠ সংস্রবাধীন বৈজ্ঞানিকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণতঃ কয়েকটী লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা আবশ্যক।

(১) প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান অতি সুস্পষ্ট হয়। উহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অপচ্ছায়াবিহীন হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহার অবগতি হয়, তাহাতে সন্দেহের স্থল নাই বলিয়াই ধারণা হয়, অর্থাৎ সমুদায়ই পরিষ্কার এবং পরিস্ফুট ভাবে বুঝিলাম বলিয়া মনে হয়, সুতরাং কল্পনাবলে বুঝিবার প্রয়োজন থাকে না। এইরূপ অভ্যাসবশতঃ বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন পুরুষ যাহা বুঝেন, তাহা পরিষ্কার এবং পরিস্ফুটরূপেই বুঝিবার চেষ্টা করেন। একটা কিছু যেন জানিলাম মনে করিয়া তাঁহার মনের তৃপ্তি হয় না।

(২) প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশেষতঃ তাহার অন্তর্গত পরীক্ষাবিধানে বস্তুর সহিত সম্বন্ধটা অতি ঘনিষ্ঠ হয়—উহার অন্তর্ভাগে দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, উহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া চাড়া হয়। তাহাতে যে শুদ্ধ বস্তুগ্রহই উত্তমরূপ হয়. এমত নহে, উহার অভ্যন্তরে কিছু লুক্কায়িত ভাবে রহিল, এরূপ ভাবনারও অবসর হয় না। সুতরাং কল্পনাশক্তি সংযত হইয়া পড়ে।

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণটী মূলতঃ বর্ত্তমান লইয়া থাকে। বর্ত্তমানের. ভূত এবং ভাবীকে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। ইহা হইতেই মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বোধ জন্মিয়া যায়। যাহা এখন দেখিতেছি, পূর্ব্বে এবং পরেও তাহাই ছিল এবং থাকিবে—এইরূপ সাদৃশ্যোপলব্ধি হইতে কার্য্য জগৎ যে নিয়মের অন্তর্ভূত এই জ্ঞানটি জন্মে। এই জন্য এইজন্য নিয়মাবধারণ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রকৃতি।

(৪) নিয়মাবধারণ প্রবণতা হইতে আর একটী শুভময় ফল জন্মে। প্রকৃতির শক্তিগুলার সহিত সমধিক পরিচয় হয়। তাহাতে ভক্তির ন্যূনতা

হয়, এবং পরিণামে এমন একটী বিশ্বাস জন্মিয়া আইসে যে, মানুষ আপনিই আপনার সুখ দুঃখের কর্ত্তা হইতে পারেন।

কথার অধিক বাহুল্য না করিয়া উল্লিখিত কয়েকটীকেই বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ সামান্যতঃ মনে করা যাউক যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষায় বস্তুগ্রহ পরিস্ফুট না হইলে সন্তোষ হয় না; কল্পনা-শক্তি সংযত হয়; নিয়মাবধারণে বিশিষ্ট প্রবণতা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

বুদ্ধিবৃত্তির এইরূপ শিক্ষা হইলে চিত্তেরও কতকটা বিশিষ্টতা ঘটে। যাহা তাহাতে বিশ্বাস হয় না, দ্রব্যগুণে হইল অথবা কালমাহাত্ম্যে হইল অথবা দেবাবির্ভাবে হইল এরূপ বন্ধ্যা কারণের কল্পনাও হয় না, আর অদ্ভুত রসাস্বাদের সুখানুভূতিও অতি প্রবলা হইয়া থাকে না, এবং স্বাবলম্বনজনিত সাহসিকতা বাড়ে। বৈজ্ঞানিক চিত্তের এই গুলি অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির এবং চিত্তবৃত্তির এই সকল লক্ষণের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ পর্য্যন্ত কোন দেশে বা কোন কালে ঐ সকল লক্ষণপূর্ণ কোন জাতি সাধারণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। অশিক্ষিত প্রকৃত লোকেরা চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই হুজুকে ভুলে, অযথা স্থলে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যাহা কিছু অসাধারণ এবং অদ্ভুত, তাহার চিন্তাতেই বিশেষ দুঃখী, সুখী, ভীত বা আনন্দিত হয়, আর অদৃষ্ট কারণাদির ধ্যানে রত হয়, ভারতবর্ষের ছোট লোকেরা বিশ্বাস করিতে না পারে, এমন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ত কিছুই নাই বলিলেই চলে। অনধিক কাল গত হইল, ইংলণ্ডের মধ্যেও প্রিন্স নামা এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রচারিত করিয়াছিল যে, সে খৃষ্টীয় ত্রিদেবের মধ্যে পিতৃদেবের সাক্ষাৎ অবতার। ত্রিশ হাজারের অধিক ইংরাজ ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার শিষ্য এবং আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। ফ্রান্স দেশে প্রতি দশ খানি গ্রামের মধ্যে এমন একটি গ্রাম পাওয়া যায়, যেখানে দেবানুগ্রহ নিবন্ধন কোন কুমারী বা অপর

ব্যক্তি গায়ে হাত বুলাইয়া অথবা দৃষ্টিমাত্র প্রদান করিয়া রোগীদিগের অত্যুৎকট রোগ শান্তি করেন। জর্ম্মনদিগের মধ্যে এখনও ডাকিনীর নজর দোষে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, সুতরাং ঝাড়ন মন্ত্রাদির প্রয়োগও আছে।

এই সকল উদাহরণ প্রদর্শনের তাৎপর্য্য এই যে, কোন দেশে বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত আবির্ভাব বুঝিতে হইলে সেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহা বুঝিতে হয়—অশিক্ষিত প্রাকৃত জনগণ সকল দেশেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবের বহির্ভূত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় তিনটি। এক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, অপর, আরবী, ফারসী অভিজ্ঞ মৌলবীর দল, তৃতীয়, ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা আছে কি না, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। যদি থাকে তাহা ইংরাজী শিক্ষা বা ইংরাজ সংস্রবের গুণে হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইংরাজ শিক্ষিত দলের লোকেরা কি প্রণালীতে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাই প্রথমে বিচার্য্য। যদি তাঁহাদিগের শিক্ষার রীতি এমত হয় যে, তদ্দ্বারা বস্তুবোধ এবং ভাব সংগ্রহ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, তবে ঐ শিক্ষা বৈজ্ঞানিকতা জননের অনুকূল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, এখানকার লোকেরা অতি শৈশবাবধি অতি কঠিন এবং বৈয়াকরণ নিয়মে অসম্বদ্ধপ্রায় বিজাতীয় ইংরাজী ভাষায় সমুদায় শিক্ষালাভ করেন। মাতৃভাষার শিক্ষায় বস্তুজ্ঞান যেমন পরিস্ফুট হয়, বিজাতীয় ভাষার শিক্ষায় কখনই তেমন হইতে পারে না। ভিন্নদেশ প্রণীত গ্রন্থে সর্ব্বদাই এমন সকল পদার্থের নামোল্লেখ থাকে, যাহা পাঠক বর্গের কখনই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, যে সকল ইংরাজী পুস্তক এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে, সেইগুলি হইতে এতদ্দেশে অপ্রচলিত এবং লোকের অপরিজ্ঞাত বস্তু সমস্তের নাম উঠাইয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু শুদ্ধ অপরিজ্ঞাত বস্তুর নামই

যে বিদেশীয় ভাষার পুস্তকে থাকে, তাহা নহে। অপ্রচলিত বিজাতীয় ভাবও যথেষ্ট থাকে। সে ভাবগুলির সমগ্ররূপে পরিগ্রহ হইতে পারে না। কারণ পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির কথোপকথনাদিতে ঐ সকল ভাবের সংস্রব না থাকায় সেগুলিও ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষে অপরিজ্ঞাতপ্রায় থাকিয়া যায়। পুস্তকে পঠিত ভাবের সহিত বাহিরের কথায় মিল দৃষ্ট হয় না। এই জন্য বঙ্গ-দেশীয় শিক্ষাবিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী কোন সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজীর শিক্ষা নিতান্ত শৈশবে আরম্ভ না হইয়া প্রথমে মাতৃভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা হয় এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার বয়স হইলেও কিছুকাল ইংরাজী ভাষা মাত্র শিক্ষিত হয়, অপর সকল বিষয় মাতৃভাষাতেই শিক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ঐ চেষ্টা সফলা হয় নাই। না হইবার কারণ এই যে, এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, ওরূপ করিলে ইংরাজী শিক্ষা মাত্রায় অল্প হইবে এবং ইংরাজীর উচ্চারণ সদোষ হইবে। অতি শৈশবে ইংরাজী না ধরাইলে ছেলের "টং"টী ইংরাজী হইবে না! অতএব ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের লোকগুলির বাল্যাবধিই সুপরিস্ফুটরূপে বস্তু এবং ভাব গ্রহণ করা অনভ্যস্ত। উহাঁরা যাহা কিছু শিখেন তাহার কিয়দ্ভাগ আন্দাজি বুঝিয়াই রাখেন। এইটি বড়ই কুঅভ্যাস এবং ইহা বৈজ্ঞানিকতা প্রাপ্তির পরম অন্তরায়। তাহার পর, বয়োধিক হইলে কালেজ গুলিতে যে শিক্ষা হয়, তাহাতেও বৈজ্ঞানিকতার বিশেষ সহায়তা করে না। এখানকার কালেজগুলিতে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজাদি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া যে সকল ব্যক্তি অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশই বিজ্ঞান বিদ্যায় তেমন বিদ্যাবান নহেন। যদিও কেহ কেহ গণিতবিদ্যায় মন্দ না হয়েন, তথাপি পরীক্ষাবিধান কার্য্যে প্রায় কেহই পটু নহেন। পরীক্ষাবিধান ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র। শিক্ষার অবস্থা এইরূপ হওয়াতে অধীত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বার্ষিক পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ এদেশে বিজ্ঞান-প্রসূত শিল্পা-

মির কল কারখানাও নাই বলিলেই হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং প্রয়োগজাত বস্তুর প্রত্যক্ষ কি কালেজে, কি বাহিরে, কোথাও হয় না—পুস্তকে পঠিত বৈজ্ঞানিক কথাগুলি যথাসাধ্য অনুভব করিয়াই বুঝিতে এবং কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। ফলকথা, ইউরোপীয় পুস্তক এবং ইউরোপীয় শিক্ষকের বাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে।

ফলও তদনুরূপ হয়। ইউরোপীয় পুস্তকাদির বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া পরিগৃহীত, কণ্ঠস্থ এবং ক্রমে হৃদগতপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির প্রতি বিজ্ঞানানুশীলনের যে বিশেষ প্রভাব আছে তাহা অতি অল্পমাত্রাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সামান্যতঃ বিদ্যাচর্চ্চার যে সাধারণ ফল তাহা ইংরাজী শিক্ষাতেও ফলিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত পণ্ডিতের এবং আরবিতে কৃতবিদ্য মৌলবীর অশিক্ষিত প্রাকৃত লোকসমূহ হইতে যে প্রভেদ ইংরাজী শিক্ষিতদিগেরও তাহা কিয়ৎপরিমাণে হইয়া থাকে এবং ভূগোল ইতিহাসাদি পাঠ নিবন্ধন একটু কূপমণ্ডূকতাও ন্যূন হয়, কিন্তু বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ কোন ফলই ফলে না। ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার যে গুলি ভিত্তি এখানকার ইংরাজী শিক্ষায় সে ভিত্তিগুলির অভাব। বস্তুগ্রহের উপায় নাই, ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মাইবার যত্ন নাই, পরীক্ষাবিধান নাই—সংস্কৃত এবং আরবীয় ব্যাকরণের সূত্র এবং পদ সাধন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ, কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের নাম এবং তাহাদিগের ব্যাখ্যা শুনা হয় মাত্র। এরূপ শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে কেন?

তবে কি ইংরাজীশিক্ষিত এবং স্বদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ হয় নাই? হইয়াছে। কিন্তু সে প্রভেদ বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে নয়—শাস্ত্র প্রমাণের ভেদ সম্বন্ধে। পূর্ব্বে ছিল দেশীয় শাস্ত্রাদি আপ্ত বাক্য, এখন হইয়াছে ইউরোপীয় শাস্ত্রাদি আপ্তবাক্য। ইউরোপের বাহ্য বিজ্ঞান শাস্ত্র গুলি দেশীয় বাহ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র যাহা কিছু আছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ[illegible]। আমরা সেই উৎকৃষ্টতর বাহ্য বিজ্ঞান

শাস্ত্রের কতগুলি অভ্যাস করিতে পাইয়াছি। অথবা প্রকৃত বাহ্যবিজ্ঞানের কতকগুলি গল্প শিখিয়াছি মাত্র। যদি তাহা হইতেই কোন কালে বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে, এরূপ বলা যায় তাহাতে আপত্তি করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে বা জন্মিতেছে এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম।

একবার মনে করিয়া দেখা যাউক, আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় কত অতব্য তথ্য বোধ করিয়া মধ্যে মধ্যে মাতিয়া থাকেন। ইহাঁরা সহস্র সহস্র প্লাঞ্চেট যন্ত্র ক্রয় করিয়া সেই যন্ত্র যোগে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন—ইহাঁরা যেখানে পাঁচজন একত্র হইয়াছেন, সেই খানেই স্পিরিট নামাইবার জন্য টেবিল ঘেরিয়া বসিয়াছেন—ইহাঁরা ইংরাজীভাষায় বাগ্মিতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের পুত্রবিশেষ বলিয়াও মনে মনে স্বীকার করিয়া কেবল ইংরাজের নিকট লজ্জা পাইবার ভয়ে সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই—ইহাঁরা ইউরোপীয়ের ঘরে নিজশরীরী তিব্বতীয় মহাত্মাদিগের আবির্ভাবের কথা ইউরোপীয়ের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন! ইহাঁরা দেশী হাতচালা ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইহাঁরা দেশী ভূত ছাড়িয়া বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইহাঁরা দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অবতার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সকলেই এইরূপ করেন নাই সত্য, কিন্তু দুইজন দশ জন করেন নাই বলিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের মুখ রক্ষা হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এবং কৃতবিদ্য মৌলবীদিগের মধ্যে প্রায় কেহই ঐ সকল হুজুকে যোগ দেন নাই।

পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।

[৩]

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে এতদ্দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার প্রবেশ হয় নাই, তাহা ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর এবং ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের গতি মতির পর্য্যালোচনা দ্বারা যেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, দেশের কৃবি

শিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থা বিচারপূর্ব্বক বুঝিলেও তেমনি বিস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

কৃষি সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে; ইউরোপেও কৃষি বিষয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রয়োগ শিল্প বিষয়ের অপেক্ষায় অনেক কম। ভূমির কর্ষণ, তাহাতে জল সেচন, যথাকালে তাহার জল নিঃসারণ, ভূমিতে সার যোজন, ভূমিভেদে সারের প্রভেদ সাধন এবং ফসলের পরিবর্ত্তন, এইরূপ কয়েকটী স্থূল স্থূল কার্য্যেই কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়; আর হল চালাইবার, শস্য কাটিবার, নিস্তুষ করিবার জন্য কয়েকটী কলের ব্যবহার হয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারগুলি ইউরোপেও হয় এ দেশেও হয়। ইউরোপে যত ভাল রকমে হয় এখানে তত ভাল হয় না তথাপি অনেকানেক বিচক্ষণ ইউরোপীয় পর্য্যাটকের মত এইরূপ যে ভারতবর্ষের কৃষকদিগের পক্ষে ইউরোপীয়ের স্থানে স্বদেশোপযোগী কৃষি সম্বন্ধে নূতন কিছুই শিখিবার নাই। দেশীয় নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং নবাগত ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির মধ্যে একটু মতান্তর আছে বটে। তাঁহারা মনে করেন যে, এ দেশেও ইংলণ্ডের ব্যবহৃত লাঙ্গলের অনুরূপ লাঙ্গল প্রয়োজনীয়, মনে করেন যে ইংলণ্ডে মৃত্তিকাদি লইয়া পরীক্ষা করিয়া যেমন বলা হয়, এ মাটিতে অমুক অমুক রাসায়নিক পদার্থ এত এত পরিমাণে আছে, ইহাতে এই এই ফসল ভাল হইবে, ইহাতে ঐরূপ বা ঐরূপ সার দেওয়া আবশ্যক, এখানেও সেইরূপে কৃষকবর্গের পথ প্রদর্শক কৃষি-বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন। কিন্তু শুনা গিয়াছে এবং দেখাও গিয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রদেশ ভেদে যেখানে যেখানে মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্ন সেই সেই স্থানে বিভিন্নরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার চিরপ্রচলিত আছে, আর কৃতকর্ম্মা কৃষকগণ পারম্পর্য্যোপদেশানুবর্ত্তী হইয়া মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিতে বিলক্ষণ সক্ষম এবং তাহা বুঝিয়া আপনাদিগের সামর্থ্যানুসারে সারের এবং বীজের ভেদ করিয়াও থাকে।

তথাপি মৃত্তিকাদির রাসায়নিক পরীক্ষাবিধান হইলে যে ভাল হয় না, এমত নহে। কিন্তু তাহা ত করা প্রায়ই হয় না, এবং যে যে স্থলে পরীক্ষা

বিধানে অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণ তাহা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই খানেই ঠকিয়াছে। অনন্তর দেশীয় প্রাচীন কৃষকদিগের স্থানে তাহাদিগকে শিখিতে হইয়াছে কোন্ জমিতে কোন্ ফসল ভাল হইবে কোন জমিতে কোন সার লাগিবে। যিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিবেন যে সাধারণতঃ এদেশের কৃষিকার্য্যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকতা বিন্দুমাত্রও লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। উদ্যানশোভাজনক ফুল ফলের চারা প্রস্তুত করায় এ দেশের মালীরা ইংরাজ মনিব প্রভৃতির স্থানে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছে মাত্র।

আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ইউরোপীয় শিল্প শিক্ষা। আমাদের দুই চারি জন যায় ইংলণ্ডে কৃষি শিক্ষার জন্য। তাহারাও দেশে আসিয়া প্রায়ই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়!

বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ প্রভাব কৃষির উপর নহে, শিল্পেরই উপর। শিল্প সম্বন্ধে আদৌ বক্তব্য এই যে শিল্প অতি বহুবিধ। যাহা কিছু উপভোগ যোগ্য, তাহারই সহিত শিল্পের সংস্রব আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে শিল্পের নাম কলা। তাহা চতুঃষষ্টি প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইউরোপীয়েরা শিল্পের দুইটী স্থূল ভেদ করেন। এক প্রকার শিল্প মনুষ্য শরীরের সাক্ষাৎ উপভোগ্য বস্তুজাত প্রস্তুত করণে নিযুক্ত; অপর প্রকারের শিল্প হইতে মানস সুখপ্রদ দ্রব্যজাত ও কার্য্যকলাপ জন্মে। প্রথম প্রকারের শিল্পকে উপভোগ্য শিল্প এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিল্পকে সুকুমার শিল্প * বলা যায়। সুকুমার শিল্পগুলি উৎকর্ষলাভ সহৃদয়তা এবং ইন্দ্রিয়পটুতা-মূলক। উহাদিগের সহিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের ততটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নয়। ঐ সকল শিল্পে ভারতবাসীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এখনও কতকটা আছে। পূর্ব্বোন্নতির প্রমাণ দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ যে ভাগে চিত্র-ভাস্কর্য্য-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের অধিকার অতি প্রবল হয় নাই, সেই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন

* কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য, বাস্তু এই কলা পাঁচটিকে ইংরাজীতে ফাইন আর্টস বলে, ঐ কলা পঞ্চককে সুকুমার শিল্প বলিয়াই অভিহিত করা গেল।

দেবমন্দির প্রভৃতিতে অতি জাজ্জ্বল্যমানরূপেই আছে। উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরের প্রধ্বস্তাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এমন দিব্য গঠন মন্দির, প্রাসাদ এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি সকল আছে যে, তাহা দেখিয়া অনেকানেক ইংরাজ বলিয়াছেন যে ও গুলি গ্রীক্ কারিগর ভিন্ন আর কাহার হস্তবিনির্ম্মিত হইতে পারে না *। বাস্তবিক ঐ সকল কীর্ত্তি নব্য ইউরোপীয় কারিগরদিগেরও অনায়াসসাধ্য এবং উৎকর্ষসাধ্য নয়। মথুরা নগরের ত্র্যম্বক নায়কের প্রাসাদ বলিয়া যে সুন্দর ভবনটী বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত তুলনায় আধুনিক ইংরাজ এঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুনা সন্নিহিত গণেশখণ্ডের গবর্ণমেণ্ট হৌস্ এবং ইন্দোরের নবরাজ ভবন অপকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়।

কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যে বিজ্ঞানের প্রভাব তাদৃশ নহে। উপভোগ জনক শিল্পের উপরেই বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপ প্রভাব। সেই গুলির প্রতিই যন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল শিল্পজাত সম্বন্ধেও একটা কথা বক্তব্য এই যে, উত্তম কারিগরের হস্তবিনির্ম্মিত শিল্প হইতে যন্ত্রপ্রসূত শিল্প উৎকৃষ্ট হয় না। আজিকালি অনেকানেক ইউরোপীয়েরও ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাহারা যত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার করেন, তাহার সকল গুলিই যন্ত্রপ্রসূত না হইয়া শিল্পীদিগের হস্তপ্রসূত হয়। এদেশেও যাঁহারা দেশীয় এবং বিলাতী উভয় প্রকার বস্ত্রাদির ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, যন্ত্র প্রসূত বিলাতী কাপড় অপেক্ষা হস্তপ্রসূত দেশীয় ভাল কাপড় শতগুণে উৎকৃষ্ট। স্থূল কথা, যন্ত্রপ্রসূত শিল্পজাত অল্পমূল্য বলিয়াই এত সমাদৃত।

যন্ত্রপ্রসূত দ্রব্য অল্পমূল্য হয় কলের গুণে। কলে উৎকৃষ্ট হউক, অপকৃষ্ট হউক, যেরূপ শিল্পোপাদন প্রদত্ত হউক, যন্ত্রের প্রভূত বলে উহা কার্য্যোপ-

* কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমার কাছে ঐ কথা বলিলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, কুমারসম্ভবাদি যে সকল কাব্য গ্রন্থ সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে, সেগুলি কোন্ কোন্ গ্রীক কবি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তাহা জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়। কারণ, ওগুলির নির্ম্মাণ-প্রণালী অনেকাংশে পরিপাটি এবং সমীচীন সহৃদয়ত্বের ও সুরুচির বাঞ্জক। বাঙ্গালুর গবর্ণমেণ্ট হৌসের সম্বন্ধেই কথা উঠিয়াছিল।

যোগী হইয়া উঠে। অপকৃষ্ট উপাদানের মূল্য কম হয়, এই জন্য তজ্জাত দ্রব্যেরও মূল্য কম হয়। মূল্য ন্যূন হইবার অপর কারণ এই, কলের প্রয়োগে মনুষ্যের বল অল্প লাগে, সুতরাং মজুরির খরচ কম হয়। এই দুই কারণে খরচের লাঘব হয় বলিয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পজাত স্বল্পমূল্য হয়।—আমাদের দেশে যন্ত্রের বহুল প্রচার হইলে মজুরদার লোকের কর্ম কমিয়া যাইবে বলিয়া এখন আর শঙ্কা করিবার কারণ নাই। যেহেতু এ দেশের লোকেরা বিলাতী শিল্পজাতের আমদানিতে নিকর্ম্মা এবং নিরন্ন হইয়া এক-মাত্র কৃষিকার্য্যের উপর গিয়া পড়িতেছে। অতএব এদেশে কল চলিলে কতক পরিমাণে কৃষিবৃত্তির উপর চাপ কমিয়া যাইতে পারে; সুতরাং এ দেশে কলকারখানা হইয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় কোন দোষই হইতে পারে না। কিন্তু কলকারখানা কয়টী বসিয়াছে?

দেশে বৈজ্ঞানিকতার সত্য সত্যই প্রবেশ হইলে, এতদিনে কল কারখানার সংখ্যা এত ন্যূন এবং যে কয়েকটি আছে তন্মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা এত কম থাকিত না।

জাপানীয়েরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প শিখিতেছে। বর্ষে বর্ষে তাহাদের শতাধিক সংখ্যক লোক ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকায় গিয়া ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং স্বদেশে আসিয়া স্বাধীনভাবে কল-কারখানা চালায়। ইহারই মধ্যে উহারা দুই তিনটী ইউরোপীয় কলের সংস্কার এবং উৎকর্ষ সাধন করিয়া তুলিয়াছে। ইউরোপীয় শিল্পীর প্রতিযোগিতা করিয়া উহারা ভারতবর্ষে আপনাদিগের দিয়াশালাই বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। আমরা যখন জাপানীয়দিগের ন্যায় ইউরোপে গিয়া শিল্প বিজ্ঞান শিখিয়া আসিতে পারিব, তখনই আমাদিগের মধ্যে দেশহিতকর বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার আরম্ভ হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, জাপানের কৃষি-কার্য্য ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য হইতে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে নাই। জাপানীয়েরা কেহই কৃষিবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত ইউরোপে যায় না—শিল্প শিখিতেই যায়।

ইংরাজ সংসর্গে আমাদিগের যদি কোন বিজ্ঞান যথারীতি শিক্ষা হইতেছে এমন হয়, তবে সেটী চিকিৎসা বিজ্ঞান। উহার অবস্থা কিরূপ তাহা দেখিলেই আমাদিগের মধ্যে যে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার দোষে অথবা অন্য কারণে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার হইতে পারে নাই, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইবে। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদীয়, হাকিমি এবং ডাক্তারি এই তিন প্রকার চিকিৎসা চলিতেছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার চিকিৎসার কথা এস্থলে বিচার্য্য নহে। তৃতীয় প্রকারের চিকিৎসাকেই বিজ্ঞানমূলক বলা হইয়া থাকে। এবং উহাতেই উন্নতির সম্ভাবনা শংসিত হয়। কিন্তু আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তারেরা এ পর্য্যন্ত উহার কিছুমাত্র উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিয়াছেন কি? দেশে অপর দুই প্রকার চিকিৎসা প্রণালী চলিতেছে। তদ্দ্বারা শত শত স্থলে তাঁহাদিগের অসাধ্য রোগেরও প্রতীকার হইতেছে। দেশ মধ্যে অসংখ্য ভৈষজ্য আছে, যাহাদিগের গুণ ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয় নাই। তথাপি কোন একটী স্থলেও কি তাঁহারা ঐ গুলির গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করেন? ডাক্তার টোয়াইনিং ওসাগনেসী, ওয়াইজ এবং তাদৃশ দুই চারি জন কিছু করিয়াছিলেন, দেশীয় কেহই ভৈষর্য্যদিগের গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু মার্কিনদেশীয় ডাক্তারেরা স্বদেশের আদিমনিবাসী বর্ব্বর ইণ্ডিয়ানদিগেরও ব্যবহৃত ঔষধাদি হইতে বহুসংখ্যক ঔষধের আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানেরও যেমন সুশিক্ষা হয় না, চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও সেই দশা হইয়া আছে।—অর্থাৎ উহা দ্বারাও এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির বৈজ্ঞানিক ভাব প্রাপ্তি হয় না। যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্র প্রথমে মুখস্থমাত্র হইয়া পরে তাহার স্মৃতি অল্পমাত্রাতেই পরিণত হইয়া থাকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানও তেমনি ক্রমশঃ যৎসামান্য ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী হইয়া থাকে। উহাও বৈজ্ঞানিক ভাবের জনক হইতে পারে নাই।

কয়েকটী প্রকৃত ঘটনার কথা বলিতেছি তাহাতে কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে,

কি অপরাপর বিজ্ঞানে, ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকটা অনভিজ্ঞতা আছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

(১) কোন গৃহস্থের একটী বালিকা আপনার নাকের নোলক, মাকড়ি শুদ্ধ গিলিয়াছিল। বাটির ডাক্তারকে ডাকা হইল এবং কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করা হইল। ডাক্তারটী কালেজের পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত এবং চিকিৎসা কার্য্যে সুপ্রতিপন্ন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিলেন যে, বালিকাটীকে কিছু নাইট্রোমুরিয়াটিক দ্রাবক পান করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বাটির কর্ত্তা বলিলেন, উহার পেটটী কি কাচের বোতল যে, ঐ দ্রাবকে তাহা নষ্ট হইবে না। বালিকাটীর পরমায়ু ছিল।

(২) একজন শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে বস্তুমাত্রের সচ্ছিদ্রতা বুঝাইবার সময় বলিলেন,—"তোমরা দেখ নাই, ঘরের শার্শির বাহির পিটে বৃষ্টির জল লাগিলে ভিতর পিঠেও কিছু কিছু জল জমা হয়। শার্শির গ্লাস সচ্ছিদ্র না হইলে কি তাহা হইত?"

(৩) এতদ্দেশীয় কতকগুলি বড় লোক ইলবার্ট বিলের গোলযোগের সময় কেসউইক্ প্রমুখ ইংরাজদিগের সহিত মিলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বক্তৃতা করিলেন, "যেমন নৌকা হইতে আকর্ষী দিয়া টানিলে জাহাজটা সরিয়া আইসে, আমরা তেমনি ইংরাজদলকে স্বদলে টানিয়া লইতেছি।" উপমাটী ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেই প্রকৃত কথা হইত।

(৪) "শীতকালের দিন ছোট হয় কেন?" "শীতকালে পৃথিবীর গতি দ্রুত হইয়া উঠে, তাই দিন ছোট হইয়া পড়ে।" "গতি দ্রুত হয় কেন?" কেপ্‌লরের তৃতীয় নিয়মানুসারে।"

(৫) কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্ম বলিয়াছেন "পৃথিবী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত—ঠিক পেঁয়াজের খোসার মত। যেখানে মাটী খুঁড়িবে সেই স্থানেই সকল স্তর পাওয়া যাইবে। পৃথিবী যে কাহার গঠিত ভূতত্ত্বেই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।"

(৬) পিতা সংস্কৃতজ্ঞ, পুত্র ইংরাজী নবীস। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাবা! চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার হয় সত্য—জোয়ার দিন রাত্রির মধ্যে দুইবার হয় কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন "পৃথিবী ঘোরে কি না, তাই ঐরূপ হয়; জোয়ারটাও ঘুরিয়া আইসে; পৃথিবী যে ঘুরে জোয়ার ভাটাই তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ।" পুত্রটী তাহারই পূর্ব্ববর্ষে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় খুব নম্বর পাইয়া পাস হইয়াছিলেন!

(৭) একটী সুকুমারী বালিকার বুকে সর্দ্দি বসিয়াছিল; ডাক্তার আসিয়া তাহাকে খানিকটা তুঁতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বলিল, "তুঁতে যে বিষ।" ডাক্তার বলিলেন "বমি করাইবার জন্য তুঁতে দিলাম, উহা পেটে থাকিলে ত বিষ হইবে।"

(৮) আর একদিন পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা! চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ বলে সমুদ্রের জল কাঁপিয়া উঠিয়া জোয়ার হয়, বায়ু মণ্ডলেও কি ঐরূপ হয় না?" পুত্র বলিলেন "না, তাহা হয় না" "কেন?" পুত্র বলিলেন "কোন পুস্তকে ঐ কথা লেখা নাই!"

সত্য কথা, আমাদিগের যে, বিজ্ঞানবিদ্যা তাহা পুস্তকেই আছে, উহা দ্বারা বুদ্ধি এবং চিত্তের কোন সংস্কার হয় নাই। দেশের উপভোগ্য শিল্পজাতও সম্বর্দ্ধিত এবং স্বল্পমূল্য হইয়া উঠে নাই। আমরা তৎসমুদায় অন্য দেশ হইতে পাইতেছি, এবং সকল লোকেই ক্রমশঃ একমাত্র চাকুরি এবং কৃষি ব্যবসায়ের উপর নির্ভর প্রবণ হইতেছি।

পাশ্চাত্যভাব—রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব।

ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় সমাজগুলির উপাদান ভিন্নরূপ। ইউরোপে যদিও কোন অতি বহুপূর্ব্বকালে এস্কুইমোদিগের সদৃশ নিকৃষ্ট জাতীয় মনুষ্যের আবাস ছিল এরূপ প্রমাণ হয়, তথাপি ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে তথায় ককেসীয় ভিন্ন অপর কোন জাতীয় মনুষ্যের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। রোমকেরা যে সকল বর্ব্বর জাতীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ইউরোপে আ-

নাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করে তাহারা সকলেই ককেসীয় বর্ণের মধ্যে, কেহ বা কেল্‌টীয়, কেহ বা টিউটোনীয় লোক ছিল। রোমীয়েরা নিজে কেল্‌টীয় আর তাহাদের সাম্রাজ্য বিধ্বংসকারী বর্ব্বরেরা অধিক পরিমাণেই টিউটোনীয় ছিল। অতএব ইউরোপের রাজ্যগুলি অধিকাংশই মূলতঃ এক জাতীয় লোকের আবাস ভূমি।

সকল দেশেরই সমাজ সংঘটনে বিভিন্ন স্তরের বিনিবেশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজের সংঘটনে ইউরোপের ন্যায় সমুদায় স্তরের এক জাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এখানে দ্রাবিড়ী, কোলেরীয়, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি মূলতঃ ভিন্ন জাতীয় লোকেরা ককেসীয় বর্ণসম্ভুক্ত আর্য্য জাতির নিম্নভাগে অবস্থিত। সেই আর্য্য জনগণের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে ঐ মূলতঃ বিভিন্ন বর্ণের লোক সকল ক্রমশঃ সম্মিলনের এবং একতার দিকে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে; এবং অনেক পরিমাণে ধর্ম্ম-সামঞ্জস্য, ভাষা-সামঞ্জস্য এবং ব্যবহার সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় সমাজের উপাদান যেমন ভিন্ন প্রকৃতিক, ঐ উপাদানগুলির উপর্য্যুপরি বিনিবেশও তেমনি ভিন্নরূপ। নব্য ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলি এক রোম সাম্রাজ্যের সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদের কর্তৃক বিজিত রোমীয়দিগের স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং রোমের ধর্ম্মশাস্ত্র, রোমের ব্যবস্থা-শাস্ত্র এবং রোমের সাহিত্য শিল্পাদি প্রাপ্ত হইয়া সভ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে ওরূপ কোন সুসভ্য সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিজয় করিয়া আর্য্য পুরুষেরা এখানে বাস করেন নাই। তাঁহারা নানা ভাষাভাষী, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দস্যুদৈত্যাদির দলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের শাসন, পালন এবং শিক্ষা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব ইউরোপীয় রাজ্যগুলির তলভাগের স্তরে একতা এবং সভ্যতার নিবেশ, উপরের স্তরে অনৈক্য এবং বর্ব্বরতার স্থান; ভারতবর্ষের তলভাগে অনৈক্য এবং বর্ব্বরতা, উপরি স্তরে জ্ঞান এবং সভ্যতার আশ্রয়। এই মৌলিক পার্থক্য হইতে অনেক বিষয়ের

অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে এবং সেই গুলির বিশেষ বিচার না করিয়া যাঁহারা ইউরোপীয় ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সমাজতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা সুবহু স্থলেই অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

নব্য ইউরোপীয় জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের নানা খণ্ড জয় করিয়া সাম্রাজ্য প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক খৃষ্টান হয়। অতএব তাহারা বিজিত লোকদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দেয় নাই, তাহাদিগেরই স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য ইউরোপে ধর্ম্মশাসনের গৌরব ন্যূন। শুদ্ধ ধর্ম্ম-শাসনের গৌরব ন্যূন এমত নহে, ইউরোপে ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণকে রাজ্যপালের অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধর্ম্মশাস্তৃগণের সহিত রাজ্যপালদিগের বিবাদ বিসম্বাদের ভুয়োভুয়ঃ উল্লেখ থাকিলেও রাজ্যপালেরাই যে অধিক স্থলে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্থলেই লব্ধ-বিজয় হইয়াছেন তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়া আছে। কাথলিক ধর্ম্মশাস্তা পোপের উৎকট প্রাবল্যের সময়েই ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে রাজ্য-পালেরা স্ব স্ব দেশীয় ধর্ম্মশাস্তৃগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় সম্যক্ বিরত হয়েন নাই, এবং বহুস্থলে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রোমান কাথলিকেরা যাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদিগের বার আনা বিজিত জাতীয়, সিকি মাত্র বিজেতৃজাতীয় পুরুষ ছিলেন।

ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারে নাই। এখানে রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মশাসন উভয় শক্তিই আর্য্য পুরুষদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে ধর্ম্মশাসন, রাজ্য-শাসন অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই। প্রত্যুত ধর্ম্ম-শাসন কার্য্যে অধিকতর বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের এবং পবিত্রতার প্রয়োজন বলিয়া উহাই সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এখানে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন হইয়া পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল।

ইউরোপে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন হওয়াতে রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মযাজক প্রমুখ গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সকলেই একবাক্য হইয়া

বলিতে লাগিলেন যে রাজার শক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত, উহার প্রতি কোন বাধা প্রদানে মনুষ্যের অধিকার নাই।

ভারতবর্ষে এক ওরূপ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। এখানকার শাস্ত্রে রাজশরীর যদিও দেবশরীর বলিয়া বর্ণিত, তথাপি রাজা কর্তৃক পরিচালিত যে শাস্ত্রীয় দণ্ড তাহাই প্রকৃত রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥

সেই দণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা, এবং শাসিতা, তিনিই চতুরাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিভূ।

ইউরোপীয় সমাজে রাজশাসন ধর্ম্ম-শাসনকে আত্মসাৎ করিয়া নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সমাজের মধ্যে কোন একটি শক্তি একান্ত প্রবল হইলে তাহার দমনের এবং খর্ব্বতাসাধনের প্রয়োজন হয়। এইজন্য ইউরোপীয় সমাজের অন্তর্ভূত অপরাপর দলের, যথা ভূম্যধিকারী এবং প্রজা সাধারণের, বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তির উদ্রেক হওয়াতে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান হইতে থাকিল, রাজাদিগের পদচ্যুতি ঘটিল এবং তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের সহিত বিশেষ বিশেষ নিয়মাবধারণ হইল। কিন্তু সামান্য নিয়মে অত্যাচার বন্ধ হইয়া থাকে না। আবার অত্যাচার, আবার অভ্যুত্থান, আবার নিয়ম বন্ধ হইল। কোথাও কোথাও প্রজাগণ প্রকাশ্য সভাস্থলে রাজার দোষের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিল। ঐ সময়ে একটি মতবাদ বাহির হয়, তাহাকে সামাজিক চুক্তিবাদ বলিয়া অভিহিত করা যায়। উহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা প্রজার মধ্যে কোন কালে যেন এইরূপ একটা চুক্তি হইয়া আছে যে, রাজা যথানিয়মে প্রজাপালন করিলেই প্রজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইবেন, তাহার অন্যথাচরণ করিলে তিনি পদচ্যুত হইবেন।

ভারতবর্ষে ওরূপ কোন চুক্তির কল্পনা হয় নাই। না হইবার কারণ, এখানে রাজশক্তিকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রবলতর ধর্ম্মশাসন বিদ্যমান ছিল। সেই ধর্ম্মশাসন বলিয়াছিল—

"দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং ॥"

দণ্ড সুমহৎ তেজবিশিষ্ট, অকৃতাত্মাকর্ত্তৃক তাহা চালিত হইতে পারে না; ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে বন্ধুবর্গ সহিত রাজাও দণ্ডদ্বারা হত হয়েন।

"তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মাবিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥"

রাজা তাহার সমুচিত প্রণয়ন করিলে ত্রিবর্গ ফল লাভ করেন, কিন্তু কামাত্মা, বিষয়ব্যসনাশীল এবং ক্ষুদ্রাত্মা হইলে দণ্ডদ্বারাই স্বয়ং হত হয়েন। রাজার প্রতি দণ্ড প্রণয়ন যে কথার কথা মাত্র ছিল তাহা নহে। মনুসংহিতাতেই ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

বেণোবিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃপৈজবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেবচ ॥

নীতিভঙ্গ দোষে বেণ রাজা, নহুষ রাজা, পিজবন পুত্র সুদা রাজা, সুমুখ রাজা এবং নিমিরাজা বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং নাটকাদি হইতেও ঐরূপ অনেকানেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই স্থলে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষীয় জনগণ হইতে ইউরোপীয়দিগের মনের গতি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হইয়া আছে। ইউরোপীয়দিগের মনে চুক্তির ভাবটা কিছু শীঘ্র এবং সহজে সমুদিত হইয়া থাকে। উহাঁরা স্বভাবজাত সম্বন্ধগুলিরও মূলে একটা চুক্তির ক্রিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইহার প্রকৃত কারণ, উহাঁদিগের প্রকৃতিগত স্বৈরভাবের প্রাবল্যও হইতে পারে, আর কার্য্যকলাপে বণিক্‌বৃত্তির বাহুল্যও হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক, ভারতবর্ষীয়েরা বিধি প্রতিপালনকেই যেমন ধর্ম্ম ব্যবহারের নিদানভূত জ্ঞাত করেন, ইউরোপীয়েরা চুক্তির অনুসরণ করাকেও প্রায় সেই চক্ষে দেখেন। এই জন্যই রাজা এবং প্রজার মধ্যে চুক্তির কল্পনা ইউরোপীয়দিগের মনে উদিত হইয়াছিল। ঐ কাল্পনিক মতবাদ স্থায়ী হয় নাই বটে; কিন্তু ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে যে ক্রমে ক্রমে রাজের শারীরিক বিধির সুস্পষ্ট

ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং রাজগণ সেই ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ চুক্তি সম্বন্ধীয় মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্ব্বের কল্পনাটীই প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা সমাজের প্রতিভূমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহার সর্ব্বময় অধিকারের ভাব তিরোহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও ধর্ম্মশাসনের স্বতন্ত্রতা থাকায়, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল; তবে ইউরোপের ন্যায় এখানে সামাজিক চুক্তির কল্পনায় অথবা পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবান্তে নূতন করিয়া শারীরিক-ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় নাই। এখানকার প্রাচীন সংহিতাতেই লিখিত হইয়াছে যে, শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা যে রাজা জীবন ধারণ করেন তাঁহার যশ অতি বিস্তৃত হয়। রাজা শিলোঞ্ছবৃত্তির * দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, ইহা মনে করিতে গেলেই বুঝা যায় যে, রাজা আপনাকে নিজ ধনাগারাদির অধিকারী বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। আপনাকে সমাজ কর্তৃক ন্যস্ত ধনেরই রক্ষিতা বলিয়া মনে করিতেন। †

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোভিরক্ষিতা।"

আপনাপন ধর্ম্মে নিবিষ্ট সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের অভিরক্ষিতা-রূপেই রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন।

"শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথারাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥"

শরীরের প্রতি পীড়া প্রদানে যেমন প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইরূপ রাজ্যের পীড়নে রাজার প্রাণ ক্ষীণ হয়।

---

* মনু ৭ম ৩৩ শ্লোক।

† মুসলমানদিগের অভ্যুদয় কালে এইরূপ নীতির অনুসরণেই কোন কোন ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট্ স্বহস্তে কোরাণ লিখিয়া তাহার বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কেহ কেহ বা টুপি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত একটী মনু বচনে এক স্থানে দণ্ড বা রাজার প্রতি প্রতিভূ শব্দেরও স্পষ্ট প্রয়োগ আছে—

"চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ইউরোপে নানা বিবাদ বিসম্বাদ এবং রক্তারক্তি কাণ্ডের পর কালক্রমে চুক্তির কাল্পনিক মূলে রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব স্থাপিত হইয়াছে; আর ভারতবর্ষে ধর্ম্মশাসনের স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন বিধি প্রতিপালনের অবশ্য কর্ত্তব্যতারূপ ভিত্তির উপর রাজার প্রতিভূত্ব সংঘটিত হইয়াছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, চুক্তিরক্ষা এবং বিধিপালন এই দুইটীর মধ্যে কোন ভিত্তিটী দৃঢ়তর, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, বিধি প্রতিপালন ভিত্তিটীই অধিকতর দৃঢ় এবং প্রশস্ত—কারণ চুক্তিরক্ষা বা প্রতিশ্রুত প্রতিপালন ধর্ম্মটীও বিধি প্রতিপালনের উপরেই সংস্থাপিত। অগষ্ট কোমটী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম-শাসনের প্রাধান্য সংস্থাপিত হওয়া বিধেয়। ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছিল। এখানে রাজশাসন, ধর্ম্মশাসনের বশীভূত ছিল। অতএব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, ভারতবর্ষে রাজার সমাজ প্রতিভূত্বের ভাবটী নূতন সঞ্চারিত হইয়াছে, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে রাজাকে কোথাও লুপ্তশক্তি কোথাও বা হ্রস্ব শক্তি করিয়া বিস্পষ্টরূপে প্রজাসাধারণের অভিমতি গ্রহণপূর্ব্বক সংগঠিত প্রতিভূ সমিতিদ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা ইউরোপীয় রীতি। উহার সম্ভাবয়ব এদেশে কথনই পরিস্ফুট হয় নাই। ইউরোপীয় প্রণালী কাল্পনিক চুক্তিমূলক বলিয়া উহার অভ্যন্তরে এই অতথ্যটীর সঞ্চার হইয়াছে যে কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত লোক মাত্রেই অতি গরিষ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনেও মতামত প্রদান করিতে সক্ষম এবং অধিকারী। এই অতথ্য ইউরোপের সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতে এই মৌলিক দোষ থাকায় উহা অতিশয় বিপ্লবপ্রবণ হইয়াছে। সেই জন্যই ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট, আনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট প্রভৃতি সমাজ

বিপ্লবকারীদিগের উৎপাত এবং আমেরিকার বিচার কার্য্যেও হঠকারী প্রাকৃত লোকের হস্তক্ষেপে লিঞ্চ-ল এর উৎপত্তি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই দূরদর্শী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রতিভূ নির্ব্বাচন প্রণালীর সংকোচ ও সমিতি গঠন রীতির পরিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছেন।

অপর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইংরাজী হইতে যে সকল ইতিহাসাদি গ্রন্থ সাধারণতঃ অধ্যয়ন করা হয় সে গুলি প্রায়ই প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীদিগের প্রণীত। প্রটেষ্টাণ্টেরা ধর্ম্ম শাসনের পরম বিদ্বেষ্টা। তাঁহারা ধর্ম্মশাসনের প্রাধান্যকে যাজকতন্ত্রতা বলেন, এবং ঐ শাসনকে রাজার শাসন অপেক্ষা কঠিনতর এবং সর্ব্ব প্রকারে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন।

কিন্তু তাঁহাদের কথা প্রকৃত কথা নহে। বিশেষতঃ প্রটেষ্টাণ্টদিগের পুস্তকাদিতে যাজকতন্ত্রতার যে সকল দোষের উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহার কিছুই ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্বন্ধে খাটে না। এখানকার ধর্ম্মশাসনের যে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট হইবে।

(১) অন্যান্য সমাজে, যথা রোমানকাথলিক এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে, যাজকেরা গৃহস্থ লোক নহেন। তাঁহারা বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন না। সুতরাং প্রজাসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সহানুভূতি অল্প হয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ লোক।

(২) অন্যান্য সমাজে যাজকেরা এক একটী দলপতির অধীন। রোমানকাথলিকেরা পোপের অধীন, বৌদ্ধযতিরা দেশভেদে ধর্ম্মরাজের অথবা লামার কিম্বা প্রধান ফুঙ্গীর অধীন। ব্রাহ্মণেরা ওরূপ কোন দলপতির অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহারা সাধারণ সমাজ হইতে কোন ভিন্ন সূত্রে সম্বদ্ধ না হওয়াতে সেই সাধারণ সমাজেরই প্রতি সম্পূর্ণ মমতাসম্পন্ন।

(৩) অন্যান্য সমাজে, যথা প্রটেষ্টাণ্ট এবং গ্রীক সাম্প্রদায়িক খৃষ্টানদিগের মধ্যে, যাজকদল রাজার ভৃতিভুক্; সুতরাং পরাধীন। ব্রাহ্মণেরা সেরূপ নহেন। ইহাঁরা যে নিষ্কর ভূমি অধিকার করিতেন, তাহা পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতেন—রাজা তাহার উপর হস্ত-

ক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণদিগের অপরাপর জীবনোপায়ও গৃহস্থের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানাদি হইতে হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন এবং সত্ব গুণ প্রধান থাকিয়াই ধর্ম্মাধিকরণে এবং শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানে সমীচীন রূপে যোগ্য হইতে পারিতেন।

(৪) অন্যান্য সমাজে, যথা খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের মধ্যে. ধর্ম্মশাস্তৃ-গণকে যতটা সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজসাহায্য লইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, ভারতবর্ষের সমাজ প্রণালীতে অন্তঃশাসনের আধিক্য নিবন্ধন তত করিতে হয় নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার দেখিয়া সেই দৃষ্টান্তা-নুসরণ করিবার উপদেশই বহুলপরিমাণে আছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধি রাজ-দণ্ডের বিধি নয় এবং অন্যান্য সকল সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই অধিকতর পরিমাণে ধর্ম্মশাসন নির্ব্বাহিত হইবার ব্যবস্থা আছে।

অতএব ভারতবর্ষের এবং অপরাপর সমাজের ধর্ম্মশাসনে আকাশ পাতাল ভেদ। অন্যান্য সমাজের ন্যায় এখানকার ধর্ম্মশাসনকে যাজকতন্ত্রতা মনে করা এবং তাহার প্রতিকূল মতবাদ গ্রহণ করা অতি প্রকাণ্ড ভ্রম।

পাশ্চাত্যভাব— তাহার উপসংহার।

ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাগমে যে পাশ্চাত্যভাবগুলির প্রবেশ হইয়াছে বলা হয়, সে গুলির বিচার করিয়া দেখা হইল যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটী আদবেই ভাল বস্তু নয়—আর কোন কোনটী নূতন বস্তু নয়—অপর যাহা ভাল এবং কতক নূতন তাহার যথাযথ প্রবেশ হয় নাই। পূর্ব্বগত কয়েক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে (১) একান্ত স্বার্থপরতা ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং (২) উন্নতিশীলতার প্রকৃতপথ যে চিত্তাদর্শের উৎকর্ষসাধন তাহা ইংরাজ সংশ্রবে সাধিত হইতে পারে না। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৩) ইউরো-পীয় সাম্যবাদটা নিতান্ত মৌখিকও বটে এবং মিথ্যাও বটে, আর ভারতবর্ষে উহার পর্য্যাপ্ত স্থানও নাই। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৪) ঐহিকতা যে পরিমাণে এবং যে ভাবে এ দেশে দমিত হইয়া আছে, তাহা থাকাই ভাল। দৃষ্ট হই-

রাছে যে (৫) স্বাতন্ত্রিকতার যে পথ খুলিয়াছে তাহা প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার পথ নহে, অতি মারাত্মক উচ্ছৃঙ্খলতারই পথ। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৬) এদেশে বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত প্রস্তাবে সঞ্চার হয় নাই। পরিশেষে দেখা গিয়াছে যে (৭) রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সংস্থাপনের যে উপায় ভারতবর্ষে ছিল, তাহা বর্ত্তমান রাজশাসন দেশীয় ধর্ম্ম শাসনের নিরপেক্ষ হওয়ায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, আমি যেরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সেইরূপেই হউক বা অন্য কোন প্রকৃতরূপেই হউক, যিনিই উল্লিখিত পাশ্চাত্যভাব গুলির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, উহাদিগের কতকগুলি আসলেই ভুয়া এবং মেকি আর অপর কতকগুলি ভাঙ্গা এবং বে-কেজো হইয়াই এখানে আসিতেছে। কিন্তু উহারা যতই ভুয়া বা বেকেজো হউক, উহাদিগের চলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

যে ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তারা উহাদিগের প্রচালনে বিশেষ তৎপর, তাহারা হয় ত ওগুলিকে মেকি বলিয়াই জানেন না, এবং হয়ত মনে করেন যে, ঐ সকল ভাবের প্রাবল্যেই তাঁহাদিগের নিজ জাতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহা বলে না। ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হয় যে, যে সময়ে ইংরাজদিগের মধ্যে ঐহিকতার, ক্রমোন্নতির এবং স্বাতন্ত্রিকতার ভাব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছিল, সেই পিউরিটানদিগের প্রাবল্যের সময়েই ইংলণ্ডের চরম উন্নতির সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে সঞ্চিত বল হইতেই বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার উপনিবেশের প্রসার এবং অধিকারের আধিক্য হইয়াছে। দেশে ধনাগমের পথ অতি প্রশস্ত হইয়া উঠিলে, ইংরাজের হৃদয়ে ক্রমশঃ সুখলালসার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যেমন তাহা হইতেছে সেই পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মনে ধর্ম্মসূত্রলব্ধ পূর্ব্ব বল ন্যূন হইয়া স্বার্থবাদ, হিতবাদ ঐহিকতা, সাম্যবাদ প্রভৃতির উদয় হইতেছে।*

---

* যাঁহারা স্বজাতীয় ধর্ম্মের মাত গোড়ামি ছাড়িতে পারেন নাই তাঁহারা ধন লিপ্সায় একান্ত বশীভূত হইয়া মুখে যাহাই বলুন কার্য্যে ধর্ম্মকে কাটিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন।

এক শত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যে কোন বিষয় লইয়া রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, ইংলণ্ড তাহার মধ্যে একজন হইতেন, এখন ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছে। ইটালীর স্বাধীনতা-সাধন ফ্রান্স সম্রাট করিলেন, ইংলণ্ড বসিয়া দেখিলেন। প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রীয়া মিলিয়া ডেনমার্ককে ভাঙ্গিয়া ফেলিল—ইংলণ্ড আপনার প্রতিশ্রুত পালন করিতেও ভুলিয়া গেলেন। প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রতি লগুড় প্রহার করিলেন এবং ফ্রান্সের মস্তক চূর্ণ করিলেন—ইংলণ্ডের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। এই ইংলণ্ড কি সেই ইংলণ্ড, যে প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সমুদায় ইউরোপখণ্ডকে জাগ্রত করিয়াছিল এবং ইউরোপের অর্দ্ধ পরিমিত সেনার খরচ যোগাইয়াছিল? কিন্তু ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃগণ উন্নতিশীলতার ভাবে একান্ত মুগ্ধ বলিয়া এরূপ হওয়াকেও উন্নতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এখনকার কালে তাঁহাদিগের মনে যে সকল ভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠিতেছে, তাহাই ভাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও ঐহিকতাদি নব্য ভাব সকলের সম্যক প্রবেশ হয় নাই এবং তাহা হয় নাই বলিয়াই এখনও ইংলণ্ডের প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া পড়ে নাই।

আমি এমন কথা বলি না যে ইংলণ্ড পূর্ব্বকালে যেমন ছিলেন, তাহাই ভাল ছিল। ডিসরেলি বলিয়া গিয়াছেন যে এখনকার দিনে ইংলণ্ড যতটা আসিয়িক সাম্রাজ্য, ততটা ইউরোপীয় রাজ্য মধ্যে গণ্য নয়—যদি এটা প্রকৃত কথা" হইত অর্থাৎ যদি ইংলণ্ড আসিয়িক সাম্রাজ্যগুলির ন্যায় শান্তিপ্রবণ এবং পর রাজ্যের প্রতি সম্যক লোভ শূন্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ভালই হইত। কিন্তু ইংলণ্ড তাহা পারেন নাই, আজি আসান্টি, কালি সাইপ্রস্, পর দিন মিসর, তাহার পর ব্রহ্ম এইরূপে দুর্ব্বল পররাজ্যগুলি কুড়াইয়া বেড়াইতেন, কিন্তু ইউরোপের আভ্যন্তরিক প্রবল যুদ্ধাদিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইহা লোভ দমনের লক্ষণ নয়, শক্তিসঙ্কীর্ণতারই লক্ষণ।

ফলতঃ ঐহিকতাদির প্রাবল্যে দেশের বল বৃদ্ধি হয় না। স্বার্থপরতায় দৃষ্টি সহজেই সঙ্কীর্ণ উহার সহিত বিদ্যা বিবেকাদির মিশ্রণ থাকিলে কিছু দিন কতকটা দূরদর্শন থাকিতে পারে, এবং দূরদৃষ্টির গুণে একেবারে অধঃপাত হয় না। কিন্তু পরিণামদর্শিতা সকল সময়ে সকল দিক বজায় করিতে পারে না, স্বার্থপরতাদি দোষে বুদ্ধিও বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং স্বার্থপরতা-দূষিত বুদ্ধিমত্তাতেও অধিক দিন চলিতে পারে না। ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন পাছে তাঁহারা প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি করিলে প্রজার অসন্তোষ জন্মে এবং তাঁহারা পদচ্যুত হয়েন। এই ভয়ে তাঁহারা কর বৃদ্ধি করিয়া সৈনিক বল কিম্বা পোতবল বিশিষ্টরূপে বর্দ্ধিত করিতে পারেন না। কিন্তু ইউরোপের অপরাপর দেশীয়েরা আপনাপন পোতবলের নিরন্তর বৃদ্ধি করিতেছে এবং কেহ কেহ পোতবলেও ইংলণ্ডের সমকক্ষ প্রায় হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের বণিক দ্রব্যে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে। ইংলণ্ডের কণ্ট্রাক্টরেরা স্বজাতীয় সেনার ব্যবহারার্থ অস্ত্র শস্ত্রাদিতেও ভেজাল করিয়া দিতেছে। ঐহিকতাভাবের বৃদ্ধিতে এইরূপ অশুভময় ফল ফলিত হয়

ইউরোপীয় সমাজগুলির মধ্যে যেটী আপনাকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গর্ব্ব করিত; সেই ফ্রান্সেরই ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, উন্নতিশীলতা এবং সাম্যাদি ভাবের জন্ম না হউক, ঐ দেশেই উহাদিগের আত্যন্তিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টি হইয়াছে। সেই বৃদ্ধির এবং পুষ্টির ফলে, প্রুশ ফরাসি যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের বারুদের পিপায় বালি এবং কয়লা, ময়দার সিন্দুকে খড় এবং করাতের গুঁড়া, এবং জুতার চামড়ার তলে পেষ্ট বোর্ড বাহির হইয়াছিল।

অতএব ইউরোপের ইতিহাসও বলে না যে, স্বার্থপরতা স্বাতন্ত্রিকতা, ঐহিকতাদি গুণে কাহারও কখন ভাল হইয়াছে। আমাদিগের পক্ষে ঐ সকল ভাবের গ্রহণ রোগীব্যক্তির কুপথ্য সেবনের ন্যায় অতি সাংঘাতিক।

ভারতবর্ষে ঐ সকল ভাবের প্রবেশ রুদ্ধ হওয়াই আবশ্যক। সমাজ যেন তাহা বুঝিয়াই ঐ গুলির প্রবেশ রোধ করিবার নিমিত্ত কাকুতি করিতেছে।

দেশময় আর্য্য সভা, হরিসভা, ধর্ম্মসভা, প্রভৃতির উত্থান হইতেছে—সংস্কৃত শাস্ত্রের সমাদর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে—এবং ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে প্রথম দল যতটা আত্মসমাজ বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা ততটা আপন সমাজের প্রতিকূলতা করিতেছেন না।

কিন্তু প্রতিকূলতা না করুন, তাঁহাদিগের ইংরাজী ভক্তিটা অদ্যাপি অতি বিসদৃশ হইয়াই আছে যাহা ইংরাজীতে নাই তাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা হয় না। আর ইংরাজকৃত নিন্দা এবং ইংরাজকৃত প্রশংসা তাঁহাদিগকে বড়ই অধিক লাগে। এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। মানুষের স্বভাবই এই, যাহা কিছুর নিমিত্ত অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সেটাকে অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজী শিখতে আমাদের অতিশয় পরিশ্রম হয়। সেই ইংরাজী হইতে আর কিছুই পাই নাই, কেবল সামান্য জীবিকা উপার্জ্জনের অতি সামান্য উপায় মাত্র পাইয়াছি, এরূপ মনে করিতে বড়ই ক্লেশ জন্মে। অতএব ইংরাজী হইতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইতেছে আপনাদের উন্নতি-পথ মুক্ত হইতেছে এবং আরও কত কি হইতেছে, এরূপ মনে করিতে না পারিলে হৃদয়ের সন্তাপ ঘুচে না। সেইজন্য আমরা ইংরাজী হইতে অনেক প্রকারের অনেক লাভ করিতেছি, এরূপ মনে করিতে চাই এবং মনে করিতে চাই বলিয়া তাহাই মনে করিয়া থাকি। সুতরাং ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের প্রদত্ত বস্তু সকল পরীক্ষা করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হয় না, তাঁহাদের মেকিগুলিও চালাইতে দেয়।

আলস্য মানুষের স্বভাব সিদ্ধ। ইংরাজী হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত কি অপ্রকৃত তাহার কতকটা মিথ্যা কোন্ ভাগ আমাদের উপযোগী, কোন্ ভাগ অনুপযোগী, এসকল কথা নিপুণ হইয়া বুঝিতে গেলে অনেকটা পরিশ্রম অনেকটা অধ্যয়ন এবং অনেকটা চিন্তার প্রয়োজন হয়। স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে পারিলে বড় উপাদেয় ভোজন হয় বটে কিন্তু স্বপাক খাইবার অবসর, সুবিধা এবং প্রবৃত্তি সকলের হয় না। এই আলস্যের সহিত নৈসর্গিক আশার সংযোগে মনে হয় যে, আমাদিগকে আর কিছুই করিতে

হইবে না, কেবল ইংরাজী হইতে যে সকল ভাব পাইতেছি মনে মনে সেই গুলির সঞ্চয় করিয়া রাখিলেই আমরা ফাঁপিয়া উঠিব এবং কাল স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া উন্নতির ক্রোড়ে উঠিবে। এই মনোভাবটী অনুকৃতির এবং নিশ্চেষ্টতার পোষক। আমরা সেই জন্যই অনুকৃতি পরায়ণ এবং প্রকৃত-পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছি।

কিন্তু নিশ্চেষ্টতা ভাল নয়। উহা মৃত্যুর পূর্ব্বরূপ। অতএব উহা ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক এবং সেইজন্য শুদ্ধ ইংরাজী পুস্তক এবং বাগ্মীদের মুখ হইতে মেকি এবং ভাঙ্গা পাশ্চাত্যভাব না লইয়া ইংরাজ সংস্রবে আমাদের কি হইতেছে, তাহা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া বুঝা আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে ভাল, মন্দ, সত্য, মিথ্যা আসল, মেকি চিনিতে পারা যায় না, এবং চিনিতে না পারিলেও ভাল পাইবার জন্য এবং মন্দ ত্যাগের জন্য চেষ্টা হইতে পারে না।

কিন্তু উল্লিখিতরূপে ইংরাজ সংস্রবের ফল বুঝিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না, ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের ফল কিরূপ (১) হইয়াছে এবং (২) হইবার সম্ভাবনা তাহাও নিবিষ্ট মনে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে

চতুর্থ অধ্যায়।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বণিক্‌ভাব।

ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ভারতবর্ষের পরিমাণফল ১৭ লক্ষ বর্গমাইল, গ্রেট ব্রিটেনের পরিমাণফল ৮৮ হাজার বর্গমাইল মাত্র; ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ২৮৬০ কোটী, গ্রেট ব্রিটনের লোকসংখ্যা ৩৶ কোটির অনধিক; আর ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে উত্তমাশার পথে ১৫ হাজার মাইল ও সুয়েজের পথে ৭ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। এমন ক্ষুদ্র দেশের এত অল্পসংখ্যক লোক এত দূরে এমন অতি বিস্তৃত, সাম্রাজ্য আর কখন অধিকার করিতে পারে নাই।

এইরূপে অতি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্ময়কর বোধ হয়। কিন্তু যদি মনে করা করা যায় যে, এই সাম্রাজ্য সংস্থাপনে ইংলণ্ডকে আপনার সমুদায় বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই—সমুদায় বলের কথা কি ইংলণ্ডের রাজশক্তিও এই সাম্রাজ্য গ্রহণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই—এক সম্প্রদায় ইংরাজ বণিক্ কর্ত্তৃকই একশত বর্ষের মধ্যে এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কোন ফরাসী রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষ অধিকার না করিতেন, তবে এখন ইউরোপীয় রাজা সকলের মধ্যে উহার যে উচ্চ আসন তাহা পাইতেন না—ইংলণ্ড প্রথম শ্রেণীর রাজা না হইয়া পোর্ত্তুগালের স্যায় একটী সামান্য রাজ্য বলিয়াই গণ্য হইতেন। ফরাসী রাজনৈতিকের উক্তটী সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ অধিকার তাহার মহিমার অন্যতম প্রমাণ মাত্র। ইহাতেই ইংলণ্ডের মহিমার পর্য্যবসান হয় নাই। ইংলণ্ডের অপরাপর অধিকারও অতি প্রশস্ত। ইংলণ্ডের অধিকারও কি আমেরিকা খণ্ডে কি আফ্রিকা খণ্ডে কি সামুদ্রিক খণ্ডে, কোন খণ্ডেই কম নয়। ঐ সকল খণ্ডে ইংলণ্ড যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, সে গুলিও প্রত্যেক এক একটী সুবৃহৎ সাম্রাজ্য হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বকালে রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ হইয়াছিল। উহা ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থলভাগের বিংশতিতম অংশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। নব্য রুসীয় রাজ্য পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের সপ্তমাংশ ব্যাপক; কিন্তু ইংরাজ রাজ্য (ভারত লইয়া) সমুদায় স্থলভাগের প্রায় ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া আছে। তদ্ভিন্ন, রোম এবং রুসীয় সাম্রাজ্য উভয়েই মূলতঃ কৃষিসূত্রক এবং একচক্র, অর্থাৎ উহারা কৃষি বিস্তারের প্রয়োজনে সঞ্জাত এবং এক একটী রাজধানীর চতুর্দ্দিকব্যাপী, বিভিন্নাংশে বিচ্ছিন্ন নয়। ইংরাজ সাম্রাজ্য বাণিজ্য সূত্রক এবং বহুচক্র, অর্থাৎ পরস্পর অসংলগ্ন রূপেই অবস্থিত। এক চক্র রাজ্যের সংস্থাপন, পরিবর্দ্ধন, সংরক্ষণ এবং সুপালন বহু-চক্র রাজ্যের পালনাদি

অপেক্ষা সহজ এবং স্বল্প ক্ষমতার ব্যঞ্জক। ইংরাজ শুদ্ধ বৃহত্তর সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াই আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, সেই রাজ্য বহুচক্র হওয়াতে ঐ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্টরূপেই প্রকট করিয়াছেন।*

অতএব ভারতরাজ্যের অধিকারই ইংরাজের ক্ষমতার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ নয়। প্রত্যুত ভারতরাজ্য অধিকারের জন্য ইংরাজকে স্বীয় প্রভূত বলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ভারতরাজ্য যেন স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজকে আপনাকে আপনার সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। বিচক্ষণ ইংরাজেরা ইহা বুঝেন এবং হয় (অধ্যাপক শিলি প্রভৃতির ন্যায়) ইহা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করেন, অথবা (লর্ড লরেন্স প্রভৃতির ন্যায়) ভারত রাজ্য ইংরাজকে জগদীশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলেন; আপনাদের বাহুবলে উপার্জ্জন করিয়াছেন এ কথা (নিতান্ত গোঁয়ার ভিন্ন আর কোন ইংরাজ) বলেন না। বস্তুতঃ নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হয় যে, ভারতবর্ষ আপনাতে পূর্ব্বনিহিত শক্তি সকলের প্রভাবে যে দিকে অভিমুখ হইয়াছিল, ইংরাজ ইহাকে সেই দিকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার কার্য্যটী এত সত্বরে এবং সহজে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসও বলে যে ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বহুপূর্ব্বকাল হইতে ইহার মধ্যে একটী সম্মিলনপ্রবণতাও জন্মিয়া আছে। সেই সম্মিলনপ্রবণতা হইতেই হিন্দু রাজাদিগের প্রতি দিগ্বিজয় দ্বারা রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিবার বিধি, সেই সম্মিলনপ্রবণতা হইতেই শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, যযাতি এবং অশোকাদির সময়ে কতকটা একচ্ছত্রতা সাধন, এবং সেই জন্যই আফগান এবং মোগল সম্রাট্‌দিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ আক্রমণ হইয়াছিল। ইংরাজ কর্ত্তৃক দেশের ঐ সম্মিলনপ্রবণতা সম্যক্ প্রকারেই সিদ্ধ হইয়াছে। দেশটী যেমন এক হইতে চাহিতেছিল, তাহাই হইতে পাইয়াছে।

* প্রথম নেপোলিয়ন বলিতেন কৃষিসূত্রক সাম্রাজ্য বাণিজ্য সূত্রক সাম্রাজ্য অপেক্ষা সহজে সংস্থাপিত এবং স্বতঃই দৃঢ়তর হয়।

দ্বিতীয়তঃ। ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পূর্ণতা জন্মিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রকারেরা ভারত সমাজকে শান্তিপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়ীরূপে একচ্ছত্রতা সংস্থাপিত না হওয়ায় তাঁহাদের মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইংরাজ হইতেই তাঁহাদিগের চেষ্টা সফলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন স্থলেই আর দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজগণ ইংরাজের একান্ত বশীভূত হইয়া পরস্পর বিবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং ক্রমে ক্রমে পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন।

তৃতীয়তঃ। ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি-সংস্থাপিত এবং বর্ত্মাদির বাহুল্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় এবং সম্মিলন জন্মিতেছে। আর্য্যশাস্ত্রকারেরা যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য নানা স্থানে তীর্থের এবং মেলাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরাজকর্ত্তৃক শান্তিস্থাপনে তাহা শতগুণে এবং অতি উৎকৃষ্টরূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ। ইংরাজ-মাহাত্ম্যে ভারতবর্ষের প্রতি অপরাপর বিজিগীষু জাতির আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে। এই মহাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া হূনেরা এবং যবনেরা, উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে খসেরা, কোলেরীয়েরা এবং আহমেরা, পূর্ব্বোপকূলভাগে দ্রাবিড়ীয় নানা জাতি, এবং পশ্চিম উপকূলে শক পারসিকাদি জাতি বহুপূর্ব্বকাল হইতে ইহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার অভ্যন্তরে লব্ধ-প্রবেশ হইয়াছে। ঐ সকল জাতীয়ের সংস্রব আর্য্য শাস্ত্রকৃদ্বর্গের বড়ই উদ্বেগের কারণ ছিল, এবং উহাদিগের দমনার্থ তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজকুলকে সময়ে সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। এখন ইংরাজ সেনা কি উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, কি উত্তর পূর্ব্বভাগে, যেখানে কিছুমাত্র দৌরাত্ম্যের সূত্রপাত হয়, সেইখানেই গিয়া দৌরাত্ম্যকারীদিগকে দমন করিয়া আইসে, এবং ভারতবর্ষের সমস্ত উপকূলভাগে ইংরাজ রণতরী সর্ব্বদাই প্রহরী স্বরূপে ভ্রমণ করিতেছে। কোন দিক্ হইতে কিছুমাত্র শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পারে না।

অতএব ভারতবর্ষ যে দিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবাপন্ন হইতে চাহিতেছিল, ইংরাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই ভাবাপন্ন করিয়াছেন। সেই জন্যই ভারত আপনাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়া আছে।

তদ্ভিন্ন ইংরাজ বণিক্‌বেশেই আসিয়াছিলেন এবং বণিক্‌বেশেই ভারত লাভ করিয়াছেন। বণিক্ অতি সাবধান পুরুষ। তিনি আপনার লাভের দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্ক হইয়া চলিয়া থাকেন। ইংরাজ বড় সাবধানেই চলিয়াছেন। বাস্তবিক, উপনিবেশ সংস্থাপন অথবা দূরদেশে অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে একটী নিয়ম এই যে, ঐ সকল কার্য্যে রাজশক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগে অধিকতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে স্পেনীয় এবং পোর্ত্তুগীজেরা স্ব স্ব দেশের রাজগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমেরিকা খণ্ডে এবং অনেকানেক দ্বীপাবলীতে উপনিবেশাদি স্থাপন করিতে যায়। উহারাও বিলক্ষণ সাহসিক, ক্লেশসহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, বীরপ্রকৃতিক লোক ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মনোমধ্যে কেমন একটা গর্ব্বের ভাব থাকিত, উহারা তাহা গোপন বা দমন করিয়া চলিতে পারিত না। এই জন্য যে যে দেশে যাইত, সেই সেই দেশীয় লোকদিগের সহিত উহাদের বিবাদ হইত। ইংরাজবণিক্ সেই সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ ধীরতা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি যেন আর্য্য পণ্ডিতবর্গের প্রদর্শিত ন্যায্য পথের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন। আর্য্যশাস্ত্র পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে বিধান করেন—

সর্ব্বেষাং তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েত্তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্॥

প্রজাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোক সকলের অভিমতি সংক্ষেপে বুঝিয়া বিজিত রাজার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত (করাদি গ্রহণ বিষয়ে) নিয়ম করিবে।

ইংরাজ সমুদায় ভারতে এই নিয়মে চলিয়াছেন। যে রাজাকে যুদ্ধে পরা-

ভূত করিয়াছেন. তাহারই বংশীয় বা সম্পর্কীয় কাহাকেও প্রথমে তৎ সিংহাসনে বসাইয়াছেন। তবে এইরূপে দুইবার চারিবার করিয়া ক্রমে রাজ্যটীকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্য্যশাস্ত্রের আরও একটী বিধান এই—

প্রমাণানিচ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্মান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধান পুরুষৈঃ সহ।

বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগের প্রচলিত ধর্ম্মাদি প্রমাণ করিবে এবং প্রধান পুরুষদিগের সহিত রত্নাদি প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাজার পূজা করিবে।

ইংরাজ ভারতবর্ষের যে প্রদেশ যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রজাদিগের ধর্ম্মের প্রতি বা আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরাজের প্রথম প্রতিযোগী পোর্ত্তুগীজেরা ওরূপ কথা মুখে আনে নাই, দ্বিতীয় প্রতিযোগী ফরাসিরা যদি কখন কখন মুখে ঐ কথা আনিয়াছিল, তথাপি মধ্যে মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে দুষ্ট হইত।

কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা এতদ্দেশীয় জনগণের কর্ম্মাচারের প্রতি অনেকটা ভক্তি শ্রদ্ধাও খ্যাপন করিয়া চলিতেন। খৃষ্টান মিশনরীরা এতদ্দেশীয় জনগণের ধর্ম্মাচারে নিন্দা করিবেন ভাবিয়া তাহাদিগকে স্থান দেন নাই। অসম্পৃক্ত আগন্তুক ইংরাজদিগকেও রাজ্য মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেন নাই, এবং স্বজাতীয় কাহাকেও এখানকার ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে দেন নাই। প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস কালীঘাটের ৺কালীদেবীর পূজা দিতেন বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা অমূলক নয়। দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে গবর্ণর হইতে কালেক্টর সাহেব পর্য্যন্ত ইংরাজের প্রদত্ত বহুমূল্য রত্নাভরণ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোম্পানির আমলের শেষ পর্য্যন্ত দেশীয়দিগের আচারের প্রতি

ইংরাজের কোন অযথাচরণ হয় নাই। রাজপুতানার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে একটি গোরা পল্টনের ছাউনি ছিল। আবু পর্ব্বত জৈনদিগের একটী তীর্থ স্থান এবং জৈনেরা পশুহিংসাপরাঙ্মুখ। কিন্তু গোরা সৈনিকদিগের গোমাংস ভক্ষণে অত্যন্ত অভ্যাস। তাহারা উহা না পাইলে বড়ই কাতর হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আবু পর্ব্বত হইতে গোরা ফৌজের ছাউনি উঠাইয়া তথায় হিন্দু সিপাহির পল্টন রাখিয়াছিলেন, আপনার জিদ বজায়ের প্রয়াস পান নাই। কাশীধামেও ঐরূপ করা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট আপনার জিদ ছাড়িয়াছিলেন।

ইংরাজ ভারতবাসীর আচারের প্রতিও যেমন ব্যাঘাত করেন নাই, তেমনি এখানকার ব্যবহার শাস্ত্রেরও গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। হিন্দুর সম্বন্ধে হিন্দুর এবং মুসলমানের সম্বন্ধে মুসলমানের ব্যবহার শাস্ত্র চলিবে বলিয়া প্রথমে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইংরাজ আপনাকে সেই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ বলিয়াই মনে করেন।

এ পর্য্যন্ত ইংরাজকৃত যে সকল কার্য্যের উল্লেখ হইল, তাহার কতক-গুলির দ্বারা ভারতবর্ষের চিরাভিলষিত বস্তু সাধিত হইয়াছে, এবং তাহার সাধন প্রণালীও যেন আর্য্য শাস্ত্রের অনুমোদিত পথেই চলিয়াছে। অতএব মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাহার গন্তব্য পথে লইয়া আসিয়াছেন—ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা এবং ধীরতা সহকারে প্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন—ইংরাজ ভারতে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং পারিতেন না— এই জন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বণিক্‌ভাব।

বণিক বীর ইংরাজ শতার্দ্ধবর্ষমধ্যে ভারতবর্ষ দেশে সুবিস্তৃত রাজা-ধিকার স্থাপন করিলেন, তাহা তাঁহার জন্মভূমি ইংলণ্ডের অপেক্ষা চতুর্গুণ

বৃহত্তর, এবং প্রজাসংখ্যায় তাহার আট গুণ অধিকতর হইল। তাঁহার কর্ম্মচারীরাও বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকামাত্র বেতনে নিযুক্ত হইয়া আট দশ বৎসরের মধ্যে, এত প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাইতে লাগিল যে, তাঁহাদের বিভব লোকের বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন ইংলণ্ডে কল-কারখানা এখনকার ন্যায় অত্যধিক হয় নাই—তখন শিল্পের অথবা বাণি-জ্যের কিম্বা কণ্ট্রাক্টের দ্বারা এখনকার ন্যায় অতি প্রভূত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় নাই—এবং তখন ভূসম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের সমূহ বিভব-শালিতা জন্মে নাই। সুতরাং তখন কোম্পানির স্বদেশ প্রতিগত কর্ম্মকরে-রাই ইংলণ্ডের মধ্যে অতি বিভবশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়াতে ইংলণ্ডীয় জনগণের মনে কোম্পানির প্রতি অত্যধিক মৎসরতা জন্মিয়া গেল এবং রাজমন্ত্রীদিগের ইচ্ছা হইল যে ভারতরাজ্যটী কোম্পানির অধিকৃত না থাকিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার অধীন হয়। সেই অবধি ক্রমশঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক্‌ভাব ন্যূন হইতে লাগিল, তাঁহাকে সজাতীয়ের অনুমোদিত রাজভাব ধারণ করিতে হইল, অনন্তর সিপাহী-বিদ্রোহের পরি-সমাপ্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস দখলে আসিল।

ইংরাজের অনুমোদিত রাজ ভাব ভারতবর্ষের চিরপ্রতিষ্ঠিত রাজ ভাব হইতে কয়েকটী বিষয়ে মূলতঃই ভিন্ন। ইংরাজ জানেন যে, রাজ-শক্তি ত্রিধা বিভাজিত। তাহার একটী শক্তি ব্যবস্থা প্রণয়নে নিযুক্ত, দ্বিতীয়টী ধর্ম্মাধিকরণে ন্যস্ত, এবং তৃতীয়টী বিশেষ বিশেষ রক্ষণ কার্য্যে নিবদ্ধ। প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপ্রণয়নের অধিকার রাজার হস্তে ছিল না। তৎ-কালজীবী ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। ব্যবস্থা প্রণয়ন যাহা হইবার তাহা প্রাচীন সংহিতা সকলেই হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল সংহিতানিবদ্ধ বচনের মীমাংসাপূর্ব্বক ধর্ম্মাধিকরণে আপনাদিগের অভিমতি খ্যাপন করিতেন মাত্র। রাজা সেই অভিমতির অনুরূপ কার্য্য করিলে যশোভাগী হইতেন, নচেৎ তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ জন্মিত। ফলতঃ প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের রাজশক্তি ব্যবস্থার প্রণ-

য়নে প্রসারিত ছিল না, ধর্ম্মাধিকরণেও ঐ শক্তি অতি খর্ব্ব হইয়াছিল। তাঁহাদিগের রাজ-নিয়ম একমাত্র রক্ষণ কার্য্যেই একান্ত পর্য্যবসিত ছিল। ইহাকেই ভারতবর্ষীয় শাসন-প্রণালীর শারীরিক ব্যবস্থা বলিয়া ধরা যায়। এইরূপেই এই মহাদেশে সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্যের বিধান চিরস্থায়িরূপে অবধারিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত বিধান হইতেই ইউরোপীয়-রাজনীতিশাস্ত্রে এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশাস্ত্রে একটী প্রকাণ্ড ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় রাজনীতি শাস্ত্র সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্যের বিচার লইয়াই নিরন্তর বিব্রত। রাজার হস্তে কতকটা শক্তি থাকিবে, এবং প্রকৃতি বা প্রধান পুরুষদিগের হস্তে কত থাকিবে, আর প্রজা সাধারণের হস্তেই বা কতটা থাকিবে, ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই সকল ইউরোপীয় রাজনৈতিক শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য যে সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, অর্থাৎ সকল সময়ে সামাজিক-শক্তি-সামঞ্জস্যের নিয়মগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা রাজনৈতিক দিগের পরস্পর মতভেদ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় না—প্রত্যুত তাহার বিপরীত ভাবই অভিব্যক্ত হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশাস্ত্রে শক্তি সামঞ্জস্যের কোন কথাই নাই—ইহাতে কেবল প্রজাপালনার্থ রাজার কর্ত্তব্য ব্যাপারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়া আছে। সেই সকল বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে ভারতবর্ষীয় রাজগণের রাজ্যপালন ব্যাপার ধর্ম্মনীতি হইতে অভিন্নপ্রায় থাকিয়া অতি সুশৃঙ্খলতা সহকারেই নির্ব্বাহিত হইত। ইংরাজরাজের রাজনীতিটী ধর্ম্ম-নীতির সহিত ততটা অবিরুদ্ধভাবে চলিতে পারে নাই। ইংরাজের রাজ-নীতিতে দূরদর্শিতার অবলম্বনে কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে বৈধশাসনের প্রভাবে ধর্ম্মের অধিষ্ঠান ছিল।

ইংরাজরাজের উল্লিখিত ভাব তাঁহার বৈদেশিকতামূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শুদ্ধ বৈদেশিকতাহেতুক নহে। উহা তাঁহার রাজনীতির প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত। বৈদেশিকতা উহার মূল

হইলে, ইংরাজের নিজের দেশেও ঐ দোষ দেখা যাইত না। কিন্তু ইংরাজের নিজের দেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায় সর্ব্বদাই অন্যোন্যের বলহানির জন্য চেষ্টা করে—বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী হইয়া কোন সম্প্রদায়ই রাজনীতির পরিচালনা করিতে পারে না। অতএব একপক্ষে রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া রাখিবার জন্য যে চেষ্টা করিতে হয়, এই ইউরোপীয় নীতি ভারতবাসী জানে না, আর পক্ষান্তরে ইংরাজ রাজ জানেন যে, প্রজাকর্ত্তৃক নিবারিত না হইলে যথেচ্ছ শক্তি প্রসারণে তাঁহার সম্যক্ অধিকার আছে। এইরূপে ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ মধ্যে রাজা প্রজায় একটী গূঢ় মতান্তরতা জন্মিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজ জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ হইতে সম্ভূত তাঁহার রাজস্বনীতিও ভারতবর্ষে রাজার প্রতি প্রজাকুলের সন্দিগ্ধচিত্ততা জন্মিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড দেশ যে শাক্সন জাতীয় জনগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হয়, তাহারা দেশের ভূমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকার করিত। কিন্তু নর্ম্মাণ জাতীয়েরা ইংলণ্ড দেশটিকে অধিকৃত করিয়া দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে বিজেতা রাজার নিব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং রাজার স্থানে প্রাপ্ত হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের সেই নিব্যূঢ় স্বত্বে অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিয়াছিল। ইংলণ্ডে সেই ভাব অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে। ইংরাজেরা ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়াছে ভাবিয়া আপনাকে সমুদায় ভারতভূমিতে স্বত্ববান জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু রাজার ওরূপ নিব্যূঢ় স্বত্বের কথা ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে।

স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগং।"

যে ব্যক্তি বন কাটিয়া আবাদ করে ভূমি তাহারই হয়; যেমন যে শিকারীর অস্ত্র বিধে যে পশুটি থাকে, সে পশু সেই শিকারীরই হয়।

ইংরাজ তাহা বুঝেন না; তিনি বলেন ভারতের ভূমিতে আমারই স্বত্ব। তাঁহার স্বদেশীয় জমিদারীনীতিতে যেরূপ প্রজার খোরাকীমাত্র বাদে সমস্ত উৎপন্নকেই ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধরা হয়, যেন কতকটা সেইরূপ মনে

তিনি ভারতভূমির অধিকাংশ ভাগেই প্রজার সহিত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার ভাগধের, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রদেশ ভিন্ন কোথাও কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমা বদ্ধ রহিল না। প্রজারা ইংরাজের অনুগ্রহ ভোগ করিতে পায়, কিন্তু আপনাদের স্বত্ব দেখিতে পায় না। ইং-রাজরাজ কোথাও দশ বৎসরান্তে, কোথাও বা বর্ষে বর্ষে প্রজাদিগের সহিত রাজস্বের নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক উদ্বেগ জন্মাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্‌ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্‌ভাগো ভবত্যস্যহ্যরক্ষতঃ॥
যোঽরক্ষণবলিমাদত্তে কর' শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ॥
অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্‌ভাগহারিণ'।
তমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমগ্রমলহারকং॥

যে রাজা প্রজার রক্ষা করেন, তিনি প্রজাকৃত ধর্ম্মকার্য্যের ষড়্‌ভাগ পুণ্যভাগী হয়েন; যে রাজা না করেন, তিনি পাপকার্য্যের ষষ্ঠাংশ ফলভাগী হয়েন। যে রাজা প্রজার রক্ষা না করিয়া করাদি গ্রহণ করে, সে রাজা নিরয়গামী হয়। যে রাজা রক্ষা না করিয়া কর গ্রহণ করে, সে সকল লোকের মল গ্রহণ করে।

অতএব ভারতবাসীর শাস্ত্রানুসারে প্রজারক্ষণের ভৃতিস্বরূপই রাজকর। কিন্তু বিজেতা ইংরাজ সে পথে গেলেন না। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত ভূমিতে আমি স্বত্ববান্ হইয়াছি—আমি সেই জন্য করাদান করিব। ইংরাজরাজ এতদ্দেশের ভূমিকরটীকে তাঁহার ভূস্বামিত্ব সম্বন্ধে প্রাপ্য মনে করায়, তাঁহাকে প্রজার জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তজ্জন্য নূতন নূতন করের দাওয়া হইয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারেও তিনি ষ্ট্যাম্পের আইন প্রসারিত করিয়া রাজার অবশ্যকরণীয় নির্ব্বাহের জন্যও একটী স্বতন্ত্র কর লইয়া থাকেন। ইংরাজরাজের ধর্ম্মাধিকরণও অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

ফলতঃ এই সকল এবং অন্যান্য কারণে তিনি প্রজাদিগের চক্ষে শোষক বলিয়াই অবধারিত হইয়াছেন। অতএব ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্য্যে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতা বিস্তারের সীমা একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়া এবং প্রজাব্যূহের জন্মভূমিতে আপনার স্বত্ব আরোপ করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে করাদানের মুখ বিস্তৃত করিয়া ইংরাজ রাজ ভারতবাসীর হৃদয়ে এমন একটী ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, যে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিত এবং প্রজারক্ষণে কৃতকার্য্য হইলেও তাহার ভাবান্তর হইতে পারে নাই। তিনি গৌরবের আস্পদ হইয়া আছেন কিন্তু প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই। ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

"পরাক্রমো বলংবুদ্ধিঃ শৌর্য্যমেতে বরাগুণাঃ।
এভির্হীনোঽন্যগুণযুক্ মহীভুক্ সধনোপি ন॥"

পরাক্রম, বল বুদ্ধি এবং শৌর্য্য এইগুলি অতি শ্রেষ্ঠগুণ। এই সকল গুণশূন্য ব্যক্তি অন্যান্য গুণযুক্ত হইয়া সধন হইলেও ভূমিপতি হইতে পারেন না।

অতএব পুরসিংহ ইংরাজ রাজা হওয়ায় যোগ্যব্যক্তিরই রাজ্যাধিকার হইল মনে করিয়া ভারতবাসী তাঁহার গৌরব করিতেছে। তিনি যে বিদেশী সেজন্য ভারতবাসী তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব সম্পন্ন হয় নাই। কেবল শোষক এবং স্বৈর স্বভাব এবং ভূস্বত্বাপহারক মনে করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া আছে।

ইংরাজ-রাজের প্রজাপালন ভাব কেমন, তাহা সকলেই দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড, তাঁহার শাসনরীতি দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে হঠকারিতা, অন্যায়কারিতা, পক্ষপাতিতাদি দোষ নাই বলিলেও চলে; অথবা যাহা কিছু আছে, তাহা বিশেষ যত্নসহকারেই সমাচ্ছাদিত। ইংরাজের রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রতি বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ নাই, ইহার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি নাই, চৌর্য্য দস্যুতাদির প্রাদুর্ভাব নাই, সমস্তদেশ সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত। ইংরাজের

রাজত্বে বহির্বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তর্বাণিজ্যের সৌকর্য্য বাড়িতেছে, বিচার কার্য্যে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে চলিতেছে, বিষয়জ্ঞতা বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ইউরোপীয় দিগের অনুমোদিত লেখা পড়ার প্রচার হওয়ায় দেশীয়দিগের কোন কোন বিষয়ে চক্ষু ফুটিতেছে—ফলকথা. ইংরাজের রাজত্ব একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার; অপরাপর জাতির বৈদেশিক শাসনের সহিত তুলনা করিয়া না বুঝিলে ইহার উৎকর্ষ যথোচিত রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

রোমীয়েরা পূর্ব্বকালে অতি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন এবং পালন করিয়াছিল। ইংরাজের ভারত শাসন রীতি কতকটা তাহাদিগের প্রদেশ শাসনরীতির সদৃশ, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুরূপ নয়। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশের শাসনকার্য্যে তত্তদ্দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করিত না। ইংরাজেরাও তাহা করেন না বলা যায়। কিন্তু রোমীয়েরা এক প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রদেশান্তরে প্রেরণ করিত, ইংরাজেরা তাহা না করিয়া ভারতবর্ষে সংগৃহীত সৈন্যদ্বারাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতেছেন। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশগুলি হইতে কর সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিত। ইংরাজেরাও ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু সেই টাকা কর বলিয়া প্রেরিত হয় না। রোমীয়েরা প্রদেশ শাসনের ভার স্বজাতীয় এক এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিত, ইংরাজেরাও ভারতরাজ্য শাসনের ভার সজাতীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তে রাখেন। রোমীয়েরা প্রদেশ শাস্তৃগণকে আপনাদিগের সেনেট সভার নিকট দায়ী করিয়া রাখিয়াছিল, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরেল এবং গবর্ণরদিগকে আপনাদের পার্লিয়ামেন্টের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। রোমীয়েরা আপনাদের লাটিন ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদেশগুলিতে বিদ্যালয় খুলিত. ইংরাজেরাও ভারতবর্ষে ইংরাজী শিখাইবার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু রোমীয়েরা বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত ভাষা শিখাইবার দিকে মন দিত না, ইংরাজেরা তাহাও দেন। রোমীয়েরা যে প্রদেশ জয় করিত, সে প্রদে-

শের পূজিত দেবতাদিগকে আপনাদিগের দেবতা শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইত। একেশ্বরবাদী ইংরাজেরা তাহা করেন না বটে, কিন্তু ভারতবাসী-দিগের ধর্ম্মপ্রণালী বিনষ্ট করিবার জন্যও কোন সাক্ষাৎ চেষ্টা করেন না। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশ সকলে আপনাদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রচালিত করিত, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সকলের প্রণয়ন করেন, তবে সেই ব্যবস্থাগুলি তাঁহাদের স্বদেশ প্রচলিত ব্যবস্থারই অনুরূপ হইয়া থাকে।

ফলকথা, ইংরাজের ভারত শাসন রোমীয়দিগের প্রদেশ শাসন প্রণালীর সহিত যত মিলে, অপর কোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাসনের সহিত তত মিলে না। মুসলমান এবং স্পেনীয় এবং পোর্ত্তুগীজদিগের বিদেশ শাস-নের ত কথাই নাই—তাহারা অধিকৃতদেশবাসীদিগের ধর্ম্ম প্রণালীর উচ্ছেদ চেষ্টা করিত। ওলন্দাজদিগের যবদ্বীপ শাসন এবং রুসীয়দিগের মধ্য এসিয়া শাসন আর ফরাসীয়দিগের আলজিরিয়া এবং টুনিস শাসনও ইংরাজের ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশে ভিন্নরূপ।

ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ সৈন্য-শ্রেণীসম্ভুক্ত করেন, তাঁহারা কালা ফৌজে এবং গোরা ফৌজে মিলা-ইয়া পল্টন বাঁধেন—উহাদিগের মধ্যে অধিক ইতরবিশেষ করেন না। ওলন্দাজেরা আদিম অধিবাসীদিগকে কতকটা উন্নত পদও দিয়া থাকেন। কিন্তু ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অনেক কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক অহিফেণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি, দারুচিনি প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্য দ্রব্যে সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কঠিনতর বেগার খাটাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আছে।

রুসীয়েরা মধ্য-এসিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিয়া সমস্ত দেশটাকে সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত করিয়াছে। কিন্তু রুসীয়েরা দেশটিকে বিবিধ প্রকার করভারে আক্রান্ত করিয়াছে স্বজাতীয় রাজকর্ম্ম-

চারী এবং বণিক্‌গণকে পাদে পাদে উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়াছে, এবং স্বজাতীয় জনগণের সুবিধার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া দেশীয় ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছে। রুসীয়েরা যেমন তুর্কিস্থানের পশ্চিম ভাগটী বহুশত বর্ষ অধিকার করিয়াও তথাকার লোক সকলকে আপনাদিগের প্রতি ভক্তিমান করিতে পারে নাই, নবাধিকৃত পূর্ব্বাঞ্চলেও যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আলজিরিয়া প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে তত্তৎ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের স্ব স্ব জাতীয় ভাব একেবারেই বিলুপ্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে, প্রদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বতোভাবে ফরাসি ব্যবস্থা-শাস্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রকৃত ফরাসি হইতে অভিন্ন জ্ঞান করা যাইবে—নচেৎ প্রকৃত ফরাসির সমস্ত অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।

ইংরাজদিগের ঔপনিবেশিক নিয়মে শাসিত কয়েকটী স্থানে ইংরাজী ব্যবস্থার প্রসারণ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিকে ইংরাজের প্রকৃত অধিকার প্রদত্ত হইবার কথা উঠে নাই। সিংহলদ্বীপে ষ্ট্রেট্‌স্ সেটলমেণ্ট, মরিস্তসে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে, ইংরাজ সমধিক পরিমাণেই আপনার ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রচালিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সে প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। ভারতবাসীর জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেই ইংরাজ-রাজের অভিমতি আছে বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও লর্ড ডফরিণ সাহেব সে দিন লণ্ডনের ভোজে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে—ভারতবাসীর ইংরাজ রাজের প্রতি অনুরাগটী যতটা বিচার-মূলক, ততটা ভক্তিমূলক নহে। ভারতবাসী সাধারণতঃ অতি মৃদুস্বভাব, ভক্তি পরায়ণ এবং রাজানুরক্ত। ভারতবাসীর রাজ বংশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, রাজ্ঞীপুত্রাদিগের সমাগম সময়ে এবং মহারাজ্ঞীর জুবিলি মহোৎসবে সম্যক্ প্রতিপন্ন গিয়া গিয়াছে। অতএব কি জন্য সে,

ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হয় না, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন। লর্ড ডফরিণ তাঁহার উল্লিখিত বক্তৃতায় কতকগুলি অতি সামান্য বাহ্য কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন —যথা, ভারতবাসীরা আপনাদিগের স্ত্রী পরিজনকে ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দেয় না; ভারতবাসীরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ভাষাভাষী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথা অতি অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল কারণে এতটা অনুরাগশূন্যতা জন্মিতে পারে না। মুসলমান অধিকারের সময়েও ঐ সকল কারণ বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ একত্র পান ভোজন এবং স্ত্রী পরিজন প্রদর্শন ছিল না—আর ভিন্নভাষিতা এবং ভিন্নদেশিকতাও প্রায় এক্ষণকার ন্যায় ছিল। কিন্তু মুসলমানের সহিত হিন্দুর যতটা হইয়াছিল, ইংরাজের সহিত কি ততটা মিল হইয়াছে? আজি কালি কোন কোন বাঙ্গালী আপনাদিগের স্ত্রী পরিজনের সহিত ইংরাজদিগের দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া থাকেন—তাঁহাদিগের সহিত কি ইংরাজের সহানুভূতি জন্মিয়াছে?

ঐ সকল অকিঞ্চিৎকর কারণের আরোপ করায় প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান হয় না এবং সেই জন্য ইংরাজ রাজত্বের অভ্যন্তরে যে মৌলিক দোষ থাকায় প্রজারঞ্জনের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহার যথাযথ সংশোধন চেষ্টাও হয় না। ইংরাজ স্বদেশে সামাজিক শক্তির সামঞ্জস্য বিধানে যেরূপে অভ্যস্ত সেই অভ্যাসানুযায়ী হইয়া এ দেশেও রাজশক্তি প্রসারণের সীমা প্রজার প্রতিরোধ সাপেক্ষ এই রূপ মনে করিয়া চলেন। কিন্তু ভারতবাসীর অভ্যাস সেরূপ নয়। এখানকার প্রজা কোন রূপে রাজার প্রতিরোধ করিতে আছে মনে করে না। তাঁহার অসংযত শক্তি প্রসারণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হয় মাত্র। ইংরাজ প্রায় শতবর্ষাবধি পৃথিবীতে অতুল্য বিক্রমশালী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আত্মনির্ভর এবং আত্মগৌরব অপরিসীম হইয়াছে। তিনি আর আপনার দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত অথবা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তিনি তন্ত্রের অজ্ঞতা, অবিশুদ্ধতা,

অক্ষমতা প্রভৃতি দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবাসী আমাকে তেমন ভাল বাসে না, অতএব আমাতে কোন দোষ আছে, এরূপ ভাব ইংরাজের মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ভারতবাসী যে আমাকে তত ভাল বাসে না, তাহা ভারতবাসীরই দোষ—এই ভাবই ইংরাজের মনে বদ্ধমূল। যদি কোন কারণে এই ভাবের অন্যথা না হয়, তাহা হইলে ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজারঞ্জন চেষ্টা করিতে পারিবেন না, তিনি কেবল আপনার ক্ষমতা এবং বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই একান্ত মনা হইয়া থাকিবেন।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বৈদেশিক ভাব।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েলেসলী সাহেব কোন সময়ে লিখিয়াছিলেন—"আমি ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের ফাঁসি-কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হওয়া শ্রেয়োজ্ঞান করি।" কথাটী অতি শয়োক্তি অলঙ্কারে অতিরঞ্জিত হইলেও উহা স্থূলতঃ ইংরাজের স্বদেশানুরাগ এবং বিদেশবিরাগের বাঞ্জক। বস্তুতঃ ইংরাজ ইংলণ্ডকেই মনের সহিত ভাল বাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করেন।

পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, অপর সকল জাতি অপেক্ষায় ইংরাজ উপনিবেশ সংস্থাপনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর কোন জাতি তাঁহার ন্যায় বিদেশ অধিকার করিয়া তথায় বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই। ফ্রান্স বল, স্পেন বল, পোর্ত্তুগাল বল, হলণ্ড বল, আর রুসিয়াই বল, কাহারই বৈদেশিক অধিকার ইংলণ্ডের ন্যায় অতি বিস্তৃত, সুদৃঢ় এবং সুসমৃদ্ধ নহে।

অতএব নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিলে ইংরাজের প্রকৃতিতে দুইটী বিভিন্নভাব

দেখিতে পাওয়া যায়—এক, তিনি বিদেশ ভাল বাসেন না—অপর তিনি বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইতে পারেন। এই বিরুদ্ধ ভাব দুইটির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে প্রতীত হয় যে, ইংরাজ বিদেশ বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা। যদি কোন বিদেশে তাঁহার সম্যক্ অধিকারের পথ থাকে, অর্থাৎ যদি সেই বিদেশে স্বজাতীয় লোক ভিন্ন অপর কাহার আধিপত্য বা আধিকা না থাকে, যদি সেখানে তিনি আপনার আইন এবং ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালী চালাইতে পারেন, যদি সেই স্থানটিকে সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের অনুরূপ করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরাজ সেই বিদেশে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, নচেৎ বিদেশ প্রবাসে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্টানুভব হয়—তিনি বিদেশের রাজাসন অপেক্ষা স্বদেশের ফাঁসি কাষ্ঠও ভাল মনে করিতে পারেন।

এই জন্য ইংরাজ কর্ত্তৃক যে যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধন হইয়াছে, সর্ব্বত্রই ইংরাজী ভাষার এবং ইংরাজী ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রই ইংলণ্ডের অনুষ্ঠান সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অপরাপর লোকেও সেই দেশে বাস করিতে গিয়া ইংরাজের সংস্রবে বিলুপ্ত-জাতীয়ভাব হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ কখন কাহার সহিত মিশেন না—অন্যান্য লোককেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। অন্যের সহিত ইংরাজের মিশ্রণও অধিক পরিমাণে হয় না। অপরাপর ইউরোপীয় লোকের সহিত অল্প মাত্রায় হয়, ইউরোপীয়েতর লোকের সহিত প্রায়ই হয় না।

আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড প্রদেশ গুলিই ইংরাজ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে অধ্যুষিত হয়। ঐ স্থানে অপরাপর ইউরোপীয় লোকও গিয়া বাস করিয়াছে। কিন্তু ওখানকার ভাষা ব্যবস্থা, রীতি, নীতি সমুদায়ই ইংরাজী হইয়া গিয়াছে। ওখানকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ন জাতিও নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে। স্পেনীয়েরা, পর্ত্তুগিজেরা, ইটালীয়েরা এবং কিয়ৎ পরিমাণে ফরাসীরাও অপর জাতীয়দিগের সহিত যতটা মিশিতে পারে, ইংরাজেরা,

বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ন্যায় টিউটন্ বর্ণ সম্ভূক্ত কোন জাতিই, অন্যের সংস্রব সহিতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকায় বিভিন্ন প্রদেশে স্পেনীয়েরা এবং পর্ত্তুগিজেরা তত্তৎ প্রদেশীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত এতদূর মিলিয়া গিয়াছে যে. * মেক্সিকো, পেরু, বোলিভিয়া এবং ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে গড়ে একতৃতীয়াংশ লোক মিশ্রজাতীয় হইয়াছে। এবং কোথাও কোথাও প্রায় অর্দ্ধাংশ লোক অবিমিশ্র আদিম অধিবাসী-দিগেব বংশোদ্ভব। ঐ মিশ্রজাতীয়দিগের মধ্যে অনেক লোক বিশেষ গুণ শালী ক্ষমতা-শালী এবং সমাজমধ্যে মান্য গণ্যও হইয়াছে—এমন কি, মেক্সিকো সাম্রাজ্য সভার সভাপতি 'জুয়ারেজ' ঐ মিশ্রজাতীয় পুরুষ। উত্তর কানেডা প্রদেশ ফরাসিদিগের অধ্যুষিত। ওখানকার আদিম অধিবাসী অনেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—তথাপি ওখানকার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে মিশ্রজাতীয়েরা লোক-সমষ্টির দশমাংশের ন্যূন নহে—এবং লুরি নামক যে ব্যক্তি কানেডা প্রদেশে রাজনীতির বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করায়, কতকটা রক্তারক্তি কাণ্ডের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট অত্যাদার ঔপ-নিবেশিক শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, সেই 'লুরি' মিশ্র জাতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইংরাজের উপনিবেশক্ষেত্র সকল দেখ, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে আদিম অধিবাসীদিগের সমূলোৎসাদন হইয়া গিয়াছে। ইউনাইটেড রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা কোথায়? ঐ মহাদেশ নিবাসী বিবিধ ইণ্ডিয়ান জাতীয় লোকের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদিগের অধিকারভুক্ত ভূমিতে এক্ষণে ৫৮ হাজার মাত্র অবশিষ্ট আছে। যে সকল ভাগে শ্বেত-পুরুষদিগের বসবাস হয় নাই, তথায় আনুমানিক ২॥ লক্ষ ইণ্ডিয়ান এখনও মৃগয়াদি দ্বারা

---

* মেক্সিকোতে	মিশ্রজাতীয় শতকরা	৪৩	আদিম	৩৮
পেরু	"	২৩	"	৫৭
বুলিভিয়া	"	২৫	"	৫০
ব্রেজিল	"	৩৫,	"	ও নিগ্রো ৩০।

জীবন ধারণ করিতেছে। তাহাদিগের জন্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহারা সেই ভূমিখণ্ডের বাহিরে যাইতে পারে না, এবং প্রতি আদম স্থমারিতেই তাহাদিগের সংখ্যা কমিতেছে, দেখা যায়। ফলতঃ ইউনাইটেড প্রদেশের আদিম অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৪ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে কেপকলনি প্রদেশে ওলন্দাজেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ স্থান ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলে উহার দশা এখনও ইউনাইটেড দেশের ন্যায় হয় নাই। ওখানে কাফ্রি জাতীয় লোকের সংখ্যা আজিও ইউরোপীয়দিগের তিন গুণ। কিন্তু তাহাদের কোন উন্নতি নাই, প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্যে ও মজুরিতে নিযুক্ত, সংখ্যা বৃদ্ধিও কম। নিউজিলণ্ড দ্বীপে মেয়োরি নামে একটী জাতি আছে। ইহারা আমেরিকার ইণ্ডিয়নদিগের ন্যায় নিতান্ত বন্যদশাপন্ন নহে; আফ্রিকার হটেণ্টটদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অক্ষম নহে। মেয়োরিদিগের ভাষায় সাহিত্য গণিতাদির গ্রন্থ আছে, মেয়োরিদিগের হৃদয়ে যথেষ্ট সাহস এবং আত্ম-গৌরব আছে। কিন্তু ইংরাজ তাহাদিগের দেশে বাস করিতে গেলেন, আর তাহারা নিঃশেষিত প্রায় হইল। ১৮৮১ অব্দের আদমসুমারীতে ৪৪ হাজার মেয়োরি পাওয়া গিয়াছিল। ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারীতে উহাদের সংখ্যা ৪১ হাজার মাত্র। এখন নিউজিলাণ্ডে মেয়োরির সংখ্যা শতকরা ৬টীমাত্র। ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ২০০ জন মাত্র তদ্দেশবাসী মেয়োরি জাতীয় কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল পত্নীদিগের গর্ভজাত সন্তানদিগকে আপনাদিগের সমাজে গ্রহণ করেন নাই, তাহারাও মেয়োরি হইয়া আছে। অষ্ট্রেলিয়া খণ্ডের উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। ওখানকার আদিম অধিবাসীরা বেড়া আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, চতুদ্দিক হইতে যেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের অন্তর্ভাগে প্রসারিত হইতেছে, অমনি আদিম অধিবাসীরা ফুরাইয়া যাইতেছে। একজন ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয়ের ঘ্রাণমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্র প্রাণ মনুষ্যেরা একেবারে শুকাইতে আরম্ভ করে"। অন্যান্য সকল ইউরোপীয়ের অপেক্ষা ইংরাজের প্রাণ অধিকতর তীব্র. তাহার সন্দেহ নাই।

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ইংরাজ অপর জাতীয় লোকের সহিত মিশেন না—এটী একটী সিদ্ধান্ত কথা। কোম্‌টী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে তাঁহার স্বদেশীয় ফরাসিরাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার মতানুগামী হইয়া "নরদেব" পূজায় প্রবৃত্ত হইবে, এবং সমস্ত নরজাতির প্রতি ভক্তি ও প্রীতিসমন্বিত হইবে। ইটালীয়েরা উহাদিগের পরে এবং স্পেনীয় ও পোর্ত্তুগিজেরা তাহার পরে তৎপথাবলম্বী হইবে, ইংরাজেরা তাহাদিগেরও পরে নরজাতি সাধারণের প্রতি প্রেমিক হইয়া উঠিবে। কোম্‌টি যেরূপেই বুঝিয়া ঐ কথা বলুন, (তিনি প্রথম পুস্তক প্রচারে জর্ম্মণদিগকেও ইংরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছিলেন,) ইংরাজের নরজাতি প্রেম যে অনেক দূরবর্ত্তী ব্যাপার, অতি স্থূল স্থূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

কিন্তু ইংরাজাধিকৃত দেশ সকলে তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের নিঃশেষতা এবং অপর জাতির সহিত মিশ্রণের অল্পতা দেখিয়া ইংরাজকে অধিক পরিমাণে নৃশংস মনে করায় ভ্রম হয়। বস্তুতঃ অপরাপর ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজকেই স্বল্প নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্পেনীয়েরা মেক্সিকো এবং পেরুতে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপাবলীতে যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, পোর্ত্তুগিজেরা ব্রেজিলে এবং কিয়ৎকাল ভারতবর্ষে যেরূপ পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছে, এবং ফরাসিরাও কানেডা এবং আলজিয়রে এবং আনামে যেরূপ খামখেয়ালি খেলিয়াছে, ইংরাজ তাঁহার অধ্যুষিত কোন দেশেই সে পরিমাণ নৈষ্ঠুর্য্য, অত্যাচার এবং অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রদর্শন করেন নাই—অথচ তাঁহার অধিকারেই আদিম নিবাসীর সমধিক পরিমাণে বিলোপ হয়। ইংরাজের আওতাই বড় আওতা।

এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলেই ইংরাজের বৈদেশিক বিদ্বেষের বিশিষ্টতা অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে। অপরাপর ইউরোপীয় জাতির যে বৈদেশিক বিদ্বেষ তাহারও অভ্যন্তরে যেন ঘৃণার কতকটা ন্যূনতা আছে—যেন অপর জাতির প্রতি কতকটা মনুষ্যবুদ্ধি আছে। স্পেনীয় কিম্বা

ফরাসি অথবা অন্য লাটিন জাতীয় কাথলিক খৃষ্টান যেন অপর জাতীয় লোককে বলেন—"তোরা কেন আমাদের মত হইবি না, আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর, আমাদের পরিচ্ছদ পর, আমাদের ন্যায় খাওয়া দাওয়া কর আমাদের মত হইবি।" ইংরাজের ভাব ওরূপ নহে। তাঁহার ভাব—"তুমি ইংরাজ নহ! তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"

আমরা হিন্দুজাতীয়। আমরাও ঐ ভাব বুঝিতে পারি; আমরাও জানি যে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না— ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিয়া জাত্যন্তর হইতে পারে না। আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষ গুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক তেমন হইতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এবং ইংরাজের উল্লিখিতভাবে পার্থক্য আছে। হিন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত বিষয় লইয়া। ইংরাজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ত্ত বিষয় লইয়া। হিন্দুর আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে না। ইংরাজের আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া দেয়। ভিন্ন জাতির প্রতি ইংরাজের বিদ্বেষ কিরূপ প্রখর তাহা ইংরাজ সন্তান মার্কিনদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি চলিত কথার ভাব বুঝিলেই সুস্পষ্ট হয়। মার্কিনেরা বলে যে, তাহাদের দেশে যত আইরিশ আছে, তাহারা প্রত্যেকে যদি এক একটী নিগ্রোকে খুন করিয়া ফাঁসী যায়, তাহা হইলেই মার্কিন দেশের আপদ বালাই মিটে। আমাদিগের মধ্যে বর্ণ ভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, লোকে এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক-দেশবাসী এবং এক ভাষা ভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পানভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্যোন্যের শরীর-স্পর্শে অনুরাগী না হইয়া এক সমাজ সম্বদ্ধ, এক মতানুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে। সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে ভিন্ন জাতীয়

লোকের প্রতি তেমন তীব্র বিদ্বেষভাব জন্মিতে পারে না। অপর সকলের অপেক্ষা বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা হইয়াও ইংরাজ বর্ণভেদ মানেন না—সুতরাং তাঁহাকে সামাজিক পার্থক্যগুলি অতি যত্নপূর্ব্বকই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এই নিমিত্ত তিনি আপনার জাতীয় গৌরব বজায় রাখিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য তাঁহার পার্থক্য বুদ্ধিটী নিরন্তর ঘর্ষণে অধিকতর তীক্ষ্ণ ধার হইয়া থাকে।

উপনিবেশ স্থাপনের কথায় হিন্দুজাতির উল্লেখ করিবার একমাত্র প্রয়োজন ইংরাজের প্রকৃতিতে এবং হিন্দুর প্রকৃতিতে বৈদেশিক বিদ্বেষসম্বন্ধে যে প্রকার বিভেদ আছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা। নচেৎ আমরা কোথাও উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে যাই না—এবং কোন বিদেশীয়ের উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি কোমলই হউক বা কঠোরই হউক, কোন্ প্রকার ব্যবহারে নিযুক্ত হই না। তবে আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি যে ভিন্ন জাতীয়ের সহিত মিশ্রণ নিরোধ করে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে বিদেশপ্রেরিত 'কুলি'দিগের ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেকানেক শ্রমজীবি-লোক ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির অধিকৃত দেশে নীত হয়। কিন্তু তাহারা শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ লইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে চায়—বিদেশে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। অতএব দেখা গেল যে, হিন্দু বৈদেশিকের সহিত মিশ্রণে অনিচ্ছু এবং ইংরাজ বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা। ভারতবর্ষে এমন দুইটী জাতির একত্র সমাবেশ হওয়ায় ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হয়।

ভারতবর্ষে ভারতসন্তানের আধিপত্য নাই—কিন্তু আধিক্য আছে। এখানকার লোকসংখ্যা ইংরাজাধিকৃত অংশে প্রতি বর্গমাইলে ২২৯। সুতরাং এ দেশে লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছে। এখানে ইংরাজ আপনার উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, ভাষা এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে; এবং ভারত-সন্তান সেই ধর্ম্ম, ভাষা এবং ব্যবস্থার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান—সেই সকলের প্রভাবেই তাঁহার

মন এবং হৃদয় গঠিত। সুতরাং এখানে ইংরাজের ধর্ম্মাদিও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না! ভারত-সন্তানদিগের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতিরও অনেক ভাগ ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারাদি হইতে ভিন্নরূপ। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের মনে যাহাই হউক, সাধারণতঃ ইংরাজের মনে ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃত মমতা এবং ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি একান্ত অসাধ্য; ইংরাজ ভারতবর্ষের সিংহাসন অপেক্ষাও স্বদেশের ফাঁসিকাঠ ভালবাসিবেন।

কিন্তু তেমন মমতা এবং সহানুভূতি না থাকিলেও ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছেন। ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকৃত হওয়ায় ইংরাজের ধন গৌরব এবং প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার স্বদেশ হইয়া যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকৃত দেশ থাকিয়া তাঁহার লাভ-বৃদ্ধি যশোবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতবর্ষের জন্য তিনি কোন ক্ষতি স্বীকার করিতেই পারেন না—প্রত্যুত ভারতবর্ষের ধনে লাভভাগী হইতে তাঁহার পূর্ণ দাওয়া আছে। কিন্তু ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানেন যে, ন্যায়পথে এবং ধর্ম্মপথে না চলিলে কখন কোন রাজার অধিকার চিরস্থায়ী হয় না—প্রজা বিরূপ হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যে ভারতবর্ষে ন্যায়পথে এবং ধর্ম্ম পথেই চলিতেছেন, সকলকে এইরূপ বুঝাইতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া আছেন। তিনি স্পষ্ট কথাতেই বার বার বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর উন্নতিসাধন করাই আমার রাজ্যপালনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। এ প্রকার অত্যুচ্চ উদার ভাব ব্যক্ত করিয়া বলা যে, ধর্ম্মরক্ষার অনুকূল তাহা নিঃসন্দেহ। ইংরাজ যত দিন ঐ কথা মুখেও বলিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহার প্রজাপালন নিন্দনীয় হইতে পারিবে না ভারতবাসীর সহিত তাঁহার সহানুভূতি শূন্যতার সমস্ত অশুভ ফল ফলিবে না, এবং অন্তর্বাহ্য উভয়তঃ না হউক, বাহ্যতঃ ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতে থাকিবে।

অল্পদিন গত হইল একজন জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া এখানকার ইংরাজ শাসনের সমূহ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরাজের ভারত শাসনে বৈদেশিক ভাব নাই। সেই গুণ কীর্ত্তনের একটী

গূঢ় হেতু আছে। আজি কালি জর্ম্মণেরা ইউরোপ খণ্ডের বহির্ভাগে আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি এবং উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহারা উদ্ধত এবং গর্ব্বিত আচরণের দোষে কোথাও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজের ব্যবহার তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অনুকরণীয়, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ জর্ম্মণ পণ্ডিত এখানকার শাসনকার্য্যে ইংরাজ স্বদেশের এবং স্বজাতীয়ের লাভের প্রতি দৃষ্টি করেন না, এই কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছেন তাহার সহিত তুলনায় ইংরাজের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য অল্প এবং ন্যায়ানুগামিতা অধিক।

ইংরাজ বণিক্‌বেশে রাজ্যগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বণিক প্রকৃতিসুলভ নম্রতা এবং সতর্কতাগুণে সকল বিষয়েই একান্ত ন্যায়পর হইয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং অনেক স্থলেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছেন। বৈদেশিকবিদ্বেষ যদিও ইংরাজের স্বভাবগত, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা এবং আত্মসংযম এত অধিক যে, ঐ স্বভাবের সমগ্র অশুভফল কোথাও ফলিতে পায় নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষেই ঐ বৈদেশিকতার অশুভময় ফল স্বল্প পরিমাণে ফলিয়াছে। মানুষ জ্ঞানের দ্বারা সংস্কার এবং স্বভাবের দোষও অনেক কমাইতে পারেন। ইংরাজ ভারতবর্ষে তাহা কমাইয়া চলিয়াছেন। তথাপি তাঁহার রাজকার্য্যে যে বৈদেশিক ভাবের দোষ স্পর্শ হয় নাই, একথা বলা যায় না। কয়েকটি স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর উন্নতি সাধনার্থ হইবে—এই মূল সূত্রের এক্ষণে একটু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শাসনসূত্র হইয়াছে—ইংলণ্ডের শুভোৎপাদনের কোন ব্যাঘাত না করিয়া যতদূর ভারতবাসীর শুভ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা যাইবে। অবশ্য এই কথার সহিত বলা হয় যে যাহাতে ইংলণ্ডের ভাল, ভারতেরও তাহাতেই ভাল। কিন্তু যদি সত্য সত্য সকল বিষয়েই তাহা হইত, তবে শাসনসূত্রটীর পরিবর্ত্তের প্রয়োজন হইত না।

(২) আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান। এই কথাটীও অক্ষুণ্ণ নাই।

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও শ্বেতকায়দিগের পক্ষে যে আইন ও আদালত কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্ন রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) প্রজাদিগের ব্যবহার শাস্ত্র বজায় থাকিবে। অধিকাংশই বজায় আছে, সত্য। কিন্তু ঐ শাস্ত্রের যেখানে যেখানে ফাঁক পাওয়া যাইতেছে সর্ব্বস্থলেই অসঙ্কুচিতভাবে ইংরাজী ব্যবস্থা সূত্রের প্রবেশ হইতেছে।

(৪) বিচার কার্য্য—আইন অনুসারে হইবে। কিন্তু বিচারের প্রণালী ইংলণ্ডের অনুরূপ অতি জটিল হইতেছে। আর এদেশে অতি কঠিন দণ্ড-দানেই ইংরাজ বিচারকদিগের প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

(৫) প্রজার স্থানে করাদান সম্পূর্ণরূপে নিয়ম নিবদ্ধ। আদান প্রণালীতে যথেচ্ছাচার নাই, কিন্তু কর নিয়োগে যাহাতে স্বজাতীয়ের উপর উহার ভার অধিক না পড়ে, তজ্জন্য ইংরাজ-রাজকে যেন সতর্ক হইতে হইতেছে।

(৬) শুল্ক বা বাণিজ্যকর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে, যাহাতে ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৭) স্বায়ত্ত শাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত।

(৮) সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, কিছুই দেশীয় ধরণের হয় না।

(৯) ভারতবাসীর ধর্ম্ম্যকীর্ত্তিতে হস্তার্পণ হয় নাই। কিন্তু রক্ষণ অভাবে সমুদায় বিধ্বংসে সমর্পিত হইয়াছে।

(১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ রাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থ রাখিতেছেন।

এইরূপে যে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইবে সর্ব্বত্রেই কতকটা ন্যায়ানুগামিতা সত্ত্বেও প্রজার প্রতি সহানুভূতি না থাকিবার অশুভ লক্ষণ একটী না একটী দেখা যাইবে। যাহা কিছুর সংস্কার, প্রতীকার বা সৎকার করিতে

হইবে, ইংরাজ তাহার একমাত্র উপায় দেখিতে পান, তাঁহার স্বজাতীয় লোকের নিয়োগ অথবা তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্তুতঃ ইংরাজের বৈদেশিক ভাব হইতেই এরূপ হইতেছে—এবং সে ভাব তিনি অধিকতর সূক্ষ্মদর্শন-দ্বারা স্বয়ং সঙ্কুচিত করিতে না পারিলে তাঁহার বলবৃদ্ধির সহিত নিয়ত বর্দ্ধন-শীল হইয়া চলিবারই সম্ভাবনা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভবিষ্যবিচার—সাধারণ কথা।

মানসদৃষ্টি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি নিয়ত এবং স্থিরতররূপে সম্বদ্ধ রাখিলে অনুরাগ বিরাগ, আসক্তি, বিদ্বেষ প্রসাদ এবং গ্লানি প্রভৃতি ভাবের ন্যূনতা হইয়া প্রকৃত তথ্যোপলব্ধির পথ পরিষ্কৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর বিচারে মনের ঐ প্রকার ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া চলা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। ঐ সকল ঘটনার সহিত আপনাদের সুখ দুঃখের এত ঘনিষ্ঠ সং-স্রব, উহারা বাল্য সংস্কার রূপে মনের এমন সারভূত হইয়া থাকে, এবং উহাদিগের সহিত ঔচিত্যানৌচিত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং যোগ্যাযোগ্য প্রভৃতি বোধ সকল এমন সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত হইয়া যায় যে, বোধ হয়, কোন ব্যক্তিই একান্ত পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া সমাজতত্ত্বের বিচারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

আমি ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমার অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কার্য্য কারণ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজের বণিক্ ভাবে রাজ্য লাভ, তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী রাজভাব, এবং তাঁহার জ্ঞান ও পরিণামদর্শনমূলক ন্যায়পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিক ভাব প্রদর্শন করি-য়াছি, এবং তৎসহ এ কথাও বলিয়াছি যে, এদেশে ইংরাজের বদ্ধমূলতার

সহিত তাঁহার বলবুদ্ধির অভিলাষ বর্দ্ধিত হইবার এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সমানুভূতির ন্যূনতা ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঐ কথা বলাতে ভবিষ্যবিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের সূচনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক, ভবিষ্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া মানুষ আপনার গন্তব্য পথে পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। লোকে ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান বলে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্য বলে না। অর্থাৎ কালের পৌর্ব্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অতীতের পর ভাবী, এবং সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান কালের উল্লেখ করে। এরূপ করিবার অপর কারণ যাহাই হউক, একটী কারণ এই হইতে পারে যে ভূত বিষয় গুলির বিচার করিয়াই ভাবী ব্যাপারের অনুভব হয়, এবং সেই অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়।

যিনি সমাজ তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই অল্প বা অধিক পরিমাণে নরজাতির ভাবী অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা, অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সকল অনুমানে কতক বিজ্ঞানের, কতক ধর্ম্মশাস্ত্রের, আর কতক ইতিবৃত্তের এবং মানব প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেরূপেই ও বিষয়ের নির্ণয় চেষ্টা হউক, বিষয়টী কল্পনার লীলাভূমি। এখানে আশা, প্রীতি, ইচ্ছা, ঘৃণা প্রভৃতি সহচরদিগের সহিত তিনি যেন নিয়তই নৃত্যশীলা। এখানে মনের একান্ত ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া বিচার করা, অতীতের মধ্যে কার্য্যকারণ সূত্র ধরিয়া চলা অপেক্ষাও বহুপরিমাণে কঠিনতর। যাহাহউক, মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল মতের প্রচলন হইয়া আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা মনুষ্যের বাস ভূমি পৃথিবীর ভবিষ্যদশা কিরূপ হইবে, তাহার অবধারণ চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃ তাপশূন্য হইয়া শীতল হইতে থাকিলে কিছুকাল ইহার সর্ব্বত্র শীতপ্রধান হইবে কাজেই ইহার সকল ভাগই শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের উপযোগী হইয়া উঠিবে—কোন ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের

বাসোপযুক্ত থাকিবে না। অনন্তর পৃথিবীর শৈত্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জল এবং বায়ুও তারল্য ভাব পরিহার করিবে, সুতরাং জল এবং বায়ুর বিনা ভাবে যে সকল প্রাণী বাঁচে না, তেমন প্রাণী একটীও বাঁচিবে না। অতএব সকল মানুষই মরিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, চন্দ্রমণ্ডলের একণে যে অবস্থা হইয়াছে, পৃথিবীরও ভাবী দশা তাহাই হইবে।

অত দূরতর কালে দৃষ্টি প্রসারিত না করিয়াও বিজ্ঞানের নিয়ত উন্নতি দর্শনে কদাচিৎ এরূপও মনেকরা হয় যে, দেশভেদে যে উষ্ণানুষ্ণতার প্রভেদ আছে নরজাতি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। এবং তাহা হইলেই পৃথিবীর সকল ভাগে বাস করিতে পারিবে। শুদ্ধ তাহাই পারিবে এমত নহে। বিভিন্ন স্থানের জল বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ এক্ষণ যেরূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ, আকৃতি ভেদ, এবং প্রকৃতি ভেদ আছে, সেই সকল বিভেদও আর থাকিবে না। সকল মনুষ্যই এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে—এবং অবশ্যই এক-ভাষা-ভাষী এবং একশাসন প্রণালীর বশীভূত হইবে।

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মনুষ্যের অমরত্ব লাভ এবং জীবের স্বতঃ উৎপত্তি সাধনও অসম্ভবপর ব্যাপার নহে। স্থূল কথায়, ইহাঁরা মনে করেন যে, কালে পৃথিবীই স্বর্গ হইয়া উঠিবে। তাঁহারা বলেন পৃথিবীর ভাবী অবস্থাই স্বর্গের প্রতিরূপ স্বরূপ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর প্রদান করিয়া যাঁহারা নরজাতির ভাবী অবস্থার অবধারণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একেশ্বরবাদী তাঁহারা বলেন যে, সকল জাতীয় মনুষ্যই কোন সময়ে তাঁহাদেরই ধর্ম্মাবলম্বী হইবে। খৃষ্টান দিগের মতে সকলেই খৃষ্টান হইবে, মুসলমানদিগের মতে সকলেই মুসলমান হইবে, যাহারা না হইবে তাহারা মারা পড়িবে। তাহা হইলেই পৃথিবীর সমস্ত পাপ তাপ দূর হইয়া যাইবে—এবং পৃথিবী স্বর্গ না হউক, স্বর্গতুল্য হইয়া উঠিবে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু মত ওরূপ নয়॥ নিরীশ্বরবাদী এবং সেশ্বরবাদী উভয়েরই মতে পরিবর্ত্ত মাত্রেই অস্থায়ী। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, তাহাও চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না। সুতরাং কালের অনন্ত

ভাব ধরিয়া বিচার করিলে সকল ব্যাপারেই পূর্ব্বাবস্থা চক্রনেমিক্রমে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ইহাঁদিগের শাস্ত্রেরেদিও ব্যক্তিগত ক্রমোৎকর্ষের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হয় তথাপি সমাজোন্নতির অশেষতা উপলব্ধ হয় না। ইহাঁদের মতে স্বর্গও অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া স্বীকৃত নহে।

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্ম্মমত উভয়কেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া এবং ইতিহাস শাস্ত্রের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া অশেষবিৎ অগষ্ট কোম্‌টি মনুষ্যজাতির ভবিষ্যদশার বিচার পূর্ব্বক একটী নব্য মতের কল্পনা করিয়াছেন। কোম্‌টির গ্রন্থসমূহে সমাজতত্ত্বের নিগূঢ় বিচার এবং ভবিষ্যঘটনার বহুধ কথা দৃঢ়রূপে ব্যক্ত আছে। তাঁহাকে ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের সংস্থাপয়িতা বলিয়াই ধরা যায়। তাঁহার মতের সহিত প্রচলিত হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রণালীর কত কটা মিল আছে, এবং ইংরাজী শিক্ষিত সুবোধ, এবং সুশীল কতিপয় দেশীয় লোক এক্ষণে কোম্‌টির মতবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কারণে কোম্‌টির স্থূল স্থূল কথাগুলির পরিশেষ উল্লেখ করা আবশ্যক। কোম্‌টি বলেন, (১) পৃথিবীতে ধর্ম্মভেদ রহিত হইবে (২) বর্ণভেদ রহিত হইবে (৩) যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যাইবে (৪) বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে (৫) শাসন এবং শিক্ষা কার্য্য সাবজ্ঞা পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে (৬) জনগণ সর্ব্বত্র যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে এবং (৭) অভ্যাসগুণে পরার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্বার্থপরতার আসন পরিগ্রহ করিবে। কথাগুলি বিচার করিয়া বুঝিতে হয়।

(১) ধর্ম্মভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কোম্‌টির তাৎপর্য্য এই যে, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই বিচার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। প্রত্যুত উহা বিচারের বিষয়ই নহে। আর মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধির মূল এবং চরম উদ্দেশ্যই মনুষ্য সমাজের হিতসাধন। অতএব যখন বিজ্ঞানালোচনার বলে, উপধর্ম্মের প্রয়োজন এবং তাহাতে বিশ্বাস তিরোহিত হইবে, তখন সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্ম মতের পরিহার পূর্ব্বক মনুষ্য নিজ সমাজেরই

পূজা করিবে—সেই আবহমান কাল ব্যাপক মানব সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ শিশুক্রোড়স্থা একটী নারী মূর্ত্তি—যথা গণেশ-জননী—অথবা বিশু- মেরী অথবা কোসেন কভেম্ম। এই নরদেব পূজাই পৃথিবীর ভাবী ধর্ম্ম।

কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর প্রতি ক্ষুদ্র সকল প্রাণের দ্বারাই ত বদ্ধ যখন দেখা যাইতেছে যে কারণের অনু- সন্ধান অনুধাবন চির স্বাভাবিক যখন দেখা যাইতেছে যে মনুষ্য সমাজের প্রতি সহানুভূতিমূলক যে ধর্ম্ম, তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ যথা বিশ্বপ্রেম এবং বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্বসৌন্দর্য্য প্রভৃতি অত্যুদার ভাব সকল মনুষ্যহৃদয়ে অধিষ্ঠিত, এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বশক্তি মত্তা, অপাপবিদ্ধত্ব প্রভৃতি গুণ লক্ষণে লক্ষিত মনুষ্যের উপাস্য বস্তু সর্ব্বময় রূপেই বিদ্যমান, তখন পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ-বিদূষিতাঙ্গ, আংশিক এবং কাল্পনিক একটী নরদেব পূজায় মানব বুদ্ধি এবং মানবহৃদয়ের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথা? আমার বোধ হয় যে, সর্ব্বেশ্বরবাদই পৃথিবীতে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবে। কোম্‌টির গুরুপর্য্যায়ী এবং শিষ্যপর্য্যায়ী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরও ঐ ভাব।

(২) বর্ণভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিবেচ্য। তাহার প্রথম কথা এই যে, বর্ত্তমান বর্ণভেদের হেতু কি শুদ্ধ বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর ভেদ, না মৌলিক উৎপত্তিরই ভেদ। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল বায়ুর বিভেদই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ। কোম্‌টির মতও তাহাই। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তথাপি বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর প্রকৃতির ভেদ রহিত করাই কি বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত? ইউরোপীয়দিগের বংশজাত মার্কিনেরা আপনাপন পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা দীর্ঘচ্ছন্দ এবং রক্তবর্ণ হইয়াছে—অর্থাৎ আকারে এবং বর্ণে আমেরিকার পূর্ব্ব অধিবাসী- দিগের সমধিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অতএব এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় না যে, জল বায়ুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তি বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন। তবে এ কথা বলা যায় যে, বিভিন্ন বর্ণের লোক সকল

পুরুষানুক্রমে একদেশবাসী হইয়া থাকিতে থাকিতে উহাদের সকলেই মিশ্রিত হইয়া যাইবে এবং সেই মিশ্রণের ফলে কোন কালে আকার এবং বর্ণগত জন্মিতে পারিবে। পক্ষান্তরে ইহাও দেখিতে হয় যে, যদিও "মিশ্র নর নারীর সংযোগে বহু পুরুষ ব্যাপিয়া বংশের রক্ষা হয় না", এ কথা সত্য না হয়, তথাপি অনেক জাতীয় লোকেরই দৃঢ় সংস্কার মিশ্রণের বিরুদ্ধ। সেই সংস্কারের বল কোথায় যাইবে? উহা অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ নিবারণ করিবে, সুতরাং পৃথিবীতে বর্ণভেদ রহিত হইয়া যাইবে। এ কথা যতই দূরবর্ত্তী কালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হউক, উহা কোন নির্দ্দিষ্ট কালকেই লক্ষ্য করিতে পারে না। আর মিশ্রণ-প্রবণতা যতই বলবতী হউক, যে যে কারণে পূর্ব্বে বর্ণভেদ জন্মিয়াছে, সে সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে পরিস্থিতির ভেদে আকারভেদ এবং যোগ্যতার অনুসারে বংশের রক্ষা, তাহা ত কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না।

(৩) যুদ্ধবিগ্রহাদি উঠিয়া যাইবার সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, পৃথিবী এবং তজ্জাত ভোগ্যবস্তুর সসীমতাই মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ, মোকদ্দমা, মামলা যুদ্ধবিগ্রহাদির মূলকারণ। যদি ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ এবং সংখ্যা অপরিসীম হইত, তবে মানুষে মানুষে বিবাদের কোন চিরস্থায়ী হেতু থাকিত না। তুমিও যাহা চাও আমিও তাহাই চাই, আর সে সব বস্তু অনেক নাই—এই জন্যই তোমাতে আমাতে বিবাদ হয়। বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সংগ্রাম হয় তাহারও মূল কারণ ঐরূপ। তোমার আমার বিবাদ না হয় এরূপ করিতে হইবে, হয় তুমি যাহা চাও তাহা আমি না চাই অথবা উভয়ে যাহা চাই সেই বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। মনে হইতে পারে যে, প্রথমটী পরার্থপরতা বৃদ্ধির প্রাবল্যে সাধিত হইবে, দ্বিতীয়টীও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার প্রভাবে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু পরার্থপরতাও অসীম হইতে পারে না, আর বিজ্ঞান যতই বিকলন শক্তির আস্ফালন করুক, এ পর্য্যন্ত একটীও প্রকৃত নূতন দ্রব্যের সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। অতএব, যেমন ব্যক্তিগত বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা রাজব্যবস্থার বলে সাধিত হই-

রাছে, জাতিগত বিবাদের মীমাংসাও যদি কখন বিনা যুদ্ধে সিদ্ধ হয়, তাহা সেইরূপেই হইতে পারিবে। বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত অনেক দিন হইতে হইয়া আছে। গ্রীকদিগের মধ্যে অ্যাম্‌ফিক্‌টিয়োনিক সভা ছিল, ইউরোপ খণ্ডেও শক্তি-সামঞ্জস্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরস্পর মিলন হইয়া থাকে, আর পোপের কর্তৃত্বেও কখন কখন বিবাদাদি মিটিয়া যায়। যদিও ঐ সকল উপায়ে এ কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-কাণ্ডের বিশেষ হ্রাস বা নিবৃত্তি হয় নাই, তথাপি যখন বীজ আছে, কখন কালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্নজাতীয় লোক-দিগের মধ্যে সকলের মাননীয় এমন একটী সভার সংস্থাপন হইতে পারে, যে সভা বিভিন্ন জাতীয় বিবাদের হেতু জানিয়া বিনা যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ কিছুতেই যাইবার নহে। সুতরাং তাহা একেবারে মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

(৪) বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা রহিত হইবার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ পর্য্যন্ত তদ্রূপ চেষ্টার কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হইতেছে না। তবে এখন সাম্রাজ্য স্থাপনের ভাব একটী বিশেষ পথকেই লক্ষ্য করিতেছে। যে সকল লোক মূলতঃ একজাতীয় তাহাদিগকেই মিলাইয়া এক একটী সাম্রাজ্য ঘটাই-বার জন্য যত্ন হইতেছে। জর্ম্মণিয়া বলেন জর্ম্মণ জাতীয় সকলেই আমার সহিত মিলুক, রুশিয়া বলেন স্লাবোনিক জাতীয় যাবতীয় লোক আমার অধীন হউক, ফ্রান্স লাটিন জাতীয় সকলকে আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করা-ইতে সমুৎসুক আর ইংলণ্ডীয়সাম্রাজ্যনৈতিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত অ্যাংলোস্যাক্সন জাতিকে ইংলণ্ডের সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য যত্নবান। এরূপ সাম্রাজ্য সংগঠিত হইবার অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় পক্ষই বিদ্যমান আছে। এক এক ব্যক্তি এক একটী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলে সাম্রাজ্য গুলি অধিকতর দৃঢ় সবল হয়, অতএব তাদৃশ সাম্রাজ্য সংঘটনে লোকের প্রব-ণতা থাকিতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তার এবং গমন সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া

এক জাতীয় মনুষ্যকে বিভিন্ন দেশবাসী করিয়া তুলিতেছে। মনুষ্যের পরস্পর সংস্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি পাইবে। তদ্ভিন্ন, একজাতিত্বে যেমন সহানুভূতির বৃদ্ধি, তেমনি দেশভেদে স্বার্থের কতকটা ভেদনিবন্ধনসহানুভূতির হ্রাস হয়। তজ্জন্য জাতিত্বকে মূল করিয়া সাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ইটালী লাটিন জাতির আবাসভূমি। উহা ফ্রান্সের কৃপায় অষ্ট্রীয়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইটালী এখন ফ্রান্সের চিরশত্রু জর্ম্মণির সহিত একমত হইয়া চলিতেছে। বাল্‌কান দেশগুলিতে স্লাভজাতীয় লোকেরাই অধিক পরিমাণে বাস করে। ঐ প্রদেশগুলিতে তুরস্কের যে আধিপত্য ছিল তাহা রুসিয়ার প্রতাপেই খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বালকান প্রদেশীয় অধিকাংশ লোক রুসিয়ার প্রতি নিতান্ত সন্দিহানমনা হইয়াই চলে। ইংলণ্ড আপনার উপনিবেশ গুলির জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের এমনি আদুরে ছেলে হইয়াছে যে, মাতৃভূমির নিমিত্ত তাহারা কোন ক্ষতি স্বীকারে সম্মত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব একজাতিত্বমূলক সাম্রাজ্য বন্ধনও যে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুভব'সদ্ধ নহে। যদিই বা হয়, সেই সকল সাম্রাজ্য সত্বরেই প্রাদেশিক সম্মিলিত শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সম্মিলিত শাসনপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক প্রদেশ প্রমাণ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং ক্ষমতাশীল লোকে আবার বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে। পরার্থপরতার সহস্রবৃদ্ধিতেও ঐ কার্য্যের নিবারণ হইবে না।

(৫) শিক্ষা এবং শাসনের ভার পুরোহিতবর্গের হস্তে থাকিবার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, এখনও শিক্ষার ভার প্রায় সকল দেশেই যাজকবর্গের হস্তে ন্যস্ত আছে। পূর্ব্বেও ছিল। ইউরোপ খণ্ডের যে যে দেশে প্রটেষ্টাণ্ট মতের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, সে সকল দেশে যাজকবর্গ কিছু হীনপ্রভ

হইয়াছেন এবং যাজক ভিন্ন অন্যান্য লোকেও শিক্ষকের পদে ব্রতী হইতে-ছেন। কিন্তু তাহা হইলেও একমাত্র ফ্রান্স দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশে, এখনও যাজক দলই স্বদেশের শিক্ষায় নিযুক্ত। ফ্রান্সেও যাজকেতর লোককে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ফল অতি শুভ বলিয়া গণ্য হয় নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, তাঁহারাই সকল শিখাইবেন, ইহাই স্বভাব-সিদ্ধ পদ্ধতি। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ঐ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল— ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন। মুসল-মানদিগের মধ্যেও মুল্লা বা যাজকের দলই প্রধানতঃ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ জাতীয়দিগেরও ঐ রীতি। অতএব যাহা পূর্ব্বে ছিল এখ-নও আছে, তাহা পরেও থাকিবার সম্ভাবনা।

কিন্তু শাসন কার্য্যের ভার যাহা কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পর-ম্পরা সম্বন্ধে যাজকবর্গের হস্তগত ছিল, তাহা উঁহাদিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে পোপের প্রাধান্য কাথলিক রাজ্যগুলি তেও পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছে। এমন কি, এই সে দিন আয়র্লণ্ডের লোকেরাও ল্যাণ্ডলীগ সম্বন্ধে পোপের নিবারণ শুনিল না। প্রটেষ্টান্টদিগের দেশেত যাজকদিগের প্রাধান্য কিছুই নাই। তুরস্কের সুলতান আপন যাজক মণ্ডলীর (উলেমার) মত গ্রহণ করিয়া চলেন বটে, কিন্তু ইউরোপীয় রাজা-দিগের প্রবলতর অনুরোধের নৈরন্তর্য্যে তাঁহাকে ক্রমশঃ উলেমার মুখাপেক্ষা ন্যূন করিতে হইতেছে। বৌদ্ধদিগের রাজ্য সকলেও পূর্ব্বে এক একটী ধর্ম্ম রাজ্যের অধিষ্ঠান ছিল, তাহা হয় একেবারে উঠিয়া যাইতেছে নতুবা, খর্ব্ব-শক্তি হইতেছে। এই সকল লক্ষণে আপাততঃ মনে করা যাইতে পারে না যে শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের মহিমা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু যখন ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যাজকদিগের হস্ত হইতে শাসনভার অপসৃত হইবার মুখ্যকারণ রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের আধিক্য এবং জনগণের বৈষয়িক ব্যাপারে অনুরাগের বৃদ্ধি, তখন মনে করা যায় যে, যুদ্ধের ন্যূনতা হইলে এবং বিষয়ানুরাগ ধর্ম্মানুরাগ হইতে অভিন্ন

রূপে উপলব্ধ হইলে আ বার শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের আধিপত্য জন্মিতে পারে। এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সর্ব্বেশ্বরবাদ স্বীকৃত হইলে বিষয় চিন্তা এবং বিষয়ার্থ পরিশ্রম, ধর্ম্মচিন্তা এবং তপশ্চরণ হইতে অপৃথক্‌ভূত হইয়া উঠে। অপর কোন মতবাদে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন হয় না।

(৬) রাজ্যের লোক যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভাজিত হইবার সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, স্থূলতঃ ঐ প্রকার বিভাগই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরেও ঐ বিভাগ বলবৎ থাকিবারই সম্ভাবনা। ঐ বিভাগ ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমিক হওয়াতেই অতি বিস্পষ্ট ভাব ধারণ করিয়া আছে এবং যদি উহা অতিপল্লবিত না হইত, তাহা হইলে কোন অশুভ ফলই প্রসব করিত না। যাতায়াত সৌকর্য্যের বৃদ্ধির সহিত কূপমণ্ডুকতার হ্রাস হইয়া এ দেশেও এক্ষণকার স্থানভেদমূলক জাতীয় অবান্তরভেদগুলি কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হইতে পারে, এবং মহাদেশটী আপনার প্রকৃত পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৭) মানবহৃদয়ে পরার্থপরতা সম্যক্‌ প্রকারে স্বার্থপরতার অধিকার গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই অবধারিত হয় যে, অভ্যাসগুণে যদিও স্বার্থপরতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করা যায়, তথাপি উহা একেবারে নিঃশেষিত হইতে পারে না। যে সহানুভূতি হইতে পরার্থপরতা জন্মিবে, অহং অভিমানটী তাহারও মূলে আছে। সুতরাং স্বার্থবোধ এবং পরার্থবোধ উভয়ে পরস্পর অনুস্যূত। বস্তুতঃ যদি মানব মন একেবারেই স্বার্থবোধে শূন্য হয়, তাহা হইলে উহা পরার্থবোধেও অক্ষম হইয়া পড়ে—তখন মানুষ পরের উপকার করিবে কি, উপকার কিসে এবং অনুপকার কিসে, তাহা জানিতেই পারে না। কোম্‌টীও ঐরূপ স্বার্থশূন্যতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উদ্দেশ্য এইমাত্র ছিল যে, লোকে বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা, যেরূপ পরার্থ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া স্বার্থের অনুসরণ করে, এবং তাহা করিয়া একান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং অব্যবস্থিত হয়,

ক্রমশঃ সেই ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পদার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে অভ্যস্ত হয়।

অতএব উপসংহারে বলা যায় যে, মনুষ্য সমাজের প্রতি আন্তরিক হিতৈষা প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর সুতীক্ষ্ণধী অগষ্টকোম্‌টী যে রূপে ভবিষ্য গণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কিয়ৎপরিমাণে তথ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য। তিনি ইতিবৃত্তশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা মনুষ্য সমাজের প্রতি যে সকল শক্তির কার্য্যকারিতা উপলব্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কতক-গুলির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং অনেকটা সংযতচিত্ত হইয়াও বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। যদি নিতান্ত তাড়াতাড়ি করিয়া একটা নূতন ধর্ম্মপ্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না যাইতেন, অথবা যদি তাহার পূর্ব্বে কখন এই ভারতবর্ষে কিম্বা কোন বৌদ্ধ দেশে আসিতেন এবং তাঁহার আনুমানিক অনেকানেক ব্যাপারের কতকটা ফল প্রত্যক্ষীভূত করিতেন, কিম্বা অভ্যাস এবং শিক্ষার দ্বারা কতদূর হইতে পারে আর কি হইতে পারে না, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে মানুষের পরিবর্ত্তনশীলতার সীমা এবং মানব সমাজে চক্রনেমির ক্রম নির্ণয় করিতে না পারিলেও সমাজ যে বক্র রেখাক্রমে চলে তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাইতেন, তাঁহার প্রণীত দর্শন শাস্ত্র আরও বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইত, এবং সমাজ-তত্ত্বশাস্ত্র সংস্থাপনের মুখ্য ফলই ফলিত—গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় মনুষ্য সমাজও যে কোন বিশেষ কক্ষায় গমন করে তাহা অনুমিত হইতে পারিত।

ভবিষ্যবিচার—ইউরোপের কথা।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখনও অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্মপর এবং পর-কালে বিশ্বাসবান আছেন। তথাপি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই উদরচিন্তায় অর্থচিন্তায়, এবং সুখলালসায় উত্তেজিত হইয়া বিষয় ভোগার্থই আয়াসবান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল লোক কেবল ঐহিকসুখবাঞ্ছন্যাই চায়। উহারা

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদত্ত পারলৌকিক সুখের উৎকোচে ভুলিতে চাহে না। তাহাদের মধ্যে গিয়া যদি বল যে, তোমাদের শাসন প্রণালীর এই এই দোষেই তোমাদের যত দুঃখ। তাহারা সে কথায় কান দিবে এবং হয়ত শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। যদি বল, তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা অমুক বা অমুক কর্ত্তৃক অপহৃত হইতেছে, তাহারা সে কথায় বিশ্বাস করিবে এবং সেই অমুক বা অমুকের ঘর বাড়ী লুঠ করিতে যাইবে। কিন্তু স্বর্গের কোন কাহিনীতে উঁহাদের মন যায় না। পরকালকে মাথায় রাখিয়া উঁহারা ইহকালকেই ভোগ করিতে চায়।

যেখানে অনেক লোকের মন এরূপ ঐহিকতাপ্রবণ হইতেছে, সেখানকার কবি এবং সংস্কারকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ যে ঐহিকতার উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া সমাজসংস্কারের এবং সমাজের ভাবি অবস্থার কল্পনা করিবেন, তাহা সম্ভবপর। ইউরোপে তাহাই হইতেছে। যেমন সর্ব্বদাই রাজ্যশাসন নীতির এবং অর্থনীতির পরিবর্ত্ত চেষ্টা হইতেছে, তেমনি সমাজগঠনের নূতন নূতন শৃঙ্খলার আন্দোলনও চলিতেছে। ঐ সকল সমাজ কল্পনার কিছু উল্লেখ না করিলে সমাজ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যবিচার সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না। এই জন্য সংক্ষেপতঃ তাহাদিগের কিছু উল্লেখ করিব।

ইউরোপ খণ্ডের ইতিবৃত্ত তিনটী স্থূল ভাগে বিভক্ত। তাহার প্রথম ভাগের আরম্ভ যে কোন পূর্ব্বকাল হইতে হউক, উহার পরিসমাপ্তি রোমসাম্রাজ্যের পতনে; দ্বিতীয় ভাগ, ঐ সময় হইতে আরব্ধ হইয়া ফরাসিদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবে পর্য্যবসিত; আর তৃতীয় ভাগ, ঐ বিপ্লবকাণ্ডের পরবর্ত্তী আজ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়কে লইয়া সংঘটিত। ভবিষ্য সমাজসংঘটনের যাবতীয় কথা এই শেষভাগেরই অন্তর্নিবিষ্ট। পূর্ব্ব দুই ভাগে সমাজ কল্পনায় যে সকল কথা পাওয়া যায়, সেগুলি কবিকল্পনার ন্যায়, সে সকল কথাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই বলিলেও চলে। অতএব ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক বন্দোবস্তের নূতন মতবাদগুলি বাহির হইয়াছে বলা যায়।

ফরাসিদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে কয়েকটি কথার ধুয়া উঠিয়া ক্রমে ইউরোপের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে। কথাগুলি এই (১) মনুষ্য স্বাধীন জীব। (২) মনুষ্যেরা পরস্পর তুল্য। (৩) মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। এই সকল কথা যে কারণে উঠে তাহার প্রভাবে ফরাসিদেশে সমূহ পরিবর্ত্ত ঘটে। তাহারি মধ্যে কোন গুলি অল্প কালের জন্য থাকে, অপর কতকগুলি স্থায়ী হইয়াছে, এবং অপরাপর দেশেও পরিগৃহীত হইতেছে। ফরাসি-বিপ্লবে (১) যাজকদিগের তিরস্কার এবং ধর্ম্ম-শাসনের উচ্ছেদ হয়। (২) রাজার শাসন উঠিয়া গিয়া প্রজা-সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিভূদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। (৩ ভূম্যধিকারীদিগের নির্ব্বাসন হইয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। (৪) পৈত্রিক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠাধিকার রহিত হইয়া সকল সন্তানের সমান স্বত্ব সংস্থাপিত হয়। (৫) রাজ্যমধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থার তিরোধান হইয়া সার্ব্বভৌমিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। [৬] ব্যক্তিভেদে ধর্ম্মাধিকরণের বিভিন্ন নিয়ম রহিত হইয়া আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান হইয়া দাঁড়ায়। [৭] অপরাধীর নির্য্যাতন এবং বিচার কার্য্যের ব্যয়াধিক্য নিবারিত হয়। [৮] আদত্ত কর, শাস্তার ভোগে ব্যয়িত না হইয়া প্রজার হিতার্থই ব্যয়িত হইবার বিধি হয়। [৯] শিক্ষা সম্পাদন, সুনীতি প্রবর্ত্তন, বিদ্যা এবং শিল্পের সম্বর্দ্ধন, রথ্যা নির্ম্মাণ, বাণিজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি প্রজার হিতকর ব্যাপার. রাজা বা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা সম্ভূত বা দয়ার কার্য্য না থাকিয়া শাসনকার্য্যের অঙ্গীভূত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, ইউরোপে প্রজাসাধারণের হিতোদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমাজের পরিচালনা করাই ফরাসিবিপ্লব কাণ্ডের প্রদত্ত অতি মহতী শিক্ষা।*

*ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা শাস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, যথা—ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্ম্মঃ প্রজানামনুপালনম্। নির্দ্দিষ্ট ফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে। সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শাস্ত্রে কর করাদিভোক্তা রাজা সর্ব্বতোভাবে তৎপ্রতিপালনে বাধ্য।

পরন্তু ঐ তথ্যশিক্ষার সহিত একটী অতথ্যশিক্ষাও হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে সুশাসনের শিক্ষা হয় নাই—বিপ্লবের বলে হইয়াছে। সেখানে ন্যায়ানুগামিতার শিক্ষা না হইয়া বিদূষিত সাম্যবাদ ধরিয়া বিপ্লব করিতে হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ সাম্যের কথাটি প্রকৃত কথা নয়। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী প্রভৃতিই সধন ছিলেন। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যাদির প্রভাবে মধ্যবিধ লোকের মধ্যেও ধনবত্তার এবং বিদ্যাচর্চ্চার বিস্তার হয়। এমন কি, ঐ সকল লোকের মধ্যে অনেকেই ভূম্যধিকারী প্রভৃতি শাস্তৃবর্গের অপেক্ষা ধনে এবং ক্ষমতায় বড় হইয়া উঠে। ঐ সকল লোক আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শাস্তৃদলের সহিত আপনাদের সমতা স্থাপন করে এবং সেইসাম্যবাদের বলে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। কিন্তু জন্মবৈষম্যের স্থলে ধন ধনবৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। বৈষম্য যায় নাই—উহার একটু গতি ফিরিয়াছিল।

যে সময়ে ফরাসি বিপ্লব হইতে অলীক সাম্যবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, সেই সময়েই ইউরোপখণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির আবিষ্কার, উৎকর্ষ সাধন, এবং প্রয়োগ বাহুল্যে শিল্পজাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং মূলধনীদিগের ধনের ঐকান্তিক আধিক্য হইতে থাকিল। তজ্জন্য শ্রমজীবীদিগের কার্য্যহানি, ভক্ষ্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং অস্থি পেষক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হইল। কলের ব্যবহার বাড়িলেই মজুরের কাজ কমে, কাজ কমিলেই মজুরের দর কমিয়া যায়। মজুরির দর কম হওয়া, আর ভক্ষ্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া, একই কথা। বৈদেশিক শিল্পকরদিগের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় শিল্পকরদিগের পরিশ্রমের আতিশয্য এ দুইটিও এক পদার্থ। ফলে জিনিস হয় বেশী, স্বদেশে সমুদায় কাটে না, বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়, এবং বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়ে। শ্রমজীবী এবং শিল্পকরদিগকে খাটিতে হয় অধিক; এবং যে সমাজে ঐহিকতার প্রাবল্য তথায় শ্রমজীবীরা লাভভাগী হয় না. ধনোপার্জ্জন হয় মূল ধনীদিগের।

অতএব একপক্ষে ফরাসীবিপ্লব হইতে লোকের মনে সাম্যভাবের বৃদ্ধি হইল, এবং পক্ষান্তরে কলের প্রভাব হইতে লোকের অবস্থার সমূহ বৈষম্য

জন্মিল। এই বাহ্য বৈষম্য নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই সুবুদ্ধিগণ কর্ত্তৃক সমাজের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে।

ঐ কল্পনা অনেক প্রকার হইয়াছে। ইহার এক একটী করিয়া বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। উহাদিগের মূলসূত্র কয়েকটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সকল কল্পনারই প্রধান সূত্র এক—"সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া সমাজনিষ্ঠ হউক"। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের কিছুমাত্র সম্পত্তি থাকিয়া কাজ নাই, সকল সম্পত্তির অধিকারী একমাত্র সমাজ হইয়া থাকুন। তুমি আমি যে যাহা রোজগার করিব, সকলই সমাজের হাতে দিব; সমাজ আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। আমরা কাজ করিব ক্ষমতানুসারে, ভোগ করিব প্রয়োজনানুসারে।

ইউরোপীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষা সহস্রগুণে ব্যক্তিনিষ্ঠস্বত্বের পক্ষপাতী। আমাদের মধ্যে সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালী প্রচলিত। উহাঁদের মধ্যে তাহা নাই। আমাদের মধ্যে পাঁচ ভাই রোজগার করিয়া বাপের হাতে দেয়, বাপ যাহাকে যাহা দিতে হয়, তাহা দিয়া থাকেন। ইউরোপীয়েরা এরূপ বন্দোবস্ত আদবেই ভাল বাসেন না। উহাঁদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্ হইয়া যাইবারই বিধি।

এরূপ পারিবারিক অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে একেবারে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের বিলোপ হইয়া সমাজ-নিষ্ঠ স্বত্বের সংস্থাপন হইবার কথা অতি বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা ততটা বিস্ময়ের বিষয় থাকে না। কোন বস্তুকে নিতান্ত নিজস্ব বোধ করা একটী প্রকাণ্ড ভ্রম। একতঃ এই নশ্বর মর্ত্ত্যলোকে কিছুই কাহার নিজস্ব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির উৎপত্তি বল, তাহার রক্ষা বল, তাহার ভোগ বল, কিছুই কাহার একেলার যত্নে বা সুখসাধনে সম্পাদিত বা পর্য্যবসিত নহে। সুতরাং শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যে মনুষ্যের যে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব, তাহার অভ্যন্তরে একটি গূঢ় সম্মিলিত স্বত্ব স্বীকার করিবার সম্যক্ হেতু আছে। ইউরোপীয়েরা রোমীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বত্বের ঐ

গূঢ় প্রকৃতিটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এখন যে, একেবারে সামাজিক-সম্মিলিত স্বত্বের পক্ষপাতী হইতে যাইতেছেন, তাহা সেই পূর্ব্ব ভ্রমেরই ফলমাত্র। একদিকে অধিক ঝুঁকিলেই আবার তাহার বিপরীত দিকে ঝুঁকিতে হয়।

যদি বাণিজিকী সুবিধার প্রতি তন্মনস্কতা বশতঃ সম্মিলিত স্বত্বের জ্ঞান বিলুপ্ত না হইত, যদি ঐ বোধটীকে আপনাদের সহিত মিলেনা বলিয়া অসভ্যতার বা অনুন্নতির চিহ্ন বলিয়া গণনা না করিতেন. তবে আজি ইউরোপের মধ্যে সামাজিক স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য এমন আগ্রহাতিশয্য হইত না;

এখন যে ইউরোপে পরার্থপরতা শিখাইবার জন্য এতটা আগ্রহ বাড়িয়াছে, তাহারও কারণ ঐরূপ। ইউরোপীয়দিগের রাজনীতি, সমাজ-নীতি, গৃহনীতি সকলই একমাত্র স্বার্থপরতার উপর সংঘটিত হইয়া আছে। ঐ সকলের দোষ ক্রমে ক্রমে আতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে। অতএব একেবারে পরার্থপরতার দিকে বেগ বাড়িয়াছে—এখনও কাজে বড় কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু ক্রমে কাজেও কতকটা হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও এইরূপ ঝোঁকগুলিকে সমাজের উন্নতির পথানুসরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত উন্নতির পথে ওরূপ ঝোঁক ধরে না, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত তথ্যকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াই ব্যাপকতর সত্যের আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে কোন পূর্ব্ব নির্ণীত সত্যের অপলাপও হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ-কল্পয়িতৃগণ অনেকানেক সত্যের অপলাপ করিয়াই আপনাপন মত প্রচারিত করিয়া থাকেন। প্রথম, তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধন মানেন না; দ্বিতীয়, তাঁহারা বৈবাহিক সংস্কার স্বীকার করেন না; তৃতীয়, তাঁহারা প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি সংকোচ করা আবশ্যক বলেন না; চতুর্থ, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন দল বলেন যে, মানুষের সাহজিক রিপু সকলকে দমন করিবার চেষ্টা করা অবৈধ;

পঞ্চম, অপর কোন কোন দলের মতে শারীরিক সুখ ভোগই পরম পুরুষার্থ।

আমাদিগের শাস্ত্রেও অর্থ সাধনের উপায় কথিত হইয়াছে, যথা—

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থান্

ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া মনকে সংযত করিয়া সমুদায় অর্থের সাধন করিবে।

ভারতবর্ষের কথা যাহাই হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্র সকল ধরিয়া ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মণিতে এবং আমেরিকায় অনেকানেক সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে গুলির বন্দোবস্ত এবং কার্য্যনির্ব্বাহের সহায়তার জন্য কয়েক জন মানবকুল হিতৈষী মহাত্মা ধন ব্যয় এবং শরীরব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায়ের অনেক গুলিই টিকে নাই। অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে গুলি আছে, তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অতি কঠিন দণ্ডনীতির প্রবেশ করাইয়াই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়গুলিতে যেরূপ হইয়াছে এপর্য্যন্ত কোন প্রচলিত সমাজেই সমাজপতিদিগের হস্তে ততটা প্রভূত ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটী স্পষ্টানুভূত হইবে। পরিণয় ব্যাপারে স্বেচ্ছাচার প্রবণ ইউরোপীয়দিগের সংঘটিত ঐ সকল সম্প্রদায়ে বিধি হইয়াছে যে, সেই সেই সম্প্রদায়সম্ভুক্ত কোন নরনারী স্বেচ্ছাতঃ এবং কর্ত্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারিবে না। এটা সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিধিও সংস্থাপিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রীপুরুষের সন্তান সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত হইবে না। আবার কোন সম্প্রদায় বিধান করিয়াছেন যে, প্রত্যহ কে কখন কোথায় কি করিবে, তাহার এক একটি তালিকা কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুরির নিমিত্ত প্রত্যহ প্রদত্ত হইবে। অতএব ঐ সকল সাম্প্রদায়িকেরা স্বাধীনতা বর্দ্ধনের প্রয়াসে ইউরোপ প্রচলিত শিথিল সমাজ বন্ধনগুলি ছিন্ন করিতে গিয়া তদপেক্ষা বিবিধ কঠিনতর বন্ধন জালেই জড়িত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ প্রথা-

র্থটী কুম্ভকারের প্রতিমাদির ন্যায় হাতে করিয়া গড়িবার বস্তু নহে; উহা প্রাণী বা উদ্ভিজ্জশরীরের ন্যায় জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হয়। উহার উপর অতিরিক্ত কাটা ছেঁড়াও চলে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া আর একটি দল নূতন উঠিয়াছে। ইহাঁরা বলেন যে, স্বাধীনতা এবং সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের জল্পনা ছাড়িয়া দিয়া যে একমাত্র পরিণাম বাদে সকল বিষয়ের তথ্য নিহিত আছে, সেই পরিণামবাদ মানব সমাজের সম্বন্ধে কি বলেন বা বলিতে পারেন, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

অতএব পরিণামবাদ বলিলে ইউরোপীয়েরা যাহা বুঝেন, তাহার এ স্থলে কিছু ব্যাখ্যা করা আবশুক। তাঁহাদের মতে পরিণামবাদের মোটামুটী অর্থ জগৎকার্য্যে উন্নতিশীলতার স্বীকার। পরিণামবাদের ভিতরে উন্নতির ভাবটীকে বিভিন্ন প্রকারে প্রবেশিত করা হয়। তাহার এক প্রকার এই— একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হওয়ার নাম পরিবর্ত্তন বা পরিণাম। কিন্তু একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হয় কেন? অবশ্য কোন উদ্দেশু সিদ্ধির নিমিত্ত হয়; সে উদ্দেশু কি হইতে পারে? সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস ভিন্ন আর কি উদ্দেশু আছে? তবেই জগতে যাহা কিছু হয়, তাহার দ্বারা সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস হয়। তাহারই নাম উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা একপ উদ্দেশু-বাদী নহেন। তাঁহারা বলেন জগৎকার্য্যের মধ্যে উদ্দেশ্যের কল্পনা মনুষ্যের আত্মত্বারোপসম্ভূত। উহা কোন প্রকৃত বস্তু নহে। অতএব জগৎকার্য্য কিরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহাই দেখ এবং তাহা দেখিয়া উহার পথ বুঝিয়া লও; দেখিবে, সেই পথটী সুখের বৃদ্ধি এবং হ্রাসের দিকে যাইতেছে। সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাসের নামই উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা বলেন যে, এই বিচারে যদিও জগৎকার্য্যের প্রতি কোন উদ্দেশ্যের আরোপ নাই বটে, তথাপি সর্ব্বত্রই যে সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস কল্পিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ অনুভব বিরুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎকার্য্যের মধ্যে ইহাই দেখিতে

পাওয়া যায় যে, তাহার কোথাও একটা কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে অপরাপর ব্যাপারেও তদুপযোগী রূপান্তরতা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার রূপান্তরতার সংঘটন অথবা সাধারণতঃ উপযোগিতার সম্বর্দ্ধন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু উপযোগিতার বৃদ্ধিতেই সংরক্ষণ হয় এবং যাহাতে রক্ষা হয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। অতএব পরিণতি ব্যাপার ধর্ম্মের অভিমুখে হয় এবং ধর্ম্ম কোথাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আর কোথাও বা পরম্পরা সম্বন্ধে সুখের হেতুভূত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পরিণামবাদের শেষোক্ত ব্যাখ্যাটী সর্ব্বাপেক্ষায় বিচারসহ হইলেও উহা পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ নহে। রক্ষণ বলিলেই বিনাশের একটি প্রতিযোগী শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ঐ ব্যাখ্যায় তাহার উল্লেখ নাই। ফলতঃ পরিণামবাদ যেমন জগৎকার্য্যের প্রথম প্রবৃত্তির কোন কথাই বলিতে পারেন না, তেমনি রক্ষণোপযোগী প্রতিযোগিতারও হেতু দেখাইতে পারেন না। এই জন্য অস্তিত্ব এবং পরিবর্ত্ত অর্থাৎ (১) অস্তিত্ব (২) উৎপত্তি ও (৩) বিনাশ বিশ্বব্যাপারে এই ত্রিগুণাত্মিকতা স্বীকৃত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

পরিণামবাদী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতগুলি অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল। নূতন দলস্থদিগের মধ্যে ব্যক্তিভেদে ইহার অন্যতম ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা মনুষ্য সমাজের প্রতি পরিণামবাদের প্রয়োগ করিয়া বলেন, মানুষ প্রথমতঃ একান্ত পশুভাবাপন্ন ছিল, অনন্তর দণ্ডনীতির বশীভূত হইয়া পশুভাব ত্যাগ করিয়াছে, পরে নীতিমান হইয়া অনেকেই দণ্ডের প্রয়োজন অতিক্রম করিতেছে, সুতরাং পরিশেষে সকলেই নীতি সংস্কারপূত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। তখন আর কোন প্রকার শাসনকাণ্ডের প্রয়োজন থাকিবে না। শাসন মানুষের শিক্ষার জন্য, যখন শিক্ষাকার্য্যসম্পন্ন হইয়া গেল, তখন শাসনেরও কাজ ফুরাইল। এত বলিয়া ইহারা সমস্ত শাসন প্রণালীর বিধ্বংস করিতে চাহেন। সেই জন্য ইহাদিগকে 'নিহিলিষ্ট' বা বিধ্বস্তা বলা যায়।

বিধ্বস্তৃগণ বলেন যে, প্রকৃত সাধারণ তন্ত্রতাই শাসন প্রণালীর পরিণাম

কিন্তু নির্ব্বাচনপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপ্রতিভূদিগের দ্বারা শাসনপ্রণালী সংঘটিত হইলে, তাহা বাস্তবিক সাধারণতন্ত্রতা হয় না। কারণ সে শাসন-প্রণালীও প্রজাসাধারণের সম্পূর্ণ অভিমতানুসারে চলে না। উহাতেও ধনশালী ব্যক্তিবৃন্দের প্রাধান্য থাকে। সম্পত্তিশালী লোকেরাই নির্ব্বাচন করেন, এবং সম্পত্তিশালীরাই নির্ব্বাচিত হয়েন। অতএব নির্ব্বাচিত পালিয়ামেণ্ট অথবা তাদৃশ সভার দ্বারা যে শাসন কার্য্য চলে, তাহাও ধনীদিগের শাসন এবং ধনহীনদিগের পীড়ন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত সাধারণ-তন্ত্রতাই শাসন প্রণালীর পরিণাম. অর্থাৎ কোন শাসন না থাকাই শাসনপ্রণালীর চরমাবস্থা। অতএব শাসনকার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাউক। ইহাঁরা আরও বলেন যে, কোন মনুষ্য প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া সুখভোগ করিবে, আর কেহ বা উদরান্নের নিমিত্ত হাহা করিবে, ইহাও মনুষ্যসমাজের যথোচিত পরিণাম নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ গুলিতে লোকের আর্থিক বৈষম্য অপরিসীম হইয়াছে। সে বৈষম্যের হেতু ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব। যদি ভূমিতে, যন্ত্রাদিতে এবং মূলধনে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের লোপ হইয়া সামাজিক স্বত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে যে আর্থিক বৈষম্য জন্মিয়াছে তাহা অবশ্যই তিরোহিত হইবে। অতএব ইহাঁদের মতে সামাজিক পরিণামের ফলে শাসনপ্রণালী একেবারে উঠিয়া যাইবে এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের সম্যক্ লোপ হইবে।

বিধ্বস্তৃদিগের মতবাদ লইয়া অধিক বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা শাসন কার্য্য একেবারে উঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তদ্বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, শাসনের প্রয়োজন থাকিলেই শাসন থাকে। যদি শিক্ষাগুণে এবং অভ্যাসগুণে মানুষমাত্রেই কখন এমন ধর্ম্মশীল হইয়া উঠে যে, আপনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে শাসন করিতে পারে, তবে বাহির হইতে অপর কোন শাসনের প্রয়োজন হয় না। মানুষ তেমন ধর্ম্মশীল হইতে পারে কি? মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষায় এখন ধর্ম্মশীল হইয়াছে কি? এ প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের কোন কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যে ইউরোপে এই সকল কথা উঠিয়াছে সেখানে ধর্ম্মের যে কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া মনে করিব?

অপর কোন কথার উল্লেখ না করিয়াও বলা যায় যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পররাজ্যগ্রহণ চেষ্টা যেরূপ বলবতী এবং বৃদ্ধিশীলা হইতেছে, এবং ভোগসুখতৃষ্ণার যেরূপ তীক্ষ্ণ ধার জন্মিতেছে, তাহাতে ত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইতে পারিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইউরোপীয়েরা যত দিন পররাজ্য গ্রহণের ছল, বল, কৌশল না ছাড়িতেছেন, তত দিন তাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি করিতেছেন বলিয়া মনে হওয়া অসাধ্য। প্রত্যুত তাঁহাদের সন্তানেরাও ঐ দস্যু প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিবে, ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। শাস্ত্রে, শাসনের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে—

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

যদি রাজা সতর্ক থাকিয়া দণ্ডযোগ্যের প্রতি দণ্ডের প্রয়োগ না করেন, তবে বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে শিকপোড়া মাছের মত করিয়া পাক করে।

ইউরোপীয়রাই কি সেই বলবত্তর নহেন? তাঁহারাই কি পৃথিবীর সকল লোককে শূলে বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় ভাজা ভাজা করিতেছেন না? এমন ইউরোপে যদি শাসনের প্রয়োজন নাই, তবে কোথায় আছে?

আর্থিক বৈষম্য ইউরোপে যতদূর হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সমাজ সংঘটনের দোষে এবং পুরুষানুক্রমে পরার্থপরতা শিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে। অতএব সেই সকল দোষ নিবারণের চেষ্টা করিলে এবং পরার্থপরতা শিক্ষার সাফল্য হইলে ঐ বৈষম্য কতকটা নিবারিত হইবে। কিন্তু বিধবস্তুগণ আর্থিক বৈষম্যের যে সকল হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বিচার করেন তাহার মধ্যে একটী প্রধান কারণের উল্লেখ করেন না। সে কারণটী মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য এবং পরিশ্রমশক্তির এবং পরিশ্রম প্রবৃত্তির তারতম্য। ঐ নৈসর্গিক বৈষম্যের তিরোধান হইতে পারে না। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের অপর সকল উপাদান সমান করিয়া দিলেও ঐ দুইটি উপাদানের বৈষম্য নিবন্ধন আবার সমাজমধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব সমাজমাত্রেই কতকটা বৈষম্য থাকিবার স্বাভাবিক হেতুই বিদ্যমান আছে।

বস্তুতঃ বিধবস্থ প্রভৃতি লোকের যে সকল মতবাদ উঠিয়াছে, তাহার অধিক কথাই অভিলাষমূলক, বিচারমূলক নহে। প্রত্যুত তাঁহারা বিতণ্ডা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের কথাগুলি যদিও অভিলাষ হইতেই উঠিয়াছে বটে, তথাপি অভিলাষ হইতে উঠিয়াছে বলিয়াই কথাগুলি অলীক, বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাহাতে প্রয়োজন তাহাতেই মনুষ্যসাধারণের নিয়ত অভিলাষ থাকে, এবং তাহা কালক্রমে সিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, অভিলাষ বশতঃ চেষ্টা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি স্থায়িভাবে কার্য্য করিলেই ফলবতী হয়। এ কথাতেও বলা যায় যে, চেষ্টার ফলবত্তা কার্য্যের সাধনে পর্য্যবসিত হয়। প্রয়োজনসাধনের প্রণালী আবিষ্কারে অভিলাষের অধিকার নাই, অভিজ্ঞতার অধিকার।

স্থূল কথা এবং সূক্ষ্ম কথাও এই যে, শাসনের প্রয়োজন কখনই যাইতে পারে না, তবে শাসন কঠোর না হইয়া অর্থাৎ কেবল দণ্ডমূলক না হইয়া অধিক পরিমাণেই শিক্ষা এবং উপদেশমূলক হইতে পারে। আর সমাজ হইতে বৈষম্য যাইতে পারে না, কিন্তু উহার অনেকটা ন্যূনতা হইতে পারে। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত "স্বাধীনতার" পরিবর্ত্তে "শাস্ত্রাধীনতার" এবং "সাম্যের' পরিবর্ত্তে "ন্যায়ানুগামিতার" এবং "ভ্রাতৃত্বের' পরিবর্ত্তে "ভক্তি, প্রেম, এবং দয়ার" ধ্বনি, উত্থিত হইলেই ভাল হয়। কতকটা এইরূপ ধ্বনি, অন্ততঃ "শাস্ত্রাধীনতার" ধ্বনি, ইংলণ্ডের বিপ্লবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার ফলও ইউরোপীয় অপরাপর বিপ্লব কাণ্ডের ন্যায় তেমন অপকৃষ্ট হয় নাই।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(উপনিবেশ যোগ্যতা।)

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইউরোপেরই অবস্থামাত্র ভালরূপে জানিয়া সমস্ত মানব সমাজ সম্বন্ধে যে প্রকার ভবিষ দর্শন করেন, সম্প্রতি তাহার সহিত

ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অল্প। ভারতসমাজ অনেকটা স্থির পথ অবলম্বন করিয়াই আপনার উন্নত সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি শান্তিপ্রবণ, ইহার নেতৃত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রবর্গের হস্তগত, ইহাতে সামাজিক স্বত্বও কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত, ইহাতে সম্মিলিত গার্হস্থ্যের ব্যবস্থা প্রচলিত, ইহাতে ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং পরার্থপরতার পবিত্রতা জাজ্জ্বল্যমান, এবং ইহাতে সম ব্যবসায়ীদিগের সুদৃঢ় দলবন্ধন সূত্রও বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এ সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজে অনেক অন্তর। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজের পরপরকালিক পরিবর্ত্ত সকল দেখিয়া তাহাতে যেরূপ পরিণতি অনুমিত হইয়াছে ভারত সমাজের পরিণতিও অবিকল সেই প্রকারের হইবে এরূপ মনে করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভারত-সমাজ সর্ব্বতোভাবে মুক্তাবস্থ থাকিলে উহা এতদিন যে পথে চলিয়া আসিয়াছে এখনও সেই পথেই চলিতে থাকিত। কিন্তু ভারতসমাজ সেরূপ মুক্তি পাইতেছে না। ইউরোপের মধ্যে যে জাতি সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে, ভারত এখন সেই জাতির একান্ত বশতাপন্ন। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন গিয়াছে, সামাজিক স্বাধীনতাও সেইরূপ যাইবে কি না, ইহা বিচারের স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব অগ্রেই দেখিতে হইবে যে, ভারত সমাজের স্বাধীন ভাব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। ভারত সমাজের স্বতন্ত্রভাব যাইতে পারে দুই প্রকারে। এক, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের অনুরূপ পরিবর্ত্ত সাধিত হইয়া গেলে হয়। অপর এখনকার ভারতবাসী নিঃশেষিত হইয়া এই দেশ ইউরোপীয় জাতির আবাস ভূমি হইয়া উঠিলেও হয়। এই দুইটী বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টীর বিচারই অগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ যদি ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশিত হইয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, তবে আর ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কি কি পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয় থাকে না। অতএব ভারতবর্ষ ইউরোপীয় কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইতে পারে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে দুইটী স্থূল কথা আছে। (১) উপনিবেশ

স্থাপন বিরল-প্রজ দেশেই হয়। (২) উপনিবেশ স্থাপন সমপ্রকৃতিক দেশেই ভাল হয়; অর্থাৎ যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিবে তাহারা যেমন দেশ হইতে আইসে সেই দেশের সমানশীতোষ্ণ এবং তাহার সমান জল, বায়ু শস্যাদি বিশিষ্ট দেশেই উহারা সহজে বসবাস করিতে এবং বর্দ্ধিতবংশ হইতে পারে।

উল্লিখিত দুইটী সূত্রের প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রতি উহার কোনটীই খাটে না। ভারতবর্ষে প্রজার বিরল প্রচার নহে। ইহার মধ্যে অনেক বন ভূমি এবং পার্ব্বতীয় ভূমি আছে। সে সকল স্থান অধিক লোকের বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সে সকল ধরিয়া হিসাব করিলেও এদেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ১৮৪র অন্যূন এবং ইউরোপে ৯১র অনধিক। ইহাতেই ভারতবর্ষের কেমন প্রজাধিক্য তাহা বুঝা যায়। এই কথা অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছি যে, ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রতিবর্গমাইলে ১৮৭, ডেনমার্কের ১৪৩ বেলজিয়মের ৫৪৮, হলণ্ডের ৩৬৯, ইটালীর ২৭৬; অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরির ১৭১, জর্ম্মণির ২৩৬, গ্রেটব্রিটন আয়লণ্ডের ৩১৬, চীনের ২৯০ এবং জাপানের ২৭৫। ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি প্রতিবর্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ অধিক। অতএব ভারতবর্ষ অতি নিবিড়-প্রজদেশের মধ্যেই গণ্য। এখানে অপর জাতীয় লোকের উপনিবেশ সংস্থাপনের সুবিধা নাই।

ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের পক্ষে দ্বিতীয় সূত্রটীও খাটে না। কারণ এক পক্ষে ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান এবং অধিক পরিমাণেই সমতল দেশ। উহার সুবিস্তৃত সমতল ভূভাগের মধ্যে উচ্চ এবং অপেক্ষাকৃত শীতল অধিত্যকা অত্যল্পই আছে। পক্ষান্তরে ইউরোপ শীতপ্রধান। অতএব ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে সমপ্রকৃতিকতা নাই। এই জন্য ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার বিশেষ সুবিধা নাই।

বাঙ্গালার প্রতি বর্গমাইলে ৪৭১, উত্তর পশ্চিম প্রদেশও অযোধ্যায় ৪৩৬, মান্দ্রাজে ২০২, পঞ্জাবে ১৮১, বোম্বাইয়ে ১৫১, মধ্য প্রদেশে ১২৫, রাজপুতানায় ৯২, ব্রহ্মে ৪৫, কাশ্মীরে ৩১।

কিন্তু একটী কথা আছে। ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। ইহার কোন কোন অংশ এমন আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত বিরলপ্রজ এবং পর্ব্বত-বহুল বলিয়া শীতপ্রধান। ভারতবর্ষের সেই সকল ভাগেও কি ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে না? ভারতবর্ষের মধ্যে ঐরূপ স্থানের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গড়ে ঐ স্থানগুলিতে বর্ত্তমান প্রজার সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২১র অনধিক। ঐ সকল প্রদেশে ইউরোপীয় শ্রমজীবী লোকেরাও আসিয়া বাস করিতে পারে।

অপর একটী কথাও বিবেচ্য আছে। অবিরল-প্রজ দেশেও উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধা দুই কারণ হইতে হয়। (১) যদি উপনিবেশিতব্য দেশে আপনাদের রাজ্যাধিকার থাকে, আর (২) তৎসহ উপনিবেশ স্থাপয়িতার বল যদি নিয়ত বৃদ্ধিশীল থাকে, তাহা হইলেও হয়।

উল্লিখিত দুই সূত্রের মধ্যে প্রথমটী ভারতবর্ষের প্রতি খাটিয়াছে। ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ পার্ব্বতীয় এবং শীতপ্রধান তাহার সকলগুলিই ইংরাজ রাজের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, অথবা করিলেই হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতবর্ষের ঐ সকল ভাগে উপনিবেশস্থাপনের প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ ঐ সকল ভাগ একেবারে নিস্প্রজ অথবা অস্বামিক নহে। দ্বিতীয়তঃ গ্রেটব্রিটন এবং আয়র্লণ্ড হইতে প্রতিবৎসর যে প্রায় ২ লক্ষ লোক দেশের বাহির হইয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ইউনাইটেড দেশে এবং অল্প লোকমাত্র ইংরাজের নিজের অধিকারে গমন করে। ভারতবর্ষে যে দুই হাজার লোক বর্ষে বর্ষে আইসে তাহারা প্রায় সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সুতরাং যত কাল ইউনাইটেড দেশের এবং তাহার পরে কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া কেপকলনি, মধ্য আফ্রিকা, প্রভৃতি দেশে উপনিবেশের অধিকতর সুবিধা থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে স্বেচ্ছাতঃ আসিবার জন্য ইংরাজ ঔপনিবেশিক অধিক যুটিবে না। পৃথিবীর যতস্থানে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহার শতকরা অশীতি ভাগ ইংরাজেরা ঐ কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই উপ-

নিবেশ যোগ্য স্থান সমস্তে যাইবার সুবিধা থাকিতে ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে ইংরাজের উপনিবেশের চেষ্টা হইবার সম্ভাবনা অল্প।

আর এক প্রকারে ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে ইংরাজ উপনিবেশের সূত্রপাত হইতে পারে। ইংরাজরাজ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার স্বজাতীয় কতকগুলি লোক ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করিয়া থাকিলে ভারত বর্ষকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার এবং তাহার আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ দমন করিবার সুবিধা হইবে; এবং তাহা মনে করিয়া রোমীয়েরা যেরূপ আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ সকলে সৈনিক নিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল ইংরাজেরাও সেইরূপ চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে দুই চারিটি উপনি বেশের বীজ বপন করিয়া দিতে উৎসুক হইতে পারেন। গ্রিফিন সাহেব যে কাশ্মীরে উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেটি ঐরূপ একটি কথা। তিনি একেবারে ইংলণ্ড হইতে ৩০ লক্ষ উপনিবেশিক আনিয়া কাশ্মীরে বসাইতে বলেন নাই। এখন হইতে উপনিবেশের সূত্রপাত করিয়া রাখিলে প্রয়োজনের সময়ে অর্থাৎ রুষিয়ার সহিত ভারতবর্ষ লইয়া যুদ্ধের সময়ে কাশ্মীর প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে ইংরাজ ফৌজ পাওয়া যাইবে এই কথাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজরাজ যদি এই কাজে হাত দেন তবে তাঁহার শাসন আরও কঠোর হইয়া পড়িবে, তাঁহার শোষকতা আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তিনি এক্ষণ অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে প্রজার বিরাগ ভাজন হইবেন। কিন্তু হয়ত এ সকল কথা ভাবিয়া ইংরাজ পশ্চাৎপদ হই-বেন না। তিনি আপনার বলবত্তা দৃঢ়তর করিবার লোভে কাশ্মীর এবং তাদৃশ দুই একটি প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

কিন্তু ইংরাজের প্রতাপ কি চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে?—এই বিচার দ্বিতীয় সূত্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট। সাম্রাজ্য শক্তির লোপ বা খর্ব্বতা হইলে উপ-নিবেশাদির সর্জ্জন, পালন এবং রক্ষণ হয় না। তবে ইংরাজের সাম্রাজ্যশক্তি যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত এবং প্রচারিত হইতে পারে।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, কোন জাতি কর্তৃক সংস্থাপিত কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই। আসিরীয় সাম্রাজ্য ১৬০৯ বর্ষ ছিল, মীড পারস্য ৪০০ বর্ষ, গ্রীক ১৪০০ বর্ষ, রোমরুম ২২০০ বর্ষ, মুসলমানের ভারত সাম্রাজ্য ৫৫০ বর্ষ, আরব সাম্রাজ্য ৩০০ বর্ষ, স্পেনীয় ১১০০ বর্ষ, পোর্টুগীজ ৭০০ বর্ষ। ইহাদিগের প্রথম ছয়টী একেবারেই গিয়াছে। শেষের দুইটীরও সাম্রাজ্য শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে, তবে রাজ্যের স্বাধীনতা এবং কতক অধিকারেরও লোপ হয় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বকার সাম্রাজ্যগুলি গিয়াছে বলিয়াই কি মনে করিতে হইবে যে, কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হইতে পারে না? সাংদৃষ্টিক ন্যায়ের বল কি এত অধিক যে তাহারই উপর অনুমানের একান্ত নির্ভর হইতে পারে? প্রাণি শরীরের পক্ষে বলা গিয়া থাকে, জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। এ কথাটী সম্পূর্ণ সাংদৃষ্টিক-ন্যায়মূলক হইলেও ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া সম্যক্ পরিগৃহীত হয় নাই। কারণ অনেকানেক লোক ঐ চিরপ্রচলিত বাক্য সত্বেও চিরজীবী হইবার উপায় আবিষ্করণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকানেক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাটী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচারের উপর কোন প্রকারে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বিচারাবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়াছেন যে প্রাণিশরীরের বৃদ্ধির সহিত সেই শরীরের ভার তাহার ঘন ফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং বেধের গুণফলের) অনুসারে বর্দ্ধিত হয় এবং উহার স্থিতিস্থাপক শক্তিপেশী নিচয় বর্গফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং বিস্তারের গুণ-ফলের) অনুসারে বাড়ে! অতএব দেহের ভার যত বাড়ে বল তেমন বাড়ে না। এই জন্য দেহের পাত হয়।

অতএব সাম্রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী. সাংদৃষ্টিক-মূলক এই কথাটীর প্রতিপোষক কোন স্বতন্ত্র যুক্তি আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। সেরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ তিনরূপ হইতে পারে। এক এই—সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে ধনের বৃদ্ধি; ধনের

বৃদ্ধিতে সুখের অভিলাষ; সুখাভিলাষে আলস্যপ্রবণতা এবং আলস্য হইতে দৌর্ব্বল্য; এবং দৌর্ব্বল্য হইতে বিনাশ। আসিরীয়া, পারস্য, গ্রীক, প্রভৃতি সাম্রাজ্য মুখ্যতঃ এই কারণেই গিয়াছে।

সাম্রাজ্যক্ষেপের দ্বিতীয় সূত্র এই—সাম্রাজ্য অতি বিস্তৃত হইলে তাহার বিভিন্ন ভাগনিবাসী জনগণের স্বার্থ বিভিন্ন হইয়া উঠে। স্বার্থভেদে ঐকমত্য থাকে না—বিভিন্ন ভাগের পরস্পর বিবাদ হয়। সেই বিবাদ শুদ্ধ বল প্রয়োগে মিটে না। সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমেরিকার বিচ্ছেদে ইংলণ্ডের একটা প্রভূত অধিকার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড সে আঘাত সামলাইয়াছেন—ঐরূপ অপর উপনিবেশের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও আবার সামলাইতে পারিবেন। কিন্তু স্পেন তাহা পারেন নাই।

সাম্রাজ্য পতনের তৃতীয় সূত্র এই—সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া যে জাতি বাড়িয়া উঠে সে অপর কোন প্রবলতর জাতি কর্তৃক পর্য্যুদস্ত হয়; সুতরাং তাহার সাম্রাজ্যাধিকার থাকে না। বেনিস এবং জেনোয়া এইরূপে স্পেন এবং পর্টুগাল কর্ত্তৃক, স্পেন এবং পোর্টুগাল হলন্দ কর্ত্তৃক এবং হলন্দ ইংরাজ কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রতি উল্লিখিত তিনটী সূত্রের প্রয়োগ করিয়া দেখা যায় যে (১) ইংলণ্ডের ধন অতি বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ধনের প্রতি ইংরাজের মায়াও বাড়িয়াছে। কিন্তু ইংরাজ খুব বাবু হয়েন নাই। আয়াস স্বীকারেই তাঁহার আনন্দানুভব হয়। অক্‌সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা পড়া শুনায় তেমন মনোযোগ না করেন, তাঁহারাও দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি নৌকাবাহন প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য্যে বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকেন। এখানেও দেখা যায়, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরা আপনাপন কাজ ভাল করিয়া করুন বা না করুন, কিন্তু টেনিস, ক্রিকেট, ক্রোকে, বাড্‌মিণ্টন এবং শিকার খেলায় খুব মন দেন। (২) ইংলণ্ড আপনার উপনিবেশিকদিগকে চিরকালই স্ববশে রাখিতে পারিবেন এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। উহারা যে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, মার্কিনেরাই তাহার

লক্ষণ দেখাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মার্কিনেরা ছাড়িয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডের কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? মার্কিনেরা হাত ছাড়া হইবার পরই ত প্রথম বোনাপার্টি ইংলণ্ডের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। (৩) জর্ম্মণি এবং রুসিয়া যথেষ্ট বাড়িতেছে বটে, কিন্তু জর্ম্মণি, যত দিন হলণ্ড এবং ডেনমার্ককে আত্মসাৎ না করিবে, ততদিন ইংলণ্ডের সমকক্ষতাও প্রাপ্ত হইবে না। রুসিয়ারও তুর্কি এবং আফগানকে স্ববশ করা চাই, তবে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী হইতে পারিবে। সে সকলের অনেক বিলম্ব। ফ্রান্স, জর্ম্মণির বৃদ্ধি নিবারণ করিবে এবং জর্ম্মণি ও অষ্ট্রীয়া মিলিত হইয়া রুসিয়াকে বাড়িতে দিবে না। তবেই অপর কেহ বড় হইয়া ইংলণ্ডকে খাট করিতে পারিবে না। সম্প্রতি ইংলণ্ডের শিল্পজাত ইউরোপীয় অপরাপর দেশে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক যাইতেছে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অনেকানেক দেশে ইংলণ্ডের শিল্পজাতের আমদানিই অধিক হইয়া উঠিতেছে। অতএব ইংলণ্ডের ধন এবং সাম্রাজ্য শক্তি যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তেমনি থাকিবে না, ইহা বলিবার কোন হেতুই এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না।

যদি ইংলণ্ডের বল চিরকাল অটুট থাকে এবং তাঁহার ভারতবর্ষ অধিকার কখন হস্তচ্যুত না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ দেশ অতি নিবিড়-প্রজ বলিয়া সামান্যতঃ ইংরাজের উপনিবেশিত না হইয়াও একটী বিশেষ প্রকারে ইংরাজের উপনিবেশিত প্রায় হইতে পারে; অর্থাৎ এ দেশে ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের প্রবেশ না হইয়া এখানকার প্রধান প্রধান রাজপদ সমস্ত যেমন ইংরাজের করকবলিত হইয়াছে, তেমনি ক্রমে ক্রমে জমিদারী স্বত্ব, শিল্পালয়ের মূলধনিকতা, এবং অপর সর্ব্ব প্রকার কর্তৃত্ব ইংরাজের আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে। দেশীয়েরা ইংরাজ ভূস্বামীর প্রজা, ইংরাজ মনিবের কর্ম্মকর এবং ইংরাজ নেতার অধীন লোক মাত্র হইয়া থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ এখন হইতেই তাহার কতকটা সূত্রপাত হইয়া যাইতেছে। চাকর, নীলকর এবং অনেক স্থলে ইজারদার আর কোথাও কোথাও জমীদার রূপেও ইংরাজ ভারতবর্ষে ভূস্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন।

জমিদারী, বাটী, বাগান প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও ইংরাজেরা টাকা ধার দিতেছেন। এই সে দিন বেতিয়ার মহারাজা ইংলণ্ড হইতে ৫ লক্ষ পৌণ্ড ধার পাইয়াছেন। তুলার কল, পাটের কল, গালার কারখানা, রেশমের কুঠি বহু পরিমাণেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ক্রমশঃ ইংরাজের হাতে যাইতেছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সুনাব্য নদ নদীতে যে সকল বাষ্পীয় পোত নিরন্তর গতি বিধি করিতেছে, সকলগুলিই ইংরাজ বণিকের সম্পত্তি। দেশীয়দিগের হস্ত হইতে সকল অধিকার, ক্ষমতা এবং ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে খসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডীয় শিল্পজাতের আমদানিতে দেশীয় শিল্পের লোপ হইয়া কৃষিজীবীর সংখ্যা বাড়িতেছে, পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারাদির লোপে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। সাম্রাজ্য বল ত্রিবিধ। (১) রাজনৈতিক বল, [২] সৈনিক বল, (৩) ধন বল। ভারতবর্ষ প্রথম দুইটী দ্বারা সন্দষ্ট হইয়া ক্ষতশির হইয়াছে, তৃতীয় বলটী ক্রমে ক্রমে ইহাকে দৃঢ়তররূপে বাঁধিবার নিমিত্ত প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীদিগের মধ্যে ধনশালী লোকের সংখ্যা একান্ত ন্যূন হইয়া গেলেও উহাদিগের ধর্ম্মলোপ না হইলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে না।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(ধর্ম্মপ্রণালী বিষয়ক)

পণ্ডিতেরা কোন মানবিক ব্যাপার সম্বন্ধেই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, উন্নতি এবং অবনতি, এই শব্দগুলি যথাশ্রুত মুখ্যার্থে প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, যাহা আপনার সময়ের উপযোগী তাহাই উৎকৃষ্ট বা উন্নত, এবং যাহা সময়ের অনুপযোগী তাহাই অপকৃষ্ট বা অবনত। এই গৌণার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখায় সাধারণ লোকের মধ্যে দুই প্রকারের ভ্রম জন্মে। এক যাহা পূর্ব্বগত তাহাই অপকৃষ্ট বলিয়া নিন্দিত, অথবা যাহা পরবর্ত্তী তাহাই হেয় বলিয়া ঘৃণিত

হয়। প্রথমটীর ফল অযথানুকরণ এবং দ্বিতীয়ের ফল গোঁড়ামি। প্রথমটী হইতে পুরাতনের প্রতি বিরাগ এবং দ্বিতীয়টী হইতে নূতনের প্রতি অযত্ন সম্ভূত হয়। প্রথমটী বলে যাহা নূতন তাহাই আসুক, পুরাতনের থাকিয়া কাজ নাই, দ্বিতীয়টী বলে যাহা যেমন আছে, তাহা ঠিক সেই রূপই থাকুক।

এ দুইটী ভাব দুইটী উপধর্ম্মস্বরূপ। প্রকৃত ধর্ম্ম ইহাদের কোনটিতেই নাই। যাহা উপযোগী, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অনুকূল পরিবর্ত্ত, তাহাই হউক—এই ভাবই ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাবের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া 'উন্নতি' 'উৎকর্ষ' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃতার্থ যে 'উপযোগিতা' মাত্র, ইহাই স্মরণ রাখিয়া, ইংরাজ আধিপত্যে ভারত সমাজে কিরূপ পরিবর্ত্তের উন্মুখতা জন্মিতেছে, তাহা বিচার পূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান সামাজিক বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রণালী লইয়া সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

ধর্ম্ম তিনটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। যেমন দেহের শিরোভাগ, মধ্যভাগ, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্ম্মের শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া; মধ্যভাগ, নীতিব্যবহার লইয়া; এবং হস্তপদাদি, আচার-প্রণালী লইয়া সংঘটিত মনে করা যাইতে পারে। উহারা পরস্পর পৃথক হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়। যেমন শিরোদেশ হইতেই অপর দুই ভাগের বল, তেমনি অপর দুই ভাগে বিশেষ বিশেষ কার্য্য না হইলেও শিরোদেশে বলসঞ্চার হয় না। ধর্ম্মের শিরোভাগ বা মতবাদ, দর্শনাত্মক-জ্ঞান-কাণ্ড। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের মন যাহা কিছু জানিতে এবং বুঝিতে চায়, এই ভাগ তাহা জানাইয়া এবং বুঝাইয়া দেয়। মনুষ্য আপনাকে কিরূপে রাখিবে এবং অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা নৈতিক উপদেশের পালনে শিক্ষিত হয় এবং যদ্দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারিবে আচারকাণ্ডে তাহার অভ্যাসের উপায় বিবৃত হয়। এই রূপে ত্রিধাবিভাজিত আর্য্যধর্ম্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে পারে কি না, তাহাই ক্রমশঃ দেখা যাইবে।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের কয়েকটী সূত্র নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে।

(১) ব্যাপকতর ধর্ম্মের অবির্ভাবে ব্যাপ্য-ধর্ম্ম তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। মনে কর, কোন বালক বা যুবা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে, কয়েকটী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান মাত্রেই ধর্ম্মের চরম, তাহাকে যদি অপর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, ঐ সকল অনুষ্ঠানমাত্রেই ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম জাগতিক সমুদায় গূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর দেয় এবং তাহার আদেশ সকল কার্য্যেই যাবজ্জীবন পালনীয়, তাহা হইলে সে যাহাকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, তাহা অপেক্ষা উদারতর ভাবে মগ্ন হইয়া পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যদি কোন কারণে কোন ব্যক্তির বা জাতির মন উচ্চতর এবং পবিত্রতর ধর্ম্ম গ্রহণের উপযোগী হইয়া থাকে তবেই তাদৃশ ধর্ম্ম প্রণালীর সাক্ষাৎ লাভে ঐ ব্যক্তি বা জাতির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রহণ যোগ্যতা না জন্মিলে উচ্চতর ধর্ম্ম আপনা হইতে গৃহীত হয় না।

(২) বিজেতৃদিগের নিয়ত পীড়নেও ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যদি একজাতি অপর জাতীয় লোক কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং বিজয়ীরা আপনাদের ধর্ম্মটীকে বিজিতদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য নিয়ত যত্ন করেন, তাহা হইলে বিজিত জাতির ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হয় অথবা বিজিতেরা নিঃশেষিত হইয়া যায়। মিসর পারস্য প্রভৃতি দেশে এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের এবং দক্ষিণ আমেরিকায় খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

(৩ ধর্ম্মের আদান প্রদান হয়। অর্থাৎ যদি দুইটী জাতির ঘনিষ্ঠ মিশ্রণ ঘটে, তবে উভয়ের ধর্ম্মও সম্মিলিত হইয়া একরূপ হইয়া যায়। রোমীয় এবং গ্রীকদিগের এবং অপরাপর দেবপূজাপরায়ণ জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ হইয়াছে।

[৪] কোথাও কোথাও দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্রবে একটী নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যদি দুইটী জাতি বুদ্ধিবিদ্যায় কতকটা সমকক্ষ হয় এবং উভয়ের মধ্যেই জ্ঞানচর্চ্চা সমভাবে প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে দুইটী হইতেই কিছু কিছু মতবাদ এবং আচার পরিগৃহীত হইয়া নূতন পন্থাটী জন্মে।

ভারতবর্ষের নানক পন্থী, কবীর পন্থী, গোরক্ষ পন্থী, দাদু পন্থী, প্রভৃতি পন্থ সকল মুসলমান এবং হিন্দু উভয় ধর্ম্মের সম্মিলনসম্ভূত।

(৫) অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংখ্যায় বৃহত্তর জাতির সহিত সংস্রব ঘটিলে তাহার ধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র জাতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত দেশাদিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, এবং সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতিতে খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব, এই সূত্রে হইয়াছিল, বলা যায়।

[৬] দেশের ভিন্নতা হইলেও ধর্ম্ম ভাবে ঈষৎ ভিন্নতা জন্মিবার সম্ভাবনা। যদি কোন জাতি আপনাদের পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতিক দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে জগতের মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষে পূর্ব্ব হইতে ভিন্নরূপ দেখায় এবং তাহারা পুরুষ পরম্পরাক্রমে যে দেশে আসিয়াছে তাহার উপযোগী সুতরাং তদ্দেশ প্রচলিত ধর্ম্মভাব গ্রহণ করিতে উন্মুখ হয়। রোমধ্বংসকারী বর্ব্বর জাতীয়েরা যে, অতি সহজেই খৃষ্টান হইয়াছিল, আবাস পরিবর্ত্ত তাহার অন্যতম কারণ।

এই ছয়টী স্থূল স্থূল সূত্রের মধ্যে কোনটীর প্রয়োগে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় কি না? প্রথমতঃ ধর্ম্মমতবাদ সম্বন্ধে বলা যায়—

[১] আর্য্যধর্ম্মের অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদিত হয় নাই—হইতেও পারে না। এ ধর্ম্ম কোন একটী বাক্যে অথবা কোন ঘটনা বিশেষের প্রতি প্রতীতি খ্যাপনে অথবা কোন বিশেষ মতবাদে সম্বদ্ধ নহে। ইহার প্রদত্ত শিক্ষা, অধিকারিভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে পারে। ইহা অপর কোন ধর্ম্মেরই ব্যাপ্য বস্তু নয়। ইহাতে ভীতি-প্রণোদিত বর্ব্বর জাতীয়দিগের অর্চ্চন বন্দনাদি, বশ্যতা-প্রবণ এবং সম্মিলনপটু যুদ্ধ-কুশল লোকদিগের দাস্য সখ্যাদি, ভক্তিপরিষিক্ত ভাবুক জনগণের প্রেম বাৎসল্যাদি, এবং অধ্যাত্ম দর্শনোন্মুখ মানবদিগের আত্মনিবেদন এবং অভেদ ভাবাদি, অতি প্রোজ্জ্বল রূপেই বিদ্যমান। আর্য্য-ধর্ম্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও নাই।

[২] ভারতবর্ষের অধিপতি ইংরাজ। ইংরাজ পরধর্ম্মের পীড়ন করেন না। তিনি বরং স্বদেশ মধ্যে কখন কখন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকের প্রতি অযথাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশে আসিয়া তাহা কখনই করেন নাই। আর ভারতবর্ষে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া আছেন, সেই প্রতিজ্ঞা সম্যক্রূপেই পালন করিয়া চলিতেছেন বলা যায়।

(৩] ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ পাদ্রি সাহেবদিগের নিরন্তর আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া ভারতবর্ষীয়গণ আর্য্যধর্ম্মের সারভূত কথা সকলের সমধিক চর্চ্চা করিতেছেন। আর্য্যধর্ম্মের যে ভাগটী খৃষ্টধর্ম্মের অনুরূপ. সেই ভাগই সম্প্রতি বিশেষরূপে প্রকটিত হইতেছে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদের অনুরূপ ভারতবর্ষের যে বৈষ্ণবতন্ত্রতা তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে জর্ম্মণ জাতীয় পণ্ডিতেরা কেহ স্পষ্টতঃ কেহ বা অস্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষীয় মতবাদ হইতে ভিন্ন নয়। ইংরাজেরাও ক্রমশঃ ঐ জর্ম্মণ মতবাদে দীক্ষিত হইতেছেন এবং পূর্ব্বে খৃষ্টান ধর্ম্মের যেরূপ সঙ্কীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা ছাড়িয়া দিয়া উহাতে আর্য্যধর্ম্মসম্মত উদারতর ব্যাখ্যা প্রবিষ্ট করিতেছেন। কালে যখন জর্ম্মণদিগের মতবাদ অধিকতর প্রচলিত হইয়া উহা পাদ্রি সাহেবদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে নূতন জিনিস বলিয়া প্রদত্ত হইবে, তখন আবার অদ্বৈতবাদ প্রোজ্জ্বলতররূপে পরিদৃষ্ট হইবে। হেগেল এবং সোপেনহৌর এই দুই জন জর্ম্মণির অতি প্রধান দার্শনিক। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম্য মতবাদ সম্বন্ধে হেগেল বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা প্রকৃত জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বিচারপূর্ব্বক করিতে পারে নাই—আন্দাজিতে করিয়াছিল মাত্র! সোপেনহৌর বলিয়াছেন যে. আমি যাহা বলিলাম তাহার সহিত বৈদিক উপনিষদ সমস্তের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন আছে; কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি উপনিষদ গ্রন্থ হইতে নিজ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ইউরোপে

সংস্কৃতের চর্চা এখনকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত এবং গভীরতর হইলে, গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্রাদি পাঠে ইউরোপ যেমন একবার জাগ্রৎ হইয়াছিল, আবার সেইরূপ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর জাগ্রৎ ভাব ধারণ করিবে। ফলতঃ অতীন্দ্রিয় ভাবের একান্ত বিরোধী যে সংকীর্ণ জড়বাদ এক্ষণে ইউরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিকেরা স্থায়ীবস্তু বলিয়া মনে করেন না এবং ঐ ইউরোপীয় জড়বাদ এদেশে আসিলেও ভারতবর্ষের প্রশস্ত অদ্বৈতবাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াই যাইবে। অতএব ইউরোপীয় সংস্রবে এবং ইংরাজ আধিপত্যে আমাদের ধর্ম্মমতবাদের কোন মৌলিক পরিবর্ত্ত সংঘটন হইতে পারে না।

(৪) যদি ভারতবর্ষে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা বলবৎ থাকে এবং এখানকার অধিবাসিগণ একেবারে বিদ্যাবিহীন না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মুসলমানদিগের অধিকার কালেও যেমন লোকে ফারসি আরবি পড়িয়া মুসলমান হয় নাই, তেমনি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী পড়িয়াও সাধারণে ধর্ম্মচ্যুত হইবে না। নূতন ব্রাহ্মদিগের ন্যায় দুই একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে দেখা দিবে মাত্র। ফলতঃ যেমন মুসলমানেরাই আর্য্যমতবাদের স্বাদগ্রাহী হইতেছিল, ইংরাজও ক্রমে তাহাই হইবেন।

(৫) ভারতবাসী সংখ্যায় অল্প নয়। প্রত্যুত পৃথিবীর সর্ব্বত্র লইয়া যত ইংরাজ আছেন, ভারতবাসীর সংখ্যা তাহার তিন গুণ অধিক। সম্প্রতি বিদ্যাবত্তাতে ভারতবাসী ন্যূন হইয়া আছে। কিন্তু যখন প্রাচীন সংস্কৃতের প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে এবং ইহারা আপনাদের চলিত ভাষাগুলিতে যত্নপূর্ব্বক সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছে, তখন যে ইংরাজদিগের অপেক্ষা নিতান্তই স্বল্পবিদ্য হইয়া থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অপর, ইউরোপীয় ধর্ম্মমতবাদ যে অভিমুখে আসিতেছে, যখন আমরা সেই দিকেই পূর্ব্ব হইতে আসিয়া আছি, তখন আপনাদের রক্ষায় উপযোগী কোন মৌলিক পরিবর্ত্তই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না অর্থাৎ আর্য্যধর্ম্মের পরিবর্ত্ত সাধনে উন্নতির বা উপযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

(৬) ভারতবর্ষবাসীরা স্বদেশেই আছেন. এবং স্বদেশেই থাকিবেন। আর যদিই স্বদেশ হইতে গিয়া অপর কোথাও বাস করেন, তাহা হইলেও তথাকার বাহ্য প্রকৃতি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিরূপ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে সমুৎপন্ন ব্যাপক ধর্ম্ম ভাবের বিসদৃশ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, নীতিবাদ। পূর্ব্বকালে অপরাপর জাতীয় লোক ভারতবাসীকে কেমন সুনীতিসম্পন্ন এবং একান্ত সত্যপরায়ণ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। অনধিক কাল গত হইল, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মন্‌রো সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশের নীতি বিষয়ক বাণিজ্য চলে,, অর্থাৎ ভারতবর্ষের নীতি সেই দেশে যায় এবং সে দেশের নীতি ভারতবর্ষে আইসে, তবে ইউরোপীয় দেশটী আমদানী দ্রব্যগুলি পাইয়া যৎপরোনাস্তি লাভবান হয়। কিন্তু আজি কালি আর সে ভাবের কথা নাই। এখন ভারতবাসীকে দুর্ব্বিনীত বলাই একটী অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে, এবং অত্যন্ত-অন্তর্দৃষ্টি, শান্ত স্বভাব, এবং পূর্ণতাভিলাষী ভারত-সন্তান সহজেই আপনার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ করিয়া আপনার প্রতি আরোপিত সকল ত্রুটিই স্বীকার করিয়া লইতেছেন; অন্যের সহিত তুলনায় তাঁহার নিজের যে উৎকর্ষ প্রমাণিত হইতে পারে, অমানিত্বাদিগুণ বশতঃ তিনি সে তুলনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

অনেক জাতির শাস্ত্রেই ধর্ম্ম দশ-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে আর্য্যশাস্ত্রেও ঐরূপ অনেকানেক উক্তি আছে। মনু বলেন—

ধৃতিঃক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ. ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মলক্ষণ।

অপর কোন জাতিরই মধ্যে শান্তি দৃঢ়তা এবং পবিত্রতা সাধনের এমত উচ্চ এবং কার্য্যকারী উপায় সকল কথিত হয় নাই।

প্রত্যুত অপর কাহার বর্ণিত ধর্ম্মলক্ষণ ইহার সহিত তুলিত হইতেই পারে না।

লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে "অমানিত্বমদম্ভিত্বহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবং" এই কয়েকটী শব্দেই সমস্ত সার কথা রহিয়াছে।

লোকের প্রতি মনের ভাব কেমন হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও সারাৎসার বলা হইয়াছে, যথা—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা।

অন্যের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, মিত্রের প্রতি, দ্বেষ্টার প্রতি, সর্ব্বদা আত্মবদ্‌ব্যবহার করিবে, ইহাই দয়াধর্ম্ম। আর্য্য-নীতির আরও একটী উচ্চতম সোপান আছে। তাহা এই—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।

বস্তুতঃ আর্য্যনীতি শাস্ত্র প্রকৃত বস্তু প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত অভেদ হইয়া আত্মপর বোধটীকেই থাকিতে দেয় না—এই জন্য ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। এই কারণে স্বল্পাধিকারীর চক্ষে ইহাতে একটী প্রকাণ্ড ত্রুটি লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যুত সেই একমাত্র ছিদ্র দ্বারেই ভারতবর্ষে যাবতীয় ধর্ম্মবিপ্লবের স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। প্রথমে বৌদ্ধই ঐ পথ দেখাইয়া দেন। তিনি "সংঘ" বা আত্মসম্প্রদায়কে নিরতিশয় ভক্তি এবং প্রীতি করিতে শিক্ষা দেন। তাহার পর, যতগুলি "পন্থ" মুসলমানদিগের সময়ে আর্য্যধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূতরূপে উত্থিত হইয়া ক্রমে উহাতেই লীন হইয়া গিয়াছে তাহারাও মুসলমান ধর্ম্ম হইতে শিখিয়া আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছিল। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উহাদিগেরই অন্যতম।

যাহা হউক, বৌদ্ধবাদ, 'পন্থ'বাদ এবং বৈষ্ণবতা ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হওয়াতেই এখানকার লোকের মনে উহাদিগের উপদিষ্ট সাম্প্রদায়িকসুহাদ্‌-

ভূতি এবং প্রেম, প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত ভারতসমাজে দৃঢ়তর একতার প্রবর্ত্তন ও সম্বর্দ্ধন অর্থাৎ ভারতবাসীমাত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্মিলন ইংরাজের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রভাবে হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়—আচার। আমাদিগের আচার প্রণালীর কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলে আচারের সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি কিরূপ তাহা স্মরণ করিতে হয়; শাস্ত্র বলেন—

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতা প্রজা।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥"

আচার হইতে আয়ুষ্মত্তা, অভীষ্টরূপ সন্তান, ধন এবং অক্ষয়ভাব লাভ হয়। আচারে দুর্লক্ষণের নাশ হয়।

অতএব আচারের সাক্ষাৎ ফল ঐহিক। সুতরাং উহা মনুষ্যের ভূয়োদর্শন বা বিজ্ঞানের সহিত অসম্পৃক্ত নয়, অর্থাৎ প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান যাহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহা হইতে ভিন্ন হইবে না। মনুসংহিতায় ভক্ষ্যাভক্ষ বিচার প্রকরণের প্রারম্ভেই নিম্নোক্ত শ্লোকটি আছে,—

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাং।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥

হে প্রভো! আপনি যেরূপ বলিলেন সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বাক্যে বলা হইতেছে—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাৎ অন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদের অনভ্যাস বশতঃ, আচারের বর্জন নিমিত্ত আলস্য দোষ হেতু এবং ভোজন দোষ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয়।

অতএব ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের প্রকৃত কারণ শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ—তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই ভাবটী সুব্যক্ত হইয়াছে।

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়া॥

আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ্য, সুখ এবং রুচি-বৃদ্ধিকর সরস, সস্নেহ, স্থায়ী এবং তৃপ্তি-জনক ভক্ষ্য দ্রব্য সাত্ত্বিক স্বভাব লোকের প্রিয় হয়।

অতএব কোন্ দ্রব্য খাইতে আছে আর কোন্ দ্রব্য খাইতে নাই, তাহা নির্ণয় করিবার শাস্ত্রসম্মত মূলসূত্র শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য রক্ষারই সূত্র—দীর্ঘায়ুঃ লাভের সূত্র। ঐ মূল সূত্রের যত শাখা পল্লব আছে, সেগুলির অধিকাংশই এতদ্দেশে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপযোগী নিয়ম বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সে নিয়মগুলি সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারদিগের অভিজ্ঞতাসম্ভূত; সুতরাং তাচ্ছল্যের বস্তু নহে। আজি কালি ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই স্বাস্থ্য হারাইতেছেন এবং স্বল্পায়ুঃ হইতেছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার আহার শাস্ত্রকারদিগের প্রশংসিত সেই প্রকার আহারই প্রচলিত থাকিবে, কারণ তাহাতেই রক্ষার উপায়, তাহাই আমাদের উপযোগী। কিন্তু বিদেশগত হিন্দু সন্তানের আহার কিছু ভিন্নরূপ হইলে ততটা দোষ না হইতেও পারে। ধাতুভেদে এবং বয়োভেদে এবং ঋতুভেদে আহারের অবান্তর ভেদ হওয়া অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক নহে।

আচারের অপরাপর অঙ্গের এই কয়েকটী প্রধান (১) দশবিধ সংস্কার (২) ব্রতানুষ্ঠান (৩) আশ্রম ভেদ রক্ষা (৪) শ্রাদ্ধ পূজাদি ক্রিয়া।

এগুলি অনেক লুপ্ত হইয়াছে। সাগ্নিকতা পূর্ব্বেই গিয়াছিল। বৌদ্ধের প্রাবল্য হইতে আচার লোপ আরম্ভ হইয়াছে, মুসলমানের অধিকারে আরও বাড়িয়াছে, এখনও বাড়িতেছে। কিন্তু আচার লোপ হইবার কারণ, সকল আচারের অনুপযোগিতা নহে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচার ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া যাওয়াতেই লোকের মধ্যে আচার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অনেক

ম্লানতা হইয়াছে। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে এই বঙ্গ দেশেই স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত আচারকাণ্ড এখনও সজীব আছে এবং এই প্রদেশেই স্মার্ত্তাচারও অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার জল বায়ু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও আচার রক্ষা নিবন্ধন এ প্রদেশের লোকেরা অনেক বিষয়েই অন্য কোন প্রদেশবাসী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই।

বাস্তবিক আচারটী পরমধর্ম্ম না হউক, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষার প্রধানতম উপায়। আচার যাওয়া ভাল নয়। যে দেশের এবং যে জাতির যে আচার, তাহার ত্যাগে তদ্দেশীয় এবং তজ্জাতীয় লোক সকল ক্ষীণ এবং অল্পায়ুঃ হয়। রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারের অনেকানেক নিয়ম প্রচলৎ আছে। উহাঁরা তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া ইউরোপ পচলিত ধনোপার্জ্জন পথার সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারেন। ইহুদীয়েরাও খুব ধনবান এবং নীরোগ এবং আয়ুষ্মান্ হয় এবং কখন কোন দেশে আপনাদিগের জাতীয় আচার পরিত্যাগ করে না। অতএব ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া এক্ষণে কেহ কেহ যেমন আচার ছাড়িতেছেন তাহা অপ্রকৃতদর্শীর কাজ।

শাস্ত্রে যে আচারের উল্লেখ আছে, তাহা বহু পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপাল্য। এখনও ব্রাহ্মণেরাই সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এবং অপর সকল ভারতবাসী অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা যে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়া আছেন ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

বস্তুতঃ আচার ধর্ম্মের শরীর। দশ সংস্কার, পবিত্রতার বাঞ্জক। ব্রতানুষ্ঠান ইন্দ্রিয় দমনের বিকাশ। আশ্রম-অধিকারী-ভেদ ভেদ স্বীকৃতির পরিচায়ক। এবং শ্রাদ্ধপূজাদি পূর্ব্বাগতদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। অতএব সমগ্র আচার লোপে নীতি-লোপও অবশ্যম্ভাবী

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(ভাষা বিষয়ক)

পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাঁহার পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে। মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতা মাতাও যাহা, মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।

দক্ষিণ-আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ান লোকেরা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম খৃষ্টান এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা পোর্টুগীজ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মও নাই, পূর্ব্ব ভাষাও নাই। ঐ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্ব্বতোভাবেই বিলুপ্ত।

মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রো জাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকা খণ্ডের লাইবিরিয়া নামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণদিগের বড়ই আশা ছিল যে, ঐ সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ঐ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রোজাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রো জাতীয় ঐ লোকগুলি লাইবিরিয়ায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো-

জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম আছে, কোর্ট কোর্ত্তা আছে, গির্জা ঘর আছে, বৈদেশিক রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজ্যিকী সন্ধি-পত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ায় জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, সচ্ছলতাও নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য না থাকিত, তবে এত দিন সমীপবর্ত্তী বাস্তব নিগ্রোজাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিন প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটী নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎপ্রদেশীয় ভাষার শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালত গুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রাজ্যই বর্ব্বর বিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল মুসলমানদিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারতবাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুনরুজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রকৃত কথায় হিন্দু

দিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্য-শক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারত-সাম্রাজ্য পাইয়াছেন; বস্তুতঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিম্বা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্তভাব প্রাপ্ত হইবে? আমাদের ভাষাগুলির ভবিষ্য দশা কিরূপ হইবে অনুমিত হইতে পারে, তাহাই এই প্রবন্ধে বিচার করিব।

বিচার্য্য বিষয়টীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, তবে কেমনভাবে থাকিবে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেথানে পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটী জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে—ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল, তাহারও পূর্ব্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয় ত তাহারও পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে দেশটি একেবারে মনুষ্য-শূন্য ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পূর্ব্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মোরভঞ্জের গভীরতম বন প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহারা কোন প্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে

পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা নির্ণীত হয় না।

এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা যায় যে, জাতির বিধ্বংসে জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, যথায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষায় লুপ্তহীন হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষায় অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কর্ণওয়াল প্রদেশে কর্ণিস নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর স্বতন্ত্র ভাষারূপে বিদ্যমান নাই—ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলৎ ছিল। ব্রহ্ম দেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ঐ ভাষাটীকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সকলপ্রযত্ন হইয়াছিল—পেগুবী ভাষাটী ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। রুসিয়াধিকৃত পোলণ্ডের মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্নে পোলদিগের ভাষা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে।

উল্লিখিত কয়েকটী স্থলে এবং ঐ প্রকার অপরাপর স্থলেও বিজিত ক্ষুদ্রসংখ্যক লোকের ভাষা বিজয়ী বৃহত্তর জাতির ভাষায় অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিজিগীষু ক্ষুদ্র জাতির ভাষাও বিজিত বৃহত্তর জাতিদিগের ভাষার শিরোবর্ত্তী হইয়াছে, এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। রোমীয়দিগের ভাষা, গ্রীকদিগের ভাষা, এবং আরবদিগের ভাষা এইরূপে তত্তজ্জাতীয়দিগের বিজিত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশগুলিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থলে, দেখা যায় যে, বিজিত প্রদেশগুলির ভাষাতে শিক্ষাদান, বিচারালয়ের ব্যবহার এবং রাজকীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ একেবারেই বন্ধ করা হইয়াছিল।

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষপ্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লিখিত লক্ষণগুলি বা তাহাদিগের কোনটী সংলগ্ন হয় কি না।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ভারতবাসী একেবারে নির্ব্বংশ এবং বিধ্বস্ত

হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ব্বর অল্প-সংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল—জাতি পদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং সুপরিস্ফুট হয় নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তদ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির অনুক্রমেই জন্মে। বর্ব্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সেরূপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ৮০টি ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিক সংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, * এবং পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটি ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানতঃ পাঁচটি ‡ আর্য্যাবর্ত্তে, (১) হিন্দুস্থানী এবং (২) বাঙ্গালা উড়িয়া; দাক্ষিণাত্যে, (৩) মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী কানারী, (৪) তেলেগু, (৫) তামিল, মালায়ালম; এই পাঁচটার মধ্যে একটা অর্থাৎ

---

* ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারীতে মোট ১১৮টি এবং তন্মধ্যে ২৬টি ইউরোপীয় এবং ১২টি এসিয়া ও আফ্রিকার বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। বক্রী ৮০টি ভাষার মধ্যে আকা (আসাম) ১২৫০ এবং পালৌং (বর্ম্মা) ২৮০০ লোকের ভাষা। এরূপ "ভাষা" ৮০টির মধ্যে অনেকগুলি আছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও ফরাসিস এবং স্পেনীয় ভিন্ন বাসক ভাষা; ইটালীয় ভিন্ন মালটীয় ভাষা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের সামান্য বিভিন্নতা ধরা হয় না।

‡ (১) খাস হিন্দী ৮ কোটি ৫৬ লক্ষ, পঞ্জাবী ১ কোটি ৭২ লক্ষ, দক্ষিণী মুসলমানী ৩৬ লক্ষ, সিন্ধী ২৬ লক্ষ, পশ্চিম পাহাড়ী ১৫ লক্ষ, মধ্য পাহাড়ী ১২ লক্ষ, মাড়বারী ১১ লক্ষ—মোট হিন্দুস্থানী ১১ কোটি ২৮ লক্ষ লোকের ভাষা।

[২] খাস বাঙ্গালা ৪ কোটি ১৩ লক্ষ, আসামী ১৪ লক্ষ, উড়িয়া ৯০ লক্ষ। মোট বাঙ্গলা, উড়িয়া ৫ কোটি ১৭ লক্ষ লোকের ভাষা।

[৩] মহারাষ্ট্রীয় ১ কোটি ৯০০ লক্ষ, গুজরাটী ১ কোটি, কানারী ৯৭ লক্ষ, কচ্ছী ৪ লক্ষ। মোট মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, কানারা ৩ কোটি ৯১ লক্ষ লোকের ভাষা।

[৪] তেলেগু ১ কোটি ৯৮ লক্ষ লোকের ভাষা।

[৫] তামিল ১ কোটি ৫২ লক্ষ, মালায়লম ৫৫ লক্ষ। মোট তামিল, মালায়ালম ২ কোটি ৬ লক্ষ লোকের ভাষা।

হিন্দুস্থানী ১০ কোটী লোকের ভাষা—সুতরাং পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণ লোকে হিন্দুস্থানী কহে। বাঙ্গালা-উড়িয়া ৫ কোটী লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মণভাষী লোকের তুল্য। মহারাষ্ট্রীয়ভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, সমস্ত ফরাসীভাষীর সমান। তেলেগু ভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি এবং তামিল-মালায়ালম ভাষীর সংখ্যাও প্রায় ২ কোটী অর্থাৎ ইউরোপের স্পেনীয় ভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও অধিক। এই পাঁচটী ভাষার মধ্যে একটীও অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্য গ্রন্থ আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল মারা পড়িতে পারে না। নেতৃদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত-জাতির ভাষা লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়. কিন্তু এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনটিই ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষীয় বহু প্রচলিত ভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট করিবার জন্য কোন ইচ্ছাই করেন না। প্রত্যুত অনেকে ইংরাজের ভাষা সম্বন্ধীয় রাজনীতির প্রতি অন্যরূপ সন্দেহই করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখেন যে, ইংরাজ প্রতি প্রদেশে এবং কখন কখন প্রতি বিভাগেও ভাষাগত অবান্তর ভেদগুলি রক্ষা করিয়াই চলিতে সমুৎসুক, * এবং তাহা দেখিয়া মনে করেন যে, ভারতবর্ষীয় ভাষাভেদ মিটিলে পাছে সমুদয় অন্তর্ভেদ মিটিয়া যায় এবং ভারতবাসী সবল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে ইংরাজ আমাদের ভাষাভেদ রক্ষা করিতেই চাহেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত অনুমান নয়। দেশের মধ্যে গমনাগমনের সৌকর্য্য যত বৃদ্ধি হইবে, এবং শিক্ষার যত বিস্তৃতি হইবে, এবং ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলে পুস্তক রচনা এবং সংবাদ পত্র প্রচারাদি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই এক একটী ভাষার অন্তর্গত অবান্তর ভেদ লুপ্ত হইবে এবং বিভিন্ন ভাষীদিগেরও মৌলিক ভেদ ক্রমশঃ ন্যূন

* সিন্ধু দেশে সাধারণ লোকে ভাষা দেবনাগরীতে লেখে, তথায় আরবী অক্ষরের প্রচলন, উড়িয়া ও আসামীকে বাঙ্গালা হইতে সযত্নে পৃথক রাখা, অনেকে এইগুলিকে ঐরূপ রাজনৈতিক কুটিলতার উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করেন।

হইয়া আসিবে। ইংরাজ হইতেই ঐ ত্রিবিধ কার্য্যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সহায়তা হইতেছে। অতএব তাঁহার কর্তৃক আমাদের ভাষাগুলির অন্তর্ভেদ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায্য। কিন্তু কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর মনে যে ঐরূপ রাজনৈতিক ভাব সমুত্থিত হইতে পারে না এমত নহে।

যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোম-সাম্রাজ্যে চলিয়াছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্য্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন হইয়া উঠে তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন। ইংরাজ বিধি করিলেন যে, সকল আদালতেই স্থানীয় ভাষা অথবা ইংরাজী ভাষা এই দুয়ের এক ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু সেরূপ বিধি থাকিলে দেশীয় ভাষায় উকীল মোক্তার প্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং আমলাবর্গের লেখা পড়া, বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া পড়িতেছে এবং ইংরাজীতেই আদালতের সমুদায় কাজ চলিতেছে। দেশীয় ভাষার সেরেস্তা উঠিয়া যাওয়াতে, ইংরাজ হাকিমের কোন অসুবিধা নাই। এই জন্য তিনি বুঝিতে পারেন না যে, ইহা হওয়ায় আদালতের কার্য্য ইংরাজী শিক্ষিতদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাতে প্রজার অসুবিধা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বাঙ্গালা দেশের আদালত সকল হইতে যে সকল কারণে ফারসি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বিহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে কায়েথি-হিন্দি প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজীর অতি প্রসারতা রোধ করিবার জন্য সেই সকল কারণই বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা বুঝেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সাধারণ লোক হইতে, তাঁহাদের যে বিশিষ্টতা জন্মে, তাঁহারা সেই অভিমান-সুখেই একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতদিগের অভিমান বশতঃই হউক, আর ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের অভিমানমিশ্রিত আলস্য বশতঃই হউক, যদিও ইংরাজ অধিকারে আদালত এবং রাজ কার্য্যালয় সকলে দেশীয় ভাষাগুলির অনাদর হইয়া উঠিতেছে, তথাপি উহা মুসলমানদিগের সময়ে যতটা হইয়াছিল তাহার অধিক হয় নাই, এবং হইতে পারিবেও না—মুসলমানদিগের সময়ে রাজকার্য্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন একেবারেই বন্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানের আমলেও দেশীয় ভাষাগুলি সর্ব্বতোভাবে সজীব ছিল। পঞ্জাবী ভাষায় "আদি" গ্রন্থ হিন্দি ভাষায় দাদুপন্থীদিগের বিলক্ষাধিক দোঁহা, কবীরপন্থী দিগের সুরসাগর, ভক্তমালা, সতসইয়া এবং চন্দ্রপ্রকাশাদি গ্রন্থ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী; অভঙ্গ, এবং বাকৃহারাদি গ্রন্থ, বাঙ্গালায় চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যনিচয়—এ গুলি মুসলমানদিগের রাজত্বকালেই প্রণীত এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। অপরাপর দেশে বিদ্যাচর্চ্চার সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত রাজার সাহায্যের যতটা প্রয়োজন, ভারতবর্ষে চলিত ভাষা সম্বন্ধে কখনই রাজানুকূল্যের ততটা প্রয়োজন হয় নাই। এই মহাদেশের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মভাবের আধিক্য এবং সেই ভাবের বিকাশই এখানকার সাহিত্যের মূল। অপরাপর ভাবের বিকাশ সেই মূল হইতেই সমুদ্ভূত। এদেশে যত দিন ধর্ম্মভাব আছে, তত দিন এখানকার লোক আপনাপন পিতৃমাতৃ ভাষায় সেই ভাব প্রকাশ করিতে রত হইবে—এবং তাহা হইলে সমস্ত সাহিত্য-শাস্ত্র সজীব থাকিবে। অতএব ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের লোপ বা হীন-বীর্য্যতা ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল সজীব এবং উন্নতাবস্থ থাকিলেও রাজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকিবে। মুসলমানদিগের সময়ে যেরূপ যেরূপ হইয়াছিল, ইংরাজের আমলেও সেই সকল ব্যাপারের অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে—এবং তাহা স্বল্পতর কালে এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটিবে। কারণ, এখন মুদ্রাযন্ত্র জন্মিয়াছে, শিক্ষার বিস্তৃতিও হইতেছে, এবং গতায়াত দ্বারা লোকের পরস্পর মিশ্রণ পূর্ব্বের

অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। মুসলমানদিগের সময়ে কত শত শত আরবী এবং ফারসী শব্দ আমাদিগের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী শব্দ অনেক আসিয়াছে, আরও অনেক আসিবে। ইউরোপের আমদানি নূতন নূতন দ্রব্যাদির নাম, আর আইন এবং ব্যবহার ঘটিত এবং বিজ্ঞান ঘটিত অনেকানেক পারিভাষিক শব্দ, আর জাতিবাচক এবং গুণবাচক কতক শব্দ অবশ্যই আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বর সামঞ্জস্যের নিয়মানুসারে অপভ্রষ্ট হইয়া চলিত হইবে। বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হই তেও বহু পরিমাণে শব্দ রত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষা সমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারত-বাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমান-দিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভাবষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।

———•(•)•———

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(সামাজিক-রীতি বিষয়ক।)

আমাদিগের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা—জাতিভেদ। ইহা পৃথিবীর অপর সকল লোকের পক্ষে অতি আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার হইয়া আছে। যে বৈদেশিক পর্য্যটক যখন ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া ছেন, তিনিই এখানকার জাতিভেদ প্রণালী সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছেন। পূর্ব্ব-কালের লোকেরা ইহার প্রায়ই নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু প্রশংসাই করুন আর নিন্দাই করুন, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই বলিলেই হয়। জাতিভেদ প্রণালীটী কোন সমাজের পক্ষেই নিতান্ত নূতন বস্তু নয়। পুরুষানুক্রমে ব্যবসায় বিশেষের অবলম্বন করা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী-

দিগের বিভিন্নদলে সম্বদ্ধ হওয়া, এবং সকল ব্যবসায়িবর্গের এক মাত্র যাজক সম্প্রদায়ের বশ্য হওয়া, এ সকল ব্যাপার সর্ব্বদেশ সাধারণ এবং কোন কালে পৃথিবীর সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায় বিভাগের ভেদটী অপর সকল দেশের অপেক্ষা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট হইয়া আছে।

এইরূপ হইবার কারণ, যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধেয়। ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণ ভেদের নিরতিশয় আধিক্য। ভারত ভূমির মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আকার এবং প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে একত্রিত হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। এখানে ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, কোল্লেরীয়, দ্রাবিড়ীয়, নিগ্রীয়, পলিনেসীয় প্রভৃতির বিবিধ পরিমাণে মিশ্রণ-জাত নানা প্রকারের লোক সুবহু পরিমাণেই বাস করিতেছে। ব্যবসায় ভেদের সহিত ঐ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যবসায় ভেদ জন্মভেদ অনুসারে ঘটিয়াছে। মনুসংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, অমুক বা অমুক হইতে উৎপন্ন বংশীয়দিগের অমুক ব্যবসায়। উক্ত সংহিতায় ককেসীয়াদি মৌলিকবর্ণের কথা নাই বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও যখন জন্মের গুণাগুণ ধরিয়া ব্যবসায়ের নিরূপণ হইয়াছিল, তখন মৌলিক বর্ণের ভেদ এবং তাহাদের উচ্চাবচ সাঙ্কর্য্য ঐ গুণাগুণ অবধারণের যে শ্রেষ্ঠ উপাদান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। ব্যবসায়ভেদ সাহজিক বর্ণ ভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ সুদৃঢ় এবং অত্যধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য অপরাপর দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের স্বল্পতা মাত্র দৃষ্ট হয়, এখানে ওরূপ বিবাহের একেবারেই নিষেধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই বিবাহ-নিষেধের অঙ্গীভূত হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভোজনের একপংক্তিকতা এবং শরীর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়াছে। সঙ্কর, বিশেষতঃ বিলোম-সঙ্কর উৎপাদনে আর্য্যশাস্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি। "সঙ্করো নরকায়ৈব"।

আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থূল এবং মূল কথা এই। ইংরাজ এত

দিনের পর জাতিভেদের এই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার উপক্রম করিয়াছেন। সম্প্রতি রিস্‌লী সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে জাতিভেদ বিষয়ে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীর জাতিভেদের অন্তস্তলে যে মৌলিকবর্ণভেদের অস্তিত্ব আছে তাহার সুপরিস্ফুট বোধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে যখন একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় এই কথার প্রথম উত্থাপন করেন তখন তাঁহার শ্রোতৃবর্গ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালি এরূপ কথাও উঠিতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় লোকের শরীর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারিলে, জাতিভেদের মৌলিক হেতু স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, ইংরাজ বিদেশী— তিনি যে এতদিন আমাদের সামাজিক প্রণালীর প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিচিত্র নহে। এ দেশের বড় বড় সংস্কারকেরাও এই রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারেন নাই এবং তাহা না পারাতেই আপনাদের প্রবর্ত্তিত সংস্কার কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। "যেমন গঙ্গাতে আসিয়া পড়িলে সকল নদ নদীর জল গঙ্গার জল হইয়া যায়, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে"—বুদ্ধদেবের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না, সকল জাতির লোককে তুল্য মূল্য করিলেন; সেই জন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণাত্মক লোকের বাস, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং বদ্ধমূলতা লাভ করিল।

বৌদ্ধের স্থানে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির নীতিবাদ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একটি উক্তি যে, যবন খস হুন প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয়েরাও হরিনাম গ্রহণ বলে দ্বিজোত্তম হয়—ইহার পারমার্থিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারিক বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ লইয়া, নব্য বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রবর্ত্তকগণ দলপোষণ চেষ্টায় জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ

ছিলেন। কিন্তু দুই এক পুরুষের মধ্যেই ঐ উপদেশ নিষ্ফল হইয়া পড়িল। বৈষ্ণবেরা বৈবাহিক বিষয়ে আপনাপন জাতি খুঁজিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ফল কথা, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং দৃঢ়, এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বৈষ্ণবই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর নানক পন্থীই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, আর যেই হউক, ভারতবাসী জাতিভেদ প্রথার অবলম্বন না করিয়া পুরুষানুক্রমে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারে না। এখানকার জাতিভেদ প্রণালীর হেতু যদি কেবল মাত্র ব্যবসায় ভেদ হইতে সমুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে যেমন পৃথিবীর অপরাপর দেশ হইতেও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতেও সেইরূপে ইহা অনেক কাল উঠিয়া যাইত। মনুসংহিতা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোক সকলকে পুরুষানুক্রমিক বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় কার্য্যে সম্বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা সেই সংহিতার সময় হইতেই বিলক্ষণ শিথিল ছিল। মনু বলেন—

আজীবংস্তুতথোক্তেন ব্রাহ্মণং স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যানন্তরঃ॥
উভাভ্যামপ্যজীবান্তু কথাস্যাদিতি চেদ্ভবেৎ
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্যজীবিনং॥

পূর্ব্বোক্ত রূপ জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ আপনার জীবিকার অর্জ্জনে অসমর্থ হযেন তবে দ্বিতীয় যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহার ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। যদি দুয়েতেই না হয়, তবে কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন।

অতএব জীবনোপায়ের নিমিত্ত একজাতীয় লোকে জাত্যন্তরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। ব্রাহ্মণেরা পাখি মারা, কুকুর পোষা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন, মনুসংহিতাতেই ইহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চজাতীয়দিগের বৃত্তি স্বল্পোৎপাদিকা। নীচজাতীয় লোকে যে

উচ্চ জাতীয়ের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত না, বোধ হয়, ইহাও তাহার একটি কারণ।

ভারতবর্ষের জাতি ভেদ প্রণালী শুদ্ধ ব্যবসায় ভেদমূলক নয়, এই প্রকৃত কথাটি না বুঝাতেই এই প্রণালীর প্রতি অনেকটা অযথা নিন্দাবাদ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিকেরা বলেন যে, লোকে যাহার যে ব্যবসায়ে ইচ্ছা, সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে না পাইলে, সমাজের ধনবত্তার কথা দূরে থাকুক, তাহার জীবন রক্ষাই দুরূহ হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধান্তটী কিরূপ যুক্তির উপর সংস্থাপিত তাহা একটু অনুধাবনপূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় অর্থ নৈতিকদিগের বিচার এইরূপ,—'কোন দেশে তদ্দেশ নিবাসী জনগণের প্রয়োজনীয় শস্য, বস্ত্র, লবণ, তৈলাদি ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত হইতেছে। মনে কর, অপর কোন দেশ হইতে তথায় ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন একটা, যথা তৈলের আমদানি হইল, এবং সেই তৈল দেশে যে তৈল জন্মিতেছিল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং স্বল্পমূল্য হইল। তাহা হইলে ঐ আমদানি তৈলেরই ব্যবহার হইবে এবং দেশীয় তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। যদি তাহাদিগকে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা অতিশয় বিপদাপন্ন একান্ত দরিদ্র এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইবে। তৈলিকদিগের সম্বন্ধে যেরূপ, অপর ব্যবসায়ী সকলের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে এই জন্য ব্যবসায় পরিবর্ত্তের পথ সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত থাকা আবশ্যক।'

অর্থ নৈতিকদিগের যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম, সেগুলি বিচারসঙ্গত কথা। কিন্তু ভারতবাসীর জাতিভেদ প্রথা যে ব্যবসায় পরিবর্ত্তের তেমন কঠিনতর কোন প্রতিবন্ধকতা করে না, তাহা মনুসংহিতা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানাপন্ন এমন দুইটী ইংরাজের উক্তিও উদ্ধৃত করিব। এলফিনষ্টোন সাহেব বলেন,—"আমি এতদিন ভারতবর্ষে আছি, এবং ইহার অনেক দেখিয়াছি,

কিন্তু পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কোন নূতন ব্যবসায় গ্রহণ করিতে জাতি গিয়াছে ইহা দেখি নাই"। কোলব্রুক্ সাহেব বলিয়াছেন "পৈতৃক বৃত্তির দ্বারা জীবিকায় অর্জ্জন না হইলে অপর বৃত্তির অবলম্বন করার শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি আছে, সুতরাং জাতি ভেদ আছে বলিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায় পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় না"। অতএব প্রকৃত অর্থনৈতিক বিচারে যাহা সিদ্ধ হয়, ভারতবাসীর জাতিভেদ প্রথাটী সে বিধানের বিরোধী হইয়া চলে না। সকল লোকেই বৃত্তি কর্ষিত' হইলে স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ এবং জাত্যান্তরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে।

কিন্তু ইংরাজ অর্থনৈতিক বিচার যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। উহার পরিণামে একটী হঠোক্তি আছে। তাহা এই—সমাজান্তর্গত অধিক লোকের যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই ন্যায্য, কোন একটী সম্প্রদায়ের দুঃখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়া তাহাদের কষ্ট হইতেছে বলিয়া কি উৎকৃষ্টতর এবং স্বল্পতর মূল্য বৈদেশিক তৈলের আমদানি বন্ধ করা হইবে? কদাপি নহে। তৈলিকেরা ব্যবসায়ান্তরে প্রবিষ্ট হউক। আমার বিবেচনায় ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটী ভাল কথা নয়। তৈলিকেরা কি সমাজেরই একটী অঙ্গ স্বরূপ নয়? সমাজের অন্তর্গত কোন একটী সম্প্রদায় অথবা একটী পুরুষও যদি জীবিকার জন্য কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্য সমাজের চেষ্টা করা কি বিধেয় নয়? দীন দুঃখীদিগকেও সমাজ পালন করেন কেন? ইংলণ্ডাদি দেশে দীনপালন বিধির সৃষ্টি কেন হইয়াছে? ভারতবর্ষাদি দেশে আতিথ্য প্রথা এবং ভিক্ষাদানের নিয়ম কেন এত বলবৎ রহিয়াছে? সমাজ আপনার অঙ্গস্থানীয় কোন সম্প্রদায়কেই তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারেন না। এইজন্য কোন চিন্তাশীল স্বতন্ত্রপ্রজ দেশেই ঐ হৃদয়শূন্য অর্থনীতি গ্রহণ হইতে পারে নাই। মার্কিণেরা আমদানি বাণিজ্য সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, স্বদেশীয় কোন ব্যবসায় উঠিয়া যাইতে পারে এমত কোন বৈদেশিক আমদানির আরম্ভ হইলে, সেই দ্রব্যের উপর গুরুতর

শুল্ক বসাইয়া স্বদেশীয় ব্যবসাদারদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, এত বর্ষের জন্য ঐ শুল্কটী বসান হইল, সেই সময়ের মধ্যে তোমরা আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যটীকে উৎকৃষ্ট এবং অল্প মূল্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। ঐ নিয়মের ফলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া উঠে, তাহার বিক্রয় অধিক হয় না, দেশীয় ব্যবসায়ীরা অবসর পায়, এবং সেই অবকাশের মধ্যে, হয় আপনাদের দ্রব্যটীকে বৈদেশিক দ্রব্যের সমান বা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে, অথবা আপনারা ব্যবসায়ান্তর শিখিয়া লইয়া সেই নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথাও কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ এখানেও সমাজের অঙ্গীভূত ব্যবসাদারদিগের প্রতি মমতা থাকে এবং সেই জন্য আমদানি দ্রব্যের একেবারে ভূরি প্রবেশ কতকটা বন্ধ করিয়া রাখে, এবং বৈদেশিক আমদানিতে যে ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে কিছু অবসর দেয়। বস্তুতঃ অর্থনীতি যদি ধর্ম্মনীতির সহিত মিলিয়া চলে, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথার সহিত তাহার কোন অনৈক্যই হইতে পারে না।

জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে একটী শিক্ষাসূত্রকেও সাক্ষ্য স্বরূপে দণ্ডায়মান করা হয়। সে সূত্রটী এই—ব্যক্তি-ভেদে প্রবৃত্তির ভেদ থাকে, যে যাহার আপনাপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। এই জন্য পুরুষানুক্রমে কোন এক ব্যবসায়ে লোকের নিবদ্ধ হওয়া ভাল নয়। এস্থলে দেখা যায় যে, শিক্ষা সূত্রের সাক্ষ্যটী প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিভেদ প্রথার অনুকূল বই প্রতিকূল নহে। প্রবৃত্তির মূল প্রথমতঃ পিতৃমাতৃ শরীর সঞ্জাত এবং দ্বিতীয়তঃ শৈশবের দৃষ্ট ব্যাপার সম্ভূত। উভয় কারণ হইতে পিতৃ ব্যবসায়ে প্রবৃত্তির আধিক্যই সম্ভবপর, এই জন্য সাধারণতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করাতেই কি প্রবৃত্তিগত, কি শিক্ষা-সৌকর্য্যগত, সকল প্রকার সুবিধা অধিক। আর বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিবন্ধক কিছুই নাই।

জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর একটী কথা বলা হয়। ঐ কথাটী ঐতিহাসিক পরিণামবাদ হইতে সমুদ্ভূত। কথাটী এই—কোন সময়ে ইউরোপীয় সকল সমাজেই এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে ঐ প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামবাসীদিগের পুত্রেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায় অবলম্বন করে, এবং সমব্যবসায়ীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এখন ঐ প্রথা কোন বৃহন্নগর বা দেশ-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব সমাজ যে পরিণতি নিয়মের অধীন, সে নিয়ম জাতিভেদ প্রথার অনুকূল নহে—এই জন্য উহা এখন পৃথিবীতে অসাময়িক হইয়াছে এবং উৎসাদিত হওয়া উচিত। ঐ কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা যদি অন্যান্য দেশের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় কেবলমাত্র শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনে সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও ঐ প্রথার পরিণতি তদনুরূপ হইত, অর্থাৎ উহা ঐ সকল দেশে যেরূপে গিয়াছে সেই প্রণালীতেই উঠিয়া যাইত।

পরন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিণাম-বাদীর বিচার তদনুরূপ স্থূল কথায় পর্য্যবসিত নহে। প্রকৃত পরিণাম বাদী বলিবেন যে, জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন তিনটী; এক শ্রমের বিভাগ, দ্বিতীয় শিক্ষার সৌকর্য্য, তৃতীয় ব্যবসায়ানুসারিক দলবন্ধন। ভারতবর্ষে জাতিভেদ নিবন্ধন এই তিন প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবাসীর প্রয়োজন ব্যবসায়ানুসারিক দলবন্ধন নয়, এখন প্রয়োজন লোক সাধারণের সম্মিলন এবং একতা। আমি এ কথাটীর অসম্মান করি না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এক প্রকারের দলবন্ধন অন্য প্রকারের বৃহত্তর সম্মিলনের ব্যাঘাতক নহে, প্রত্যুত তাহার অনুকূল। কারণ জাতিভেদ বশতঃ ব্যবসায়গুলি অতি বিস্পষ্টরূপে পরস্পর পৃথক্‌ভূত হওয়াতে সমাজান্তর্গত সকলেই অতি দিবাচক্ষে দেখিতে পায় যে, তাহারা অন্যোন্যের আশ্রয়াপেক্ষী হইয়াই সকলে সচ্ছন্দে থাকিতেছে, পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে কেহই সুখে থাকিতে পারিত না।

অতএব ব্যবসায় পার্থক্য স্পষ্টীকৃত হওয়ায়, সাধারণ সম্মিলনের ব্যাঘাত না হইয়া তাহার বিশিষ্ট সহায়তাই হইতে পারে। এই যে এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের নানা দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের মধ্যে সম ব্যবসায়ি-ব্যক্তিদিগের দলবন্ধন হইতেছে, তাহাই কি ইউরোপীয় সমাজের পরিণামি ফল বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতেছে না? ঐ সকল দলবন্ধন কি জাতীয় বন্ধনের অঙ্গীভূত নয়? ঐ দলবন্ধনের প্রভাবেই কি মূল-ধনিগণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি করিতে শিখিতেছেন না? অতএব ঐতিহাসিক পরিণতির প্রকৃত বিচারে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সদোষ বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অর্থনীতি, শিক্ষাসূত্র, এবং সমাজ-নীতি যাহা যাহা বলেন, তাহার বিচার করিয়া এক্ষণে অপর তিনটী সামান্য কথার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ, কথাগুলি আজি কালি বহুলোকের মুখেই শুনা যায়। (১) খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কোন প্রতি-বন্ধকতা থাকিলে, সমাজের মধ্যে দৃঢ় সম্মিলন জন্মে না। কিন্তু আমার বিবেচনায় যখন সম্মিলনের প্রকৃত মূল বশ্যতাব তখন খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের অবারিত ব্যবস্থা সম্মিলনের অনুকূল হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোন দেশেই ঐ সকল সম্বন্ধ অবারিত ভাবে চলে নাই, এখনও চলিতেছে না; (২) জাতিভেদ স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়। উহার উত্তর এই—যাহা নাই তাহার অস্বীকারে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তদ্ভিন্ন, সম্পূর্ণ সাম্যভাবের প্রভাবে বশ্যতার লোপ হয় এবং বশ্যতার লোপে সম্মিলন একেবারে অসম্ভবপর হয়। (৩) জাতিভেদের কথা বেদে তেমন স্পষ্টতঃ উক্ত হয় নাই। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে অথবা তাহারও পশ্চিম অঞ্চলে হইয়াছিল। সেই সকল দেশ আর্য্যবহুল। তথায় বিভিন্ন বর্ণের লোক সমধিক পরিমাণে একত্রিত হয় নাই। সুতরাং অপরাপর লোকের সহিত মিশ্রণে আর্য্য-শোণিত দূষিত হইবে, এরূপ শঙ্কার কারণ ব্রহ্মাবর্ত্তে উপ-

ন্বিত হয় নাই। এই জন্যই প্রাথমিক বৈদেশিক গ্রন্থে জাতিভেদের কথা তেমন অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। আর্য্যগণ ক্রমে ব্রহ্মর্ষি দেশে, অনন্তর সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে, এবং তাহার পর দাক্ষিণাত্যে যেমন প্রসারিত হইতে থাকিলেন, অমনি ব্যবস্থাপকেরা অপরাপর লোক-দিগের সহিত তাঁহাদিগের মিশ্রণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন। মৌলিক বর্ণভেদ জনিত আকারগত পার্থক্য হইতে যে ভিন্নতা স্বতঃই উপস্থিত ছিল, ব্যবস্থা শাস্ত্র সেই ভিন্নতাকে ন্যূনকল্প করিয়া এবং তজ্জাত বিদ্বেষ ভাবকে মন্দীভূত করিয়া তাহাকে সামান্য ব্যবসায় ভেদরূপে পরিণত করিয়া দিলেন।

এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ইংরাজের অধিকারে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সাহজিক এবং সাধারণতঃ অর্থ, শিক্ষা ও সমাজনীতির অবি-রোধী, এই জাতিভেদ প্রণালীর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে।

ইংরাজ ভারতবাসীকে আপনার অধীন মনে করেন। অধীনের প্রভু-শক্তি থাকে না। প্রভুতা দুই প্রকারে জন্মে; (১) ধনাধিকার হইতে (২) আভিজাত্য হইতে। সুতরাং সাধারণ ইংরাজের চক্ষে ভারতবাসীর ধনাধিকার এবং আভিজাত্য দুইটী বস্তুই ভারতবাসীর অবস্থার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের আভিজাত্য সহজেই ইংরাজের চক্ষুঃশূল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রতি অনুকূল না হইলেই জাতি-ভেদ প্রথার প্রতিও অনুকূল হওয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজ ঐ আন্তরিক প্রতিকূল ভাবটীকে বিলক্ষণ দমন করিয়াই চলেন এবং জাতিভেদ প্রথার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন না করিয়া উহার প্রতি সম্যক্ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াই অপক্ষপাতিতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন।

যে যে স্থলে অত্যল্প পরিমাণে ইংরাজ আমাদিগের সমাজ রীতির প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন তাহাও দেশীয় সম্প্রদায় বিশেষের প্ররোচ-নাতেই করিয়াছেন। ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সমাজ-প্রণালীর গাত্র স্পর্শ করেন নাই। যাহা হউক, দুই একটী স্থলে তাঁহার কৃত কার্য্যের

দ্বারা আমাদের সামাজিক প্রথার প্রতি কিছু কিছু আঘাত হইয়াছে বলিতে হয়। প্রথম আঘাত ১৮৫০ অব্দের ২১ আইনের দ্বারা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার অনুসারে কেহ স্বধর্ম্মচ্যুত হইলে পিতৃধনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে না। ঐরূপ ব্যবস্থা বা ব্যবহার মুসলমানদিগের সময়েও প্রবল ছিল, এবং তাহা থাকায় যেমন সমাজের কোন ক্ষতিই হয় নাই, ইংরাজ কৃত ঐ আইন হইতেও তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই, এবং হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। ১৮৫৬ অব্দের ১৫ আইন অর্থাৎ বিধবাবিবাহের আইনটিও আমাদিগের সামাজিক রীতির প্রতি একটু আঘাতের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ঐ আইন হইতে বিশেষ কোন ফলই ফলে নাই। প্রত্যুত আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়াতে এই হইয়াছে যে, হিন্দু বিধবা দুশ্চরিত্রা হইলেও মৃত স্বামীর ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। যদি দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তাহা হইলেই সেই অধিকার বিচ্যুতা হইয়া যায়!! কিন্তু উল্লিখিত দুইটি আইন জাতিভেদ প্রথার প্রতি সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করে না; ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন অর্থাৎ ব্রাহ্ম-বিবাহের আইনও জাতিভেদ প্রথার প্রতি অধিকতর বিরূপতা করিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটিকে 'সংস্কার' কার্য্য হইতে আনিয়া 'চুক্তির' ভিতরে ফেলায় ভাল হয় নাই, ইতিমধ্যেই দুই এক জন ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া অনুতাপ করিতে শুনিয়াছি। হিন্দুর বিবাহ যে সংস্কার কার্য্য তাহা যদিও ১৮৯১ সালের কনসেণ্ট আইনের দ্বারা অস্বীকৃত হয় নাই, তথাপি ঐ আইন প্রচলিত সামাজিক রীতির প্রতি কিঞ্চিৎ আঘাত করিয়াছে। কিন্তু সুবোধ এবং সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই দিয়া ঐ পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবেন তাহা মনে করা যায় না—প্রমাদ কখনই স্থায়িভাব হইতে পারে না!

বস্তুতঃ এই সকল উপায়ের দ্বারা ভারতবর্ষের সমাজ প্রণালীর মূল স্বরূপ জাতিভেদ প্রথার কিছু কিছু অনিষ্টের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যতই চেষ্টা হউক, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার নৈসর্গিক মূল আছে, এবং যত দিন

সেই মূল থাকিবে, ততদিন সকল ঘরেই সকল লোকে বিবাহ করিতে পারিবে না। জাতি-ভেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বিবাহভেদ, অন্য কোন ভেদ নয়; বিবাহ-ভেদটীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই অন্যান্য ভেদের ব্যবস্থা। বিবাহ-ভেদের মূল কথাও যাহা শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞান এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাহাই সমর্থিত করে।

বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ।
উভয়ন্তু সমংযত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে॥

কোথাও পুরুষ উৎকৃষ্ট, কোথাও বা স্ত্রী উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়ে সমান হইলেই সন্তান ভাল হয়। ক্ষেত্রে বীজের বৈষম্য হইতে পূর্ব্বপুরুষের দোষাদি সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সম্ভাবনা—এইটী মৌলিক তথ্য।

জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপরেই সংস্থাপিত। যদি কখন ভারতবাসিগণ ইউরোপীয় বা আসিয়িক কোন একটি দেশের অধিবাসিবর্গের ন্যায় সমবর্ণ এবং সমাকার হয়, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যত দিন ইহাদের আকার, বর্ণ এবং প্রকৃতির সাদৃশ্য না জন্মিতেছে, ততদিন ইহাদের মধ্যে একজাতিত্বও হইবে না। তবে একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থান ভেদ জনিত বিবাহ প্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়। উপসংহারে বলি জাতিভেদ প্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও ন্যূন হইয়া পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শান্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(আর্থিক অবস্থা বিষয়ক।)

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বিভিন্নদেশীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক উপাদেয় দ্রব্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইতেন, এখন ভারতবর্ষেই অপর দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজাত সমানীত হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজকার্য্য দেশীয় লোকের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত, এক্ষণে সমস্ত উচ্চ রাজকার্য্যে বিদেশীয়দিগেরই সম্যক অধিকার হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের রক্ষা যুদ্ধ ব্যবসায়ী দেশীয় লোকের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এক্ষণে বিদেশ হইতে সমাগত সৈন্যই দেশ রক্ষার অস্থিকল্প হইয়াছে।

দেশীয় জনগণের উল্লিখিতরূপ অকর্ম্মণ্যতার লক্ষণগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইটি অর্থাৎ রাজকার্য্যে এবং সৈনিক কার্য্যে বিদেশীয়ের নিয়োগ, মুসলমানদিগের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল। তখনও অনেকানেক উচ্চতম রাজকার্য্য বৈদেশিক মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, এবং অনেকানেক মুসলমান সৈনিক পুরুষও ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু কি মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারী, কি মুসলমান সৈনিক প্রায় সকলেই স্ব স্ব জন্মভূমির সহিত সম্পর্ক-শূন্য এবং ভারতবর্ষ নিবাসী হইয়া যাইত।

এখন ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী এবং ইংরাজ সৈনিক প্রায় কেহ এ দেশে স্থায়ী হইয়া থাকেন না—এবং ইংরাজের অধিকারেই ভারতবর্ষের বাণিজিকী অবস্থার পূর্ব্বোল্লিখিত বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরাজের অধিকার কালকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকারের কাল বলা যায়।

পক্ষান্তরে এই বৈদেশিক অধিকারের সময়েই ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত হইয়াছে, ইহার সমস্ত অন্তর্বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, বহিঃশত্রুর আগ-

মন-সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে, বাণিজ্যকার্য্যের সম্যক্ বিঘ্নশূন্যতা জন্মিয়াছে, এবং ধনোপার্জ্জনের পথ লোকসাধারণের পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতা, অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতার সমক্ষে এক প্রকার উন্মুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সকল কারণে ধনের বৃদ্ধি বই কদাপি হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু ঐ সকল শুভ লক্ষণের যুগপৎ উদয়েও ভারতবর্ষ দরিদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন যে, ৫ কোটি ভারতবর্ষবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত অন্ন দুই সন্ধ্যা যুটে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অনাহার, অল্পাহার এবং কদাহার দোষে ভারতবাসী ক্ষীণবীর্য্য এবং স্বল্পায়ুঃ হইতেছে। এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, প্রতি দশ এগার বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটি করিয়া বৃহৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তাহার পরেই একটি করিয়া মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট এবং মারীভয় প্রায় প্রতিবর্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রভূত ধনশালী ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর অপর কোন দেশের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

ভারতবর্ষে সর্ব্ববিজয়ী ইংরাজের অধিকার। ঐ অধিকারের গুণে দেশে শান্তি থাকায় যে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও তৎসহ আবাদের বৃদ্ধি হইয়া মোট কৃষ্যুৎপন্ন ধনের উৎপত্তি বাড়িয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়পড়তায় প্রজার আয় বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ঐ অধিকার কালেই বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পোৎপন্ন ধনের হ্রাস হইতেছে এবং যত ধন উৎপাদিত হইতেছে, তাহাও সমস্ত দেশে থাকিতেছে না।

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকারে কত ধন প্রতিবর্ষে উৎপন্ন হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজস্ব সচিব বেয়ারিং সাহেব এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াছেন যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭ টাকা মাত্র। কেহ কেহ, যথা গ্রাণ্টডফ সাহেব বলেন, ঐ আয় ২০ টাকার অনধিক। যদি ২৭ টাকাই ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রতি ব্যক্তির ভাগে মাসে ২।০ অথবা

দিন /২।৫ সাড়ে চার পয়সা পড়ে। ঐ আয় হইতেই ভারতবাসীর খাওয়া, মাখা, পরা, বাস, ক্রিয়া, আমোদ, প্রমোদ সমুদায় নির্ব্বাহিত হয়। এবং ইহার ভিতর হইতেই বৈদেশিক শিল্পজাতের মূল্য দিতে হয় এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।

কয়েকটি প্রধান প্রধান দেশে গড়ে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় ও রাজস্ব দান কত টাকা তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে। ২২ কোটী ব্রিটিস ভারত-বাসী ৮৯ কোটি টাকা রাজস্ব দেয়।

দেশ।	আয়।	রাজস্ব দান।
ইংলণ্ড	৩৪০	৩০
ফ্রান্স	২৯০	৩৪
জর্ম্মণি	১৮০	২৫
ইটালী	৭৭	২৩
অষ্ট্রীয়াহঙ্গেরী	১১০	২৭
রুসিয়া	৫৪	১৪
স্পেন	৬২	২০
পর্ত্তুগাল	৮০	১১
তুরস্ক	৪০	৫
মার্কিন	৩০০	১৪
পারস্য		২
জাপান	৬২	৪
চীন	অজ্ঞাত	॥০
ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ	২৭	৪

* বিদেশীয় রাজ্যের হিসাব পৌণ্ড জানা আছে। এই প্রবন্ধের সকল তালিকায় সাবেক মত ১০ টাকায় পৌণ্ড ধরা গেল।

অতএব পৃথিবীর অপর সকল প্রধান প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা, ভারতবাসীর আয় এত কম যে তাহার উপর অধিকতর করভার পড়িয়াছে স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ইংরাজাধীন ভারত ভূমিতেই এরূপ গুরুভার করের আদায় হয়, এমত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজের অনধীন ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ আছে, সেই সকলেও করভার অল্প নহে। হাইদ্রাবাদ রাজ্যে প্রতি ব্যক্তির রাজস্ব দান ৪৴০ টাকা, হোলকার রাজ্যে ৭ টাকা, বরোদা রাজ্যে ৫ টাকা, সিন্ধিয়া রাজ্যে ৪ টাকা, কাশ্মীর রাজ্যে ৫৴০ টাকা, মহীশূর রাজ্যে ২॥০ টাকা। অতএব দেশীয় রাজাদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজ অধিকারে কর দানের আধিক্য বোধ হয় না।

কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে যে কর গৃহীত হয়, তাহা অনেকটা দেশের ভিতরেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধন দেশের কার্য্যে লাগে। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত ভাগের যে রাজস্ব তাহার প্রায় চতুর্থাংশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। ভারতবর্ষের নিমিত্ত কখন আবশ্যক হইতেও পারে এইরূপ অনুমানে ইংলণ্ডে যে সকল সৈনিক প্রস্তুত থাকে, তাহার জন্য, ভারতবর্ষের রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় বিলাতী আফিসের খরচের জন্য, ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত ঋণের বৃদ্ধির জন্য, এবং বাটা বিভ্রাট প্রভৃতি অন্যান্য বাবে সমুদয় রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইংলণ্ডে ঐরূপ খরচ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ১৮৭৯ অব্দে কিঞ্চিন্যূন ১৭ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ডে খরচ হয়। ১৮৯২ অব্দে ঐ খরচ প্রায় ২৩ কোটি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এখানে যে প্রায় ৭০ হাজার গোরা ফৌজ থাকে এবং প্রায় ১০ হাজার নানা ব্যবসায়ী ইংরাজ আছেন, তাঁহাদিগের বেতনাদির টাকাও অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। উহার পরিমাণ কত তাহা ভারতবর্ষের বাণিজ্যিকী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু অনুভূত হইতে পারে।

১৮৯২—৯৩ অব্দে কয়েকটী প্রধান প্রধান দেশে আমদানি রপ্তানি যেরূপ হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে দেখান যাইতেছে।

দেশ	আমদানি	রপ্তানি
	কোটি টাকা,	কোটি টাকা,
ইংলণ্ড	৪২৩	২৯১
ইউনাইটেড দেশ	১৭৩	১৬৬
ইটালি	১৬০	১৪৮
ফ্রান্স	৩৬৮	৩১৬
জর্মণি	৪৫০	৩৫০
হলণ্ড	১০৬	৯৪
পোর্টুগাল	১১	৭
চীন	৩০	২৩
তুরস্ক সাম্রাজ্য	২৩	১৫
ভারতবর্ষ	৮৩	১১৩
মিসর	১২	১৫

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ, এবং বৈদেশিক ঋণে বিক্রীত-প্রায় মিসর ব্যতীত উল্লিখিত সকল দেশেই রপ্তানির অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ অধিক।

১৮৯২-৯৩ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে যত মাল রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ১১৩ কোটি টাকা। ইংরাজ সওদাগরেরা শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে লাভের গণনা করেন; অতএব ১১৩ কোটির উপর লাভ ১৭ কোটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের বাণিজিকী ব্যাপারটী সুস্থাবস্থ হইত, অর্থাৎ যদি বহির্ব্বাণিজ্যের লাভের টাকাও দেশে আসিয়া পৌঁছিত, তাহা হইলে আমদানির পরিমাণ (১১৩+১৭=১৩০) এক শত ত্রিশ কোটি হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ৮৩ কোটি মাত্র হয়। অতএব সুস্থাবস্থার সহিত তুল-

ন্যায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি (১৩০—৮৩=৪৭) সাতচল্লিশ কোটি টাকা বলিয়া ধরিতে হয়। আমাদের বাণিজ্য চেষ্টা না থাকায় আমরা পূর্ব্বোক্ত ১৭ কোটি টাকার লাভভাগী হইতে অধিকারী নহি। কিন্তু যত যায় তত ত আইসে না।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যত টাকার জিনিস বাহির হইয়া যায় তাহার অপেক্ষা ৩০ কোটি টাকার জিনিস কম আইসে। ঐ ৩০ কোটি টাকা, কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পরম্পরাসম্বন্ধে ইংলণ্ডেই যায়। ইংলণ্ড হইতে কতক মূলধন রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য এবং নীল, চা, কাফি প্রভৃতির চাসের জন্য; এবং চটের কল, তুলার কল, চিনির কল প্রভৃতি কারখানার জন্য, ইংরাজ কর্ত্তৃক এই দেশে আনীত হয়। ঐ মূলধনও ভারতবর্ষের মোট আমদানির অর্থাৎ ৮৩ কোটি টাকার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি ৩০ কোটি মাত্র নহে, তাহার অপেক্ষা অধিক।

বৎসর বৎসর যে বৈদেশিক মূলধন আসিতেছে তাহার পরিমাণ ঠিক জানিবার উপায় নাই। রেলওয়ে কোম্পানিদের অংশে ও গবর্ণমেণ্টের ঋণে মোটামুটি আন্দাজ ৩০০ কোটি টাকা এক্ষণে ভারতের বাহিরের ঋণ দাঁড়াইয়াছে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যেই এই ঋণের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ৬ কোটি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজা জমিদার প্রভৃতির ঋণ, কলকারখানা, চা-বাগান; ষ্টীমার প্রভৃতির জন্য টাকা আসিতেছে; সুতরাং গড়ে বার্ষিক আরও ২ কি ৩ কোটি মূলধন ঐ হিসাবে আসিতেছে মনে করা অসঙ্গত নহে। এইরূপ বাণিজ্যের গতি এবং অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে এখনই ভারতবর্ষের বৎসরে ৩৭। ৩৮ কোটি টাকা সাক্ষাৎ লোকসান হইতেছে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের এবং এদেশে ইংরাজ বণিকাদির প্রেরিত মূল-ধনের সুদ পরে

আমাদের রপ্তানিকে ক্রমশই বর্দ্ধিত করিবে। এদেশে ইংলণ্ডের ন্যস্ত মূলধন গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়াই হউক আর সাক্ষাৎ বিলাতী কোম্পানীদিগের দ্বারাই হউক রেলওয়ে নির্ম্মাণেই সমধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৯২ অব্দ পর্য্যন্ত মোট ২৩৪ কোটি টাকা রেলওয়ে নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে প্রজার স্থানে গৃহীত রাজস্ব হইতে অন্যূন ২৬ কোটি টাকা প্রদান করিয়া ইংলণ্ডীয় মূল-ধনীদিগের সুদ পোষাইয়া দিতে হইয়াছে। তবে আজি কালি আর তেমন ক্ষতি হইতেছে না। কোন কোন রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু লাভ হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অপর কতকটা মূলধন ভারতবর্ষের জলপ্রণালী নির্ম্মাণে বিনিযুক্ত হইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে যে গুলি পূর্ব্বকালের অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমান দিগের সময়ের জলপ্রণালীর পুনরুদ্ধার মাত্র সেইগুলি হইতেই কিছু কি লাভ থাকে নূতন প্রণালীর মধ্যে কয়েকটী ভিন্ন প্রায় কোনটীতেই লাভ থাকে না, কিছু কিছু লোকসান হয়। তবে রেলওয়ে এবং খালে দেশীয় মজুরদারেরা কতকটা কাজ পায়।

রেলওয়ে এবং পূর্ত্তকার্য্যে তাদৃশ লাভ না হইবার কয়েকটী কারণ প্রধান বলিয়া উক্ত হয়। এক কারণ এই যে, উহাদিগের নির্ম্মাণে অযথারূপ মূলধন ব্যয় হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, উহাদিগের কার্য্য পরিচালনেও অপরিমিত খরচ হয়। তৃতীয় কারণ, সকল কাজ বুঝিয়া করা হয় না। চতুর্থ কারণ, কখন কখন ইংলণ্ডীয় বণিকদল ভারতবর্ষের কাজ করিতে আসিয়া ক্ষতি গ্রস্ত হইতে বসিলে, যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাহাদিগের কারবার ক্রয় করিয়া লওয়া হয়।

রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী নির্ম্মাণ এই দুইটী প্রধান কার্য্য ভিন্ন, নীল, চা, কাফির চাসে এবং পাট, তুলা, পশম, কাগজ এবং চিনির কারখানায় ইংলণ্ডের কতক মূলধন ভারতবর্ষে খাটে। ঐ গুলির উপর গবর্ণমেণ্টের টাকার, অর্থাৎ প্রজার প্রদত্ত রাজস্বের কোন অংশ ব্যয়িত হয় না। সুতরাং ঐগুলিতে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন লোক-

সান নাই। প্রত্যুত ঐ সকলের অবলম্বনে মজুরদার লোকেরা খাটিয়া খাইতে পায়।

ঐ সকল চাসের এবং কল-কারখানার কাজে কত মজুর খাটে তাহার একটা স্থূল হিসাব করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ৯১০টী ঐ প্রকার কারবার চলিতেছে। তাহার কোন কোনটী বৃহৎ এবং কোন কোনটী অতি সামান্য। যদি প্রত্যেক কারবারে গড়ে ৫০০ মজুর খাটে বলিয়া ধরা যায়, তবে ইংরাজদিগের চাস এবং কলকারখানাদিতে (৯১০ × ৫০০ = ৪৫৫০০০) মোটামুটি ৫ লক্ষ মজুরের অন্ন সংস্থান হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যতই হউক, বিলাতী দ্রব্যের আমদানিতে আমাদের যে সকল ব্যবসায় মারা পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই সকল ব্যবসায়ের অবলম্বনে কত লক্ষ লোক অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। লবণ প্রস্তুতকারী মলুঙ্গিদিগের সংখ্যাই বোধ হয় ৫ লক্ষ ছিল।

ফলতঃ ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষীয় শিল্পজাতের বড়ই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা তন্তুবায়ের কিম্বা কর্ম্মকারের অথবা কাংস্যকারের ব্যবসায়দ্বারা অতি স্বচ্ছল অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাহারা সকলে আর স্ব স্ব ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। কলের কাপড় এবং সুতার আমদানি হওয়াতে, এবং বিলাতী ছুরি, কাটারি, কূদ্দাল, প্রভৃতির আগমনে, আর লোহা, পিত্তল এবং তাম্রের চাদর বিলাত হইতে আসাতে, এখানকার অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে।

১৮৯২-৯৩ অব্দে ২৫৷৶৹ কোটি টাকার সূতার বস্ত্র আসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন ৪॥৹ কোটী টাকার অন্যান্য বস্ত্র ও সুতা, ৪৪ লক্ষ টাকার ছাতা, ৬॥৹ কোটী টাকার ধাতু ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ৫৭ লক্ষ টাকার লবণ, ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ্য ও ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার তৈল আসিয়াছিল।

এক মাত্র কার্পাস শিল্পনাশে ভারতবর্ষের আয় কত ন্যূন হইয়া

গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দেখা যায় যে তুলার মণ ২০ টাকা ও বিলাতী বস্ত্রের মণ ৬৩ টাকা। প্রতি ২০ টাকার তুলায় প্রায় ৪০ টাকা বৈদেশিক শিল্পীর মজুরি ও মহাজনদিগের লাভ। সুতরাং বাৎসরিক ২৫ কোটি টাকার কাপড় আমদানিতে এদেশে প্রায় ২০ কোটি টাকার ধনোৎপত্তি কমিতেছে। যদি এমনও মনে করা যায় যে অন্যান্য শিল্পনাশে ভারতের যত লোকসান হয় তাহা ইংরাজ মূলধনীদিগের অধীন মজুরদারদিগের আয়ে পোষাইয়া যাইতেছে তথাপি বিলাতের খরচ যোগানয়, বৈদেশিক ঋণে ও দেশীয় শিল্পনাশে বৎসরে ৫৭।৫৮ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত হিসাবে এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশে কৃষিজীবীর পরিমাণ কিরূপ হইয়া থাকে তাহা দেখিলে ভারতবর্ষের শিল্পনাশের ফল আরও সুস্পষ্ট হইবে। শিল্পপ্রধান ও সুসমৃদ্ধ দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক হয় না। ইংলণ্ডের কর্ম্মণ্য লোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন কৃষিজীবী; স্কটলণ্ডের ১৭ জন, আয়র্লণ্ডের ৪৩ জন ইটালিতে ৪৪ জন ফ্রান্সে ৪৬ জন, গ্রীসে ৪৯ জন, মার্কিন দেশে ৪৪ জন। সমস্ত ভারতবর্ষ-ব্যাপক আদমসুমারি তিনবার গৃহীত হইয়াছে, প্রথমবার ১৮৭১ অব্দে, দ্বিতীয় বার ১৮৮১ অব্দে ও তৃতীয়বার ১৮৯১ অব্দে। প্রথমবারের গণনার উপর নির্ভর করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের জনগণের ব্যবসায়ানুযায়ী সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ অবধারণ করেন।

কৃষী ও পাশুপাল্যজীবী	শতকরা	৫৬ জন।
বণিক, মজুর ও শিল্পী		৩৪ জন।
চাকরী ও উচ্চ ব্যবসায়ী		১০ জন।

১৮৮১ অব্দের গণনা হইতে দেখা যায়—

কৃষী ও পাশুপাল্যজীবী	শতকরা	৬০ জন।
বণিক, মজুর ও শিল্পী		৩১.৫ জন।
চাকরী ও উচ্চ ব্যবসায়ী		৮.৫ জন।

১৮৯১ * অব্দের গণনা হইতে দেখা যায়—

কৃষি ও পশুপালাজীবী	শতকরা	৬১ জন।
বণিক, মজুর ও শিল্পী	শতকরা	৩৩ জন।
চাকরী ও উচ্চব্যবসায়ী	"	৬ জন।

পর পর আদমসুমারিতে মজুরদারদিগের সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান হইলে কৃষিজীবীর পরিমাণ যে, আরও অধিক তাহা সহজেই দেখা যাইবে। যাহা হউক উপরি লিখিত বিবরণগুলি হইতেই বোধ হয় যে (১) ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর পরিমাণ অন্যান্য সুস্থাবস্থ দেশের অপেক্ষা অধিক; (২) বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় এখানকার অনেকানেক লোক স্ব স্ব ব্যবসায়চ্যুত হইয়া কৃষিকার্য্যের উপর যাইয়া পড়িতেছে এবং কৃষিকার্য্যই ভারতবাসীর একমাত্র অবলম্বন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা। ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল। এই মহানিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সুদূরদর্শী এবং উদারমতি ইংরাজ শাস্তৃগণ কেহবা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, কেহবা স্বদেশীয় বিদ্যা দানের, কেহ বা স্বায়ত্তশাসন-শক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। সে সকল উপায় একান্ত নিষ্ফল হয় নাই—কিন্তু পর্য্যাপ্তও হয় নাই! এখনও সমাজের উপরিভাগ নামিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের যে এতদূর দারিদ্র্য হইয়াছে, কিছু দিন পূর্ব্বে ইংরাজরাজের তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত ছিল না। ভারতবর্ষকে সোণার গাছ বলিয়াই সকলের বোধ ছিল। এখনও যে ইংরাজ

* (১) কৃষিতে ৫৯.০৮ এবং পাশুপাল্যে ১.২। (২) বাণিজ্যে শতকরা ২.৯, ইহার মাল ও সংবাদাদি বহন কার্য্যে অর্থাৎ রেল, নৌকা প্রভৃতিতে ১.৪ শিল্পে শতকরা ১৫.৪, ইহার মধ্যে আহার্য্য দ্রব্যের প্রস্তুত করণে অর্থাৎ মাছধরা, ধান ভানা, মুড়ি ভাজা ইত্যাদিতে ৫, সাধারণ মজুরীতে [মাটিকাটা প্রভৃতি] শতকরা ৮.৯, গৃহস্থের চাকরীতে [ধোপা নাপিত চাকর চাকরাণী ইত্যাদি] শতকরা ৩.৯; অজ্ঞাত বা কুব্যবসায়ে ২.৯।

মাত্রেই এই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু যখন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অবগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, * তখন কালে দেশের পরিচালন এরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা, যাহাতে ইহার দারিদ্র্য দশা আরও বর্দ্ধিত না হয়; প্রত্যুত যাহাতে ভারতবাসীর এমন সচ্ছল অবস্থা হয় যে, এদেশে জন্মিতে পারে না এমন শিল্পজাত দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়া এখনকার অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে ভারতবাসীর দ্বারা ক্রীত হইতে পারে।

স্বদেশীয় কাহার কাহার মনে এমন একটা ভ্রম আছে যে এইদেশে ধনবিভাগের বৈষম্য নিবন্ধন ক্লেশ হয়। বস্তুগত্যা তাহা নহে। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে লোকের যে প্রকার ভয়ানক ধনবৈষম্য জন্মিয়াছে, এখানে তাহার লক্ষাংশের একাংশও হয় নাই, হইতে পারেও না। এখানে উপরের স্তর সকল ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িতেছে এবং ভারতবাসী সকল লোক ক্রমে এক সা হইয়া যাইতেছে।

[৩] সরকারী চাকরীতে শতকরা ২·৪, উচ্চ ব্যবসায়ে শতকরা ২, যাহাদের পরিশ্রম করিতে হয় না শতকরা ১·৬—ইহার মধ্যে ·১৬ পেন্সন ভোগী, অবশিষ্টের কতক সম্পত্তিশালী এবং কতক ভিক্ষোপজীবী বা দান গ্রহণে প্রতিপালিত।

* তাঁহার মনে যে দেশের প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি হইতেছে তাহা দুর্ভিক্ষ কমিসনের প্রদত্ত সদুপদেশ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

কমিশনের প্রধান কথা এই—

[১] ভারতবাসীর শিল্প বিদ্যার সম্বর্দ্ধন করা উচিত।

[২] গবর্ণমেণ্ট এই দেশ হইতে যে যে বস্তু ক্রয় করিতে পারেন ইংলণ্ড হইতে তাহার আনয়ন না করাই কর্ত্তব্য।

[৩] দেশীয়েরা কোন শিল্পালয় স্থাপিত করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনানুসারে সুশিক্ষিত শিল্পী প্রভৃতি আনাইবেন এবং সাক্ষাৎ অর্থসাহায্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল প্রকারের আনুকূল্য করিবেন।

এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সকলের আন্দোলনে দেশের দারিদ্র্য দোষ বৃদ্ধি ক্রমশঃ স্থগিত হইতেও পারে।

১৮৭২ অব্দে পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় ভারতের আয় ব্যয় সবন্ধীয় যে বিজ্ঞাপনী দাখিল হইয়াছিল তাহা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কত আয়ের কত লোক আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রদেশ.	৫০০টাকা হইতে ১০০০ এর ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা	১০০০ হইতে ২০০০এর ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা,	২০০০ হইতে ১০০০০এর ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা.	১০০০০ হইতে ১লক্ষের ন্যূন আয়ের লোকসংখ্যা	১লক্ষের অধিক আয়ের লোকসংখ্যা.	৫০০ টাকা ও তদধিক আয়বানের সমষ্টি	২০০ টাকার অন্যূন আয়বান সঃ কঃ সমেত
বাঙ্গালা	১৪২৯৪৭	২৬২০০	১৬৬৯১	২৫০৮	১৮০	১৮৮৫২৬	২৭৮৪৮২
মান্দ্রাজ	৪৬০৩৯	৯৩৯৮	৪৮২০	৪১৫	২২	৬০৬৯৪	১৩৯৫২৯
বোম্বাই	৭৯৩৭১	৩৭১২৭	১৪৭৪৯	১৪৫৬	২০৮	১৩২৯১১	২১৮৯৬৮
উঃ পঃ প্রদেশ	৫৪১৪৩	১২৩৫৯	৭১০৭	৮৩৮	২১	৭৪৪৬৮	২০০৪৯৩
অযোধ্যা	৭১৫৯	১৪৭৫	৯৯৮	৪৩৪	৩৮৬	১০৪৫২	৪৪২৩৮
পঞ্জাব	২৫২২৯	৫২৮০	২০৩১	১৫৮	২	৩২৭০০	৭৬০৩৪
ব্রহ্মদেশ	৭৫০৫	১১৯১	৫৬৯	২৭৯	১০	৯৫৫৪	৩৩১০২
মধ্য প্রদেশ	৮০৩৫	২৫৭৮	১৪১৫	১৫৪	৭	১২১৮৯	২৬১৯২
৫০০ টাকার অনূ্যন আয়ের (সঃ কঃ = সরকারী কর্ম্মচারী	—	—	—	—	—	৫৯৫৬৮	—
	৩৭০৪২৮	৯৫৬০৮	৪৮৩৮০	৬২৪২	৮৩৬	৫৮০০৬২	১০১৭০৩৮

উপরি উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, লক্ষ টাকার অধিক আয়বিশিষ্ট বড়মানুষ বাঙ্গালার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার ও বোম্বাইয়ের সওদাগর

ও জাইগীরদারদিগের মধ্যেই যাহা কিছু আছে, অন্যান্য প্রদেশে নাই বলিলেই চলে। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বড় বড় হৌসওয়ালা বৈদেশিক সওদাগরেরাও ঐ মোট ৮৩৬এর মধ্যেই আছেন।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের তৎকালীন ১৯ কোটি প্রজা সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শতকরা ·৩ জনের ৫০০ বা তদধিক টাকা বার্ষিক আয় এবং শতকরা ৫৩৬ জনের আয় ২০০ টাকার অন্যূন। *

ইংলণ্ড ওয়েল্‌স এবং স্কটলণ্ডের মোট প্রজাসংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ। উহাদিগের মধ্যে ১৪ লক্ষের বার্ষিক আয় ১৫০ পৌণ্ড বা তদধিক। অর্থাৎ শতকরা ৫ জনের বার্ষিক আয় ১৫০০ (এখনকার হিসাবে ২৫০০) টাকার অন্যূন। এই সকলের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক এরূপ অতুল আয়বান যে, গড়পড়তায় দেশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ই ৩৪০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, ইংলণ্ডের মধ্যে যাহারা সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে আছে তাহারা, ইউরোপে দান ও আত্মীয় প্রতিপালন ধর্ম্মের প্রভাব না থাকায় এবং শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু, এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা গরীবদিগের অপেক্ষাও অধিক দুঃখভাগী। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে প্রতি ৩১ জনের মধ্যে এক জনকে দরিদ্রাবাসে খাটিয়া খাইতে হয়। এবং ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক আছে তাহার মধ্যে শতকরা ৩৮ জনকে শেষ দশায় ঐ স্থলে গিয়া পড়িতে হয়।

ফলতঃ ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জন্মিয়াছে এখানে তাহার নাম গন্ধও নাই। অতএব জমিদার বা উকিল অথবা মহাজন ইহারাই দেশের সকল টাকা উদরসাৎ করিতেছে, কৃষক এবং শিল্পীরা সেই জন্যই নিরন্ন হইয়া পড়ি

---

* এখনকার আয়করের বিজ্ঞাপনী হইতে সর্ব্বপ্রকার আয়ের ঠিকানা হয়না। পথকর খাসমহলের ও আয়করের কাগজ হইতে যদি অন্ততঃ ২০ বৎসর অন্তর মহাসভায় দাখিল করিবার জন্য সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হয় এবং ইউরোপীয় ও এদেশীয়দিগের বিবরণ পৃথক তালিকায় দেখান হয় তবেই দেশীয়দিগের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সকলে সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারেন।

রাছে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে নাই। ওরূপ কথা বলিলে কেবল ইউরোপ সম্বন্ধে একটি সত্য কথার নিতান্ত মিথ্যা কল্পনা করা হইবে, গৃহের ছিদ্র আরও বিস্তৃত হইবে, সম্মিলন হইবার উপায় আরও ন্যূন হইয়া যাইবে এবং শত্রু হাসিবে মাত্র।

(জৈবনিক অবস্থা বিষয়ক।)

কোন দেশের লোক সমধিক নির্ধন হইলে সেই দেশে অনেকানেক দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তদ্দেশবাসীদিগের জৈবনিক অবস্থা সম্পৃক্ত কোন দুর্লক্ষণ যদি জন্মিয়া থাকে, সেগুলি বিশেষ সাবধানতা পূর্ব্বক লক্ষ্য করা আবশ্যক। দেশের দরিদ্রতা অতিবর্দ্ধিত হইলে (১) দেশবাসীদিগের খাদ্য পরিমাণ ন্যূন হয়, এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকৃতি অপকৃষ্ট হয় (২) সন্তানোৎপত্তি অল্প বা দুর্ব্বল সন্তান উৎপন্ন হয় এবং লোকের আয়ুষ্কাল স্বল্প হইয়া পড়ে।

এই সকল বিষয়ে ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে হইলে ভারতবাসীর বিভিন্ন সময়ের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ 'ন্যূনতা,' 'অপকর্ষ,' 'স্বল্পতা' প্রভৃতি শব্দগুলি সাপেক্ষ শব্দ। কোন কিছু 'ন্যূন' বা 'অপকৃষ্ট' বা 'স্বল্প' বলিলে, কাহার অপেক্ষা ন্যূন বা অপকৃষ্ট বা স্বল্প এই প্রশ্ন সহজেই উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া বুঝিবার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। মনে কর, প্রশ্ন হইল, এখন ভারতবাসী দীর্ঘায়ু হইতেছে অথবা স্বল্পায়ু হইতেছে। ১৮৯১ অব্দের আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, ঐ অব্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ষাইট বৎসর এবং তাহার অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১ কোটী ৪৮ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫ জন। ভারতবর্ষের পক্ষে বৃদ্ধ লোকের এই পরিমাণ অল্প বা অধিক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, ভূতপূর্ব্ব কোন সময়ে ৬০ বৎসর এবং তদধিক বয়স্ক শতকরা কত লোক ছিল, তাহা জানিবার

প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। আকবর বাদসাহের সময়ে, কি বিক্রমাদিত্যের সময়ে, কি সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে কত লোক ছিল এবং তন্মধ্যে কত বৃদ্ধ লোক বাঁচিয়া ছিল, তাহা কেহই বলিতে বা অনুমান করিতেও পারেন না। উহা অপেক্ষা স্থূল আর একটা কথা লইয়াই দেখ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দুর্ভিক্ষ-পীড়া এখন অধিক হইতেছে, না পূর্ব্বকালের সমানই আছে না কমিয়াছে, তাহা হইলে কোন কথাই দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের অধিকার কালেও দুর্ভিক্ষ হইত, এখনও হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে কতকাল অন্তর হইত, কত সময় ব্যাপিয়া থাকিত এবং কতদূর প্রসারিত হইত, তাহার কোন নির্ণয় নাই। এই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায় যে, এখনকার দুর্ভিক্ষ যেমন প্রায় লাগিয়াই রহিয়াছে, অথবা এক বৎসর বা দুই বৎসর অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলেই ঘটিতেছে, পূর্ব্বে তেমন শীঘ্র শীঘ্র হইত না। কিন্তু ঐ কথাটীও অনুমান মাত্র। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে সকল দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাওয়া যাইত না, তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায়, এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নাই।

উল্লিখিত দুইটী উদাহরণ দ্বারা অবশ্যই বোধ হইবে যে, পূর্ব্বগত কোন কালের সহিত তুলনা করিয়া ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থাকে ভাল অথবা মন্দ বলিতে পারিবার প্রকৃত পথ নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও এখন ভারতবাসীর জৈবনিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা জানিবার অনেকটা উপায় হইতেছে এবং তাহা জানাতেই বিশেষ ফল।

ভারতবাসীর খাদ্য পরিমাণ ন্যূন হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ বিশ্বাস। এখনকার দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই একটীর হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে লোক খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই

পরিমাণ লোক খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। প্রসিদ্ধ দেবসেবাগুলির পূর্ব্বকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল, তাহা দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে; এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বসনীয় অপর এক প্রমাণ আছে। এখানকার জেলের কয়েদীদিগের নিমিত্ত ইংরাজ ডাক্তরেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, তণ্ডুল এবং দাইল এবং মৎস্যাদি উপকরণ সমস্তে প্রতি ব্যক্তির অন্ততঃ ১ সের, ১ পুয়া, ২ ছটাক, ২ তোলা ভক্ষ্য পাওয়া অত্যাবশ্যক। যাহারা তণ্ডুল খায় না, আটা খায়, তাহাদেরও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে এক সের, দুই ছটাক, দুই তোলা খাদ্য পাওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত পরিমাণের ন্যূন হইলে কয়েদীর শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া হিসাব করিলে প্রতি ব্যক্তির খোরাকী খরচ মাসিক ৪৲ টাকার ন্যূন হয় না। কিন্তু ইহা বাজার দর। কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে অনেক জিনিস বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয় না এবং বিক্রেতাকে লাভ দিতে হয় না। এজন্য সাধারণের পক্ষে খোরাকী খরচ গড়ে ৩৲ ধরা যায়। কিন্তু এই খোরাকী পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্যই প্রয়োজনীয়। যাহারা অল্পবয়স্ক অথবা বৃদ্ধ, তাহাদের পক্ষে ঐ পরিমাণ খোরাকীর প্রয়োজন হয় না। ২২ কোটি বৃটিশ ভারতবাসীর মধ্যে পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১২ কোটি; তাহার মধ্যে ৬ কোটি পুরুষ, ৬ কোটি স্ত্রীলোক। পুরুষ ৬ কোটির খোরাকী খরচ ডাক্তারদিগের উপদিষ্ট হিসাবে ধরিলে ৬ × ৩৬ = ২১৬ কোটি টাকা হয়। এবং ৬ কোটি স্ত্রীলোকের খোরাকী উহার চতুর্থাংশ ন্যূন ধরিলে ৬ × ২৭ = ১৬২ কোটি টাকা হয়। অতএব উভয়ের খোরাকীতে (২১৬ + ১৬২ =) ৩৭৮ কোটি টাকা পড়ে। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের খোরাকী যদি গড়পড়তায় পূর্ণবয়স্কদিগের এক-তৃতীয়াংশ হয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ খোরাকীতেও বার্ষিক ১০ × ১২ = ১২০ কোটী টাকা পড়ে। অতএব সমুদায় ভারতবাসীর বার্ষিক

খোরাকী খরচ ডাক্তারদের মতানুসারে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী হইতে হইলে ৪৯৮ কোটি টাকা হয়। কিন্তু সমস্ত ব্রিটিসভারতবাসীর রোজগার ২৭ × ২২ = ৫৯৪ কোটি টাকার অধিক বলিয়া কেহই মনে করেন না। উহারই ভিতর হইতে রাজস্ব দান করিতে হয়, এবং আবাস ও বস্ত্রাদির জন্য খরচ করিতে হয়। অতএব ভারতবাসীর খাদ্য যে, এত ন্যূন হইয়া আছে যে, তদ্দারা শরীর সবল বা সুস্থ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জেলের খোরাকী ডাক্তার সাহেবদিগের উপদেশানুযায়ী হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহাও জেলের বহিঃস্থিত প্রজাসাধারণের অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কেহ কেহ স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন যে, অন্যূন পাঁচ কোটি ভারতবাসী অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে।

ভারতবাসীর খাদ্য অবশ্যই অপকৃষ্ট হইয়াছে। খরচের অনাটন হওয়াতে লোকে আহারে ন্যূনতা করিতে বাধ্য হইলে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই আহারের অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য সামগ্রী শস্যজাতের মধ্যে গোধূম, যব এবং চাউল ছিল। শাস্ত্রে ঐ তিনটী শস্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এখনকার কয়েকটী নূতন এবং প্রধান ভক্ষ্য শস্যের নাম বাজরা, মকাই, চিনে, জোয়ারি। ঐ গুলির নাম কোন সুপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তকে নাই। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে উহাদের এরূপ প্রাধান্য ছিল না। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশে গোমের ব্যবহারই সমধিক ছিল, এখন সেই সকল স্থানে তণ্ডুল বাড়িয়াছে এবং বাজরাদি শস্যের বৃদ্ধি অপরিসীম হইয়াছে। এইটী সাধারণ সংস্কার। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত (১৮৯১-৯২ অব্দের) বিবিধ বিজ্ঞাপনী হইতেও জানা যায় যে বঙ্গবিভাগ ছাড়িয়া ধরিলে এখন বাজরা প্রভৃতি খাদ্য শস্য ২৩ কোটি বিঘায়, গোধূম ৬॥• কোটি বিঘায় এবং ধান্যের চাস ৮ কোটি বিঘায় হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে চাউলের রপ্তানি ১২ কোটি টাকার হইতেছে, গোধূম ৭॥• কোটি টাকার; বাজরাদিগরের রপ্তানি নাই; ডাইল

৩০ লক্ষ টাকার যায়। অতএব ভারতবাসী অপরাপর দেশবাসীদিগের নিমিত্ত যথেষ্ট গোধূম এবং তণ্ডুল পাঠাইয়া দিয়া আপনারা অধিকাংশই বাজরাদিগর খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রতিবর্ষে যত গোধূমের রপ্তানি হয় প্রায় তত পরিমাণেই বাজরা মকাই প্রভৃতি তথায় আমদানি হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিসবরী সাহেবও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী বাজরাদিগর খাইয়াই থাকিতে পারে অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গোধূমের আমদানী প্রসারিত হউক।

লোকের আহার যথোচিত না হইলে তাহাদের উৎপন্ন সন্তানের জীবন রক্ষা ভাল হয় না। কোন বিচক্ষণ ইংরাজ এই তথ্যের স্মরণ করিয়া এদেশে দুর্ভিক্ষের নিরূপণ করতঃ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে সন্তানোৎপত্তির হ্রাস বা অধিক শিশুর মৃত্যু হইতেছে দেখিলেই অনুভব করিতে হয় যে, তথায় খাদ্য সামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে, এবং সত্বরেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। বাস্তবিক আহারগ্রহণ এবং সন্তানোৎপাদন এই দুইটী ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই আছে। উদ্ভিজ্জদিগের চাসে দেখা যায়, যদি মৃত্তিকায়, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সার না পড়ে, তবে গাছ সতেজ হইয়া উঠে না। এই কথা উদ্ভিজ্জের পক্ষেও যেমন খাটে, অপরাপর সকল জীব এবং মনুষ্যের পক্ষেও তেমনি খাটে।

এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে সন্তানের উৎপত্তি এবং রক্ষা কি পরিমাণে হইতেছে। ইংরাজদিগের দেশে প্রতিবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি শতকরা ১.০৭। যদি আয়র্লণ্ডে প্রজার স্বদেশত্যাগাদি জন্য বৎসর বৎসর সংখ্যা হ্রাস না হইত তবে প্রায় ২ হইত। ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধি ·৩, জর্ম্মণির ১·১, অষ্ট্রীয়ার ৭, বেলজিয়মের ১·১, বেলজিয়মই ইউরোপের মধ্যে অতি নিবিড়-প্রজ দেশ। ডেনমার্কের ১, ইটালীর ·৬, স্পেনের ·৩ পোর্টুগালের ১.১। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাইয়ে .৮ বঙ্গবিভাগে .৭, মান্দ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ ও পঞ্জাবে .৬ এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ·৩। সমুদয় ভারতবর্ষের পক্ষে ৬ ধরা যাইতে পারে।

যে সকল প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে ১৮৮১ অব্দের এবং

১৮৯১ অব্দের আদমসুমারি গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে প্রজা বৃদ্ধির স্বল্পতার কোন হেতুই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু প্রায় সকলেই এ দেশের বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন। ভারতবাসীর যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটে, তাহা ভারতবাসীর দোষেই ঘটে, এরূপ ভাবিয়া লইতে ইচ্ছা হওয়া অসঙ্গত নয়। এরূপ ইচ্ছার বশীভূত না হইলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও কেন এমন অপ্রকৃতস্থলে দোষারোপ করিতে যাইবেন?

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রণালীর তেমন কোন গুরুতর দোষই নাই। (১) এখানে বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নাই এখানে গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেই বিবাহ করে। ইউরোপের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী নরওয়ে সুইডেন দেশে স্ত্রীজাতীয়দিগের মধ্যে প্রতি শতে ৬০.৮ অবিবাহিতা, ৩১.৮ বিবাহিতা এবং ৭.৪ বিধবা থাকে। ইংলণ্ডে ৫৯.২ অবিবাহিতা, ৩৩৩ বিবাহিতা এবং ৭.৫ বিধবা। ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী গ্রীসদেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৫৪.৩ অবিবাহিতা, ৩৪.৭ বিবাহিতা এবং ১১ বিধবা থাকে। হঙ্গেরীতে অবিবাহিতা ৪৯.৫, বিবাহিতা ৪০.৫, বিধবা ১০। ভারতবর্ষে অবিবাহিতা ৩৩.৪ বিবাহিতা ৪৮.৮ এবং বিধবা ১৭.৮। অতএব স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বিবাহিতার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, রোগিণী ভিন্ন, দেশের সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্বাহ সূত্রে সম্বদ্ধ হওয়া উচিত। অতএব ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে ঐ বৈজ্ঞানিক নীতিরই অধিক সুপালন হয়, তাহা অপক্ষপাতী ইউরোপীয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী লেখক একটী ইংরাজও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে সধবার সংখ্যা শতকরা ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক। অতএব ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রথা উৎকৃষ্টতর এবং প্রজাবৃদ্ধির অনুকূল।

(২) আদমসুমারির কর্ত্তৃপক্ষীয়ের এদেশের প্রচলিত বাল্য বিবাহ

প্রথার প্রতিকূলে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। যুক্তির মধ্যে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এখানকার বিবাহ-রীতি ইংলণ্ডের রীতির সহিত মিলে না। কিন্তু এ বিষয়েও বিজ্ঞানের মত লওয়া যাইতে পারে। উদ্বাহসূত্রে সম্বন্ধ প্রতি দম্পতীর ন্যূনকল্পে চারিটি করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে বংশ থাকে না, কারণ যত সন্তান জন্মে গড়ে তাহার অর্দ্ধেক অপূর্ণাবস্থাতেই মারা গিয়া থাকে। চারিটি সন্তানের জন্মলাভে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাতার পালনে দশ বার বৎসর কাল লাগে। সুতরাং যদি দেশভেদে আয়ুষ্মত্তার ভেদ হয়, অর্থাৎ কোন দেশের লোক অধিক কাল বাঁচে আর কাহারাও বা অল্প কাল বাঁচে এমত হয় তবে যে দেশের লোকের আয়ুষ্মত্তার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের সহিত বৈবাহিক বয়সেরও একটী নিত্য সম্বন্ধ হইয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন সাহজিক সংস্কারের প্রভাবেই ঐ বৈবাহিক কালের অবধারণ করিয়া লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নরওয়ে-সুইডেনে লোকের আয়ুষ্মত্তা গড়ে ৪২ বৎসর; ঐ দেশের বৈবাহিক বয়স ৩০ বৎসর। ইংলণ্ডে আয়ুষ্মত্তা ৩৫ বৎসর; ওখানে বৈবাহিক বয়স ২১ বৎসর। ফ্রান্সে আয়ুষ্মত্তা ৩০ বৎসর বৈবাহিক বয়স ১৯ বৎসর। ইটালী এবং গ্রীসে আয়ুষ্মত্তা ২৮ বৎসর, বৈবাহিক বয়স ১৬ বৎসর। ভারতবর্ষে আয়ুষ্মত্তা ২৫ বৎসর, এখানকার প্রকৃত বৈবাহিক (দ্বিরাগমনের) বয়স ১৩ বৎসর। অতএব ভারতবাসীর বৈবাহিক বয়সের নিয়ম, অন্যান্য জাতীয়দিগের নিয়মের ন্যায় সাহজিক সংস্কার হইতে সমুত্থিত এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত।

(৩) আদমসুমারির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আর একটি কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে বৈবাহিক বয়োবৈষম্য অধিক, অর্থাৎ এখানে পুরুষের বয়স খুব বেশী এবং স্ত্রীর বয়স খুব কম হয়। কিন্তু তাঁহারা এই ব্যবস্থার কোন বিশেষ দোষের উল্লেখ করেন নাই। এই মাত্র আন্দাজ করিয়াছেন যে, ঐ কারণে এ দেশে পুত্র সন্তান অধিক এবং কন্যা সন্তান অল্প হয়। কিন্তু ইংলণ্ডেও পুত্রসন্তান অধিক জন্মে; তথায় জন্ম-

মৃত্যুর রেজিষ্টরী সঠিক হয় এবং জানা গিয়াছে যে শতকরা ৩৭টি পুত্রসন্তান অধিক জন্মে অথচ পুত্রসন্তানের শৈশবে অধিক পরিমাণে মৃত্যু, পুরুষদিগের বিদেশ যাত্রা প্রভৃতি কারণে ইংলণ্ডে পুরুষের সংখ্যা হাজারকরা ৫১টি কম। ভারতবাসীর মধ্যে যে পুরুষের সংখ্যা তেমন অধিক এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা তেমন অল্প, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে। আদমসুমারিতে সকল স্ত্রীলোকের সংখ্যা না হওয়াই ঐসংখ্যা বৈষম্যের প্রধান কারণ। ১৮৭১ সালের আদমসুমারিতে যত বৈষম্য দেখা গিয়াছিল ১৮৮১ সালে তত দেখা যায় নাই, ১৮৯১ অব্দে তদপেক্ষাও কম। ইউরোপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম প্রধান গ্রীস এবং ইটালীর আদমসুমারিতেও ঐরূপ অল্প পরিমাণ ইতর বিশেষ দেখা যায়; এখানেও সেইরূপ, তাহার অধিক নহে। মোট অধিবাসীর সংখ্যা মধ্যে পুরুষের সংখ্যা জর্ম্মণীতে শতকরা ৪৮.৭, স্পেনে ৪৯.৩, ইটালীতে ৫০.৩, গ্রীসে ৫১.৭, ভারতবর্ষে ৫০.৮ দেখা যায়।

(৪) যাঁহারা ভারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত দুরবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা যে, এখানকার বিধবা বিবাহ প্রতিষেধের উল্লেখ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিন্দাবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রদেশভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলৎ আছে। দ্বিতীয়তঃ, আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী হইতেই দেখা যায় যে, বিধবার সংখ্যা হিন্দু স্ত্রীজাতীয়ার মধ্যে শতকরা ১৭, মুসলমানের ১৫, জৈনের ২১.৪, খৃষ্টানের ১২.৪ এবং আদিমদিগের ১০.৭; অতএব দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান এবং খৃষ্টানাদির মধ্যে বিধবা বিবাহের কোন শাস্ত্রীয় প্রতিষেধ না থাকিলেও ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এদেশে বিধবার বিবাহ অধিক দেন না। আদমসুমারির বিজ্ঞাপকেরা এই তথ্যের সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, এখানে হিন্দুই অধিকসংখ্যক এবং প্রবল; এই জন্য এ দেশে

তৃপর সকলে হিন্দুরই অনুকরণ করে, এবং তাহা করিবার ইচ্ছাতে স্বধর্ম্মাবলম্বী বিধবাদিগের বিবাহ দেয় না। এ কথা নিতান্ত অমূলক নয়। অমূলক কি, ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর এক সামাজিকতার মূলসূত্র। ভারতবর্ষে হিন্দুরই সম্যক্ প্রাধান্য এবং স্থূলতঃ হিন্দুর আচার ব্যবহারই এদেশের যোগ্য এবং সকলের অনুকরণীয়। ফলতঃ ভারতবর্ষে বিধবার বিবাহ স্বল্পসংখ্যক হইবার সাহজিক কারণই আছে। গ্রীস এবং ইটালী প্রভৃতি দেশ ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী, সুতরাং অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম প্রধান। ঐ দেশগুলিতে বিধবার সংখ্যা ইউরোপের শীত-প্রধান ভাগগুলির অপেক্ষা অনেক অধিক। ও সকল দেশে ত হিন্দু প্রবল এবং অনুকরণীয় হয় নাই। গ্রীস এবং ইটালীতে বিধবার সংখ্যা শতকরা ১২ এবং নরওয়ে সুইডেনে ৩ মাত্র। যদি তুরস্ক, মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশের তেমন আদমসুমারি পাওয়া যাইত. তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিধবা সংখ্যার সহিত (শতকরা ১৮.৭ সন্নিহিত মিলিয়া যাইত বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যৌব-ধর্ম্মের হ্রাস শীঘ্র হয়—এই মুখ্য কারণেই ঐ সকল দেশে বিধবার সংখ্যা অধিক থাকিয়া যায়।

(৫) আদম সুমারীর বিজ্ঞাপনীতে বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ক কথার মধ্যে বহুবিবাহের অতি সামান্যরূপ উল্লেখ আছে। কারণ এখন আর ভারতবর্ষে বহুবিবাহের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। বিবাহিত পুরুষের যে সংখ্যা তাহাদের পত্নীসংখ্যা তাহা অপেক্ষা ৩ লক্ষ মাত্র অধিক অর্থাৎ শতকরা ৫৪। তন্মধ্যে হিন্দুপত্নীর আধিক্য শতকরা ৩, মুসলমানের ১.৯ এবং আদিমদিগের .৩। বাস্তবিক বহুবিবাহ ব্যাপারটি কখনই কোন দেশে সমধিক পরিমাণে প্রবল হইতে পারে না। প্রাচীন রোমীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে যেরূপ, জর্ম্মণদিগের, ভারতবাসীদিগের এবং মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে। প্রভুতাশালী ধনী এবং বিজেতৃভাব সম্পন্ন লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে সকলদেশেই একাধিক দারপরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বহুবিবাহের রীতি একমাত্র বিশিষ্ট

রূপে বিজেতৃধর্ম্মী মুসলমান ভিন্ন আর কাহার মধ্যে তেমন প্রচলিত হয় নাই।

অতএব প্রকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারিলে, ভারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীতে এমন কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধির অল্পতার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। কম হইবার কারণ, সন্তান জনন শক্তির হ্রাস নহে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রতিবর্ষে এই বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যেই ৩০ লক্ষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ কথা হইতে অনুমান করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষে ৮০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪টী সন্তান জন্মে ধরা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ইহা হইতে কিছু ন্যূন পরিমাণই সন্তান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এখানে উৎপত্তির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক হইয়াও প্রজার বৃদ্ধি কম হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষজাত সন্তানগুলির শৈশবে মৃত্যুর পরিমাণ অতি বিসদৃশই হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুভিক্ষের বর্ষে ভারতবর্ষীয় বৈবাহিক প্রণালীর গুণে সন্তানোৎপত্তি এখনও কম হয় না। কিন্তু শিশু মৃত্যু এত অধিক হইতেছে যে, তন্নিবন্ধন সমস্ত লোকের আয়ুর গড় পড়তা অর্থাৎ দেশের সাধারণ আয়ুষ্কাল পঞ্চবিংশতি বর্ষের অনধিক। *

ভারতবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ন্যূন হইবার কারণ বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নয়, লোক সকলের অবৈধ আচরণের আধিক্য নয়, জননশক্তির হ্রাস নয়, ইহার কারণ এক মাত্র দরিদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। যদি এখানকার বৈবাহিক রীতি ইউরোপীয় দেশগুলির রীতির ন্যায় হইত, অর্থাৎ ঐ রীতি অল্প মাত্রায় পালিত, তুচ্ছীকৃত এবং অসাময়িক হইত, তাহা হইলে এত দিনে ভারত নিতান্ত স্বল্পপ্রজ হইয়া ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ যোগ্য হইয়া পড়িত। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, কোন দেশে আকার্য্যোৎপত্তি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইয়া গেলে তথায় আর প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন জন্ম মৃত্যুর পরিমাণ এক হারে হইয়া প্রজার সংখ্যা স্থির থাকে।

---

* বাঙ্গালার ২৩ বৎসর মাত্র। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও পঞ্জাবে ২৬শের কিছু অধিক,

আর ও ভূমণ্ডলের কোন দেশই ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভূমি এত উর্ব্বরা এবং উহাতে সর্ব্বত্রই এত অনাবাদী ভূমি পতিত আছে যে, ভারতবর্ষে প্রজা সংখ্যার পূর্ণতা নিকটবর্ত্তী হওয়াতেই প্রজাবৃদ্ধির হার ন্যূন হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখানকার আদম-সুমারির সমুদায় কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া একজন সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি ইংলণ্ড বাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন "মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতেই ভারতবর্ষে প্রজা সংখ্যার তাদৃশ বৃদ্ধি নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের উপর এমন প্রবল প্রতিযোগিতার ভার পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য দেশবাসিগণের পুরুষে পুরুষে আহার্য্য কমিয়া যাইতেছে এবং উৎপন্ন প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।"

ভবিষ্যবিচার—তাহার উপসংহার।

ভারত সমাজের পরিণামে কিরূপ হইতে পারে, ইহার অনুমান করিতে গিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে, (১) পণ্ডিতপ্রবর অগষ্ট কোমটি মানব জাতি সাধারণের ভাবী ধর্ম্ম এবং শাসনাদি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই মত সর্ব্ববাদিগ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং (২) ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী ও বিধ্বস্তৃদলের অনুযায়ী পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়া এখানকার সমাজের প্রকৃতি সম্যক্ ভাবান্তরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, (৩) ইউরোপীয়দিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনের সম্ভাবনা অতি সুদূরবর্ত্তী কোন ভবিষ্য কালকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কি বর্ত্তমান কি অনতিদূরবর্ত্তী কোন কালের সহিত তাদৃশ ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। দৃষ্ট হইয়াছে যে ভারতবাসীর (৪) ধর্ম্মজ্ঞান যে উচ্চতম অক্ষয় বস্তু তাহার বিলোপের কোন শঙ্কাই হইতে পারে না, এবং (৫) ভারতবর্ষ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলির সমীকরণ বুদ্ধি বিলক্ষণসম্ভবপর। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসীর (৬) বর্ত্তমান সামাজিক রীতির

মূল স্বরূপ জাতিভেদ প্রথা কোন সামান্য কাল্পনিক বস্তু নহে; নৈসর্গিক কারণ হইতেই সম্ভূত; সুতরাং উহা হঠাৎকারে এবং স্থায়ীরূপে উঠিয়া যাইতে পারে না। পরিশেষে ভারতবাসীর (৭) বর্ত্তমান ধনহীনতা এবং (৮) জীবন ক্ষীণতার সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, আমাদিগের অবস্থার প্রতি দেশাধিপতির এবং তজ্জাতীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগের সযত্ন দৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং দেশীয় জনগণের প্রকৃত উদ্যোগ হইলে অধঃপাতের প্রতিবিধান চেষ্টায় সফলতা লাভ হইলেও হইতে পারে।

ইউরোপখণ্ডের ইতিবৃত্ত মাত্র পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের যে সকল স্থূল সিদ্ধান্ত হইয়া যায়, সেই সকল সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করিয়া ভারত সমাজের সংস্কার সাধন চেষ্টা করায় বৈফল্যের এবং অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। সকল দেশের সমাজ গঠনপ্রণালী একরূপ নহে। ইউরোপীয় সমাজ সকল যে প্রকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, আসিয়াখণ্ডের বিভিন্ন সমাজগুলি ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আসিয়াখণ্ডে ধর্ম্মশাসনের প্রাবল্য। ইউরোপে বৈষয়িক ভোগবাসনার আতিশয্য। আসিয়াখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তিতিক্ষার শিক্ষা, ইউরোপে স্বার্থরক্ষার শিক্ষা এবং অভ্যাস। ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন, যদি একমাত্র জাতিভেদ প্রথাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা যায়, তবে চীনীয় জাপানীয় প্রভৃতি আসিয়িক জাতিদিগের সহিত অধিক মিলে। জাপান এবং চীন যে সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে ইউরোপীয় জাতিদিগের তুল্য মূল্য হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার পথ যে ইউরোপীয়দিগের অনুসৃত পথ হইতে ভিন্নরূপ তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। জাপানীয়দিগের সৈন্য বৃদ্ধি এবং যুদ্ধপোত বৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। তাহাদের ভূমাধিকারীরা স্বেচ্ছাতঃ আপনাদিগের ভূমি সম্পত্তি সমুদায় সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিল এবং আপনারা সম্রাটের বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিল। ইউরোপের ইতিহাসে কোথাও এমন ব্যাপারের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। ইউরোপে ভূমাধিকারীর বল খর্ব্ব হইয়া রাজার বল বৃদ্ধি হইতে কত রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং

যত কাল বিলম্ব হইয়াছে। আবার দেখ, জাপানীয়েরা ইউরোপের শাসন-প্রণালীর প্রকৃতি অবগত হইয়া ইচ্ছা করিল যে, তাহাঁদের দেশেও ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এই অভিলাষে তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিল। তাহাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হইল, এবং জাপানে প্রজা নির্ব্বাচিত পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইউরোপের কোনও দেশে কি এরূপে শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে? ওখানকার সকল দেশেই পার্লিয়ামেণ্টের উদ্ভাবন, সংস্থাপন এবং বলবর্দ্ধন করিতে অনেক গোলমাল এবং অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে।

সে দিন দেখিলাম এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ চীন সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাটেরা যদিও সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুশ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তথাপি চীনের শাসন কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বকই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, চীনের রাজা এবং প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের শিক্ষা, সংস্কার এবং অভ্যাস এরূপ যে, তাঁহারা একমাত্র প্রজার শুভ সাধনের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া অতি পরিশ্রম সহকারে আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং তদ্বিপরীতাচরণকে অধর্ম্ম জানিয়া তাহার পরিহার করেন। অতএব প্রজার হিতের নিমিত্ত রাজার সৃষ্টি রাজার হিতের জন্য প্রজার সৃষ্টি নয়, এই তথ্য জ্ঞানের লাভ করিতে ইউরোপ খণ্ডে যত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে চীন দেশে সেই তথ্যজ্ঞান ধর্ম্মমূলক বলিয়া একেবারে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়া চলে না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তরতা ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বিজাতীয়ের অনুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন সমাজের সম্যক্ শুভ সাধন হইতে পারে না। কি রাজনৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক কি পারিবারিক, সকল ব্যবস্থাই দেশভেদে কিছু কিছু পৃথক হইয়া আছে এবং পৃথক থাকাই ভাল। দেখ ইউরোপখণ্ডে রাজনীতি লইয়া নিরন্তর আন্দোলন চলিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ আন্দোলন চীন এবং জাপানের পক্ষে

আবশ্যক হয় নাই। ঐ দুইটী দেশে সেরূপ আন্দোলন না হইয়াও তথায় প্রয়োজনানুরূপ ইউরোপীয় শিল্প ও সমর প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, ভারতবর্ষেও ইউরোপীয় প্রণালীর অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজনীয় কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া বুঝা হয় নাই; গতানুগতিকতা বশতই ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয় জনগণ ঐ প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আরও দেখ, ইউরোপ খণ্ডের সমাজগুলিতে সাম্য ভাবের বৃদ্ধি করাই সমাজোন্নতির বিশিষ্ট পথ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। ওখানকার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গের ক্ষমতা এবং অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছে; আরও ন্যূন করিয়া দেওয়া অনেকানেক রাজনৈতিকের অভিমত। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা, মহারাজা, নবাব, সুবা, জমিদার এবং ব্রাহ্মণাদি স্বসমাজভুক্তদিগের পদমর্য্যাদার এবং গৌরবের লোপ করিতে গেলে নিতান্ত অপথে পদার্পণ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপে বৈবাহিক বন্ধনটীকে চুক্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা পারিবারিক শুভ সাধন বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। কিন্তু বিবাহকে চুক্তিতে পরিণত করা ভারতবর্ষের সংশোধন কার্য্য না হইয়া নিতান্ত অপুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। কোন্ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই প্রকার নানা সন্দেহের ভঞ্জন হইবে?

কার্য্যপ্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রবৃত্তির বলে লোকে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যাবধারণের পূর্ব্বেও কাজ করিতে যায়। সেই জন্য হঠকারিতাও জন্মে। ভারতবর্ষে যে কোন না কোন প্রকার সংস্কার কার্য্যের নিমিত্ত অনেকেই সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং ব্যস্তভাবে একটা না একটা কিছু করিতে বা করাতেই প্রবৃত্ত হইতেছেন, ঐ কার্য্য-প্রবৃত্তিই তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ। বস্তুতঃ কর্ত্তব্যবোধ প্রণোদিত সমাজ সংস্কার কার্য্যেও হঠকারিতার উপস্থিতি হইয়া থাকে। এই জন্য সংস্কার কার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ভারত সমাজ হীনাবস্থ হইতেছে, ইহার হীনাবস্থা কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, ইহা নিপুণ হইয়া জানিতে হয় এবং দেখিতে হয় যে, বর্ত্তমান হীনাবস্থা আরও হীনতর হই-

বার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং হীনতাবৃদ্ধির অভিমুখ কোন দিকে। এই সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির হইলেই কর্ত্তব্য নির্ণয়টি যথাযথরূপ হইতে পারে নচেৎ কেবল উদ্বেগ, অধৈর্য্য, অস্থৈর্য্য এবং বিড়ম্বনা সার হয়। যিনি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কর্ত্তব্যের পথ অবধারিত করিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত সংস্কারক হইবেন।

ভবিষ্য বিচার দ্বারা ভারতবাসীর যে যে বিষয়ে হীনাবস্থা বৃদ্ধির শঙ্কা হইতে পারে, সেই সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্ণয় করা আবশ্যক। সমুদায় সমাজটীকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা করা অবৈধ এবং অফল। আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, যত দিন আমাদিগের মধ্যে তাদৃশ কোন নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইতেছে, তাবৎকাল আমরা ধৈর্য্যা-বলম্বন পূর্ব্বক ভারত গবর্ণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইব না। এত-দ্দেশাগত বেসরকারী ইংরাজদিগের অথবা বিলাতের ইংরাজ রাজনৈতিক দিগের আন্দোলন প্রণালী আমাদের অবস্থা এবং প্রকৃতির উপযোগী নহে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলিতে আমাদের মিশ্রিত হওয়া যেমন অকর্ত্তব্য, বে-সরকারী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোন অনুষ্ঠা-নের প্রতিকূলে আন্দোলন করিতে যাওয়া তেমনি মূর্খতার কার্য্য। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, বিলাতী উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল উভয় দলই আমাদের পক্ষে সমান। যদিও বিলাতবাসী ইংরাজের অথবা এতদ্দেশাগত ইংরাজের চাপে বা মন রাখিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট কথঞ্চিৎ এমন কাজ করিয়া ফেলেন যে তজ্জন্য আমাদের ক্ষুব্ধ হইতে হয়; তথাপি ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আমাদের আজীবনের সহিত বিলাতী ও এতদ্দেশাগত বে-সর-কারী ইংরাজদিগের প্রখর স্বার্থের যতটা বিরোধ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের কখনই ততটা প্রভেদ হইতে পারে না। এ দেশে বড় লোকের আবির্ভাব গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত, ইংরাজ-কর্ম্মচারীর মুখেও এরূপ হঠবাদ অসঙ্গত এবং অশ্রদ্ধেয়।

ভারতবাসীর ক্ষমতা ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী আপনাকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে অশক্ত, আপনার সুশাসনে আপনি অক্ষম, নিজের দেশটীকেই নিজে মিলাইয়া এক করিতে পারেন নাই। এখন ত সমস্ত দেশ একচ্ছত্রে মিলিত হইয়াছে, তথাপি উহাকে স্বশক্তিতে একত্র করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে অপরের সাহায্য অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষ সেই অত্যাবশ্যক সহায়তা ইংলণ্ডের স্থানে পাইতেছেন। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহার সুশাসন করিতেছেন; ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত রাখিতেছেন।

অতএব ইংলণ্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের যতটা উপকার হইয়াছে, অপর কোন ইউরোপীয় জাতি কর্তৃক ততটা হইতে পারিত না। যদি ফ্রান্সই ইহার অধিকারী হইতেন, তিনিও ইংলণ্ডের প্রবলতর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। পোর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজদিগের ত কথাই নাই। কিন্তু ইংলণ্ড কেবল মাত্র পরাক্রমেই যে অপর সকল ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতম তাহা নহে। অপর সকল ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজের ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য অধিকতর, এবং তাঁহার ন্যায়ানুগামিতা স্থিরতর। অতএব যখন ভারতবাসীর অবস্থা এমন যে, তাঁহাকে অপরের অধীন হইতেই হয়, তখন আর কাহার না হইয়া যে ইংরাজের অধীন হইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকার্য্য।

ইংরাজী শিক্ষিত সুতরাং ইংরাজনীতি এবং চরিত্রে যাঁহারা অধিক অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটী বিশেষ ভাব সঞ্চিত হয়। তাঁহারা জানেন যে, বীর প্রকৃতিক ইংরাজ যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না তাহার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতেও পারেন না। এই ভাব হইতে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে এক প্রকার স্বচেষ্টার বাহুল্য হইয়াছে—রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক সমিতির সংঘটন হইয়াছে, সংবাদপত্রাদির সৃষ্টি

হইয়াছে, সমুদায় দেশ ব্যাপিয়া বিবিধ প্রকার আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে এবং নানা প্রকার সংস্কারের কল্পনা এবং চেষ্টা চলিতেছে।

কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া স্বয়ংসিদ্ধের ন্যায় এ পর্য্যন্ত কোন্ প্রধান রাজনৈতিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, খ্যাতনামা অনেকানেক দেশীয় রাজনৈতিক ভিতরে ভিতরে ইংরাজ বিশেষের উপদেশ এবং পরামর্শ লাভ করিয়াই যাহা কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়া সভায় জর্জ টমসনের আবির্ভাব হইতে কংগ্রেসের জীবাত্মা স্বরূপ হিউম সাহেবের নাম স্মরণ করিলেই আমাদের প্রকৃত অবস্থার অববোধ হইবে। ফলতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে বে-সরকারী ইংরাজের সাহায্য এক্ষণে আমাদের একমাত্র অবলম্ব হইয়া আছে। কিন্তু ঐ অবলম্ব গ্রহণ আমাদের পক্ষে কোন মতেই নির্দোষ নহে। উহার প্রধান দোষ দুইটী। এক দোষ এই যে, ঐ সাহায্যগ্রহণে আমাদিগের অনুকরণ বৃত্তিটীই অতি প্রবলা হয়। সুতরাং ইংরাজের প্রণালীশুদ্ধ রাজনৈতিক বিচার বিষয়ে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে না, উহা আমাদের সামাজিক নীতি, ধর্ম্মনীতি এবং পারিবারিক নীতির মধ্যেও প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের অনুপযোগী অনেকানেক পরিবর্ত্ত ঘটাইয়া দিতে চায়। দ্বিতীয় দোষটীও অনুকৃতি প্রবণতার বৃদ্ধি সম্ভূত। ইংরাজ অধিনেতা তাঁহার স্বদেশের উপযোগী যে আন্দোলনের রীতি তাহাই জানেন। তিনি সেই রীতি এখানেও প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তাহা এখানকার লোকের স্বভাব, শিক্ষা এবং অভ্যাসের উপযোগী হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিব। মনে কর, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজার নিকটে স্বদেশ বিষয়ক কোন প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ-রাজ স্বদেশীয় নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা দুই পাঁচ জনে যে প্রার্থনা করিতেছ তাহা তোমাদের মনগড়া প্রসূত হইতে পারে—দেশের অধিক লোকে ত ওরূপ কোন প্রার্থনা করে নাই! এই উত্তর ইংরাজী রীতির অনুযায়ী হইলেও উহা এদেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য নহে। সুতরাং উহার ফল এই হয় যে,

ইংরাজ নেতার প্ররোচনায় ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা এদেশে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রণালী এদেশের অনুপযোগী। অতএব ইংরাজ নেতৃত্বে এখানে সমীচীন কার্য্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ইংরাজ সত্বেও ভারতবর্ষে দেশীয় নেতারই সমূহ প্রয়োজন হইয়া আছে।

-***-

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কর্ত্তব্যনির্ণয়।

নেতৃ প্রতীক্ষা।

উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজ। কিন্তু অনুকরণ কার্য্যতঃ সহজ হইলেও উহাতে ভ্রম এবং হানি অধিক হইতে পারে। উদ্ভাবন সহজে হয় না; কিন্তু যদি হয় তবে একেবারে দেশকালপাত্রের উপযোগী হইয়াই হয়। অনুকরণে ঐরূপ উপযোগিতার রক্ষা বিশেষ চেষ্টাসাধ্য। যে অনুকরণে সম্যক্ উপযোগিতার রক্ষা হয়, তাদৃশ অনুকরণ উদ্ভাবন হইতে বড় নিকৃষ্ট বস্তু নহে। প্রত্যুত, অনেকানেক উদ্ভাবনের উদাহরণই ঐরূপ অনুকরণের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও অনুকরণে এবং উদ্ভাবনে মূলতঃই ভেদ আছে। অনুকরণ বাহ্য, উদ্ভাবন আভ্যন্তরিক। অনুকরণে ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য, উদ্ভাবনে একত্ব এবং তদাত্মতা। এই জন্য যিনি অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি প্রায়ই উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয়েন। এই জন্যই বোধ হয়, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির ন্যূনতা। আমাদের বর্ত্তমান নেতা ইংরাজও আমাদিগকে তাঁহার নিজের অনুকরণের শিক্ষা ভিন্ন আর কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না। ইংরাজের অবস্থা, স্বভাব এবং চিত্তবৃত্তি এরূপ নয় যে, তিনি আমাদিগের জন্য এবং আমাদিগের হইয়া, আমাদিগের প্রকৃত গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিতে

শত্রু হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত এমন একটী আইন, কার্য্য-বিধি অথবা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই যাহা ইংলণ্ডের অনুকরণসঞ্জাত নহে।

ইংরাজের স্থানে অনুকরণ করিবার অনেকানেক বিষয় ভারতবাসী আপনার সম্মুখেই পাইতেছেন। এখন ইংরাজ নানা প্রকারেই তাঁহার আদর্শস্থলীয়। অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, ইংরাজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মূর্ত্তিমান হইয়া আছে। ইংরাজের উচ্চাভিলাষ আছে, সাবলম্বন আছে, অধ্যবসায় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, গাম্ভীর্য্য আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আছে। সম্মিলন শক্তিটীতে অনেকানেক উচ্চতম সদ্‌গুণেরই সত্তা বুঝায়। ইহাতে মনের সংযম বুঝায়, স্থিরতর সহানুভূতি বুঝায়, বশ্যতা বুঝায়, সত্যনিষ্ঠা বুঝায়। ভারতবাসীর সম্মিলনশক্তি ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ঐ শক্তিটীকে অধিকার করিবার জন্য বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় ভাবের পরিবর্দ্ধন অতি অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ জাতীয় ভাব সম্মিলন-প্রবণতারই নামান্তর অথবা পরিপাক।

আমরা সম্মিলন প্রবণতা ইংরাজের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, তাঁহার প্রকৃত অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারতবাসীর যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলন প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্নপ্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া দারিদ্র ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে অক্ষমতা।

এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্ত্তমান নেতা ইংরাজের সাক্ষাৎ চেষ্টায় কদাপি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইবার নহে। কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষ-কর্ত্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন

পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্যকরণীয় দুইটী। একটী এই যে, যখন কোন শুভকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৶জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজাতীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটী তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড় লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড় লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই, অতএব ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত।

যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাত্মা-দিগের গুণ গরিমা দেখিতে পাইব এবং তখন আর অর্থপিশাচ, লঘুচিত্ত, অনুদার প্রকৃতিক বৈদেশিকদিগকেই সর্ব্ব গুণাধার বলিয়া মনে করিব না। তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য দেশীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণের অপমান, দেশীয় রীতি নীতির প্রতি ঘৃণা এবং স্বজাতীয় লোকের কুৎসা প্রচার করিব না।

ভারতভূমি সত্যসত্যই রত্নপ্রসবা। এখানে প্রকৃত বড় লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হয়। তাহা না হইলে এত শত শত নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? যাঁহারা ছোট খাট যেরূপ হউক, এক একটী সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে।

তবে কি যে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে, তাহারই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়? তাহাও নহে। কিন্তু বরং তাহাও ভাল, তথাপি কেহ কোন উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহার প্রতি অসূয়াবান হওয়া ভাল নয়। পরন্তু যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

[১] তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয়লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন। [২] তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপ-যোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারি-বেন। [৩] তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্য-দিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। [৪] তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫] তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পুর্ব্বোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মি-জালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই

লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধপাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্ন মাত্র পাইলেই ভগবদ্ বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্‌যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদ্দেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্ভবঃ॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড় লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটি আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উপকর্ষ সাধন, মনের সংশয়চ্ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভ শান্তন করিবার জন্য স্বজাতিমধ্যে একজন নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক। কারণ ভগবদ্‌বাক্য আছে—

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজামাহং॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের উদয় হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্ট করি।

ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্য্যকলাপ, ব্যবহার প্রণালী, এবং মনেরভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোন অনুমান করা যাইতে পারে না! অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে

করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্ব্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটীই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহা হইতেই ভারতবাসীর সম্মিলনসূত্রের আবিষ্কার হইতে পারে, ইহা হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহা হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মধনের সম্বর্দ্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত পাপাচার এবং অভূতপূর্ব্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে। কোন একটী মনুষ্যশিশুর ভাবি অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বা কি হইতে পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দ্দিষ্টরূপে নিরন্তর যত্ন করিলে সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতেও নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্যতর হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জন সাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায় একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্ত-মানের কর্ত্তব্য। শিক্ষা কার্য্য ও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি বাৎ-সল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উঁহার নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—সম্ভল গ্রামের" * অর্থ 'নিশ্চয়াত্মকচিত্তসমূহ,' 'বিষ্ণু যশার' † অর্থ 'ব্যাপক আজ্ঞা,' সুমতির" অর্থ 'সাধুবুদ্ধি এবং 'কল্কির" ‡ অর্থ 'কলহনাশক"। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে সুবুদ্ধি হইতে কলহ নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভলগ্রাম, সমস্ত ভারত সমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য্য। কল্কিদেব যে অসি ধারণ করিবেন সেটী জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলন সাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে য়িহুদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে,

---

* সম্ভলগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি—'ভল' ধাতু নিরূপণার্থ, অং প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকচিত্ত; গ্রাম অর্থে সমূহ, অতএব সম্ভলগ্রাম—নিশ্চয়াত্মকচিত্ত সমূহ।

† বিষ্ণুযশা বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা সত্তা, অতএব বিষ্ণুযশা—ব্যাপক আজ্ঞা।

সুমতি—সুন্দর বুদ্ধি।

‡ কল্কি—কলি অর্থে কলহ বা পাপ (কলহাৎ কলিরুৎপন্নো যেন ধর্ম্মং বিনশ্যতি) কলি হইতে কণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ; কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহের নাশ করেন এই অর্থে ই প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি—কলহ বা পাপনাশক। কলকি পুরাণেই কথিত আছে "কল্কিঃকল্ক বিনাশার্থং আবির্ভূতং বিদুর্ব্বুধাঃ।"

আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়িহুদীরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়সকৃপাণ হস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—অতথ্য পরিহার।

ভারতবর্ষের অবস্থা হীন হইয়াছে। আজি কালি ইংরাজেরা, বিধিপূর্ব্বক, অবিধি পূর্ব্বক, সর্ব্ব প্রকারেই ভারতবাসীর নিন্দা করিতেছেন। ভারতবাসী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলহে মগ্ন, অসূয়াপরবশ, মিলনে অশক্ত, বিদ্যাহীন, ধনহীন এবং স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দোষ মাত্রই ধর্ম্মহানি হইতে জন্মে। অতএব শাস্ত্রে কলিযুগে যে ধর্ম্মহানির উল্লেখ আছে, তাহাতেই সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে সকল দোষের উল্লেখ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবাসীর শাস্ত্রই ভারতবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক তিরস্কার করিয়াছেন এবং স্নেহময় পিতার ন্যায় ঐ তিরস্কারের সহিত তিরস্কারের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কলি হইতে দোষ হইয়াছে, কলি জয়েই দোষের পরিহার হইতে পারে।

মানুষের সকল দোষই ধর্ম্মহানিমূলক। কিন্তু ভারতবাসী পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্মভীরুতাপ্রবণ। একথা শুদ্ধ আমরাই বলি না, সকল দেশের সকল লোকেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অতএব ভাবিয়া দেখিলে একটী বিষম সমস্যাই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হয়। এক পক্ষে, ভারতবাসীর সকল দোষের মূল ধর্ম্মহানি; পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর মন অপর সকল জাতির অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মানুরক্ত, তবে ভারতবাসীর দোষ কোথা হইতে

আইসে? কোন্ সময়ে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছিলাম এবং যাহা এখনও মনে লাগিয়া আছে, এ প্রবন্ধে তাহারই ব্যাখ্যা করিব। সংক্ষেপতঃ বলিয়া রাখি যে, ভারতবাসী ধর্ম্মশীল বলিয়াই এখনও পৃথিবীতে থাকিতে পারিয়াছেন. অন্যান্য প্রাচীনজাতিদিগের ন্যায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যান্ নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া আছে, এই জন্য তাঁহার উন্নতি নাই, অধঃপতন হইতেছে।

কতিপয় বর্ষ গত হইল ৺ কাশীধামে একটী মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে লোকে অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং আরবি ফারসিও জানিতেন এবং ভারতবর্ষের সকল তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া ছদ্মবেশে পাদচারে ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অনেকানেক দেশ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক জন সেবক বা শিষ্যের স্থানে আমি তাঁহার কতকগুলি মতবাদ শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিতেন—এখন ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি অর্থাৎ উহার শাস্ত্রোক্ত পূর্ণাবয়ব প্রায়ই ভারতবাসীর মানসচক্ষে সমুদিত হয় না। ভারতবাসী এখন যে ধর্ম্ম রক্ষায় নিমিত্ত যত্নবান. চিন্তাপর, অনুষ্ঠানশীল এবং ব্যাকুল, তাহা ধর্ম্মের সর্ব্বাবয়ব নহে—মুখ্যাবয়বও নহে। এইজন্য ভারতবাসীর দ্বারা ধর্ম্মের যথাযথ পূজা হইতেছে না। ধ্যানেই ত্রুটি হয় বলিয়া অনুষ্ঠানও দুষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই ভারতবাসী নানা দোষে জড়িত হইয়া বিপন্ন হইতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন ভারতবাসীর যে যে দোষ তাহার উদাহরণ, যথা——

(১) পারলৌকিক স্বার্থপরতা। ভারতবাসী শাস্ত্রীয় শিক্ষার গুণে স্বার্থত্যাগে এবং পরার্থপরতায় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পৃথিবীর অপর কোন জাতি তেমন কৃতকার্য্য হয়েন নাই। গৃহস্থাশ্রমের সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা হইতে চতুর্থাশ্রমের পূর্ণ সংন্যাস পর্য্যন্ত সকল আশ্রমধর্ম্মই ভারতবাসীর পরার্থপরতার পরিচায়ক। এমন কি, কেবল আপনার নিমিত্ত ভাত রাঁধিয়া খাওয়াও ভারতবাসীর পক্ষে কিল্বিষ ভোজন বলিয়া নিন্দিত।

এরূপ কথা কি আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রে বলিতে পারিয়াছে? প্রস্তাবিত অঙ্গের ধর্ষণ ভারতবাসীর স্বভাবের বিপরীত। অঙ্গের দুঃখ মোচনে ভারতবাসীর প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। ভারতবাসীর সচ্চরিত্রতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার দানশক্তিও পৃথিবীতে অতুল্য। কিন্তু ইহলৌকিক সকল বিষয়ে এরূপ পরার্থপর হইয়াও ভারতবাসী পারলৌকিক বিষয়ে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে সে নিজেই ধর্ম্মাচরণের ফলভোগ করিবে, অর্থাৎ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মে মনুষ্যের আত্মা সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বর্ণিত এবং উহা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন। সুতরাং ঐহিক সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধে, ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে প্রকার ব্যবহার, পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধেও যে তদনুরূপ বোধ জন্মিয়া থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষাদান অন্য প্রকার। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলির মতবাদে অবান্তর ভেদ যাহাই থাকুক, আত্মার অনাদিত্ব, অনশ্বরত্ব এবং বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব সকলেরই স্বীকৃত বলিলে চলে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ বা অধর্ম্মাচরণ যে অপর কাহাকেও স্পর্শ করে না, এরূপ হইতেই পারে না। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে, এক জনের সুকৃত দুষ্কৃত যে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে অপর সকলেই সংলগ্ন হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর্য্যদার্শনিকদিগের এই প্রকৃত এবং অত্যুদার মতবাদ কোন সময়ে ভারতবর্ষের অত্যুচ্চ জ্ঞানিপুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তখন এক জীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি; সুতরাং সকলের মুক্তির পথ না হইলে কোন একজনেরও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাসও দৃঢ়তর ছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ মতবাদ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং জ্ঞানযোগী পুরুষেরাও ইদানীং যে যাহার আপনাপন আত্মার নিঃশ্রেয়সঃ সাধনে যত্নবান হইয়া পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতেছেন। এখনকার ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থেরা অপরের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক হরিনাম করিতেছেন; এখনকার ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং

পরমহংসেরা কেহ জপ, কেহ ধ্যান, কেহ বা যোগ করিয়া আপনাপন উর্দ্ধ-গতির চেষ্টা পাইতেছেন এবং এখনকার ভাতৃগণও দানাদি দ্বারা পুণ্য ক্রয় করিয়া স্ব স্ব পরকালের সম্বল করিতেছেন।

যাঁহাদের মধ্যে উচ্চতর এক জীব-বাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই ভারত-বাসীর মন এখন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাতে উল্লিখিতরূপ পারলৌকিক স্বার্থপরতার প্রবেশ জন্মিয়া গিয়াছে। উত্তরায়ণী বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা পৃথক্‌রূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়াই মানে। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে ডালাই-লামার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি বহু পূর্ব্বকালে মুক্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ণরূপে অধিকারী হইয়াও কেবল স্বধর্ম্মাবলম্বী দিগের শিক্ষা, উন্নতি ও মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন—সকলের মুক্তি প্রাপ্তি না হইলে তিনি আপনার মুক্তি প্রার্থনা করেন না। এই বিষয়ে সুরক্ষিত বৌদ্ধমতবাদ যে, কিয়ৎপরি-মাণে বিকৃতাবস্থ হিন্দু ব্যবহারের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের প্রকাশ করি-তেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান মলিন এবং ধর্ম্মবুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই জন্য অপরের কৃত পুণ্য পাপে বা অপরের ভুঞ্জিত সুখ দুঃখে, আমাদিগের ঔদাসীন্য জন্মিয়া যাইতেছে। ঐ ঔদাসীন্যই পাপ। সেই জন্য আর্য্যধর্ম্ম ক্রমশঃ নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে, দেশ মধ্যে সহানুভূতি দিন দিন স্বল্পতর হইতেছে, এবং সম্মিলন-শক্তি ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া যাইতেছে।

অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিতেছেন যে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আশ্রমধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক মনুষ্য আপনার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন মাত্র। কিন্তু শিক্ষা-গ্রহণ করিলেই ত সমুদায় কার্য্য শেষ হইতে পারে না। এই জন্য স্বসমা-জের ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত চতুর্থাশ্রমের পরবর্ত্তী একটী আশ্রমান্তরের প্রয়োজন আছে। লোকের শিক্ষা প্রদান ও সমাজের হিতসাধন সেই আশ্রমের করণীয়। এই জন্য সকলকে তাঁহাকে অত্যাশ্রমী বা সর্ব্বাশ্রম অতীত পুরুষ

বলিত। তিনি বলিতেন, কোন এক জনের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সঃ সাধন স্বতন্ত্র-ভাবে হইতে পারে না। মুক্তি পদার্থটী সকলের যুগপৎ লভ্য বস্তু; কারণ, আত্মা এক, বহু নয়। পরিগৃহীত শরীরের ধর্ম্ম-ভেদেই আত্মার ধর্ম্মের পৃথক্ত্ব বোধ হয়। তিনি বলিতেন, ভারতবাসী ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে যেমন পরার্থপর হইয়া মুক্তির পথে আসিয়াছেন, পারলৌকিক বিষয়েও সেইরূপ পরার্থপর হউন; কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক, সকল ব্যাপারে সকলের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল ইহা জানুন; আত্মার বিভুত্ব যেমন বিচার কালে স্বীকার করিয়াছেন, কার্য্য কালেও সেই বিভুত্ব স্মরণ করিয়া কার্য্য করুন, এবং অন্যের পাপে আপনার পাপ, অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট ইহা অনুভব করিতে অভ্যস্ত হউন। তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রাচীন কালের ন্যায় পূর্ণরূপে মূর্ত্তিমান হইবেন এবং প্রাচীন কালের তেজস্বিতা এবং প্রাচীন কালের উদারতাও জন্মিবে।

(২) অভেদ ভেদবুদ্ধি। দর্শনশাস্ত্রসমূহের টীকাকারদিগের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে; তাহার মধ্যে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। একপক্ষ বলেন, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার যুগপৎ অবস্থানের আবশ্যকতা আছে। ভগবান রামানুজ স্বামী প্রভৃতি এই মতানুগামী। ইহাঁদিগকে সমসমুচ্চয় বাদী বলে। অপর দলের নেতা ভগবান শঙ্করস্বামী। ইহাঁরা বলেন যে, জ্ঞানের আবির্ভাবে কর্ম্মের লোপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উভয়ের একত্রাবস্থান অথবা সমসমুচ্চয় হইতে পারে না। ইহাঁদিগকে ক্রম-সমুচ্চয়বাদী বলা যায়। যেখানে দুইটী মতবাদ স্থায়িভাবে প্রচলিত হয়, সেখানে উভয়েই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সত্যের বিদ্যমানতা থাকে। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। জ্ঞানের সারাৎ সার কথা, আত্মার বিভুত্ব। যাঁহার সেই জ্ঞান উপস্থিত হইল, তাঁহার নিজের পক্ষে আর কোন কর্ম্মই থাকিতে পারে না। তাঁহার কাম্য-কর্ম্ম ফুরাইল। কিন্তু যত দিন সকলের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের স্ফুরণ না হইতেছে, তাবৎকাল তাঁহার কর্ম্মের শেষ হইতে পারে না। অন্য

হৃদয়ে আপনার জ্ঞানস্ফূর্ত্তি সম্পাদন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ একটী কাজ পরম জ্ঞানীর পক্ষেও বাকী থাকিয়া যায়। ফলেও দেখা যায়, ক্রমসমুচ্চয়বাদীরাও গ্রন্থ প্রণয়নে, শিষ্যের শিক্ষার এবং শাস্ত্রীয় বিচারে কখনই অবহেলা করেন নাই। অতএব সমুচ্চয়াসমুচ্চয় উভয় বাদের মীমাংসা করিয়া লওয়াই প্রকৃত পথ। কারণ আত্মার বিভুত্ব-জ্ঞান-মূলক সকলের যুগপৎ মুক্তিসাধন স্বীকৃত হইলে, তাহার জন্য যে কর্ম্ম তাহা উভয়বাদীর সম্মত। প্রত্যুত ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্ম; ইহাই বুদ্ধিযোগ এবং সন্ন্যাসযোগ।

যেমন কর্ম্মে এবং জ্ঞানে বিরোধ বাধাইয়া লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রকার লোকে ভক্তির সহিতও জ্ঞানের বিবাদ বাধাইয়া একটা সমূহ অনিষ্টের হেতু জন্মাইয়াছে। জ্ঞান এবং ভক্তি ইহারা পিতা এবং মাতার স্থানীয়। উহাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। ভক্তি না হইলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, কার্য্য না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা না হইলে জ্ঞান জন্মে না; এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। অতএব কেহ কর্ম্ম যোগী কেহ ভক্তি যোগী এবং কেহ জ্ঞান যোগী এই যে সাময়িক পার্থক্য হইতে স্থায়ী পার্থক্য হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যধর্ম্মের সমূহ ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

(৩) ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ। আর এক রূপেও ধর্ম্মের অঙ্গহানি হইয়াছে। এখন লোকে ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ করিতেছে। আমরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি পুনর্ব্বার রাত্রিকালে শয্যাশায়ী হইতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত, যে যে কার্য্য করি, সকল কার্য্যই ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক আরব্ধ করিতে উপদিষ্ট। কোথাও যাইব, কিছু করিব, কিছু খাইব, একখানি সামান্য চিঠি লিখিব, কিছুই বিনা ঈশ্বর স্মরণে করিবার কথা নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-চিন্তাই ভারতবাসীর সকল ব্যাপারে সর্ব্বনাশী হইয়া থাকিবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই ঈশ্বর স্মরণের তাদৃশ প্রবর্ত্তনা। কিন্তু এখন ধর্ম্মের ঐ সর্ব্বব্যাপিত্ব লুপ্তপ্রায় হইতেছে। "বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা ত

তপস্যা নয়” “চাকুরি করা ত তীর্থবাস নয়,” “ধর্ম্ম করিবার বয়স ত এখনও হয় নাই”—এইরূপ কথা সকল কিছুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে আজি কালি আবার “ক্লেশ স্বীকার” “সহনসহিষ্ণুতা” “তপশ্চর্য্যা”—প্রভৃতি কথাগুলি যে ভাবের ব্যঞ্জক তাহা উপধর্ম্মমূলক বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সাপ্তাহিক বারাদিও ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম সমস্ত জীবন ব্যাপক না হইয়া একটি কার্য্যবিশেষ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবাসীর পূর্ব্ব শিক্ষা এরূপ ছিল না। ভারতবাসী জীবিত কালের সকল কার্য্যেই ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষিত হইতেছিলেন।

প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তবপূজনং ॥

হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত; আমি যাহা যাহা করি সকলই তোমার পূজা হউক। তান্ত্রিকের প্রার্থনা এইরূপ। বৈষ্ণবের প্রতি উপদেশও ভিন্নরূপ নয়।

ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

“যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণং ॥”

“তুমি যাহাই কর আমাকে অর্পণ কর। অতএব শাস্ত্রানুগামী হিন্দুমাত্রের প্রতি বিধি হইল, ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, শুদ্ধ নিজের জন্য কিছু করিও না, তাহা করিতে নাই।

এই অতুচ্চ পবিত্রভাবের বিলোপ হইয়া অমুক বারে বা অমুক সময়ে ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, অপর সময়ে অপর কার্য্য করিতে হয়, এই অতথ্য-

* ভারতবর্ষের বাহিরে কেবল দুই সময়ে দুই স্থানে এইরূপ ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এক মহম্মদ ও প্রাথমিক কালিফদিগের সময়ে আর দেশে, আর ইংলণ্ডে পিউরিটানদিগের অভ্যুদয় কালে।

জ্ঞান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মভাবকে জীবনের সর্ব্ব কার্য্যকলাপে অনুস্যূত করাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রেত সাধন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর জীবন আবার সতেজ, সুন্দর এবং মধুময় হইয়া উঠিবে, আপনার শিক্ষা এবং তদ্দ্বারা অপরের হিত সাধনা, ইহা ভিন্ন আর কোন চেষ্টা থাকিবে না, জীবিতকালের উৎমাত্রাও নিষ্কর্ম্মে বা অকর্ম্মে নিরর্থক নষ্ট হইবে না এবং আমোদ প্রমোদও ধর্ম্মানুমোদিত, অবস্থার উপযোগী, বিশুদ্ধ এবং স্ফূর্ত্তিপ্রদ হইবে।

—•(০)•—

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্র নির্দ্ধারণ।

বুদ্ধি দুই প্রকারে কার্য্যকারিণী হয়। উহার এক প্রকার কার্য্যের নাম সংকলন, অপর প্রকারের নাম বিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যষ্টীভূত পদার্থ সকলের সমষ্টি সাধনপূর্ব্বক প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের সংঘটন হয়, আর বিকলনের দ্বারা সমষ্টীভূত বস্তুর বিচার হইয়া তাহার উপাদান সমস্তের আবিষ্কার হয়। বুদ্ধিশক্তির এই দুই প্রকার কার্য্য যদিও যুগপৎ ভাবেই চলে, তথাপি উভয়েই সকল সময়ে সমানরূপে বলবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সমাজের অবস্থাবিশেষে যখন দ্রব্য এবং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, তখন সংকলন শক্তি তেজস্বিনী দেখায়; এবং সমাজে ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, যখন সংঘটিত ভাব এবং বস্তুর সম্বন্ধে চিন্তার আধিক্য হইয়া উঠে, তখন বিকলন শক্তি তেজস্বিনীরূপে বিস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে যখন শাস্ত্রাদির প্রণয়ন, ব্যবহার নিরূপণ, দেবমূর্ত্তির কল্পন, এবং মহাকাব্য বিরচন হইয়াছিল, তখন সমাজ-নেতৃবর্গের সংকলন শক্তিমত্তা প্রকট হইয়াছিল। অনন্তর, যখন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদির প্রাদুর্ভাব হইল, তখন বিকলনশক্তিমত্তা অতি প্রবলরূপেই দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধির উভয় শক্তিই সকল সময়ে কার্য্যকারী থাকে, তবে একটী বা অপরটী সময়ভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রবলরূপ দৃষ্ট হয়। সংকলন শক্তির কার্য্য—সংঘটন,

সুতরাং নির্ম্মাণ কার্য্যের বাহুল্যে ঐ শক্তির প্রাবল্য লক্ষিত হয়; বিকলন-শক্তির কার্য্য—বিচার, সুতরাং উহার প্রাবল্য চিন্তার এবং পরীক্ষণের বাহুল্যে অনুভূত হইয়া থাকে।

সমাজের এই বিভিন্ন ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকট হয়। একবার সংকলনের কার্য্য হইয়া পরে বিকলনের কার্য্য হইয়া গেলে, আবার সংকলনের কার্য্য চলে, এবং তাহার পর পুনর্ব্বার বিকলন হয়—এইরূপ পর পর হইতে থাকে। ভারতবর্ষে বৈদিক মন্ত্র ও এবং অনুষ্ঠানাদি প্রস্তুত হইয়া সামাজিক আচার ব্যবহারাদি সম্বদ্ধ হইয়া উঠিলে, দর্শন শাস্ত্র সকল জন্মে। সেই সকল দর্শনের এবং বৌদ্ধের বিচার দ্বারা বিভাজন কার্য্যের পর, আবার পুরাণ সংহিতাদির সৃষ্টি হইয়া সমাজের দৃঢ়তর বন্ধন হয়। অনন্তর মুসলমানের আগমনে আবার নূতন ভাবাদির সমাগম হইলে, সংকলনের কাল আইসে। নানক, কবীর, দাদূ প্রভৃতি পন্থীবাদীরা এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমানের ভাব সম্মিলিত করিয়া আপনাপন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

পৃথিবীর সকল সমাজেই এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সংকলন এবং বিকলন শক্তির কার্য্যকারিতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। কোন ইউরোপীয় ঐতি-হাসিক এই পর্য্যায়ক্রমকে শ্রদ্ধা এবং সংশয়ের কাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাহা করিয়া সংশয়াত্মিকতার ভূয়সী প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাত্মিকতার সমূহ নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের মধ্যে তেমন কোন ভেদ নাই যাহার জন্য একটীর নিন্দা বা অপরটীর প্রশংসা হইতে পারে।

এখন ভারত-সমাজে সংকলন শক্তিই বিশিষ্টরূপে বলবতী হওয়া আব-শ্যক বোধ হয়। আর্য্য দার্শনিকদিগের সময়ে যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিক বিচার চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সকল বস্তুর, সকল ভাবের, এবং সকল ব্যাপারের উপা-দানভূত মৌলিক পদার্থের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে; ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন জাতীয় জনগণের সমাগমেও কিছু কিছু নূতন উপাদান আসিয়াছে; এবং নানা কারণ সহকারে দেশের অনেকটা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অতএব পূর্ব্ব হইতে যাহা আছে, এবং পরে যাহা আসিয়াছে, তৎসমুদায়কে বর্ত্তমানের

উপযোগী করিয়া বিনিবেশ করিবার জন্য সংকলন শক্তি-মূলক কার্য্যসূত্র নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। এখন কর্ম্মের আধিক্য হইলেই সজীবতার প্রমাণ হয়।

কর্ম্মেরই প্রয়োজন বলিয়া আমি কোন সময়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। শ্লোকটী এই—

চরাচরমিদং সর্ব্বং যৎসৃষ্টং কর্ম্মণা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম্ম ভজেন্নিত্যং ভক্তিজ্ঞানসমন্বিতঃ॥

আমি কর্ম্মের দ্বারাই চরাচর সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব ভক্তি এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়া নিত্যই কর্ম্মের সেবা করিবে।

শ্লোকটীতে ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের সম্যক্ সম্মিলনের আদেশ আছে এবং কর্ম্মেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্লোকটীর উপদেশ বর্ত্তমান স্থলের সম্পূর্ণরূপেই উপযোগী। কর্ম্ম করাই আমাদিগের পক্ষে বিধেয়। কিন্তু কর্ম্ম বলিলে কি বুঝিতে হইবে?

আমাদিগের শাস্ত্রসমূহের প্রধান প্রধান টীকাকার এবং ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী বা পরমহংস ছিলেন। যখন কোন কর্ম্মের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, উঁহারা তখনই অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাদি যজ্ঞীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মের উদাহরণ দিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ লোকের করণীয় অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যুদ্ধ কৃষি বাণিজ্যসেবাদি কর্ম্মের উল্লেখও করেন নাই। এই জন্য আমাদের মধ্যে কর্ম্ম শব্দের মুখ্যার্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া উহার গৌণার্থ যে যজ্ঞাদি ব্যাপার তাহাই প্রচলিত হইয়াছে, এবং বিষয় কর্ম্মের সহিত ও ধর্ম্ম ব্যবহার সম্পর্ক শূন্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম্মের প্রকৃত অর্থই উক্ত হইয়াছে, যথা—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

যাহা হইতে জীব সমস্ত উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য আপনাপন কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।

অতএব জীব আপনার প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্য্য পূজাবুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করিলেই জগৎকর্ত্তার অর্চ্চনা করে এমন বলা যায়। কর্ম্ম শব্দের এই প্রকৃত এবং উদার অর্থ লইয়া এবং যে কর্ম্ম করি, তাহাই ঈশ্বরের পূজা হউক, মনে মনে এই ভাব স্থিরতর রাখিয়া আমাদিগের পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহার স্থূল স্থূল কয়েকটী সূত্রে সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যথা—

১। পারিবারিক। সমস্ত পারিবারিক বিধি একটী মূল সূত্রের অন্তর্ভূত করা যায়। সে সূত্রটী এই,—যাহাতে বাটীর সন্তানদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ হয়, কায়, মন, বাক্য, ব্যবহারে তাহাই করণীয়। তাদৃশ কার্য্যই পারিবারিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা।

২। সামাজিক। সামাজিক কার্য্যসূত্রও একটী হইতে পারে— যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সবর্দ্ধিত হয়। কায়, মন, বাক্য, এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা। কিন্তু এই সাধারণ মূল সূত্র হইতে কয়েকটী বিশেষ সূত্রেরও নির্দ্দেশ হইতে পারে।

(ক) প্রতিবাসী। প্রতিবাসীর প্রতি স্থলভেদে গৌরব, সাম্য এবং দয়া প্রকাশ করিতে হয়। প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখানুভব এবং দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়। প্রতিবাসীর সাহায্যদানে সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিতে হয় এবং প্রতিবাসীর স্থানে সাহায্য প্রাপ্তিতেও সঙ্কুচিত হইতে নাই। প্রতিবাসীর সহিত বাক্যালাপ এবং ব্যবহারে অহঙ্কার এবং মাৎসর্য্য এই দুইটী দোষ বিশিষ্টরূপেই পরিহার করিতে হয়। প্রতিবাসীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(খ) স্বদেশীয়। স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশবাসী বিশিষ্টরূপেই প্রেমের পাত্র। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত, এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটী মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই

হিন্দি ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দিতে কথোপকথন করাই ভাল। বাঙ্গালী বাঙ্গালীতে ত ইংরাজী না চলাই উচিত। পত্রাদি লিখিতেও ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন্ ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি স্বল্পায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) ভিন্নদেশীয়। ভিন্নদেশীয়দিগের প্রতি সাহায্য-দানে এবং দয়া প্রদর্শনে ত্রুটি করিতে নাই।

(ঘ) রাজা। রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত এবং সুব্যবস্থিত পরিবারের মধ্যে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না, বাটীর প্রৌঢ়, যুবক, গৃহিণী, বধূ এবং কন্যাগণ, দাস দাসী প্রভৃতি সকলে বিবেচনা এবং ধীরতা পূর্ব্বক আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়—আমাদিগেরও রাজার প্রতি সেইরূপ সম্ভ্রম শীল হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। রাজাকে যত অল্প দেখিতে এবং করিতে হয়, ততই ভাল। তাহাতে শুদ্ধ সহানুভূতি নয়, প্রকৃত রাজভক্তিও প্রদর্শন হয়। দেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা বিজাতীয় রীত্যাদির পক্ষপাতী হইয়া অথবা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাধারণতঃ দেশীয় জনগণের প্রকৃতি, রীতি ও অবস্থার বিপরীত কার্য্যের জন্য রাজ ব্যবস্থার প্রার্থনা করে, তাহারা অনেক সময়েই রাজাকে নানাপ্রকার অসুবিধায় ফেলে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এদেশে রাজা আপন ইচ্ছাতেই সকল কাজে হাত দিতে যান। কিন্তু সকল কার্য্যেই রাজার হস্তক্ষেপ প্রজার

অভিমত নহে, ইহা দেশীয় সকলে এক বাক্যে জানাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল কার্য্যে রাজার পূর্ব্বেও আগ্রহ ছিলনা এখনও নাই।

(ঙ) রাজপুরুষ। আমাদের রাজপুরুষ দুই প্রকারের—তিন প্রকারের বলিলেও হয়। এক, বিজাতীয় ইংরাজ রাজপুরুষ। অপর স্বদেশীয় প্রাপ্তপদ রাজপুরুষ। তৃতীয়, অপ্রাপ্তপদ রাজার স্বজাতীয় লোক।

(চ) বিজাতীয় রাজপুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নম্র এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্যক। নির্ভীকতা রক্ষার একমাত্র উপায় অতি সাবধানতাপূর্ব্বক সত্যের সম্যক্ পালন। উহাঁদিগের তুষ্টি সাধনের জন্য বিন্দুমাত্রও মিথ্যার প্রয়োগ করিবে না এবং নির্ভীকতা প্রদর্শনার্থেও বিন্দুমাত্র নম্রতার ত্রুটি করিবে না। সমুদায় কথা এবং কার্য্য বিনম্র এবং সত্যপূত হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত কখন আলগা হইয়া কথা কহিতে নাই। উহাঁরা ভিন্ন সমাজের লোক। সেই ভিন্ন সমাজের সহিতেই উহাঁদিগের বিশেষ সহানুভূতি। আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহা বুঝিয়াই কখন কখন ইংরাজী শিক্ষিত দু দশ জনকে দেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া পরামর্শাবধারণ করিতে যান। ওরূপে আহূত হইলে প্রত্যেক সুজাত ভারত সন্তানের উচিত যে, রাজপুরুষদিগের অভিমতি বুঝিয়া তাঁহাদের সন্তোষার্থ অথবা তিনি স্বয়ং যে পাশ্চাত্য প্রণালীর বিশেষ পক্ষপাতী তাহা দেখিবার জন্য কিম্বা আপনাদের মধ্যে একজন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিপরীত যুক্তির অবলম্বন করিয়া কয়েকটি ইংরাজী গত বলিবার জন্য, যেন স্বদেশীয় জনগণের প্রকৃত শুভানুষ্ঠানের প্রতিকূল পরামর্শ না দেন।

(ছ) দেশীয় রাজ-পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে, লোকে তাঁহাদিগের প্রতিও ইংরাজরাজ-পুরুষদিগের সদৃশ মান সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের এই অভিলাষ-পূরণ করাই ভাল। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে একটী বিশেষ কর্ত্তব্যও আছে—তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই এমন সাহায্য দান করিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা আপনাপন কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন।

(জ) রাজার জাতীয় লোক, যথা ইউরোপীয় বণিক, প্লান্টর কলওয়ালা দোকানদার, পাদ্রি, সম্পাদক প্রভৃতি। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার লোপ হওয়া অবধি, এই সকল ইংরাজের সংখ্যা এবং ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। দেশীয় লোকের অপেক্ষা ইহাঁদিগের কথার গৌরব বাড়িয়াছে। এইজন্য ইহাঁদিগের প্রতিও কিয়ৎ পরিমাণে রাজ-পুরুষবৎ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ নম্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক এবং সতর্ক হইয়া চলাই বিধেয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাইওনিয়র কিম্বা ইংলিস্‌ম্যান কিম্বা হেষ্টি কিম্বা ব্রানসন্ অথবা কেসউইকের ন্যায় কোন সম্পাদক, পাদ্রি বা রাজজাতীয় পুরুষ, ভারতবাসীর নিন্দা করিলে, ইংরাজের জাতি বা ধর্ম্ম ধরিয়া প্রতি নিন্দা না করিয়া উহাঁদের গালি দান যে সত্য হয় নাই, মিথ্যা হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ সহকারে দেখাইয়া দিয়া আর কিছু না বলাই বিধেয়। নিন্দাতে ধর্ম্মের রক্ষা হয় না, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষা করিয়া সকল কার্য্যে ঈশ্বরের পূজা করিব, ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এইরূপে সর্ব্বদা সত্যের পালন, সর্ব্বদা সতর্ক থাকা, এবং সর্ব্বদা যথাযোগ্য স্থলে সহানুভূতি প্রদান বিষয়ে উন্মুখ থাকিলেই আমাদের কার্য্যকলাপে সত্যের, জ্ঞানের, এবং আনন্দের অধিষ্ঠান থাকিয়া উহা সফলতা প্রাপ্ত হইবে।

৩। বহিরাশ্রমিক। সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা তাদৃশ শিক্ষার প্রভাবে কখনই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থাশ্রমের বহিঃস্থিত বলিয়া বহিরাশ্রমিক বলা যায়। তাঁহাদিগকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সমাজেরই উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সমাজের হিতের নিমিত্ত আপনাদিগের সুশিক্ষা নির্ব্বাহ ও তদনন্তর সাধুশীলতা ও সংযমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অথবা জ্ঞানের বিস্তার চেষ্টা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহাই এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের মুখ্যধর্ম্ম বা ঈশ্বর পূজা।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্রেরব্যাখ্যা।

কাহার কাহার মতে সমাজই ধর্ম্মের মূল। সমাজ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। সমাজ ছাড়িয়া দেখিলে সমস্ত প্রকৃতিকার্য্যের মধ্যে কোথাও ধর্ম্মভাব নাই। প্রকৃতিতে কি জড়ে কি চেতনে, ধর্ম্মও নাই অধর্ম্মও নাই—প্রকৃতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাব-পরিশূন্য। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই এই মত।

আমাদিগের শাস্ত্রের মত ভিন্নরূপ। পশুদিগের এবং মনুষ্যদিগের সংঘ জন্মিলে, ধর্ম্মের ভাবটি প্রকটিত হয় মাত্র; কিন্তু সমজ বা সমাজ ঐ জ্ঞানের মূল হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, অভাব পদার্থ হইতে কোন ভাব পদার্থ জন্মে না। ধর্ম্ম একটি ভাব পদার্থ। যদি উহা জীব-ধর্ম্মের অন্তর্ভূত রূপে না থাকিত তাহা হইলে শুদ্ধ জীবের সঙ্ঘমাত্রে (অর্থাৎ সমজ বা সমাজের সংঘটন মাত্রে) উহা জন্মিতে পারিত না। দ্রব্যের অণুগুলি পরস্পর দূরবর্ত্তী থাকিলে, উহাদিগের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির কার্য্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া যেমন প্রতি অণুতে আকর্ষণশক্তি নাই বলিতে পারা যায় না, এস্থলেও ঠিক তদ্রূপ হয়। জীবের সঙ্ঘ না হইলে উহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু যখন সঙ্ঘ হইলেই ঐ জ্ঞানের কার্য্য দৃষ্ট হয় তখন ঐ জ্ঞান অনুদ্ভূতাবস্থায় জীবধর্ম্মের মধ্যেই আছে, ইহা বলিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মই ধর্ম্মের মূল বলিয়া উক্ত। "ঊর্দ্ধমূলমবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ"। এই সনাতন অশ্বত্থের মূল ঊর্দ্ধে শাখা নিম্নে।

বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান আধিভৌতিক ব্যাপার সকল একই শক্তির কার্য্য। বিজ্ঞান ইহাও বলিতে উন্মুখ হইয়াছেন যে, আধি-ভৌতিক এবং আধি-জৈবনিক কার্য্যকলাপও একই অভিন্ন শক্তির কার্য্য হইতে পারে। বিজ্ঞান, কালে ইহাও বলিতে পারেন যে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমস্তও কোন স্বতন্ত্র মূল হইতে হয় না, সেই একই মূলশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। সে পর্য্যন্ত হইলে সামাজিক নিয়মাদি বা ধর্ম্ম সূত্রও যে, ঐ মূলশক্তির কার্য্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমা-

দের শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই যে বৈজ্ঞানিক চরম সিদ্ধান্তের সহিত একীভূত হইবে, ইহাই সম্ভবপর—অর্থাৎ আকর্ষণাদি ভৌতিক বা বাহ্য-শক্তির মূলেও যাহা, ধর্মজ্ঞানের মূলেও তাহাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে।

"ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াভূতং চরাচরং"।

(গীতায় ভগবান বলিতেছেন) এই চরাচর ভূত সৃষ্টিতে এমন কিছুই নাই যাহা আমা হইতে নয়।

বিজ্ঞানের অতদূর উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে সমাজের উৎপত্তির হেতু যদি কেহ না বলিতে চান, তথাপি ধর্ম্মই যে সমাজের স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ সে বিষয়ে কিছু মাত্র মতভেদ নাই। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া যেমন কোন বাহ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তেমনি সামাজিক কোন কার্য্যই ধর্ম্মসূত্রকে ছাড়িয়া পরিচালিত হইতে পারে না। ধর্ম্মই সামাজিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা।

ভারতসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বলবর্দ্ধনের একমাত্র উপায় ধর্ম্মের বৃদ্ধি। অপর কোন উপায়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে অথবা স্থায়িভাবে ভারত-সমাজের শুভসাধন হইতে পারে না। যে যে কার্য্য দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, পরার্থপরতা প্রবল হইবে, সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মসংযম বর্দ্ধিত হইবে, এবং পাশব-ভাবের ন্যূনতা হইবে, তাহাতেই সমাজের বল বৃদ্ধি হইবে। যিনিই যাহা বলুন, নিজ সমাজ মধ্যে সহানুভূতি বিস্তারের ব্যাঘাতক, মনের সঙ্কীর্ণতা সাধক, এবং বিলাস বাসনার উত্তেজক, কোন অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম্য-কার্য্য হইতে পারে না।

আজি কালি ধর্ম্মের সহিত সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই লোকের মুখে শুনা যায়। এখন বাঙ্গালা বহিগুলিতে "মনের সুখ" "আত্ম-প্রসাদ" প্রভৃতি শব্দের কিছু অধিক পরিমাণেই প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উহা একটী দুর্লক্ষণ বলিয়াই মনে করিব। কারণ উহাতে ধর্ম্মের অপীরাপর

প্রধানতম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি ন্যূন হইয়া উহার অনিশ্চিত সহচর সুখের দিকেই দৃষ্টির আধিক্য প্রকাশ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভও যে অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার তাহা ঐ সকল জল্পনাদ্বারা প্রকট না হইতে পাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্ম কথাটী বলিতে সহজ, কিন্তু উহা তেমন সহজ বস্তু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই—

ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

সে পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়াছেন। সুখের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ।
তেউভে নানার্থে পুরুষং সিনীত।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি।
হীয়তে হর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥

শ্রেয়স্কর এবং প্রীতিকর এই দুইটী বোধের দ্বারা মনুষ্য নানা প্রয়োজনে বদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে সে সাধু হয়, যে প্রেয়কে বরণ করে তাহার প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না।

অতএব প্রীতিপ্রদ সুখ, মঙ্গলকর ধর্ম্মের চিরসহচর না হইয়া বস্তুতঃ তাহা হইতে দূরগত বস্তু। ধর্ম্ম করিলেই সুখ হয়, যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ব্যবহারের প্রবর্ত্তনার জন্য অলীক প্ররোচনা প্রদান করেন মাত্র। কষ্ট এবং চিন্তা এবং সংযম এবং পরিশ্রম এবং অবধানতা ধর্ম্মকার্য্যের নিত্য সহচর রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা ধর্ম্মকার্য্যের শুভফল, তাহা প্রায়ই দূরে ফলে এবং কখন কখন জন্মান্তরের প্রতীক্ষাতেও থাকে। প্রকৃষ্ট সুখের লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং॥

অভ্যাস বশতঃই যাহা রমণীয়, যাহা দুঃখের শেষ করিয়া যায়, যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় বোধ হয় এবং পরিণামে অমৃতের তুল্য হয়, তাহাকেই আত্ম-প্রসাদ-জনক সাত্ত্বিক সুখ বলে।

অতএব আত্মপ্রসাদটীও হাতে হাতে পাইবার বস্তু নয়। সুতরাং সুখ-প্রাপ্তির জন্য ধর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া যে ভ্রমসঙ্কুল বিপথপ্রাপক মতটী এক্ষণে দেখা দিয়াছে, সেটীর অস্তিত্ব লোপ হওয়াই ভাল। ঐ মতটি যে বিচারমূলক তাহার ব্যাসবাক্য এইরূপ হইতে পারে, যথা—"এমন কাজ করিব, আর ওরূপ কাজ করিব না কেন?—এমন কাজে ধর্ম্ম আর ওরূপ কাজে অধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম করিব কেন, আর অধর্ম্ম না করিব কেন?—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া হেতুবাদাশ্রয়ীরা বলেন, 'ধর্ম্মে সুখ তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে অসুখ তাই অধর্ম্ম করিবে না।' কিন্তু ঐ উত্তর সদুত্তর নয়, কারণ উহা প্রত্যভিজ্ঞা বিরুদ্ধ। ধর্ম্মের সহিত সুখের যে সম্পর্ক তাহা দূর সম্পর্ক; কখন কখন বহু অনুসন্ধানেও তাহা দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মে সুখ, তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে দুঃখ, তাই অধর্ম্ম করিবে না, এ কথা না বলিয়া বলিতে হইবে যে, ধর্ম্ম হইতেই রক্ষা হয়, তাই ধর্ম্ম করিবে; আর অধর্ম্ম হইতে বিনাশ হয়, তাই অধর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্ম—ধারণ করে * বা রক্ষা করে, হাতে হাতে সুখ দেয় না। গীতায় সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীভগবান এই কথাই বলিয়াছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।

আমার প্রতি চিত্তস্থাপন করিলে আমার প্রসাদে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইবে, যদি অহঙ্কার করিয়া আমার কথা না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে।

অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখের কথা নয়, থাকিবার বা না থাকিবার কথা।

---

* "ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।"
মহাভারত কর্ণপর্ব্ব

এখন ভারতসমাজেরও বাঁচিবার মরিবার কথা দাঁড়াইয়াছে, ইহার সুখের বা দুঃখের কথা অতি দূরগত হইয়াছে। সেই জন্য যে একমাত্র শক্তি সর্ব্বশক্তির মূল, যে শক্তি রক্ষণ কার্য্যে সমর্থ, যাঁহার সহায়তায় সকল বিঘ্ন বিপত্তি দূর হয় তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মে এবং সুখে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাধাইয়া দিবার অপর একটা হেতুও আছে। ইংরাজেরা খুব ভাল বাড়ীতে থাকেন, খুব ভাল গাড়ী চড়েন, খুব ভাল খান ভাল পরেন, অথচ তাঁহারা খুব প্রতাপশালী, বিদ্বান্, বিচক্ষণ এবং দেশে রাজা। এই সকল দেখিয়া লোকের বোধ হইয়া যায় যে, ভোগ-বিলাসের সহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হয়, ইংরাজেরা কি সত্য-সত্যই তেমন বিলাসী? স্বদেশে উহাঁরা কি ভাবে থাকেন, তাহা ত আমরা কিছুই জানি না, এখানেও উহাঁদিগের বাহ্য আড়ম্বর মাত্র দেখিতে পাই। শুনিয়াছি, অধিকাংশ ইংরেজই যথেষ্ট মিতব্যয়ী। উহাঁরা মনে করেন যে, এদেশের লোকের জাঁক জমকেরা বড়ই গৌরব করে, হয় ত সেই জন্যই দেশীয়দিগের সন্তোষের অথবা ভয় ভক্তি উদ্রেকের উদ্দেশ্যে অতটা বাহ্যাড়ম্বর করিয়া থাকেন। হয় ত, প্রভুতা এবং ধনাধিকার বশতঃ উহাঁদের হৃদয়েও বিলাস বাসনারূপ কীটের প্রবেশ হইয়া গিয়াছে, পরিণামে কি ফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ যখন ইংরাজ তাঁহার বর্ত্তমান প্রভাবশালিতায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না; তখন তিনি নাচ, তামাসা, গান, বাদ্য, নাটকাভিনয় প্রভৃতি সকল আমোদ প্রমোদের একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ের ধর্ম্ম বলেই এখন ইংরাজ বলীয়ান্ আছেন—বিলাসিতার জন্য তিনি বলীয়ান্ নহেন।

ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত যে সুখ দুঃখের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, তাহা আরও এক প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। যদি সুখ বোধই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ হইত, তবে ধর্ম্মের বৃদ্ধির সহিত সুখবোধটীরও বৃদ্ধি হইত; আর যদি দুঃখ বোধই অধর্ম্মের অব্যভিচারী লক্ষণ হইত, তবে অধর্ম্মের বৃদ্ধির সহিত দুঃখবোধেরও

বৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ধর্ম্মের ব্যবহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, চরিত্রের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যের সুখানুভব ন্যূন হইয়া যায়; পাপের অভ্যাসেও চরিত্রের অপকর্ষ হয়, কিন্তু পাপকার্য্য জনিত দুঃখের বোধও কম হইয়া থাকে। প্রত্যুত, ধর্ম্মকার্য্যে সুখের বোধ অল্প হওয়া, চরিত্রের উৎকর্ষ লক্ষণ, এবং পাপকার্য্যে দুঃখানুভব অল্প হওয়া, চরিত্রের অপকর্ষের লক্ষণ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ দুঃখকে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা একটী মহৎ ভ্রম।

এই ভ্রমাত্মক মতবাদ হইতে ইউরোপে আর একটা মতবাদ সমুত্থিত হইয়াছে। সেটীকে বঙ্গভাষায় 'হিত-বাদ' বলা হইয়াছে। এই মতে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে বহুসংখ্যক লোকগত সুখ দুঃখের লক্ষণাত্মক বলা হয়। যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সুখ হয়, তাহাই ধর্ম্ম; আর যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ দুঃখ তাহাই অধর্ম্ম। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের মতবাদ অপেক্ষা, এই হিতবাদটী অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহাকে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য সমীচীন নহে, যে, ঐ লক্ষণের অর্থ বিভিন্নরূপে এবং প্রয়োগের পথ নানা প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। "অধিক পরিমাণ সুখ" বলিলে কি সুখের কালাধিক্য বুঝিব, না সুখের গভীরতাধিক্য বুঝিব? আর "অধিক সংখ্যক লোক" বলিতে কেমন লোক বুঝিব? বস্তুতঃ, হিতবাদ মতটী প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলিতে সাধারণ লোকদিগের রুচিকর হয় বলিয়াই ইউরোপে উহার নাম ডাক এত বাড়িয়াছে। উহার প্রকৃত প্রয়োগ বড়ই দুরূহ। কিসে যে লোকের প্রকৃত হিত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রয়োগকালে হিতবাদীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আপনাপন মনঃকল্পিত জিনিসকেই লোকের হিতকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে হিতবাদের এই অর্থ করিতে পারা যায় যে, ধার্ম্মিক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লোকের উপকার হইবে ভাবিয়া যে কার্য্যে উপদেশ দেন, তাহাই ধর্ম্মকার্য্য।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত।

প্রভূত তাদৃশ উপদেশ, প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধির সহিত অভিন্নভাবেই চলিয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিধির যথাযথ ব্যাখ্যা হইলেই ঐ সকল বিধি যে সমাজ রক্ষণ কার্য্যের উপযোগী তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। এই জন্য বিধির প্রতিপালনই ধর্ম্ম (বিধি প্রতিপালনংহি ধর্ম্মঃ) এবং ধর্ম্মের ফল রক্ষা—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া আছে।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বাশাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি॥

ধর্ম্ম কাহারও নিজের মনগড়া হয় না। এবং সুখবোধও ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

ফল কথা, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সময়ে যে জাতির হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে যে জাতি স্বকীয় শাস্ত্র বিধি পালনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে, সেই সময়ে সেই জাতির ভোগসুখাভিলাষ ন্যূন হইয়াছে, আত্মসংযম দৃঢ় হইয়াছে; এবং সেই সময়েই সেই জাতির বল সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে—এবং যথাকালে সেই জাতিই বিপদজাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবত্তায় এবং ধনবত্তায় এবং গৌরবসৌরভে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, বস্তুতঃ সকল জাতির ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এবং কীর্ত্তি ইহাঁরা তিন জনেই ভগবান ধর্ম্মের চিরসঙ্গিনী।

---

* নহি কাম্যমকার্য্যং বা সুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
প্রভবম জ্ঞায়তে সর্ব্বং তচ্চত্বং নাববুধ্যসে॥

(মহাভারত।)

——•(•)•——

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্রের প্রয়োগ

ভারত সমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ দুইটী উপস্থিত হইয়াছে। এক, বিদ্যাহীনতা; অপর, ধনহীনতা। ধর্ম্মসূত্র গ্রহণপূর্ব্বক কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা ঐ ভয়ের নিবারণ হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

বিদ্যাহীনতা। ইংরাজের অধিকারে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই লোকের সংস্কার। কিন্তু ঐ সংস্কারটী সম্যক্ ভ্রমশূন্য বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষা দুই প্রকারের। এক, প্রাথমিক শিক্ষা; অপর, উচ্চশিক্ষা। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই যে, এ দেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলৎ ছিল, উহা এখন তাহা হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই। পূর্ব্বে যে শ্রেণীর লোকেরা পাঠশালায় ছেলে পাঠাইত, এখনও সেই শ্রেণীর লোকেরাই পাঠায়, তন্নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা এখনও ছেলে পাঠায় না। ইংরাজদিগের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষাটি নিতান্তই নূতন ব্যাপার। ইংরাজেরা আপনাদিগকে সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। অতএব তাঁহাদের দেশে যাহা ছিল না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে আছে, এ কথা উহাঁদের মনে স্থান পায় না। এই জন্যই উহাঁরা আপনাদিগকে এখানকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তক, অন্ততঃ তাহার বিস্তার-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য বর্দ্ধনের সহিত কি প্রাথমিক, কি উচ্চ, কোন শিক্ষারই বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত সঙ্কোচই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ত বিস্তারে বাড়ে নাই, গভীরতায় কিছু ন্যূন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কি নীতি অর্থাৎ গুরুজনে ও দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, কি মানসাঙ্ক, কি হস্তাক্ষর, কিছু-তেই এখনকার পাঠশালায় ছাত্রেরা পূর্ব্বকার পাঠশালার ছাত্রদিগের সহিত তুলনীয় নহে। এদেশের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ওরূপ শিক্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে বর্ত্তমান কালে ভারত-সমাজের বিশিষ্ট হিতাহিত কিছুই হইতে পারে না। যখন ইউরোপীয়দিগের কোন প্রাথমিক শিক্ষা

ছিল না, তখন হইতেই উহারা প্রবল হইয়াছেন, আর ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তাহাতে ব্রহ্মদেশ, কি ধনে কি ধর্ম্মে, কি গৌরবে, কিছুতেই বড় হয় নাই।

এখনকার ইংরাজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইতেছে, তেমনি সংস্কৃত এবং আরবি ফারসি কম হইয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ বাড়িয়াছে; কিন্তু টোল, চতুষ্পাঠী, আখড়া, মাদ্রাসা কমিয়াছে। তবে যে সকল শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা ছিল না তাহাদের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষা কতকটা প্রবেশ করিয়াছে। তাহা করিলেও শুনিতে পাই যে, এখনও সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে ইংরাজী স্পৃষ্ট লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের কম। এখানে যে ইংরাজী বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তাহাও পূর্ণাবয়ব নহে। ইংলণ্ডের প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রেরা যে সকল বিষয় শিক্ষা করে, এখানকার স্কুল কলেজের উচ্চ শ্রেণীগুলিতেও সে সকল বিষয় তেমন শিক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাৎসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্প শুনা হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহা সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে, এত দিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কল কারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন আর্য্যশাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধন চেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে অপরাপর দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য্য-শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিজ্ঞান আরও অনেক দূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌঁছিতে পারিবেন।

অতএব আমরা এ পর্য্যন্ত যে প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষা পাইতেছি তাহার

যাহা কোন প্রকৃত শুভ ফল লাভ হয় নাই বলিলেই হয়। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির লোপ, ক্ষতি এবং অকার্য্যে প্রয়োগ হইয়া, দেশীয় উচ্চশিক্ষার পতন হইয়াছে। দেশের শিক্ষকবর্গ ভেকোচীন এবং তিরোপজীবী হইয়াছেন। উঁহাদিগের পুনঃ সংস্থাপনের জন্ম এবং উন্নতি সাধনের জন্ম চেষ্টা করাই এক্ষণকার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। ভারত ধর্ম্ম রক্ষার উপযোগী অপর কোন কার্য্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে মঠাদি প্রতিষ্ঠার যে ভূয়সী প্রশংসা আছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্ত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।

কিন্নদত্তংভবেৎ তেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা॥

যে ধর্ম্ম কাম এবং অর্থ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বৃত্তি দান পূর্ব্বক দ্বিজগণকে অধ্যাপিত করেন, তিনি কি না দিলেন।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা করাও আমাদের অপর একটী রক্ষোপায়। সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে সাধিত হইলে, উহা একটী প্রকৃত ধর্ম্মকার্য্যই হইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।

* * * *

বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

অবর লোক হইতেও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যার গ্রহণ করিবে। * * সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্পবিদ্যার সমানয়ন করিবে।

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে হইতে পারে। এক, স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে বেতনভোগী শিল্প-বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকের দ্বারা দেশীয়দিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া। অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে আপাততঃ

দেশে দ্বিতীয় পথটী লইয়াছে, চিনীয়রা কিয়ৎপরিমাণে প্রথম পথটীরই অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয়পথই যুগপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্প-বয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ, প্রমোদ, বাহাদুরী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য আগ্রহ, দীনতা প্রকাশ করেন তাঁহারা যে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও দু এক স্থলে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

> সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণোবিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
> প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণাচার থাকিবেন।

অতএব যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় এবং আত্মগৌরব বিশিষ্ট, সুতরাং আত্মসমাজ ত্যাগে অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐ রূপেই আসিয়াছিল। ইরান, কাবুল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারুকরেরা আসিয়া গালিচা, বিদ্রি, বন্দুকাদি শিল্প এ দেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

দেশীয় যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পাদি এখনও নানা স্থানে প্রচলিত আছে তাহার শিক্ষা এবং রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করাই উচিত।

বিদ্যাহীনতা নিবারণ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বক্তব্য। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা, শাস্ত্রের ফল এবং সিদ্ধান্তের প্রতি অল্প দৃষ্টি করিয়া বিচার মল্লতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাতে তথ্য জ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ অমনোযোগী হইয়া পড়ে, এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতাই ন্যূন হইয়া যায়। বিদ্যাবত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও তথ্যোপলব্ধি উচ্চতর শক্তি। ইহাই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিপাক। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥

পরব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলক, সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

বিজ্ঞানের অনুশীলনে তথ্যোপলব্ধি তেজস্বিনী হয়। এই জন্য সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদি শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন হওয়া অত্যাবশ্যক। সে সম্মিলন যে সাধিত হইতে পারে, তাহা বারাণসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার বালাণ্টাইন্ সাহেব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাহেব যে অভিপ্রায়েই ঐ সম্মিলনের জন্য সচেষ্ট হউন, আর্য্যধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বাস্তবিক বিরোধ নাই। সুতরাং তিনি ছাত্রবর্গকে যে পথে চালাইবার যত্ন করিয়াছিলেন, সে পথে আমাদেরই অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

আর এক বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। অপর সকল দেশে তদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের হইতেই ক্রমশঃই জনসমাজে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজকর্ম্মচারীরা বিদেশীয়, এবং তাঁহারা কার্য্যাবসানে এদেশে থাকেন না। এই জন্য দেশের অবস্থা এবং রাজকার্য্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ আমাদিগের পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে। অতএব রাজনৈতিক সভা সকলের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। ঐ সকল সভায় আর

মৌখিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনীতির আলোচনাতেই বিশেষ ফল দর্শিবে। কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয় তাহা অবধারণের পূর্ব্বেই এখন তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে থাকে। দেশের নানা স্থানে সভা স্থাপিত হইয়া রাজনীতি বিষয়ে পড়া শুনা এবং বিচার ও অনুসন্ধান হইতে থাকিলে বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট লোকমাত্রেরই রাজনৈতিক বিষয়জ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সম্বর্দ্ধিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সে সকল লোক আর ইংরাজী গতে ভুলিবেন না এবং হুজুকে মাতিবেন না—আপনাদের তথ্যজ্ঞানের উপরে চলিতে পারিবেন।

অতএব বিদ্যাহীনতার পরিহারার্থে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় শাস্ত্র শিল্পাদির প্রগাঢ় চর্চ্চা (২) ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন (৩) শাস্ত্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (৪) রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন।

ধনহীনতা। ধনহীনতা পরিহার করিবার উপায় তিনটী। এক, ব্যয়ের লাঘব, দ্বিতীয় ক্ষতির নিবারণ, তৃতীয়, আয়ের বৃদ্ধি সাধন। আমাদের দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ বিলাসী নহেন। ইহাঁরা ইহলৌকিক ভোগ সুখের দিকে তেমন মগ্ন হইতে পারেন না, পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, পারলৌকিক সুখের দিকে ইহাদিগকে মতি দিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া ইহাঁরা ক্রমশঃ বিলাসী এবং ব্যয়শীল হইয়া পড়িতেছেন। আবার ইউরোপীয়েরা এত প্রকারে নূতন নূতন অর্থাপচয়ের পথ এবং রাজপুরুষে ভক্তি প্রদর্শনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সেই সকল পথ দিয়া দেশীয়দিগের ধন ভাণ্ডার হইতে অজস্রধারে অর্থের নির্গম হইয়া যাইতেছে।

ভারতবাসী সাধারণতঃ বিলাসী নহেন, কিন্তু সাধারণতঃই দানশীল। পূর্ব্বে দানশীলতা নিবন্ধন দেশের কোন হানি হইত না। দেশের ধন দেশেই থাকিত। কিন্তু এখন ঐ দানশীলতার মুখ ক্রমশঃ ফিরিয়া যাইতেছে। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে, দেবপূজায়, এবং কন্যাপুত্রাদির বিবাহে যে দান হইত তাহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিত। এখন ঐরূপ দানেরও

কিয়দংশ দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। এখন ইউরোপীয় দোকানদারেরা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেন "৺ দুর্গাপূজাপর্ব্বোপলক্ষে প্রস্তুত ইয়র্ক সাইয়রের হাম্ (শূকর মাংস) বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে—মূল্য সেরকরা—টাকা।" পর্ব্ব, উৎসব এবং ক্রিয়া দির উপলক্ষেও ইউরোপীয়দিগের নিমন্ত্রণ না করিলে নয়! ইউরোপীয় অতিথিবর্গ স্বজাতিবৎসল। তাঁহারা এতদ্দেশীয় কোন দ্রব্য দেখিয়া অথবা উপভোগ করিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করেন না। তাঁহারা দ্রব্য সম্ভার বিলাতী এবং খাদ্যসামগ্রী খাস্ ইউরোপীয় দোকানদারের প্রস্তুত না দেখিলে প্রায়ই ঘৃণা প্রকাশ করেন। দেশীয় নিমন্ত্রণকারীরা কি করিবেন, আপনাদের ঘর, বাটী, আসবাব, গাড়ী, ঘোড়া এবং উপভোগ্য সমস্ত দ্রব্য ইউরোপীয় রুচির যোগ্য করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়েন; এবং ক্রমশঃ আপনারাও বিকৃতরুচি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাই ঈশ্বরী পূজার উপলক্ষে ইংলণ্ডের ইয়র্ক সাইরর প্রদেশে ভারতবাসীর টাকায় শূকর মাংস প্রস্তুত হয়।

দেশীয় জনগণকে এরূপ ক্ষুদ্রাশয়তা এবং চিত্ত-দৌর্ব্বল্য ছাড়িতে হইবে। তাঁহারা যদি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতি বিস্তারের যত্ন করেন, তাহা হইলেই ইউরোপীয় অনুকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারিলে ইংরাজ জাতির চক্ষেও গৌরবান্বিত হইবেন। বীর প্রকৃতিক ইংরাজ স্বভাবতঃ খোসামোদ ভাল বাসিতে পারেন না। এবং ধনিগণ তাঁহাদের মন রাখিবার জন্য যেরূপে নিজ দেশের, পূর্ব্বপুরুষদিগের, এবং শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া চলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি মনে মনে তাচ্ছিল্যই করিয়া থাকেন। ভারতবাসীকে প্রতি হুজুকেই না মাতিতে দেখিলে ইংরাজ ভারতবাসীর অধিকতর গৌরব করিবেন। কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সময়বিশেষে বলিয়াছেন—"মহারাজ আমাদিগকে খানা এবং নাচ দিবার জন্য আজি—র স্থানে—হাজার টাকা ধার করিয়াছেন। পাগলেরা কেন এরূপে অর্থব্যয় করিয়া নষ্ট হয়।"

অতএব নিজের ভোগ সুখের ইচ্ছা (যদি কিছু থাকে) তাহা ন্যূন করা এবং ইউরোপীয়দিগের মনরক্ষা বা খোসামোদের নিমিত্ত যে ধন ব্যয় হয়, তাহার লাঘব করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা হইলে পূর্ব্বকালে যেমন পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং মঠ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জলাশয় সংস্কারাদি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন হইত, এখনও তাহা হইয়া দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা যে অত্যুচ্চ পুণ্য কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। দেবমন্দির, কূপ, জলাশয়াদির সংস্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলং।

অতএব সংস্কারকর্ত্তাও প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন। ফলতঃ পূর্ব্বকালের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা পুষ্করিণ্যাদি প্রায়ই যথাযোগ্য স্থান সকলে বিদ্যমান আছে; সেগুলি পঙ্কিল বা ভরাট হইয়া যাওয়াতে অনেক প্রকারে লোকের স্বাস্থ্য হানি হইতেছে। এই জন্য নূতন পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা বদ্ধ, পচা ও পুরাতনের সংস্কারই এখন অধিকতর প্রয়োজনীয়। এইরূপে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান এবং দূষিত ভূম্যাদি ভাগের উদ্ধার একই কার্য্যের দ্বারা হইয়া গেলে এদেশে একমাত্র সদাচার প্রথা দ্বারা চিরকাল যেরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া আসিয়াছে তাহাই চলিতে পারিবে। সেজন্য অন্য প্রকার ব্যাপকতর চেষ্টার আবশ্যক হইবে না।

এখন মূলধনের বিশিষ্ট বিনিয়োগ ব্যতিরেকে ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ই হইতে পারে না। এই জন্যও ধনের অনর্থ ব্যয় করিতে নাই। শাস্ত্র বলেন—
"নাকার্য্যে ধন মুৎসৃজেৎ।"

দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে দেশীয় শিল্প কতকটা রক্ষা করিতে পারিলে দেশের ধনক্ষতি নিবারণ হয়। দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া আমাদের অবশ্যপোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশ

প্রস্তুত বিলাস-দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। কতক আবশ্যকীয় দ্রব্য (যথা শিশি, বোতল, পেন্সিল, ঘড়ি প্রভৃতি) এদেশে প্রস্তুত হয় না। যত দিন ঐগুলি এদেশে প্রস্তুত না হয় ততদিনই বিদেশজাত ঐরূপ দ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে কিন্তু যাহাতে ঐ সকল জিনিস এদেশে প্রস্তুত হয় সেই জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং এদেশে প্রস্তুত হইলে আর সেই সকল জিনিস বিদেশ হইতে লওয়া উচিত নয়। একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, এদেশে কোথাও না কোথাও প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস এখনই পাওয়া যায়। তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, পুস্তকাদি, যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায়, তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া উচিত।

আর এক প্রকারেও ব্যয় লাঘবের এবং ক্ষতি নিবারণের পথ আছে। এখন মোকদ্দমা মামলায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই ধন এবং ধর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে। অতএব সকল কথাতেই বাজার নালিশ করিবার যে অশুভকারী প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তির সম্যক্ দমন করা উচিত। দেশীয় বুদ্ধিমান বিদ্বান এবং চরিত্রবান লোকদিগকে মধ্যস্থ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের বিবাদ আপনারাই ঘরে ঘরে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা হইলে উৎসন্ন যাইবার একটী অতি বিস্তৃত পথই বন্ধ হইবে।

দেখিতে দেখিতে দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গের হস্তগত হইয়া যাইতেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে আমরা অনেক কালাবধি অপসৃত হইয়া আছি। উহা দাক্ষিণাত্য ভাগে অতি অল্প মাত্রাতেই এখনও আছে। কিন্তু এখন আমাদের দেশের নদীগুলিতেও বিদেশীয়দিগের বাষ্পীয় তরীর যোগে আমদানি রপ্তানি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে দেশীয় মহাজনদিগের লভ্যাংশও বিদেশে চলিয়া যাইতেছে অতএব কোন সম্প্রদায়ের লোকেই আর এখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। যদি সকলে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বৃত্তিরক্ষার নিমিত্ত সচেষ্ট

হইতে পারেন তবেই সমাজের বল রক্ষা হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম সাধন হয়।

দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য প্রথমতঃ দুই তিন জন করিয়া ধনশালী ব্যক্তি সম্মিলিত হউন। ইউরোপ হইতে কল এবং কারিগর আনয়ন করুন, এবং কারবারের নামে অংশ (শেয়ার) খুলিয়া সাধারণের স্থানে অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক অতি সাবধানে সত্যনিষ্ঠ এবং বাস্তুনিষ্ঠ হইয়া কারবার আরম্ভ করুন—প্রতি কারবারের মধ্যে যেন দুই এক জন মাড়য়ারি, বা সাহু, বা শ্রেষ্ঠী, অথবা তিলি, তাম্বুলি, বণিক প্রভৃতি বৈশ্য ধর্ম্ম পালনে নিপুণ লোক থাকেন। ভারতবর্ষে সকল কারবারই অত্যুত্তম রূপে চলিতে পারে। এখানে সকল কারুকার্য্যের উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে শ্রমজীবীর বেতনও অল্প, এখানে অধ্যবসায় এবং কার্য্যকরী শিল্পবিদ্যা সম্মিলিত হইলেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। দেশীয় ধনশালিবর্গ এবং তাঁহাদের সহকারী হইয়া মধ্যবিত্ত লোকেরা এখনও এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হউন। নচেৎ এদেশে ইউরোপীয়রাই সকল কারবারে হাত দিবেন এবং আমাদের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে তিরোহিত হইবে—আমরা মজুরদার হইয়াই থাকিব। ইংলণ্ডে শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘটে জয় লাভ করিয়া আপনাদিগের বেতন ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। তথায় শ্রমজীবীর বেতন আরও বাড়িবে। তাহাতে মূলধনীর লাভ আরও কমিবে। সুতরাং ইংলণ্ডের ধনীরা স্বদেশের বাহিরে আসিয়া কারবার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইবেন, এবং ভারতবর্ষের ন্যায় তাঁহাদের সুবিধার স্থান আর কোথাও পাইবেন না। অতএব এখন হইতেই দেশীয়দিগের মধ্যে সম্মিলনে এবং কারবারে প্রবৃত্তি জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নচেৎ রক্ষা নাই। শাস্ত্রে যৌথকারবারের বিধি আছে—

সমবায়েন বণিজং লাভার্থং কর্ম্মকুর্ব্বতাং।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সম্বিদা কৃতং॥

বণিকেরা লাভের নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যবসায় করিবেন, যিনি

যেমন মূলধন দিবেন, অথবা যেরূপ নিয়ম নিরূপিত হইবে, তদনুসারে ফল ভাগী হইবেন।

অতএব ধনহীনতা পরিহারের উপায় (১) বিলাসিতার পরিহার। (২) অকার্য্যে অর্থব্যয় পরিহার; (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব (৪) দেশীয় সালিসের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (৫) যৌথ-কারবারের দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি।

বিদ্যা ও ধনহীনতা বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভারতবাসীর (১) আয়ুর খর্ব্বতা ও (২) সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ চেষ্টা করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আয়ুর খর্ব্বতা। ভারতবাসীর আয়ু খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। দারিদ্র্য বৃদ্ধি তাহার মুখ্য কারণ। যদি ধনহীনতার নিবারণ হয় তাহা হইলে আবার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। ইংলণ্ড নিবাসী ইংরাজদিগের পরমায়ু গড়ে প্রায় তিন বৎসর বাড়িয়াছে।

ভারতবাসীর পরমায়ু খর্ব্ব হইবার অপরাপর যে সকল কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আচারভ্রষ্টতাই প্রধান। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের পক্ষে স্বদেশীয় শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ। ঐ আচারই এদেশের যোগ্য। উহার রক্ষায় আয়ুর বৃদ্ধি, উহার ত্যাগে আয়ুক্ষয় হয়। শাস্ত্রীয় আচার বলিলে লোকে ব্রত উপবাসাদি মনে করেন, কিন্তু যোগাভ্যাসের জন্যই কঠোর ব্রত উপবাসাদির উপদেশ। অর্থসাধনের পক্ষে শরীর ক্ষয়কর ব্রতাদি নিষিদ্ধ।

"সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থান্ অক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং"

গৃহাশ্রমী যোগ দ্বারা শরীর ক্ষিণ্ণ না করিয়াই অর্থের সাধন করিবে।

শাস্ত্রানুসারী হইয়া পবিত্র আহার, এবং পানীয় গ্রহণ, বিহিত আবাস এবং পরিমিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে শরীর সুস্থ, সবল, এবং দৃঢ় হয় এবং সন্তানও সুস্থশরীর এবং দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

আচারাল্লভতেহ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।

আচার হইতে আয়ুর বৃদ্ধি হয়, এবং অভীষ্টরূপ সন্তান জন্মে।

সমাজ সংস্কার। ভারত সমাজের সংস্কার করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া একটা তুমুল গোল উঠিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কারের চেষ্টা উচিত কি না, কেমন সূত্র ধরিয়া কোন্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে দৃক্‌পাত নাই, অথচ সংস্কারের জল্পনা সর্ব্বত্রে। সংস্কারের দল অসংখ্য। অতএব মূল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কি হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

সমাজ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনকে সমাজের সংস্কার বলে। ঐরূপ সংস্কার কার্য্য যে ভারতবর্ষে অনেকবার হইয়াছে, তাহা স্মৃতিসংহিতা এবং পুরাণাদি হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল সংস্কার অন্ধ-অনুকরণমূলক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। একটী স্থলে কোন্ কারণে এবং কি প্রণালীতে সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপেই অভি-ব্যক্ত হইয়া আছে। স্মার্ত্ত শিরোমণির উদ্ধৃত কয়েকটী পৌরাণিক বচনের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে—

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥

লোকের রক্ষার নিমিত্তে, কলির প্রথমে, পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে, মহাত্মগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়া সকলের নিবারণ হইয়াছিল। সাধু-দিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়মও বেদতুল্য প্রমাণিত হয়।

অতএব উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ সমাজের রক্ষার নিমিত্তে, নিবৃত্তিমার্গে, যে সমাজ-প্রণালীর সংস্কার চেষ্টা তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। তবে চেষ্টাটী (১) সমাজের রক্ষার নিমিত্ত, অতএব রক্ষা কার্য্যের অনুকূল যে ধর্ম্ম তাহার অনু-গত হওয়া আবশ্যক এবং (২) মহাত্মগণের অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির

অনুমোদিত সুতরাং কোন একব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত নয়, এবং পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মতি ক্রমে হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ সংস্কারের ব্যবস্থা বেদের সদৃশ মান্য হইবে।

কিন্তু এখন সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা হয়, তাহাতে (১) প্রবৃত্তিমার্গে বিদেশীয় রীতির অনুকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে, তাহাতে (২) ব্যক্তিবিশেষের বাহাদুরীর প্রখ্যাপন হয়, এবং (৩) দেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই তাহার একটী মুখ্য অঙ্গ। তদ্ভিন্ন, বৈদেশিক রাজার সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নব্য সংস্কারকদিগকে অতিশয় লালায়িত হইতেই দেখা যায়—সুতরাং আত্মসমাজের সংরক্ষণ ঐ সকল সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না।

কিন্তু স্বদেশের বিদ্যার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রচার, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, যৌথকারবারের বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তার, সাত্ত্বিক প্রণালীর সম্বর্দ্ধন, সদাচার পালন—এইরূপ বিষয়গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজসাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের রক্ষা সাধিত হয়।

উপসংহার।

ভারতবর্ষের অত্যুৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র আছে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব বলিয়া যে কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহা আমার জানা নাই। সমাজতত্ত্ব ইউরোপের একটী নূতন শাস্ত্র। উহা ইতিহাসমূলক বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাসমূলকও বটে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে ঐ শাস্ত্রে এখনও ধর্ম্মের প্রভাব বলবান্। এখনও উহাতে লেখকের

যদৃচ্ছো-সম্ভূত মতামতগুলিই সমধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ। যাহা সার্ব্বভৌমিক সংজ্ঞ সূত্র বলিয়া নির্ণীত তাহাও সর্ব্ব স্থলে দেশ বিশেষের সমাজ-সঙ্গত নয়।

এই জন্য ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তত্ত্ব হইতে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিণতি বিশিষ্টরূপে নির্ণয় করিবার সুগম পথ পাওয়া যায় না। ওখানকার কোন গ্রন্থে ভারতবর্ষের অবস্থাপন্ন কোন দেশের কোন কথাই নাই। যাহারা শুদ্ধ আপনাদিগের মনঃকল্পিত সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও কেহ পরাধীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। যদি কোন গ্রন্থকার প্রসঙ্গতঃ বিদেশ বিজয়ের কোন উল্লেখ করেন, তাহাতে ঐ কার্য্য যে শান্তি দূষক এবং বিজেতা এবং বিজিত উভয়ের অপকর্ষ জনক, এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। প্রত্যুত বৈদেশিকের সংস্রবে সমাজের কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে, ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ যেন বিশেষ যত্ন পূর্ব্বকই সে বিষয়ে কোন কথা বহেন না। নব্য ইউরোপের বেকন নামক অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তাঁহার মনঃকল্পিত আদর্শ সমাজে, বৈদেশিকদিগের প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এবং তৎসমাজস্থ কতিপয় মহামহোপাধ্যায়ের মুখে যদিও বিদেশ ভ্রমণ শুভকর বলিয়াছেন, তথাপি তাহাদের সে ভ্রমণও বিদেশ ভ্রমণ অতি ছদ্মবেশে এবং গুপ্তভাবে করণীয়, এই কথা বারবার বলিয়াছেন।

ফলতঃ, বৈদেশিকের অধিকার সমাজের হানিকর এবং স্বদেশিকের অধিকারে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় ইহাই ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণের অভিমত। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস, এই দেশের বর্ত্তমান, বৈদেশিক অধিকারকে তেমন সর্ব্বতোভাবে বিষবৎ দুষ্ট বস্তু বলিয়া নির্দেশ করে না, প্রত্যুত সমস্ত মহাদেশে অবিচ্ছিন্ন শান্তির রক্ষা এবং একচ্ছত্রে ক্রমশঃ দৃঢ়তর সম্মিলন, এই দুইটী চিরাভিলষিত বস্তু, ভারত সমাজ ইংরাজ হইতে প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া এখানে ইংরাজ অধিকারের স্থায়িত্বই প্রার্থনীয় বলে, অথচ ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববেত্তাদিগের কথাকে একান্ত মিথ্যা না করিয়া বৈদেশিক

অধিকারের যে সমূহ দোষ আছে, তাহাও দেখাইয়া দিয়া ভারতবাসীকে চক্ষুষ্মান্, অবহিত এবং আত্মদোষ সংশোধনে যত্নবান হইতে বলে।

বস্তুতঃ ভারত-সমাজের ভাবী অবস্থার অনুমান করিবার জন্য মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই বিচার করিতে হয়, অপরাপর দেশের ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বাভিহিত গ্রন্থাদি হইতে প্রসঙ্গ ক্রমে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র। ঐ ইতিহাসাদি হইতে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের সূত্র গ্রহণ করা অথবা এই সমাজের পরিণতির নিয়মাবধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ভারতবাসীর সমাজ-তত্ত্ব অপর একটী কারণেও ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তত্ত্ব হইতে ভিন্নরূপে বিচার্য্য।

সমপ্রকৃতিক কোন একটি মাত্র বস্তুতে পরিণতি সংঘটন হয় না। বিভিন্ন বস্তুর সমবায় হইতেই পরিণতির প্রবৃত্তি হয়। এ নিয়মটী জাগতিক সকল কার্য্যের পক্ষেই খাটে। বাহ্য ব্যাপারেও যেমন একাধিক দ্রব্যের সমবায়েই দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, তেমন আভ্যন্তরীণ কার্য্যেও একাধিক ভাবের সমবায়ে ভাবান্তর আইসে। সামাজিক পরিণতিও এই নিয়মের অধীন। প্রতি সমাজের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থ এবং বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক সকল বিদ্যমান থাকে। তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সমাজের অভ্যন্তরে বিবিধরূপ পরিবর্ত্ত সাধিত হয়। কিন্তু তাদৃশ পরিবর্ত্তস্রোতঃ চিরকাল সমান বেগে চলে না। সম্মিলনের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের অভ্যন্তরে বহু পরিমাণেই সাম্যাবস্থা অবস্থাপিত হইয়া যায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এবং বিবিধ দ্বীপাবলী নিবাসী বর্ব্বরেরা আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলির গঠন করিয়া বহু কালাবধি সমভাবেই রহিয়া গিয়াছিল। যদি ইউরোপীয়েরা তাহাদিগের বিনাশ সাধন না করিতেন, তাহা হইলে তাহারা চিরকাল সেই এক ভাবেই থাকিতে পারিত, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

তাদৃশ সাম্যাবস্থ সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে একটী সম-প্রকৃতিক বস্তুর

স্থায়ী হইয়া থাকে এবং তাহাতে বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত্ত চলে না। কিন্তু যদি ঐ সাম্যাবস্থ সমাজের মধ্যে কোন নূতন লোকের অথবা নূতন ভাবের সমাগম হয়, তবে সেই ভিন্ন উপাদানের সংযোগে আবার পরিণতির বেগবত্তা জন্মে এবং পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্ত স্রোতঃ চলিতে থাকে।

সাম্যাবস্থার এবং পরিবর্ত্তের এই পর্য্যায়ক্রম ভারতভূমিতে অতি বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারত সমাজের উপাদান মূলতঃই অতি বিভিন্ন-প্রাকৃতিক; তদ্ভিন্ন, এদেশের ধনবত্তার বিপুল খ্যাতি বহু কালাবধি বৈদেশিকদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে অথবা বিজিগীষায় এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছে। এই জন্য ভারত সমাজের পরিণতি-কার্য্য বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে এবং কখন স্থগিত-গতি হইতে পারে নাই। অন্যান্য প্রাচীন জাতীয়েরা কেহ বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেহ বা বহুকালাবধি কোন নূতন উপাদানের সমাগম অভাবে অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ভাবেই আছে। তাহাদের তুলনায় ভারত সমাজের পরিণতি সূত্র যে সাতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ঐ সূত্র সুদীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া যে উহার সহিত নব্য ইউরোপীয়দিগের পরিণতি সূত্রকে জুখিয়া কোন্‌টী বড়, কোন্‌টি ছোট, অবধারিত করিতে পারা যায়, তাহা নহে। যদি সকল সমাজের পরিণতি একই প্রণালী ক্রমে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা হইলেই ঐ প্রকার জোখা দেওয়া চলিতে পারিত, এবং তাহা হইলেই কোন্ সমাজ অগ্রবর্ত্তী এবং কেবা পশ্চাদ্বর্ত্তী, তাহা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সকল মনুষ্য সমাজের পরিণতি ব্যাপার একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। যেমন বাহ্য ব্যাপারে দেখা যায়, দ্রব্যের উপাদানের ভিন্নতা নিবন্ধন সমুৎপাদিত মিশ্রপদার্থের ভিন্নতা জন্মে, সেইরূপ সামাজিক উপাদানের ভিন্নতা হইতেও সামাজিক পরিণতির প্রকার ভেদ হয়। ভারত-সমাজের প্রধানতম উপাদান—কল্পনাপ্রবণ বিবিধ অনার্য্য জাতি এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বোধে পটুতম আর্য্যগণ।

ইউরোপীয় সমাজের উপাদান—রোমীয়দিগের শাসনগুণে একীকৃত সুসাহসিক কেল্টীয় লোক এবং সাতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় এবং স্বৈরস্বভাব টিউটোনীয় বর্ব্বরগণ। এইরূপ অতি বিভিন্ন প্রকৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংঘটিত সমাজদ্বয়ে মূলতঃই ভেদ থাকায়, উভয়ের পরিণতি একই প্রকার হইতে পারে নাই। শুদ্ধ উপাদানের ভিন্নতাও নহে—ভারত এবং ইউরোপীয় সমাজে তাহাদের স্ব স্ব উপাদানের বিনিবেশও ভিন্নরূপ হইয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজের নিম্নস্তরে রোমের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, উপরি স্তরে রোম বিজেতাদিগের বর্ব্বরতা; ভারত-সমাজের নিম্ন স্তরে অনার্য্যদিগের বর্ব্বরভাব, উপরিস্তরে আর্য্য-সভ্যতার সমাবেশ। এরূপ স্তর-বিন্যাসের ভেদ হইতেও পরিণতি সূত্রের ভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

এই সকল কারণে ভারতবর্ষের সহিত অন্য কোন প্রাচীন অথবা নব্য জাতীয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উপমান উপমেয় সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে না। এবং সেই জন্য ইউরোপীয় সমাজের সূত্র-ধরিয়া ভারত-সমাজের পরিণতির বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাই করা হয় বলিয়া, সমূহ ভ্রম জন্মিয়া যাইতেছে। এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারত সমাজের পরিণতি ব্যাপার এখনও ইউরোপের পশ্চাদ্বর্ত্তী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ইউরোপের বহু বিগত শতাব্দীর অনুরূপ। অপর কেহ বলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে এখনও জাতীয়ভাব পর্য্যন্ত জন্মে নাই।

ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ রোম সাম্রাজ্যের উপরিস্তরে বর্ব্বর জাতীয়দিগের অবস্থান; ভারতবর্ষে বর্ব্বরদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় লোকের উপরিভাগে আর্য্যজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রজোগুণাত্মক লোকের প্রাধান্য, ভারতবর্ষে সত্বগুণাবলম্বীর প্রাধান্য, কিন্তু তজ্জন্য ভারতবর্ষের পরিণতি ব্যাপারে পশ্চাদ্বর্ত্তিতা সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ভারত-সমাজের পরিণতি, ভিন্ন পথে বহুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্যে এখনও যোদ্ধৃদশা জাজ্জ্বল্যমান,

সকল ইউরোপীয় লোকই সিপাহী সাজিয়া উঠিয়াছে, রাজস্বের অর্দ্ধাংশ সৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। ভারত-সমাজের ঐ ভাব যদি কখন হইয়া থাকে, তবে যখন একটী স্বতন্ত্র যোদ্ধৃ-জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয়াছে—ইউরোপের সকল লোকই ভোগ-সুখ লালসায় প্রপীড়িত রহিয়াছে, ভারত সমাজের ঐ অবস্থা চতুরাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই—ইউরোপের সাধারণ লোকে এখনও সাতিশয় নিষ্ঠুর-স্বভাব এবং অকারণ প্রাণিবধে উদ্যতহস্ত। ভারত-সমাজে যখন অহিংসাই পরমধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তখন হইতেই ঐরূপ স্বৈরাচার গিয়াছে; ইউরোপ অপর সমুদয় ভূভাগকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছেন, পরের ছেলের মুখের গ্রাস নিজের ছেলেকে খাওয়াইতেছেন। ভারতবর্ষে যদি কখন ঐ ভাব দেখা দিয়াছিল এমত হয়, তাহা বহুকাল হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবাসী অন্যের অন্নে ভাগ বসাইতে চাহেন না। এ সমাজের সহিত এমন সকল বিষয়ে ইউরোপীয় সমাজের তুলনা হইতে পারে না। তবে ইউরোপের কল কার-খানা বাড়িয়াছে এবং ইউরোপ বিজ্ঞান বিদ্যায় এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীনতা বা পূর্ণতাই উৎকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাজের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য, অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের সুপালনে, ভারত সমাজ পৃথিবীর অপর কোন সমাজের অপেক্ষায় ন্যূন ছিল না—এখনও ইউরোপ অপেক্ষায় ন্যূন হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত-সমাজের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটী পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথাটী ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় ভাবটী মনুষ্য হৃদয়ের খুব উচ্চভাব ঘটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চভাব নয়। জাতীয় ভাব একটি মিশ্র-পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুইই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অতি-উদার ভাব; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণভাব। প্রাচীন গ্রীক্

এবং রোমীয় পণ্ডিতেরা ইহার উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত বড় বড় লোক সকলেরই হৃদয় এই ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতি বৎসল, তাঁহারাই নরকুলে দেবতা। নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা ঐরূপ। উঁহারাও স্বদেশ এবং স্বজাতি বাৎসল্যের যথেষ্ট গৌরব করেন—কিন্তু প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়েরা যতদূর করিতেন, ততটা করেন বলিয়া বোধ হয় না। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্বদেশানুরাগের মূল অভিমান; ইহার শাখা প্রশাখা এবং পত্র বিটপাদি বাহ্য আড়ম্বর; ইহার কাণ্ড পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ; ইহার ফল পুষ্পাদি যেমন স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন; ইহা একটী দোষে গুণে জড়িত উপধর্ম্ম মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জাতীয় ভাবটীকে উপধর্ম্ম বলিয়া নিন্দাও করেন নাই, আর উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যাত করেন নাই। তাঁহারা এক পক্ষে স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশেই সমুদায় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্ম্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার স্বজাতীয় আর্য্যগণকেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃশরীর প্রসূত বলিয়াছেন, আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট দেশ এবং তদধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দিয়াছেন——পক্ষান্তরে, তাঁহারাই সর্ব্বত্র সাম্য এবং একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটী অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে——উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতিসোপানে একটী উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়।

জাতীয় ভাবটী হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটী প্রশস্ত ধাপ। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ; (৩) বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ

প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, (৬) স্বজাতি-বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়-ক্রমে ইহাঁর উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোমটির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা শিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ বৌদ্ধ-দিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে, আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব সেটী আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভি-রত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয় নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজা-তীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম্ম-সূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতে-ছেন, যে কুশিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরি-হার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন, এবং আত্ম সমাজকেই ধর্ম্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ়ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতি-সম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে এই স্বজাতি বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর কার্য্য সকলে

প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছু কাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজে সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকসিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতর আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পর-জাতি বিদ্বেষ এবং পরজাতি পীড়ন তাঁহার স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহারি নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

সমাপ্ত।

পারিবারিক প্রবন্ধ।

—————:::০:::—————

উৎসর্গ

আমি কি? এবং কি জন্য হইলাম?—গাছে যেমন পাতা হয়, তেমনি হইয়াছি বইত নয়। আমার ঐ 'আমি' পদার্থটী কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির আবেশ বইত নয়। এখন আমার থাকাই কি?—আর না থাকাই বা কি?

মন যেন কি চায়, পায় না—কি যে চায়, তা জানেই না। যাহারা শৈশবে আমাকে কোলে পিঠে করিত এবং আপনাদের বলিত, তাহারা ত অনেকেই নাই—যাহারা আছে তাহারাও থাকিবে না। পৃথিবী শ্মশানভূমি—এখানে থেকে কাজ কি?

মনের এই ভাব, এমত সময়ে একটী দেবী মূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হইল—আমার দুই চক্ষুতে দুই চক্ষু মিলাইল—আমার হাতে হাত দিল—বলিল 'আমি তোমার'।

'আমার' আছে।—তবে 'আমি' এক জন! আমি থাকিব, আমি করিব, আমি বাড়িব, আমি বাড়াইব। ইতি স্থিতি-বিধায়িনী—

অন্তর্দৃষ্টি অতীতকালের প্রতি ধাবিত হইয়া আর পৃথিবীকে শ্মশানভূমিরূপে দেখাইল না।—বর্ত্তমান কাল

দেবীর হাস্যপ্রভায় রঞ্জিত হইয়া আশার ফলকে চিত্রিত ভবিষ্যৎ কালের সহিত একীভূত হইল। ধরাতলে একটী রমণীর আরাম প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। ঐ আরাম, দেবীর ক্রীড়া ভূমি। ইতি আশ্রম-বিধায়িনী—

ক্রীড়ারস অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ উদ্যানবাটিকার মধ্যে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। আদ্যাশক্তি আকর্ষণীর স্বরূপ উপলব্ধ হইল। জড় জগতে চিন্ময়তা দেখিলাম। ইতি লীলাময়ী—

মুখের হাসি আর মুখে ধরে না! প্রতি পাদবিক্ষেপে প্রসূনচয় প্রস্ফুটিত হয়; প্রতি দৃষ্টিপাতে হিমাংশুকিরণ বর্ষণ হয়। ইতি আনন্দময়ী—

কিছুরই অভাব নাই—কিছুরই অস্থিরতা নাই। সকলই যথাযথ। যাহাতে দৃষ্টি করেন তাহাই উথলিয়া উঠে। যাহাতে হাত দেন তাহাই শোভাময় হয়। ইতি গৃহলক্ষ্মী—

দেখিতে দেখিতে একটী একটী করিয়া কয়েকটী শিশু-মূর্ত্তি ঐ আরাম নিকেতনে দেখা দিল—উহাদিগের শরীরে তাঁহার এবং আমার উভয়ের অবয়ব একত্র সম্মিলিত দেখিলাম। হৃদয় মমতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ও গুলিকে নিতান্ত নিজস্ব জ্ঞান করিলাম। একান্তই আপনার মনে করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি বর-প্রদায়িনী—

বর পাইয়া কি আনন্দ এবং উৎসাহ! জড় জগৎকে স্পষ্ট চক্ষে চিন্ময় জগৎ দেখিলাম। নিজের শক্তিকে অপরিমেয়

বুঝিলাম। বিনা ভীতিকম্পনে এবং বিনা রাগপ্রকটনে চিত্তগিরি উন্নত হইতে হইতে যেন আকাশ ছুঁইতে চলিল এবং শ্রমশীলতা, কার্য্যতৎপরতা, পরিণামদর্শিতা সেইগিরির শিখরদেশে দৃঢ় হইয়া বসিল। ইতি সামর্থ্যবিধায়িনী—

কৈ ?—একি হইল ?—সেইটী—সেই সর্ব্ব প্রথমেরটী ?—সেই সাক্ষাৎ দেবতুল্য শক্তিসম্পন্নটী ?—সেই কোথায় গেল ?—'আর এখানে থাকিব না। বৃক্ষবাটিকা হইতে বাহির হইয়া সে যথা গিয়াছে সেই খানেই যাইব।—বাহির হই—তাত বলিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলেন গাছটীর তলায় অনেকগুলি অপক্ক কড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রু-পূর্ণ নয়নে বাষ্পদিগ্ধ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'মুকুল যত হয় ফল তত হয় না'। তথা বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধদায়িনী—

এ কি হইল ?—ইনি কৈ ?—যে সকলকে এই নিতান্ত আমার বলিয়া মনে করিতাম, তাহাদিগকেও ত আর তত আমার বলিয়া মনে হইতেছে না! সকলেই যেন আমা হইতে দূরগত হইতেছে! আমি আবার জগতে 'একা'!—আবার আমার পৃথিবী 'শ্মশান'! যেমন হৃদয় মধ্যে এইরূপ ভাবিলাম, অমনি তথায় অশরীরিণী বাণী নিঃসৃতা হইল।—"শোকে মুগ্ধ হইও না—তুমি আর তেমন 'একা' হইতে পার না, তোমার পৃথিবী আর তেমন 'শ্মশান' হইতে পারে না।—তোমার হৃদয় শূন্য নাই—তুমি

পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াই জানিয়াছ"। ইতি হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী—

পৃথিবী এখনও আমার কর্ম্মক্ষেত্র? আমি কি জন্য এবং কাহার জন্যই বা কাজ করিব? আমার বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আমার সাহস নাই—অমনি হৃদয়বাণীও শুনিলাম—'পৃথিবী শ্মশানও নয়, আবাস বাটিকাও নয়। ইহা যে কর্ম্মক্ষেত্র তাহা তুমি শিখিয়াছ। তোমার সাহস নাই, ত সাহস আছে কার? যদি সাহস নাই তবে মরিতে ভয় কর না কেন?" ইতি যম-ভয়-বারিণী—

যে প্রকৃতিশক্তি উল্লিখিত দশবিধ রূপে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে বঙ্গবাসী স্ত্রী পুরুষের হস্তে এই পুস্তক খানি সমর্পণ করিলাম।

লেখক।

সূচনা।

—::•::—

আকাশমার্গে সূর্য্যের গমন হইতেছে; তুমিও দেখিতেছ, আমিও দেখিতেছি। কিন্তু সূর্য্যের যে রশ্মিবিশেষ তোমার নেত্রমুকুরে পতিত হইয়া তথায় সূর্য্য প্রতিবিম্ব জন্মাইতেছে, আমার নেত্রমুকুরে সূর্য্যের সেই রশ্মি পড়িয়া সূর্য্যদর্শন জ্ঞান জন্মাইতেছে না। আমরা উভয়েই একই সূর্য্যের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছি। সকলের পক্ষেই এইরূপ। যে সূর্য্যকে দেখিতেছে, সে আপন নেত্রসংলগ্ন রশ্মিবিশেষের দ্বারাই তাঁহাকে দেখিতেছে, অন্যের নেত্রসংলগ্ন রশ্মিদ্বারা দেখিতেছে না।

মনুষ্যের সম্বন্ধে সত্যের অববোধও অবিকল ঐ প্রকার। যেমন সূর্য্যও এক, তেমনি সত্যও এক। কিন্তু এক ব্যক্তি সত্যের যে অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অপরে ঠিক সেই অভিজ্ঞানটী পায় না। আমি যে প্রকার শরীর এবং প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং যেরূপ শিক্ষা এবং যেরূপ সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইগুলিই আমার পক্ষে সত্যোপলব্ধির রশ্মিস্বরূপ হইয়াছে। তুমি পিতৃমাতৃ স্থানে যে প্রকার দেহ এবং স্বভাব অধিকার করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, এবং যেরূপে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়াছ, তাহাই তোমার সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। প্রতিব্যক্তির অভিজ্ঞতা ভিন্ন, সুতরাং সত্যোপলব্ধির পথও ভিন্ন।

বিভিন্ন রশ্মিসংযোগজাত বিভিন্ন সূর্য্য প্রতিবিম্ব যেমন সাধারণতঃ একবিধ—এমন একবিধ যে, তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতীতি কিছুমাত্র ভিন্ন বলিয়া মনে হয় না; সেই প্রকার কোন দুই জনের অভিজ্ঞতা ঠিক একরূপ না হউক, তথাপি এত একরূপ হয় যে, প্রায় সকল বিষয়েই পরস্পরের কথোপকথন এবং মনোগত ভাবের বিনিময় অব্যাঘাতে চলিতে পারে। আমার অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে, তোমার অভিজ্ঞতাও তাহাকেই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিতেছে, এরূপ বোধ না থাকিলে মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হইত না—দেশভাষা জন্মিত না

—পরস্পর কথাবার্ত্তা থাকিত না—বাদানুবাদ চলিত না—গ্রন্থরচনাও হইত না।

অস্মজ্জাতীয় পারিবারিক অবস্থা এবং ব্যবহার বিষয়ে আমি যেরূপ দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, এবং করিয়াছি, অন্য কেহই অবিকল সেইরূপ দেখেন নাই, বুঝেন নাই, এবং করেন নাই সত্য; কিন্তু যাহা আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট, উপলব্ধ, এবং কৃত হইয়াছে, তাহা অন্যের দর্শন, অববোধ এবং কৃতি হইতে নিতান্ত ভিন্ন হইতেও পারে না। এরূপ বুঝিয়া লইতে না পারিলে, আমি এই প্রবন্ধ কয়েকটী জনসমাজে প্রচারিত করিতাম না।

আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যে জন্য এবং যেরূপে ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারিবে, এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য্য, অবজ্ঞাত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা চিরন্তন বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্ম্ম প্রণালীই বল, সামাজিক প্রণালীই বল, আর শাসন প্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থাই সকলের নিদানভূত।

আমাদিগের পারিবারিক সুখ অধিক—এটী নিতান্ত অল্প কথা নয়; যদি পারিবারিক সুখ অধিক, তবে ধর্ম্মও অধিক এবং ধর্ম্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমশালিতাও জন্মিতে পারে।

পারিবারিক প্রবন্ধ।

প্রথম প্রবন্ধ।

বাল্য-বিবাহ।

এক্ষণে অনেকে বাল্য-বিবাহ প্রথার নিন্দা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক বিবেচনাপূর্ব্বক চলিতে না পারিলে বাল্য-বিবাহ হইতে যে কতকগুলি গুরুতর দোষ ঘটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্য বিবাহের যেমন দোষ আছে, তেমন গুণও আছে। যাঁহারা বাল্য-বিবাহপ্রণালীর কেবল দোষ মাত্র দেখেন, ইহার গুণ দেখিতে পান না, তাঁহাদিগকে ইংরাজদিগের নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষু বলিলে অন্যায্য গালি দেওয়া হয় না।

সম্প্রতি একজন সরলচেতা বহুদর্শী ইংরাজের সহিত বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। ক্ষণকাল বিচারের পর তিনি বলিলেন, বাল্য-বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত শান্তি ও ব্যক্তিগত সুখের আধিক্য এবং বয়োধিক বিবাহ প্রণালীতে জাতিগত উদ্যম ও ব্যক্তিগত ওজস্বিতার আধিক্য লক্ষিত হয়। এই কথা বলিয়া তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধানের কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি বলিলাম, আমাদিগের প্রাচীন ব্যবস্থাপকেরা বোধ হয় ঐরূপ সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর বয়স কম এবং পুরুষের বয়স অধিক রাখিয়া উদ্বাহপ্রণালীর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ, দ্বাদশবর্ষীয়া মনোমত কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইংরাজটী বলিলেন—তাহা হইলেও হইবে না—অপক্ব মাতৃশরীরপ্রসূত সন্তান সুস্থ এবং সবলকায় হইবে না। আমি বলিলাম, আপনাদিগের ভাষায় পশুপালন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে

কোন নব্য এবং বহুজনসম্মত গ্রন্থে ওরূপ কোন কথা নাই—পিতৃশরীর যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই সন্তান পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ এবং সবলকায় হইতে পারে, পশুজনন বিধান এই মত। ইংরাজটি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরিপাক অল্প বয়সেই হয় বটে—সুতরাং পুরুষের বয়স অধিক এবং স্ত্রীর বয়স কম রাখিয়া বিবাহ দেওয়াই বিধেয় এবং তাহাতে সকল দিকই বজায় থাকিতে পারে দেখিতেছি—প্রণয়, শান্তি এবং সুখ অধিক হয়, উদ্যম এবং ওজস্বিতা জন্মিবারও অবসর থাকে, এবং সন্তানও বলহীন হয় না। আমি বলিলাম বর্ত্তমান অবস্থাতেও হিন্দু দম্পতীর পিতৃমাতৃগণ কিঞ্চিৎ দূরদর্শী হইলে এবং তাঁহারা স্বয়ং একটু তপস্যাপরায়ণ হইলে ঐ সকল ফল দর্শিতে পারে।

মোটামুটি ভাবিতে গেলেও বয়োধিকদিগের বিবাহটা যেন কেমন কেমন দেখায়। ১৯। ২০ বৎসরের যে কন্যা ২৪। ২৫ বৎসরের একজন পুরুষকে লইয়া আপনার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, প্রভৃতি আশৈশব সহচর সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি যে কেমন "লজ্জাভয়বিভূষণা" তাহা অনুভব করিতেও পারা যায় না। ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুইটীকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটী নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিক-দিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে? বয়োধিকদিগের মন পাকিয়া যায়, অভ্যাস স্থির হইয়া দাঁড়ায় চরিত্র নির্দ্দিষ্টপথ অবলম্বন করে; তাহারা কি আর তেমন পরস্পরে মিলিয়া একতাসম্পন্ন হইতে পারে? ফলতঃ দম্পতীর পরস্পর প্রণয়াধিক্য উৎপাদন করাই যদি উদ্বাহ প্রণালীর মুখ্যতম সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তবে বাল্য বিবাহ যে বয়োধিক বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় থাকে না। ছেলেবেলার ভালবাসাই ভালবাসা। মা বাপের প্রতি, ভাই ভগিনীর প্রতি, খেলুড়িদিগের প্রতি মনটী যেমন কোমলভাবাপন্ন থাকে, বয়স হইলে যাহাদিগের সহিত পরিচয় হয়, তাহাদিগের কাহারও প্রতি প্রায়ই মন তেমন হয় না। ছেলেবেলার বন্ধুদিগের কোন দোষই ধরিতে ইচ্ছা হয়

না। তাহারা যাহা করে, তাহাই ভাল, যাহা বলে তাহাই মধুর। তাহাদিগের কাহাকেও দেখিলে, ভাবিলে, কাহার নাম মাত্র শুনিলে, মন সরল এবং আর্দ্র হইয়া পড়ে। এবং ছেলেবেলার সময় দাম্পত্য প্রণয়ের বীজ বপন না করিয়া যাহারা বিলম্ব করে, তাহারা প্রণয়পীযুষের প্রকৃত রসাস্বাদনে নিতান্ত বঞ্চিত থাকে।

বয়স হইয়া বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে পরস্পর স্বভাব চরিত্র বুঝিয়া যুবক যুবতী বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, এই যে একটী কথা আছে, উটী কথার কথা মাত্র। অন্যের স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কার্য্য নয়। ঐ কার্য্যে অতি সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম হইয়া থাকে। ১৯—২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪—২৫ বৎসরের পুরুষের ত কথাই নাই। ঐ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবলা, কল্পনাশক্তি তেজস্বিনী, এবং অনুরাগ একান্ত উন্মুখ। পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা ঐ সময়ে অকস্মাৎ [illegible] থাকে। একটী সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ এক [illegible] একটা অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য, হঠাৎ মনোমধ্যে অধিকার করিয়া [illegible] চরিত্র [illegible], পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেয় না। এই জন্য [illegible] বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে [illegible] না।

দেখ, যে দেশে অধিক বয়সে পরিণয়ের নিয়ম, সেই দেশেই পরিণয়োচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রচলিত [illegible]। যদি পরস্পর স্বভাবাদির পরীক্ষা হইতে পারিত তবে এরূপ হইবে কেন? ফলতঃ [illegible] অনুরাগ [illegible] প্রণোদিত উদ্বাহ বন্ধনে [illegible] প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা বিরল। সেই জন্য কারণান্তর উপস্থিত হইয়া ঐ বন্ধনের রক্ষা এবং [illegible] সম্পাদন না করিলে উহা স্বতঃই বিচ্ছিন্ন এবং স্খলিত হইতে পারে। ইংরাজেরা অধিক বয়সে বিবাহ করেন তাঁহাদিগের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা আছে। ঐ ব্যবস্থা তাঁহা[illegible] [illegible] সঙ্গত [illegible] বলিয়া ইংরাজেরা আজি কালি বড়ই দুঃখিত। [illegible] দেশে [illegible] বিবাহ [illegible] করিবার

নিয়ম। সম্প্রতি ঐ দেশে বিবাহ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত অনেকে মত প্রচার করিতেছেন। যদি ঐ সকল দেশে উদ্বাহবন্ধন সুখের বন্ধন হইত, তবে ঐ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য এত যত্ন এবং এত আগ্রহ, কেন হইবে? বস্তুতঃ যেখানে যত অধিক বয়সে বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত আছে, সেই খানেই ঐ প্রকার গোলযোগ অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে। উহা অধিক বয়সে বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া ধরা যায়।

স্পেন, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকেরাও ত লেখা পড়া শিখে কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার ন্যায় ঐ সকল দেশে এ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাবিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আমার বিবেচনায় ঐ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া দম্পতীর পরস্পর প্রণয় অধিক।

কোন কোন ইংরাজ পর্য্যাটক বলেন বটে যে, স্পেন ইটালী প্রভৃতি যে সকল দেশে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় কার্য্যতঃ উদ্বাহ-বন্ধন নিতান্ত শিথিল। তাঁহারা বলেন, ঐ সকল দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল এবং ভ্রষ্টাচার। কিন্তু ঐ সকল পর্য্যাটকেরা সাধ্বী স্ত্রী জাতির পবিত্র আবাস ভূমি ভারতবর্ষের প্রতিও ঐ প্রকার কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে লঘুপ্রকৃতি মনে করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত কথা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করাই যুক্তিসঙ্গত।

যে দেশে বয়োধিক হইলে বিবাহ হয়, সেই দেশেই বিবাহবন্ধন শিথিল এবং দম্পতীপ্রণয় অন্ধ অনুরাগমূলক বলিয়া অচিরস্থায়ী।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

—::⁂::—

দাম্পত্য প্রণয়।

প্রণয় পদার্থটী কি? তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বলা বড় কঠিন। প্রণয়ের বর্ণনায় এত সঙ্গীত, কাব্য এবং আখ্যায়িকা বিরচিত হইয়াছে, এবং সেই রচনা সকল জনসাধারণের কথাবার্ত্তায় এমত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রণয় সম্বন্ধে রূপক এবং অতিশয়োক্তি অলঙ্কারবিবর্জ্জিত কোন কথাই প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। 'জগদীশ্বর প্রেমময়', 'প্রীতিপুষ্পই পরমেশ্বরের পবিত্র উপহার,' প্রণয়ই জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ', 'প্রণয়-সুখই স্বর্গসুখ,' 'যাহার শরীরে প্রেম আছে, সে জীবন্মুক্ত'—এবম্বিধ বাক্য সমস্ত বোধ হয়, পৃথিবীর সকল দেশের সকল ভাষাতেই প্রচলিত। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল বাক্য হইতে সাধারণ ব্যক্তিব্যূহের বোধসুলভ কোন বিষয়ে ভাবার্থই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 'জগদীশ্বর' 'পরমেশ' 'স্বর্গ' 'মুক্তি' এই সকল শব্দ অনাদি এবং অনন্ত পদার্থ, সকলকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মনুষ্যের সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি ঐ সকল অসীম পদার্থের সমগ্রতা ধারণায় একান্ত অশক্ত। সুতরাং ঐ সকল শব্দ দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পদার্থের সুপরিস্ফুট অববোধ হইতে পারে না। 'জীবনের জীবন' 'প্রাণের প্রাণ' প্রভৃতি শব্দও ঐ দোষে দূষিত। জীবন এবং প্রাণ কি? তাহাই আমরা জানি না, তবে জীবনের আবার জীবন, প্রাণের আবার প্রাণ কি তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

অতএব সাধারণতঃ প্রণয় শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বলিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা যে গাঢ়তম প্রেম স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাই, তাহারই প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিব। দাম্পত্য প্রেমই সংসারী জীবের পক্ষে সকল প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রগাঢ়। শাস্ত্রকারেরা, কবিরা এবং উপন্যাসরচয়িতারা পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়কেই স্বর্গীয় প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় তাদৃশ কোন সম্বন্ধ ঘটিলেই যে মুক্তি-

ফললাভ হয়, ইহা পরম ভাগবতদিগের অভিমত ; দাম্পত্য প্রণয়টী কিরূপ ? ইহা অতি উপাদেয় পদার্থ বটে, কিন্তু উহার প্রধান প্রধান উপাদান কি ?

দাম্পত্যপ্রণয়ের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ দম্পতীর পরস্পর মনোগত আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের একটী হেতু শরীরী জীবের শারীর ধর্ম্মবিশেষ। এটী স্বতঃসিদ্ধ বস্তু—মৌলিক পদার্থ—ইহা অপেক্ষা আর সূক্ষ্মতর কোন মূল পাওয়া যায় না।

আকর্ষণের দ্বিতীয় হেতু সৌন্দর্য্যোপলব্ধি। পত্নী পতিকে এবং পতি পত্নীকে সুন্দর দেখিবে—অপর সকল পুরুষ অপেক্ষা অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখিবে ; প্রণয়ের এই উপাদানটী নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। দেখ পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকের সৌন্দর্য্যাববোধ সমান নয়। সকলের সমান হওয়া দূরে থাকুক, বোধ হয়, কোন দুই জনের সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সর্ব্বতোভাবে এক হয় না। যদি সকল স্ত্রী এবং সকল পুরুষ চিত্রবিদ্যায় পারগ হইত, এবং সকলেই আপনাপন ইচ্ছানুরূপ সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিত, তবে কোন দুইখানি চিত্র অবিকল একরূপ হইত না। সৌন্দর্য্যাববোধের অন্তরে স্নেহ ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মনোভাব সমস্ত গূঢ়রূপে নিহিত থাকে। সুতরাং সৌন্দর্য্যবোধ শক্তিটী প্রাণিমাত্রের স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ঐ শক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতে পৃথক রূপে প্রতীয়মান হয়। মনে কর, যখন তোমার পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তোমার মাতা একটী প্রতিবেশিনীর কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই কামিনী তোমার বাল্যক্রীড়ার সহচরী ছিল। তোমরা দুই জনে বর কন্যা সাজিয়া খেলা করিতে। তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে। ভাবিয়া দেখ, তাহার সেই মুখ খানি, সেই চক্ষু দুইটী, অদ্যাপি তোমার মনে সুন্দর মুখ এবং সুন্দর চক্ষুর আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। ফলকথা, অবস্থা, শিক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতির গুণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এই কথার ও মূল কথা—জগতে কিছুই অসুন্দর নাই। নারায়ণ—বিশ্বব্যাপী এবং লক্ষ্মী—শোভাদেবী—তাঁহার বক্ষঃস্থলোপরি বিরাজিতা। দ্রষ্টার অবস্থাভেদে শোভাদেবীর কোন অঙ্গ—কাহার নয়না কর্ষণ করে, কোন অঙ্গ নয়নাকর্ষণ করে না। কেহ বা তাঁহার সুপ্রসন্ন

কপোলদেশ, কেহ বা তাঁহার আনন্দোদ্দীপক আয়ত লোচন, কেহ বা তাঁহার সুগোল করযুগল, কেহ বা তাঁহার চরণপদ্ম দর্শন করিয়াই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। অসুন্দর পদার্থ কেহই ভাল বাসে না। কিন্তু সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপলব্ধিও কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। পূর্ণ জ্ঞানানন্দ এবং পূর্ণ শোভা অভিন্ন পদার্থ।•

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আকর্ষণের তৃতীয় হেতু অন্যোন্যের গুণোপলব্ধি। সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, গুণের সম্বন্ধেও সেই সকল কথা সঙ্গত। পৃথিবীতে সম্যক্ গুণহীন কেহ নাই। তবে তোমার পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, সেই প্রয়োজন যিনি পূরণ করিতে পারেন—তিনিই তোমার পক্ষে গুণশালী। তুমি তাঁহার গুণই দেখিতে পাও, সেই গুণেরই বশীভূত হও। বস্তুতঃ গুণের উপলব্ধি সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির ন্যায়, মনুষ্যের অবস্থা-ভেদে ভিন্ন হয়। যাহা অবস্থাভেদে ভিন্ন হয়, তাহা অবশ্যই শিক্ষার সাপেক্ষ; সুতরাং মনুষ্যের যত্নের আয়ত্ত। যদি এরূপ হইল, তবে দম্পতীর পরস্পর প্রণয়াকর্ষণের তিনটী হেতুই আমরা ইচ্ছানুরূপ প্রয়োগ করিতে পারি! আমরা একটী কুমার এবং কুমারীকে এমন ভাবে অবস্থাপিত করিতে পারি যে, (১ মতঃ) তাহারা যথাকালে স্বতঃসিদ্ধ শারীর ধর্ম্ম প্রভাবে পরস্পরে সমাকৃষ্ট হইবে; (২ য়তঃ) তাহারা অন্যোন্যের সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিবে, এবং (৩য়তঃ) তাহারা পরস্পর গুণের আতিশয্য এবং উৎকর্ষ অনুভব করিবে।

আমাদিগের মধ্যে যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হইয়া আছে, তাহাতেই দাম্পত্য প্রণয় সঞ্চারিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় আমাদিগের নিজের হাতে আছে। বাপ, মা এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, নিতান্ত নির্ব্বোধ, নীচাশয় অথবা দুষ্ট-প্রকৃতিক না হইলে তাঁহারা অনায়াসেই পুত্র পুত্রবধূ এবং কন্যা জামাতার পরস্পর প্রণয়সঞ্চারের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিতে পারেন। শ্বশুর শাশুড়ী জামাতার প্রতি অনুরাগবদ্ধ হইয়া তাঁহার রূপগুণাদির প্রশংসা করিবেন; বাপ মা, পুত্রবধূর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহসম্পন্ন হইয়া তাঁহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিবেন। ভাল দেখিব মনে করিলেই ভাল দেখা যায়। এইরূপে জামাতৃ কন্যার এবং পুত্র পুত্রবধূর মন পরস্পরের রূপ

গুণ দর্শনে উন্মুখ করিয়া দিতে হইবে। উন্মুখ হইলেই দেখিতে পাইবে, এবং দেখিলেই পরস্পরে আকৃষ্ট, প্রণয়রসে অভিষিক্ত এবং সৌহার্দ্দবন্ধনে সম্বদ্ধ হইবে। এই জন্যই আমাদিগের দেশে দাম্পত্যপ্রণয়টী দুষ্প্রাপ্য বনফল নয়। ইহা বাল্যবিবাহ ক্ষেত্রে যথোচিত কর্ষণ এবং সেচনের ফল! এই জন্যই ইহা এত সরস এবং এত সুমিষ্ট।

'প্রণয় আমাদিগের অনায়ত্ত মনোভাব' ইহা হঠাৎ সবলে আকর্ষণ করিয়া সমস্ত মনোভাণ্ডার বিলুণ্ঠিত করে,—'ভালবাসা স্বাধীনভাব' ইহাকে কেহই ইচ্ছার বশীভূত করিতে পারে না,—এই সকল কথায় যে কত উচ্ছৃ-ঙ্খলতার এবং অনিষ্টাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সকল উপদেশের প্রভাবে কত সুখের ঘর উৎসাদিত, কত পবিত্র আত্মা কলঙ্কিত ও কত সুন্দর বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে! এই সকল মত অনেক দুঃখ এবং দুশ্চরিত্রতার হেতুভূত।

আমার বিবেচনায় ভালবাসা জিনিসটী নরনারীর শিরোভূষণ মুকুট-স্বরূপ। উহা পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কুড়াইয়া পাওয়া যায় না। উহাকে বহু যত্নে গড়াইয়া পরিতে হয়। ভালবাসাটী প্রস্ফুটিত হৃদয়পদ্ম। উহা একেবারে ফাঁপিয়া উঠে না। উহা অতি অল্পে অল্পেই উঠে—আদৌ নাল পরে বৃন্ত, অনন্তর মুকুলভাবে অবস্থিত হয়, এবং পরিশেষে বায়ু সলিল, তাপের সহযোগে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হয়। ভালবাসা পদার্থটী অভীষ্ট দেবতা। গুরু মন্ত্র দিলেই অমনি সিদ্ধিলাভ হয় না। জপ, তপ, ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে ক্রমে মন্ত্র চেতন এবং তপঃ-সিদ্ধি হয়।

আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় লাভ করিবার যত সুবিধা, এমত আর কোন জাতির নাই। যাঁহারা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সুখময়, ধর্ম্মময়, আনন্দময়, দাম্পত্য প্রেমলাভের অধিকারী হইয়াও মায়াবিনী অনুচিকীর্ষা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়েন, তাঁহাদিগের কি বিড়ম্বনা!

তৃতীয় প্রবন্ধ।

—:*::*:—

উদ্বাহ সংস্কার।

আমাদিগের দেশে বিবাহ না করিয়া কেহই থাকে না; তাহাতে দেশের যে প্রকার অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা এস্থলে আমার উচিত নহে। উদ্বাহ-সংস্কার কি জন্য সংস্কার অর্থাৎ পবিত্রতাসম্পাদক হইল, তাহারই কিঞ্চিৎ দেখাইয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

মনুষ্য স্বভাবতঃ স্বার্থপর। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রচল অহং বিন্দু। আপনার চক্ষু খুলিলেই সৃষ্টি, চক্ষু মুদিলেই প্রলয়। আপনার সুখ অসুখ মনুষ্যের মনে যে প্রকার দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়, অন্য কাহার সুখ দুঃখ তেমন হয় না। কোন আত্মীয় ব্যক্তির মর্মান্তিক যাতনা দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায় সত্য, জগৎ শূন্যময় দেখিতে হয় সত্য, কিন্তু নিজের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দীপশিখায় দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ যে প্রকার জ্বালা বোধ হয়, এবং তাহাতে যে প্রকার তাপিত এবং ব্যস্ত হইতে হয়, অন্য কাহার দুঃখে তেমন জ্বালা অথবা তেমন উদ্বেগ সচরাচর অনুভূত হয় না। আমি দেখিয়াছি একজন বন্ধুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রেল-গাড়ীতে আসিতেছিলেন; আসিবার সময় তাঁহার চক্ষুকোণে রেণুপ্রমাণ কয়লার গুঁড়া পড়ে। আসিয়া দেখিলেন বন্ধুর বিয়োগ হইয়াছে; কিন্তু তিনি আপনার চক্ষু ধুইতেই ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবিয়োগযাতনা তৎকালে তাঁহার প্রায় কিছুই অনুভূত হইল না। তাঁহার চক্ষু হইতে যে জল পড়িল, তাহার কারণ বন্ধুবিচ্ছেদ নয়, কয়লার গুঁড়ার জ্বালা।

আমি এস্থলে পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক বীরপুরুষদিগের কথা বলিতেছি না; যাঁহারা স্বেচ্ছাতঃ জলদগ্নি মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখেন, অথবা স্বীয় সৌন্দর্য্যের নমুনা দেখাইবার জন্য স্বহস্তচ্ছিন্ন নিজ বাহুভাগ পাঠাইয়া দেন, কিম্বা দন্ত দ্বারা জিহ্বাগ্র ছেদন করিয়া ফেলেন, অথবা সহাস্য মুখে স্বশরীর ক্রকচ দ্বারা দ্বিধা করিতে দেন, সেই সকল নররূপধারী দেবতার কথা স্বতন্ত্র। সচরাচর যে সকল স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ দেখিতে

পাই, তাহাদিগের শারীরিক সামান্য ক্লেশ মানসিক বিপুল যন্ত্রণা হইতেও গুরুতর হয় বলিয়াই বোধ হয়। ফলকথা, মনুষ্যসাধারণের মধ্যে স্বার্থপরতারই যৎপরোনাস্তি প্রাবল্য। সেই প্রাবল্য উচিত কি অনুচিত, তাহাতে জগতের অপকার অপেক্ষা উপকার অধিক হইতেছে কি না, সে বিষয়ের বিচার করা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু স্বার্থপরতা যতই বলবতী হউক, কোন মনুষ্যই উহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুত সকলেই স্বার্থপরতাকে লজ্জাকর জ্ঞান করেন। লোকসমাজে যে সকল প্রশংসাবাদ প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে তাহার দুই একটী স্মরণ করিলেই এ বিষয়ে মনুষ্যমনের যেরূপ গতি, তাহা কতক বুঝা যাইতে পারে। 'অমুক আপনি না খাইয়া পরকে খাওয়ায়' 'অমুক নিজের দিক কিছুই দেখে না, কেবল হিতচিন্তা করে'—এই সকল কথাতেই বোধ হয় যে স্বার্থশূন্যতা বড়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু ও দিকে দেখা গিয়াছে, স্বার্থপরতা বড়ই প্রবল।

মনুষ্যমনে যখন এই স্ববিসম্বাদী ভাব বিদ্যমান, তখন মনুষ্যের পক্ষে সুখী এবং সন্তুষ্ট হওয়া যে কেমন দুরূহ ব্যাপার তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হইতে পারে। উহা অসাধ্য বলিয়াই বোধ হয়। প্রবল স্বার্থপরতা সর্ব্বদাই আপনার দিকে আকর্ষণ করিবে অথচ সেই আকর্ষণের বশীভূত হইলেই আত্মগ্লানি আসিয়া আবার লাঞ্ছনা করিবে। উভয় দিকেই সঙ্কট।

বিবাহপ্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় দ্বারা মনুষ্যদিগকে ঐ বিষম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ দুই জনে প্রণয় সম্বন্ধ হইলে পরস্পরকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া থাকে, এবং সেই ঔৎসুক্য চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই আপনার স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যায়। উত্তমরূপে পান ভোজন করিতে সকলেরই ইচ্ছা বটে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মসুখের জন্য সেই ইচ্ছার পূরণ করিতে গেলে 'শূয়ার পেটে খাওয়া হয়।' কিন্তু তুমি ভাল করিয়া খাইতেছ, ইহা দেখিয়া আর এক জনের আত্মা পুলকিত হইবে, এমন বুঝিয়া খাইলে আর 'শূয়ার পেটে খাওয়া' হয় না—দেবসেবা হয়। এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর দেহের বেশ বিন্যাসের সময় অতিবাহিত করিতে কোন সহৃদয় ব্যক্তির লজ্জাবোধ না হয়

কিন্তু তুমি প্রিয়তমের আনন্দসম্বর্দ্ধনের অভিলাষে নিজ দেহের যত্ন করিতেছ, এরূপ ভাবিলে আর লজ্জার লেশ মাত্র থাকে না। প্রত্যুত ইহাই বোধ হয় যে, এই দেহের যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা অপেক্ষা কোটী গুণ অধিক না হইলে সেই জীবিতেশ্বরের চরণকমলযুগলে সমর্পণ করিবার যোগ্য হইবে না। ফিট্ ফাট্ করিয়া ফুলবাবু হইয়া থাকিতে কোন্ গম্ভীর প্রকৃতি ব্যক্তির মনে লাগে? কিন্তু আমার হৃদয়ধাম সেই আনন্দময়ীর বিহার ভূমি, এই দেহ তাঁহারই পীঠস্থল, এরূপ মনে হইলে আর অপরিচ্ছন্ন অথবা অশুচি থাকিবার যো থাকে না। ধন ব্যয়ে যত সুখ, ধন রাখায় তত সুখ নাই। ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেই অপরের দুঃখমোচন দেখা যায়, লোকে যশোবিস্তার আরম্ভ করে, ধর্ম্মকার্য্য করিতেছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ধন রাখায় যাচকের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে হয়, লোকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করে, এবং দানধর্ম্মের অনুযায়ী কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া মনে গ্লানি জন্মে। কিন্তু পুত্রকলত্রপরিবার সম্পন্ন ব্যক্তি পাছে তাঁহার সেই অবশ্যপোষ্যেরা দুঃখ পায় এই ভয়ে ভীত হইয়া ব্যয়সঙ্কোচ করেন এবং তাহা করিয়াও আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না।

আপনি খাইব সুখ হইবে আর এক জনের; আপনি পরিব, তুষ্ট হইবে আর একজন; আপনি ধনসঞ্চয় করিব, আর একজনের ভাবী হিতসাধন হইবে, এই ভাবটী বিবাহ-প্রণালী হইতে অতি সহজে এবং সাধারণতঃ জন্মিয়া থাকে। স্বার্থ এবং পরার্থ মিলাইয়া দেওয়া বিবাহ সংস্কারেরই কার্য্য। বিবাহ দ্বারাই স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থের সহিত একীভূত হয়—এই জন্যই বিবাহ অতি প্রধান সংস্কার।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

স্ত্রী-শিক্ষা।

প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দটী থাকাতে এমন মনে হইতে পারে যে আমি বালিকা বিদ্যালয়ের পোষকতার কোন কথা বলিব। বাস্তবিক আমার সে অভিপ্রায় নহে। লোকে আপনাপন পরিণীতা ভার্য্যাকে কিরূপ শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করিবেন, আমি তাহারই কয়েকটী কথামাত্র বলিব।

আমার মতে পৌরাণিক দুইটী আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য স্ত্রীদিগের প্রথম শিক্ষার বিষয়। প্রজাপতি দক্ষরাজের কন্যা সতী এবং গিরিশ্বরাজ হিমালয়ের কন্যা উমা, ভিখারী মহাদেব কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া পিতার ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ সত্ত্বেও স্বয়ং ভিখারিণী হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে দানব নন্দিনী পৌলোমী দেবরাজ ইন্দ্রের গৃহিণী হইয়া যে সময়ে সপ্ত স্বর্গের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার পিতা মাতা ভাই ভগিনী সকলে রসাতলেও নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পান নাই। এই দুইটী বিবরণ হইতে স্ত্রী ইহাই শিখিবেন যে, মা, বাপ, ভগিনী ইহাঁদিগের সম্পদ বা অসম্পদ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। স্বামীর সম্পদেই তাঁহার সম্পদ, স্বামীর অসম্পদেই তাঁহার অসম্পদ। অতএব বাপের বাড়ী কিছুই নয়—শ্বশুর বাড়ীই বাড়ী।

বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক ঐ শিক্ষাটী দিতে হয়। স্ত্রীকে তাঁহার পিত্রালয় অপেক্ষা অধিক সম্মানে রাখিতে হয়, বিলক্ষণ সমাদর এবং যত্ন করিতে হয়। তাঁহার প্রতি যথোচিত গৌরব প্রদর্শন করিতে হয়। বিশেষতঃ অপর কাহার সমক্ষে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটির উল্লেখ করিতে নাই। কোন ত্রুটি দেখিলে অতি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পিত্রালয়ের যত্ন এবং সমাদর পাওয়া সহজ, কিন্তু তথায় সম্মান পাওয়া তত সহজ নয়। অতএব যত্ন ও সমাদর সহকারে সম্মান এবং গৌরব প্রদান করাই নববধূর শ্বশুরালয়ে মন বসাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

স্ত্রীর দ্বিতীয় শিক্ষাও শাস্ত্রমূলক। মনোভূমি জলিয়া থাকিলে তথায় ধর্ম্মাঙ্কুর উদ্গত হইতে পারে না। ধর্ম্মকার্য্য পবিত্র প্রীতিভাজেরই শুভময়

অঙ্কুর। এই জন্যই স্ত্রী স্বামিকৃত ধর্ম্মকর্ম্মের অর্দ্ধ ফলভাগিনী—এই জন্যই 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' শাস্ত্রের বিধি। অতএব সত্য সত্যই স্ত্রীকে আপন কার্য্যের ফলভাগিনী করিতে চেষ্টা পাও। তাঁহার সহিত মন খুলিয়া পরামর্শ করিতে আরম্ভ কর। যৌবনাবস্থায় মনে মনেক নানা মহৎ মহৎ কার্য্যের কল্পনা করিয়া থাক। স্ত্রীর সহিত সেই সকল বিষয়ে কথা কও। সে অশিক্ষিতা বালিকা—ও সকল কথার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, একবার ভ্রমক্রমেও এরূপ মনে করিও না। যাহা মনে আইসে তাহাই বল, যত রাজ উজীর মারিতে চাও, মার। গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, আমেরিকার ইতিহাস পড়িয়া যত বীরত্ব উদারতার উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছ, গল্প কর, দেখিতে পাইবে, সেই অশিক্ষিতা বালিকা তোমার সমস্ত বিবরণের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, বীরদিগের কাজেরও দুই একটী ভুল ধরিয়া দিবে, এবং তোমার মন কি চায়, কোন্ দিকে তোমার বিশেষ অনুরাগ তাহাও নিশ্চয় বুঝিয়া লইয়া আপনার মনকে তোমার অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ হইলে স্ত্রী তোমার লেখা পড়া কাজ কর্ম্মের ব্যাঘাতিকা হইবেন না। প্রত্যুত তোমার মনোমত অনুষ্ঠানের উত্তেজিকা এবং সহায় হইয়া প্রকৃত 'সহধর্ম্মিণী' পদ বাচ্য হইবেন।

কিন্তু উল্লিখিত দুইটী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা মাত্র। মহাগুরু স্বামী স্ত্রীকে যে উপদেশ দিবেন, উহা তাহার মূল মন্ত্র নয়। মূল মন্ত্র এই—ছেলে মেয়ে, বৌ, জামাই, বাড়ী, বাগান, ধন, জন, সকলই তোমার—আমিও তোমার—এসব তোমার বলেই আমার।" প্রাথমিক শিক্ষার সহিত এই শিক্ষার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তথাপি এই মন্ত্র অভ্যস্ত করাইবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিতে হয়। ইহা কেবল মাত্র কথায় বার বার আবৃত্তি করিলেই হয় না। ভুল হইলেই শোধরাইয়া দিতে হয়। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারাও এই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রটী একবার হৃদ্গত হইয়া গেলে অমনি হৃদয়পদ্ম বিকসিত হইয়া উঠে—সেই পদ্মে একটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, এবং শিষ্য সেই দেবতার ধ্যান পূজাতেই নিবিষ্টমনা হইয়া তপঃসিদ্ধি লাভ করে। শিষ্য, গুরু এবং দেবতাকে যথার্থই অভিন্ন দেখিতে পায়।

কিন্তু আবার বলি, এই মন্ত্রটী সামান্য নয়। ইহা পৌরাণিক অথবা বৈদিক মন্ত্র নহে—ইহা সজীব তান্ত্রিক দীক্ষার মন্ত্র। "আমি তোমার, ওরা তোমার বলেই আমার।" যিনি এই মন্ত্র দিবেন, তাঁহার স্বয়ং সিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে সতা সতাই ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অমৃত বাদী শঠতাসম্পন্ন গুরুর মন্ত্র অরিমন্ত্র। উহা দ্বারা দীক্ষার ফল ফলে না। এইজন্য কর্ত্তাভজারা বলে, মানুষ ধর্ত্তে গেলে মর্ত্তে হয়। যদি তুমি কাহাকেও ধরিতে চাও, অর্থাৎ নিতান্ত নিজস্ব করিতে চাও তবে আপনি মর, অর্থাৎ আপনাতে আপনি থেক না, একবারে তাহার হইয়া যাও।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

সতীর ধর্ম্ম।

"কবিগণ কল্পনা শক্তির প্রভাবে নূতন ঘটনা নূতন পদার্থ এবং নূতন পাত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কবি-কল্পিত এমত অনেক ব্যাপার, বিষয় এবং ব্যক্তি আছে, যাহা বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে কোথাও নাই।" এগুলি নিতান্ত মোটা কথা। যাঁহারা কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক কবিদিগের সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন যে, কোন কাব্যের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নূতন সৃষ্টি থাকে না। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা আছে, তাহারই সংযোগ বিয়োগ করিয়া সমুদায় কাব্যসংসার বিরচিত হয়। পক্ষিরাজঘোড়া কবির সৃষ্টি, ব্রহ্মার সৃষ্টি নয়। কিন্তু উটী কি নূতন পদার্থ? বিধাতৃসৃষ্ট ঘোটকের গাত্রে বিধাতৃসৃষ্ট পক্ষীর পক্ষ সংযোজিত করিয়াই কবি পক্ষিরাজ ঘোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র। প্রত্যক্ষের কন্যা স্মৃতি, এবং স্মৃতিই কল্পনার একমাত্র উপজীব্য। অতএব কবি কল্পনা কখনই মূলশূন্য অলীক হইতে পারে না। উহার মধ্যে প্রকৃত বস্তুরই বীজ সমস্ত নিহিত থাকে। অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র, পরম্পরাসম্বন্ধে প্রকৃত ইতি-বৃত্তমূলকই হয়; এবং সেই জন্যই কোন কাব্যপাঠ দ্বারা, যে সময়ে এবং

যে দেশে ঐ কাব্য বিরচিত হইয়াছে, সে সময়ের ও সেই দেশের প্রকৃতির উপলব্ধি হইতে পারে।

আমাদিগের দেশের সকল সময়েরই কাব্যশাস্ত্রে সাধ্বী চরিত্রের পূর্ণাবস্থা বর্ণিত আছে। সাবিত্রী, সতী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি যে সকল নায়িকার বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলের আর কোন দেশের কাব্যে তেমন সকল স্ত্রীলোকের উল্লেখ দেখা যায় না। রাজস্থানের বীরপত্নী এবং বীরপ্রসূতিদিগের সতীত্বগীত অপর সকল দেশের পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত। হীনাবস্থ দুর্ব্বল বঙ্গদেশের কাব্য-বর্ণিত রম্ভা, খুল্লনা, বহুলা প্রভৃতি কামিনী-কুল সতীধর্ম্মের আদর্শ।

অস্মদ্দেশীয় কাব্যের এই ভাব দেখিয়া কি বুঝিতে হইবে? অবশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই দেশ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা সতীকুলের পবিত্র নিবাসভূমি। প্রাচীন দেশাচারও তাহার আর একটী প্রমাণ প্রদান করিতেছে। অপর কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা কি কখন পতির অনুমরণ করিয়াছে? অনুমরণ করা দূরে থাকুক, কখন কি অনুমরণের কথা মনে মনে ভাবিতেও পারিয়াছে? কোন ইংরাজ একটী সহমরণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"পরলোকে বিশ্বাস এই হিন্দুদিগের আছে, আমাদিগের নাই।"

আমি সতী-ধর্ম্মের প্রকৃতি নিরূপণ করিব মনে করিয়া, অনন্যদেশ সাধারণ 'পতিপ্রাণা' এই শব্দটীতেই সাধ্বীর প্রকৃত লক্ষণ পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই শব্দার্থেই সতীধর্ম্মের মূল সংস্থাপিত। 'তিনি গেলে পাছে আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়,' সতীর অন্তঃকরণে এই শঙ্কা চির-বিরাজমান। তাদৃশ ভয়ব্যাকুলা কোন স্ত্রী নিতান্ত অধীরা হইয়া স্বামীকে একদা বলিয়াছিলেন—'আমার দিদি বিধবা, আমার মা বিধবা, আমার পিতামহীও বিধবা হইয়া বাঁচিয়াছিলেন শুনিয়াছি—আমারই বা কপালে কি আছে!' ঐ স্ত্রীরত্নের তাৎকালিক মলিন মুখ চন্দ্রমা স্বামীর হৃদয়াকাশে চির সমুদিত হইয়াই থাকিবে। সেই মলিনতাই সাধ্বীলক্ষণ। 'শান্ত হও—তোমার ও ভয় নাই। দেখ আমাদিগের বংশে ঠিক উহার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে—আমার ঠাকুর মা আগে যান,—ঠাকুরদাদা থাকেন,—মা

আগে যান, বাবা থাকেন—এই বংশের পুরুষেরা দীর্ঘকাল বাঁচেন—তুমিই আগে যাবে আমাকে থাকিতে হইবে'—স্বামীর এবম্বিধ বাক্যে সাধ্বীর ভয় ব্যাকুলতা দূর হইল, মুখমণ্ডলের মলিনতা অপনীত হইল—প্রফুল্লতা জন্মিল। সেই প্রফুল্লতাও সাধ্বীর লক্ষণ।

সতীধর্ম্মের মূলে স্বামীর জীবন সম্বন্ধীয় যে গূঢ় শঙ্কাটী নিহিত থাকে, তাহা অস্মদ্দেশীয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টরূপেই জানিতেন। ভগবান্ বেদব্যাস মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন, অর্জ্জুন নাগকন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণান্তর তাঁহার স্থানে বিদায় লইতে চাহিলে, উলূপী অর্জ্জুনের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিলেন না, নিঃসন্দিগ্ধরূপে অর্জ্জুনের ভদ্রাভদ্র জানিবার একটী উপায় যাচ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন ঐ পতিপ্রাণার গৃহাঙ্গনে একটী দাড়িম্ব বৃক্ষ রোপণ করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে! যত দিন এই বৃক্ষটী সজীব থাকিবে তত দিন আমিও কুশলে থাকিব।" উলূপী অহরহঃ ঐ দাড়িম্ব বৃক্ষে জলসেক করিতেন, এবং চিরদিন তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেন। ইহাই সতীর লক্ষণ।

স্বামী বেঁচে আছেন, ভাল আছেন, সুখে আছেন এটী জানিলে—স্বামী বেঁচে থাকিবেন, ভাল থাকিবেন সুখে থাকিবেন, মনকে এই প্রবোধ দিতে পারিলে—সতীর প্রফুল্লতা জন্মে। স্বামী পাছে না বাঁচেন, না ভাল থাকেন, না সুখী হন, এই ভয়েই সতীর মলিনতা হয়। স্বামীর চিন্তা ভিন্ন সতীর অন্তঃকরণে আর কোন চিন্তাই ব্যাপক কাল স্থান পায় না। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, সতী ধর্ম্মের মূল ঐ প্রগাঢ় চিন্তা, এবং চিন্তা-মূল বলিয়াই সতী-ধর্ম্মের মধ্যে একটী চিরস্থায়ী গাম্ভীর্য্যভাব থাকে। সাধ্বীদিগের আমোদেও নিতান্ত তরলতা প্রকাশ পায় না—তাঁহাদের খুসির ঢলাঢলি হয় না—হাসি উপচিয়া পড়ে না—মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া থাকে এই গাম্ভীর্য্যভাবও একটী সাধ্বীলক্ষণ।

সতী ধর্ম্মের মূলীভূত ঐ প্রগাঢ় চিন্তা হইতে একটী অতি অদ্ভুত কাণ্ড উদ্গত হয়। তাহার নাম সতত স্বামী দর্শন-লালসা। উহা সতীর হৃদয়ে নিরন্তর বিদ্যমান। সতীর মনের ইচ্ছা সর্ব্বদাই স্বামীকে দর্শন করেন। স্বামী চক্ষুর আড় হইলেই তাঁহার জগৎ শূন্য হয়। এরূপ কেন হয়? সতী

ধর্ম্মের মূলীভূত স্বামীর অনিষ্টশঙ্কাই তাঁহার প্রকৃত হেতু। 'তিনি যেমন ছিলেন তেমনি আছেন ত?' এই চিন্তা হইতেই সতীর হৃদয়ে স্বামি-দর্শন কামনা তেমন প্রবল ভাব ধারণ করে। সতীধর্ম্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম—উহার কোন স্থলে কোন প্রকার স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। স্বামী বহির্বাটীতে কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন—তিনি জানিতে পারেন, তাঁহার পতিপ্রাণা পত্নী বাতায়নদ্বার অথবা কবাটের ছিদ্র দিয়া কতবার তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন! স্বামী আবিষ্টমনে কাজ করিতেছেন, অথবা আগ্রহাতিশয় সহকারে পাঁচ জনের সহিত কথা কহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ক্লান্তি জন্মিতেছে—সেই ক্লান্তি তিনি স্বয়ং অনুভব করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার পত্নী অলক্ষ্য স্থান হইতে দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়স্থিত মূর্ত্তির সহিত তাঁহার তাৎকালিক মূর্ত্তির ঈষৎ প্রভেদও জানিতেছেন, এবং তাহা জানিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে কার্য্যের বিরাম হউক,—কথাবার্ত্তা থামুক। যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বে ঐ কার্য্যে বিরত না হয়, ঐ কথাবার্ত্তা স্থগিত না করে, সে নিষ্ঠুর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সতী ধর্ম্মের মূল স্বামীর অনিষ্টশঙ্কা, উহার কাণ্ড নিরন্তর স্বামিদর্শনলালসা। এই কল্পতরুরূপ সতীধর্ম্মের শাখা প্রশাখা অসংখ্য। স্বামীর অনিষ্টশঙ্কা যদিও মূল বটে, তথাপি ঐ মূল অপরাপর বৃক্ষমূলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন থাকে। উহা সতীর হৃদয়কন্দরে পোষিত। কদাচিৎ উহাতে কিঞ্চিন্মাত্র টান পড়িলেই সমুদায় হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। কিন্তু সামান্যতঃ ঐ মূল কেহ দেখিতে পায় না। স্বামী স্বয়ংও বিশেষ সূক্ষ্মদর্শী এবং অনুসন্ধিৎসু না হইলে উহা দেখিতে পান না। তিনি সাক্ষাৎকার বাসনারূপ কাণ্ডটী মাত্র দেখিতে পান—এবং বোধ হয়, ঐ কাণ্ডের প্রকৃত অবয়ব কেবল তাঁহারই দৃষ্টিতে পড়ে। কিন্তু স্বামীর সত্যহানির ভয়, মহিম-হানির ভয়, অর্থহানির ভয় প্রভৃতি সতী-ধর্ম্মের শাখা প্রশাখাগুলি সতীর চিত্তক্ষেত্র ব্যাপিয়া থাকে। অপরেও সেইগুলি দেখিতে পায়। কোন সাধ্বী তাঁহার পুত্রকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—"বাছা! যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করায় ক্ষতি হইল—কিন্তু যখন তিনি বলিয়াছেন, তখন ত করিতেই হইবে—তাঁহার কথা ত মিথ্যা হইবে না।" সতী-পুত্র মাতৃহৃদয়-

স্থিত সত্তাহানির তাররূপ ধর্ম্মশাখাটি দেখিতে পাইল। এইরূপে অন্যান্য শাখাগুলিও সময়বিশেষে অপরের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মবৃক্ষটী আমূলশীর্ষ অতি মনোহরভাবে পল্লবিত। সতীর ক্রিয়াকলাপই ঐ পল্লব—উহা অসংখ্য, বিবিধ, কিন্তু একবর্ণাত্মক। পতি ভিন্ন সতীর দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। সেই দেবতার বিধি-বোধিত পূজার জন্যই তাঁহার যাবৎ ক্রিয়া। গৃহকার্য্যে গমন, স্বহস্তে রন্ধন, স্বয়ং পরিবেশন, দেহে অলঙ্কার-ভার ধারণ, সেই জন্যই তাঁহার সব। যে কার্য্যে স্বামিপূজা নাই, এরূপ কাজ সতীর মনেই আইসে না। মেঘদূতের শেষ ভাগে কালিদাস বিরহ-বিধুরা যক্ষপত্নীর যে ভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনা নহে। যাহা হউক, সতী-ধর্ম্মের মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব দেখা হইল।—উহার পুষ্প কৈ?—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিকটে যাও। যে বাটীতে সাধ্বী স্ত্রীর আবির্ভাব, তথায় দাস দাসী পরিজনবর্গ সকলেই হৃষ্টচিত্ত, কলহপরিশূন্য, নম্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহা সেই পুষ্প-সৌরভ। আরও নিকটে যাও, ছেলেদের সঙ্গে আলাপ কর, তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহারা সরলমনা, ঔদার্য্য-গুণ-সম্পন্ন, পরস্পর ঈর্ষাবিহীন। সতী সন্তানেরা যেন সেই পবিত্র কুক্ষিবাস-বশতঃ সেই কুসুম-সৌরভে সুরভি হইয়া থাকে। আরও নিকটে যাইতে পার কি? অধিকার থাকে ত যাও; মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে, একটু ভয়ও জন্মিবে—কথা বাধবাধ করিবে—কিন্তু ইচ্ছা হইবে আপনার এবং আপনার বলিতে যে যেখানে আছে, সকলের ঐ খানেই স্থির নিবাস হইয়া থাকে। ফিরিয়া আইস—এখন ভাবিয়া দেখ, তোমাতে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না। সংসার, অসার পদার্থ নয়—ধর্ম্ম, কল্পিত ব্যাপার নয়—এই জ্ঞান দৃঢ়তর হইয়াছে কি না? তুমিও সেই পুষ্প সৌরভে বাসিত হইয়া আসিলে।

——(*)——

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

সৌভাগ্যগর্ব্ব।

একবার মনে ভাব, বিধাতা তোমার বশে আসিয়াছেন—তুমি যাহা মনে কর, তাঁহাকে দিয়া তাহাই করাইতে পার। তোমার মনটী কেমন হয়? বিধাতা সব জানেন, সব করিতে পারেন, তাঁহার ইচ্ছাও মঙ্গলময়ী। তুমি তাঁহাকে দিয়া কি করাইয়া লইবে? আপনার হৃদয় তাঁহার হৃদয়ের সহিত অভিন্ন করিয়া রাখিবে? শুদ্ধ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবে? তাহা ত পাইবেই—কিন্তু ক্রমশঃ। যতদিন নির্ব্বাণ না হয় কদাপি চিনি হইব ভাবিয়া তৃপ্ত হইতে পারিবে না। অবশ্যই চিনি খাইবার ইচ্ছা থাকিবে। বিধাতাকে দিয়া যদি দুই একটী ফরমাইস খাটাইবার মানস না হয়, তবে তুমি মানুষ নও। যতদিন অহং বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিবে, তত দিন ফরমাইস খাটান চাই।

শাস্ত্রকারেরা প্রণয়কে দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এক ত্বদীয়তা, অপর মদীয়তা। 'আমি তোমার' এই ভাবটী ত্বদীয়তা, 'তুমি আমার' এই বোধটী মদীয়তা। প্রকৃতিভেদে কাহার ত্বদীয়তা কাহার বা মদীয়তাভাব প্রবল দেখা যায়। বাস্তবিক বিশুদ্ধ ত্বদীয়তা, অথবা বিশুদ্ধ মদীয়তা কোথাও জন্মিতে পারে না। পতিপ্রাণা, পতিদেবতা, সাধ্বী স্ত্রীর অন্তঃকরণে ত্বদীয়তা ভাব যার পর নাই প্রবল বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শন করিলে উহার অন্তর্ভূত মদীয়তা ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনিও বিধাতাকে দিয়া ফরমাইস খাটাইতে ভাল বাসেন। দেবতা যে তাঁহার তপস্যার আয়ত্ত হইয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং অন্যকে ঐ তপঃসিদ্ধি দেখাইতে তাঁহারও ইচ্ছা হইয়া থাকে।

ত্বদীয়তা ভাবের অন্তর্ভূত এই মদীয়তা ভাবটীর নাম সৌভাগ্যগর্ব্ব। 'গর্ব্ব' এই কুৎসিত শব্দটী শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিও না। এ গর্ব্বটী ভাল

গর্ব্ব—যে ইহাকে খর্ব্ব করিতে চায়, সে স্ত্রীজাতির পাতকী হয়। যে স্ত্রীর সৌভাগ গর্ব্ব নাই, তাঁহার স্ত্রীজন্মই বৃথা। তাঁহার রূপ গুণ কিছুই কিছু নয়। তিনি আপনাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া মনে করেন। যে ধর্ম্ম-শীলার সৌভাগ্য গর্ব্ব জন্মিতে পায় নাই, জগদীশ্বর তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিয়াছেন। তিনি জীবন্মৃতা। পুণ্য করিলেই যে ইহলোকে সুখভোগ হয় না, তাদৃশ স্ত্রীলোকের জীবনবৃত্তই তাহার সম্যক্ উদাহরণ। যে পতিপরায়ণার সৌভাগ গর্ব্ব নাই, তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হয় নাই—তাঁহার জীবনবৃক্ষের ফল ফলে নাই—তিনিই যথার্থ বন্ধ্যা।

অতএব সৌভাগ্যগর্ব্ব জন্মিতে দাও। বিধাতা ফরমাইস্ খাটীতে স্বীকার করুন। তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার কার্য্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বিধাতাকে যে ফরমাইস্ খাটাইতে পায়, সে বিধাতার ইচ্ছার অনুকূল বই কদাপি প্রতিকূল ফরমাইস্ করিতে পারে না। যাহা তাঁহার নিজের মনোমত তাঁহার উপর এরূপ অনুজ্ঞাই হইবে, যাহা তাঁহার মনোমত না হয়, এমন অনুজ্ঞা হইবে না।

সাধ্বী স্ত্রীদিগের সৌভাগ্য গর্ব্বটী বড়ই অপূর্ব্ব পদার্থ। তাঁহাদিগের এই মদীয়তার অন্তর্ভূত অতি প্রবলতর ত্বদীয়তা ভাব বিদ্যমান থাকে। তাঁহার মনটী আমি এত বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি মুখ দিয়া বলিতে না বলিতে আমি তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি, তাঁহার মনের কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইলে আমার যেমন সুখ হয়, এমন সুখ আর কিছুতেই হয় না।" ফলতঃ বিধাতার উপর ফরমাইস্ বিধাতার ইচ্ছার অনুকূল ভিন্ন সেই ইচ্ছার প্রতিকূল হইতে পারে না। যদি কিছুমাত্র প্রতিকূল হইল সন্দেহ হয়, তবে আর ক্ষোভের পরিসীমা থাকে না। এখনও তাঁহার মন বুঝিতে পারিলাম না, তবে কি করিলাম? কি হইল?

কোন পতিপরায়ণা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "তুমি সাংসারিক সকল বিষয়েই আমাকে জিজ্ঞাসা কর, এবং আমি যাহা বলি প্রায় তাহাই কর—না করিলে পাছে আমার দুঃখ হয়, এই জন্যই ওরূপ কর কি?" "যদি তাহাই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি?—সে ত ভালই।" "ভাল বটে, কিন্তু তাহা ভাবিলে আমার মনে সুখ হয় না। আমার কথায় তোমার

নিজের যাহা ইচ্ছা নয়, তাহা করা হইতেছে মনে হইলে—আমার না থাকাই ভাল, বোধ হয়"। বড় শক্ত কথা হইল। ঐ কথার পর স্বামী কয়েকটী সাদা কাগজ বাঁধিয়া এক খানি বহি প্রস্তুত করিলেন, এবং স্ত্রীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, ঐ বহিতে আপনার অভিমত মগ্রে লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসার পর স্ত্রী নিজমত প্রকাশ করিলে স্বামী ঐ পুস্তকে কি কি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা দেখাইতেন। কয়েক মাস এইরূপে গেল। স্বামী অনেক গুলি গৃহকার্য্যের চিন্তা হইতে একেবারে অবসর পাইলেন। বিধাতা সৃষ্টি পালনের ভার কাহার প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। কিন্তু সুভগা স্ত্রীর পতি সংসারের অনেক ভার পত্নীর প্রতি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বিধাতা কাহার বশীভূত হন না বলিয়াই তাঁহার ঐ দুঃখ। সুভগা স্ত্রীর স্বামী বিধাতা অপেক্ষাও সুখী হইতে পারেন।

সৌভাগ্য গর্ব্বের মধ্যে আর এক প্রকারে হৃদীয়তা ভাব অনুস্যূত দেখা যায়। "তিনি আমাকে ভাল বাসেন ভাবিয়া আমি এত সুখী হই—ইহা জানিলে তাঁহার সন্তোষ হইবে, অতএব জানাইব।" এটীও একটী বিচিত্র মনোভাব। কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"আজি অমুকের বিবাহ—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহাদিগের বাটীতে যাইতে হইবে।" "এত দায় কি?—যাবার ইচ্ছা না থাকে, যেও না" "না গেলে তাহার মা দুঃখ করিবেন—তিনি আমাকে বই আর কাহাকেও দিয়া হাই-আমলা বাটাইতে চাহেন না।" এ কথার তাৎপর্য্য কি? স্ত্রীলোকেরা সুভগাকে দিয়া হাই আমলা বাটায়। তিনি স্বামীকে জানাইলেন যে, তাঁহাকে সকলে সুভগা মনে করে, এবং তাহাতে তাঁহার পরম সুখ হয়। অপর কোন সময়ে ঐ স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—"আজি ঘাটে অমুকের মাকে দেখিলাম—তেমন যে রূপ একেবারে কালিহাড়া হইয়া গিয়াছে। কেন এমন হলে? জিজ্ঞাসা করিলে বলিল "আর দিদি! একটু পায়ের ধূলা ত দিলে না।" "ও কথা কেন বলিল?—তাৎপর্য্য কি?" "সে কথায় কাজ নাই—তার স্বামীর দোষ জন্মিয়াছে, তাই ও কথা বলিল।" ইহার তাৎপর্য্য এই, তোমার আদরেই আমার এত গৌরব।

ফলতঃ সাধ্বীদিগের 'সৌভাগ্যগর্ব্ব' বর্দ্ধিত করিতে ভয় পাইও না—তাহাতে কোন হানি নাই, অনেক লাভ আছে—এবং তাহা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বদীয়তা এবং মদীয়তা ভাব কাপড়ের টানা পড়েনের ন্যায় এমনি পরস্পর বানুস্যূত যে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লওয়া নিতান্ত অসাধ্য। ত্বদীয়তার অন্তর্ভূত মদীয়তা এবং সেই মদীয়তার অন্তর্ভূত ত্বদীয়তা দেখা গিয়াছে। শেষের ঐ ত্বদীয়তার ভিতরেও আবার মদীয়তা এবং সেই মদীয়তার অন্তরেও ত্বদীয়তা দেখা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ-চিত্ত স্ত্রী পুরুষের দুইটী হৃদয় দুই খানি নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থিত—এ উহার এবং ও ইহার অন্তর্ভূত ভাব সকল গ্রহণ করিয়া নিরন্তর অশেষ বার প্রতিভাত করিতে থাকে।

সপ্তম প্রবন্ধ।

দম্পতী-কলহ।

উপন্যাস, আখ্যায়িকা, পুরাণাদি পাঠে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ প্রকার কোন গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিবার সময় আমার অনেকবার এরূপ বোধ হইয়াছে যে, যদি ঐ সকল গ্রন্থে রোগাদি কষ্টকর ব্যাপারের সামান্য বর্ণনও থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল গ্রন্থ আমাদিগের অধিকতর উপকারে আসিত। কারণ, উপন্যাসাদির নায়ক নায়িকা, এমন কি, ঐ সকল গ্রন্থের অপ্রধান পাত্রেরাও যেন চিরসুস্থ শরীর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোন দেশের কোন কাব্যে কাহার অম্বল খাইবার উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর কয় জন লোক ঐ নরকযাতনা ভোগ না করিয়াছে? এইরূপ কতকগুলি কারণে কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের অবস্থা, মনুষ্য সাধারণের প্রকৃত অবস্থা হইতে ভিন্নভাব ধারণ করিয়া থাকে। উহা গ্রন্থকারের মনঃকল্পিত কৃত্রিম পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, এবং আমাদিগের কার্য্যকলাপের প্রতি তাহার দৃষ্টান্তের প্রভাব অল্পতর হইয়া পড়ে।

গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে ওরূপ মনঃকল্পিত কৃত্রিম পদার্থের বর্ণন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য এই প্রবন্ধে গৃহস্থাশ্রমের একটী সাধারণ কষ্টকর ব্যাপারের উল্লেখ করিব। স্ত্রী পুরুষে কলহ হইয়া থাকে। উভয়ের পক্ষেই ঐ কলহ বিলক্ষণ কষ্টকর। কিন্তু যতই কষ্টকর হউক, উহার সংঘটন নিতান্ত অসাধারণ ব্যাপার নহে। প্রত্যুত, উহা অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আমার বিবেচনায় মনুষ্য দম্পতীর মধ্যে কলহ হইবেই হইবে।

যাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় এবং ঘনিষ্ঠতা, তাঁহাদের মধ্যেও বিবাদ না হইয়া চলে না, ইহার কারণ কি?—তাহার কারণ ঐ প্রণয় এবং ঘনিষ্ঠতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরস্পর প্রীতিসম্পন্ন দম্পতী সর্ব্বতোভাবে অভিন্নহৃদয় হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইহলোকে

সম্যক্ অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইয়া উঠে না, এবং তাহা হইয়া উঠে না বলিয়াই অভিমান এবং উদ্বেগের উদয় হইয়া কলহের সূত্রপাত করে। "এই বিষয়টিতে আমার এইরূপ অভিমত; কিন্তু তাঁহার ওরূপ যদি এই বিষয়েই মতভেদ হইল, তবে ত অমুক বিষয়ে মতভেদ হইবেই? এবং তাহা হইলে ঐ অমুক বিষয়েই বা কি জন্য মতভেদ না হইবে?—তবেই আমার মনের গতি হইতে তাঁহার মনের গতি ভিন্ন প্রকার—তবে আর ভালবাসা কৈ? যদি ভাল বাসাই নাই, তবে আর জীবনে ফল কি?" দম্পতী কলহের অন্তরে এই প্রকার একটি অপূর্ব্ব বিচারপ্রণালী নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া থাকে।

ঐ বিচার প্রণালীতে কল্পনা-বায়ুর প্রভাব বশতঃ এত দুরভিসন্ধি ও গূঢ়াভিসন্ধির বিচিত্র লহরীলীলার সৃষ্টি হয় যে, তদ্দর্শনে দ্রষ্টৃবর্গের যৎপরোনাস্তি আমোদ জন্মে। দম্পতীর কলহ অপর সকলেরই চিত্ত-রঞ্জক। এত চিত্তরঞ্জক যে, কেহ কেহ কৌশলপূর্ব্বক কলহ বাধাইয়া দিয়া তামাসা দেখিতে ভাল বাসেন। কিন্তু অন্যে যতই উপহাসাস্পদ জ্ঞান করুক, দম্পতীর কলহ দম্পতীর নিজের পক্ষে যৎপরোনাস্তি কষ্ট-কর ব্যাপার। বিবাদটী যতক্ষণ থাকে, তাহাদিগের মনে আপন আপন জীবনকে এমত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান হয় যে, সে সময়ের মধ্যে আত্মহত্যা করাও নিতান্ত অসম্ভব নহে। রক্ষা এই, দম্পতী কলহ প্রায়ই অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়। সৃষ্টিনাশক বজ্রাগ্নি চকিতের ন্যায় থাকিয়াই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঐ অগ্নি স্থায়ী ভাব পাইলে বিশ্বসংসার দগ্ধ হইয়া যাইত।

আমার বিবেচনায় ঐ আগুনটি উঠায় কোন দোষ নাই। কারণ উহা উঠিবার প্রয়োজন আছে। যেমন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট দুইটী মেঘের মধ্যে তাড়িতের ইতরবিশেষ থাকিলেই বৈদ্যুতাগ্নি নিঃসৃত হয়; এবং নিঃসৃত হইয়া মেঘ দুইটীর তাড়িত-সামঞ্জস্য বিধান করে, স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও সেই প্রকার অভিমতির কিছুমাত্র অনৈক্য থাকিলেই কলহাগ্নি উদ্রিক্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মনের একতা সম্পাদিত হয়। তুমি আমি এখনও ভিন্নহৃদয় আছি কেন? এখনও একমনা হই-

নাই কেন? অবশ্যই একাত্মতা প্রাপ্ত হইতে হইবে, এই ভাবটী দম্পতী কলহের অন্তর্নিহিত। সুতরাং দম্পতীকলহও দম্পতীপ্রণয়ের পরিচায়ক এবং ঐ প্রণয়ের দৃঢ়তাসাধক।

এই জন্য স্ত্রী পুরুষে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা প্রায়ই কেহ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। যতক্ষণ বিবাদ থাকে, ততক্ষণই কথা কাটাকাটি চলে। যদি একজন চুপ করিয়া থাকিলেন, অথবা স্থানান্তরে গমনের চেষ্টা করিলেন, তাহা হইলে অপরের ক্রোধ শান্ত না হইয়া শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠে। কিন্তু বিবাদের কথা পাছে গুরুজনের কর্ণে উঠে অতএব এখন তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিব না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া যদি একজন চুপ করেন অথবা স্থানান্তর যান তাহাতে অধিক দোষ হয় না। কিন্তু যথাসময়ে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের কথাগুলা উঠাইও—একেবারে ছাড়া ভাল নয়। কিন্তু অধিক স্থলেই পূর্ব্বের কথাটা তুলিলেই যিনি দোষী তাঁহার লজ্জা বোধ হয়। লজ্জা দেখা দিলে আর বাড়াইতে নাই। বিবদমান দুই জনের মধ্যে যিনি চুপ করিলেন, অথবা স্থানত্যাগ করিলেন, অপরের বিবেচনায় তিনি আপন মনের দ্বার রুদ্ধ করিলেন, তিনি অভিন্নহৃদয় হইবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিলেন না, তিনি কেবল আপন মতটি বজায় রাখিবার জন্যই বিবাদ করিতেছেন, তিনি স্বৈরাচারী স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, তাঁহার মনে যথার্থ ভালবাসা নাই।

এই জন্য অপর সকল বিবাদের স্থলে যদিও এক জনের মৌনাবলম্বন সৎপরামর্শ—কারণ তাহাতে বিবাদ মিটিবার উপক্রম হয়—কিন্তু দম্পতীকলহে মৌনাবলম্বন সৎপরামর্শ নয়। তাহাতে কলহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে—অথবা বাহিরে নিবিয়া অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্তভূমি দগ্ধ করিয়া ফেলে। অপর সকল বিবাদে এক জনের স্থান ত্যাগ করা ভাল। দম্পতীকলহে স্থানত্যাগ প্রকাণ্ড অপমানজনক বলিয়া বোধ হয়। যে যে স্থলে দম্পতীকলহ আত্মহত্যায় পরিণত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই একজনের কলহক্ষেত্র পরিত্যাগ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকিয়া সম্মুখসংগ্রাম করাই এখানকার বিধি। যদি সম্মুখসংগ্রামে মরিতে পার, তবে দেখিতে পাইবে, শাস্ত্রকারেরা মিথ্যা কথা

বলেন নাই—সময়ে প্রাণ ত্যাগ করিলে সাক্ষাৎ স্বর্গলাভ হয়। বিবাদটি মিটিয়া গেলে, অভিন্নহৃদয়তা সাধিত হইলে. কালবৈশাখীর মেঘ, ঝড়, জল ছাড়িলে তাড়িতের সামঞ্জস্যবিধান হইয়া গেলে, কেমন সুবিমল শোভা, কেমন অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নতা জন্মে। দম্পতী কলহের এই চরম ফলটী বড়ই মধুর।

সুবোধ, দান্তস্বভাব পুরুষের কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ চরম ফলটী শীঘ্র ফলে, তাহার নিমিত্ত যত্ন করেন। বিবাদ হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বিবাদটি যেন শীঘ্র মিটীয়া যায়—কোন মতে ব্যাপককাল স্থায়ী হইতে না পায়। প্রণয়ক্ষীরসিন্ধুমন্থনোদ্ভূত কলহ কালকূট মহাদেবই পান করিতে পারেন, শীঘ্রই পান করুন, নচেৎ সিন্ধু শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কেহ কেহ বিবাদ মিটাইবার উদ্দেশে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করেন। তদ্দ্বারা স্থলবিশেষে উদ্দেশ্যসাধন হয়—বড় আগুনে ছোট আগুন নিভে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এই প্রণালী অবিশুদ্ধ। ইহাতে দম্পতী কলহের প্রকৃত প্রয়োজন যে অভিন্নহৃদয়তাসাধন তাহা কিছুমাত্র হয় না। অপর, কেহ কেহ আহারাদি করেন না, কিম্বা মাথা খুঁড়েন, অথবা অপরাপর প্রকারে আপনার শরীরকে ক্লেশ দেন। এ উপায়েও কলহ শান্তি হয়—খুব সত্বরেই হয়। কিন্তু এটিও বিশুদ্ধ উপায় নহে। ইহা আসুরিক ভেষজ সেবনের ন্যায় আশু ফলোপধায়ক, কিন্তু আভ্যন্তরিক তেজোহানির কারণ। ঐ প্রকার দুষ্ট উপায় বারবার অবলম্বন করিলে অভিন্নহৃদয়তা সাধনের কথা দূরে থাকুক, মূল প্রণয় গ্রন্থি পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়ে। মহাদেব রুদ্রমূর্ত্তিতে কালকূট পান করেন নাই—শিবমূর্ত্তিতেই করিয়াছিলেন।

আমার বিবেচনায় দম্পতী কলহের প্রকৃত শুভ ফল লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি রক্ষা করা বিধেয় ;—

(১) আপনাদিগের মতভেদ অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না।

(২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না।

(৩) যদি কোন অর্ব্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আমল দিও না।

(৪) হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিও না। দম্পতী কলহে যে হারি মানে, সেই জিতে।

(৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, অনন্যকর্ম্মা হইয়া থাকিও। সংসার উৎসন্ন হউক, সৃষ্টি রহিয়া যাউক, যতক্ষণ বিবাদ ভঞ্জন না হইবে, ততক্ষণ কোন কাজই করা হইতে পারে না, অপর কাহার সহিত কথা কহা হইতে পারে না, খাওয়া হইতে পারে না, ঘুমান হইতে পারে না—বিশেষতঃ ঘুমানটী কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

উল্লিখিত পাঁচটি নিয়মই অতি গুরুতর, বিশেষতঃ পঞ্চম নিয়মটী এবং তাহার শেষ ভাগের কথাটী—সকল নিয়মের সার নিয়ম। এইগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলে দম্পতীর মধ্যে কলহ অল্প হয়; যখন হয়, তখন স্বল্পকাল মাত্র থাকে, এবং নিবৃত্তিতে অন্তঃকরণ সরল এবং সুখে আপ্লুত হয়। দম্পতী কলহের পরিসমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা হৃদয়ের সরলতার লক্ষণ—দুই চারিবার বিদ্যুৎ প্রকাশের পরেই বৃষ্টি—জগতী হয় শীতল।

—(*)—

অষ্টম প্রবন্ধ।

লজ্জাশীলতা।

লজ্জাশীলতাটী বড়ই মিষ্ট জিনিস। উহাতে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য শত গুণে বর্দ্ধিত এবং অসুন্দরীর অসৌন্দর্য্য সহস্র মাত্রায় তিরোহিত হয়। লজ্জাশীলতাটী মনুষ্যের ধর্ম্ম—পশুর ধর্ম্ম নয়। আমার বিবেচনায় মনুষ্যের প্রকৃতিতে পশুধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুভূত হইলেই লজ্জার উদ্রেক হয়। যদি কাহাকেও হাঁস্ হাঁস্ করিয়া খাইতে দেখি, তবে আপনাদের মনে একটু লজ্জার উদ্রেক হয়। যিনি সেরূপে খাইতেছেন, তিনিও তাহা বুঝিতে পারিলে স্বয়ং লজ্জিত হইয়া থাকেন। যদি কোন নব নারীর নয়নে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তবে শুদ্ধাত্মার চিত্তে লজ্জার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যদি কেহ চিৎপাত হইয়া ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়া অপরের একটু সলজ্জ হাসি আইসে, এবং তিনি নিদ্রা হইতে উঠিলে যদি তাঁহাকে বলা যায়, তোমার নাক বেশ ডাকিতেছিল, তিনিও বিলক্ষণ লজ্জাযুক্ত হয়েন।

এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, পাশব ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে ঘৃণা, তাহাই লজ্জার মূল কারণ। যে মনুষ্যসমাজ যত দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সুশীল ও সভ্য হইবার জন্য যত্নশীল, সেই সমাজের মধ্যে লজ্জার তত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বন্যদশাপন্ন লোকেরা উলঙ্গ হইয়া থাকিতে, কুকুর শিয়ালের মত বৃহৎ বৃহৎ গ্রাস তুলিয়া খাইতে, ষাঁড়ের মত নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে এবং পশুদিগের ন্যায় ব্যাপার নিরত হইতে, সঙ্কুচিত হয় না। ইউরোপীয় ছোট লোকেরাও অত্যন্ত পশুধর্ম্মপ্রবণ। ফলতঃ লোকে কেমন সকল বিষয়ের কথায় আমোদ করে, কেমন অশ্লীল শব্দ সকলের অসঙ্কোচে ব্যবহার করে, ইহা দেখিলেই তাহাদিগের মধ্যে দিব্যভাবের কি পশুভাবের আধিক্য হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

নিসর্গতঃ স্ত্রীলোকদিগের মনে পশুভাব অপেক্ষা দিব্যভাবের আধিক্য এই জন্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লজ্জানুভব করেন। শরীরের বস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্র অপসারিত হইয়া গেলে, ভোজনের সময় অপর কেহ দেখিলে, ভোজনপাত্র নোঙরা হইলে, আহারের জন্য কাহার স্থানে কিছু চাহিতে হইলে, আপনাদের মধ্যে কেহ খুব হাঁ করিয়া মুখ নাড়িয়া দন্তের মাড়ি বাহির করিয়া খাইতেছে দেখিলে, কথোপকথনে একটী মাত্র কদর্য্য ভাবের শব্দ শুনিলে, হাসির গড়রা উঠিলে, তাঁহারা লজ্জিত, ক্ষুভিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া যান। উহাঁদিগের মধ্যে যদি কেহ ঐ সকল কার্য্যে বিরক্ত বা লজ্জাযুক্ত না হয়েন, প্রত্যুত তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দিব্য প্রকৃতির বিকৃতি এবং অধঃপতনের সূচনা হয় মাত্র। যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের একত্র সমাবেশ, সকল সময়েই একত্র বসিয়া বাক্যালাপ, একত্র পান ভোজন, একত্র পর্য্যটন, সে সমাজে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র কিছু অকোমল, কিছু দিব্যভাববর্জ্জিত এবং অধিকতর পরিমাণে পশুভাবসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য তাদৃশ সামাজিক রীতি সম্যক্ নির্দ্দোষ বলিয়া আমার বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন বটে যে, তাদৃশ সমাজে স্ত্রীলোকদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রব নিবন্ধন পুরুষদিগের স্বভাব কিছু কোমল এবং পবিত্র হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব অকোমল এবং বিকৃত হওয়ায় যত দোষ, পুরুষস্বভাব কোমল হওয়ায় গুণ ততটা কি? কিন্তু যতই বলা যাউক, ভাবা যাউক, এবং সাবধান হওয়া যাউক, মনুষ্য কোন দেশে কোন কালে সর্ব্বতোভাবে দিব্যভাবসম্পন্ন এবং সম্যক্ প্রকারে পশুভাব বর্জ্জিত হইতে পারে না। প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থপতির অট্টালিকা সৃষ্টির ন্যায়, তালার উপর তালা। নীচে যে বস্তু সৃষ্ট, তাহারই উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করাইয়া উপরের বস্তু সৃষ্ট হয়। খনিজ দ্রব্যের যে সকল গুণ,—সেই সকল গুণের পরিণামেই উদ্ভিদ—উদ্ভিদের যে সকল গুণ, তাহারই পরিণামে প্রাণী—এবং অপরাপর প্রাণীতে যে যে ধর্ম্ম—সেই সকল ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট পরিপাকে মনুষ্য ধর্ম্ম। এই জন্য মানুষ সর্ব্বতোভাবে পশুধর্ম্মপরিশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। ভোজন, নিদ্রা, অন্তর্মলত্যাগ, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য না করিলে জীবন রক্ষা এবং

হ্রংশ রক্ষা হয় না। অথচ সেই কার্য্যগুলি পশুধর্ম্মিক—উন্নত দিব্যভাবের বিরুদ্ধ এবং সেই জন্য লজ্জাপ্রদ।

মানবের মনে এইরূপ ভাববৈপরীত্য হইতে যে কষ্টানুভূতি হয়, তাহা নিবারণের নিমিত্ত বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের আর্য্যসমাজের নিয়ন্তৃগণ যে অত্যুন্নত ও মহত্ত্বাবসম্পন্ন ছিলেন, তদনুযায়ী ব্যবস্থার বিধান করিয়া আমাদিগকে দেবভাবের তেজস্বিতা, পশুভাবের দৌর্ব্বল্য এবং লজ্জাদুঃখ নিবারণের উপায় সাধন করিয়া গিয়াছেন। সকল ব্যাপারের অন্তর্ভূত যে একটি অত্যুদার মহান্ ভাব আছে, তাঁহাদের পবিত্র আত্মা সেই ব্রহ্মভাবেই ওতপ্রোতরূপে পরিষিক্ত ছিল। তাঁহারা প্রাণিমাত্রের ভক্ষ্য গ্রহণ, নিদ্রাগমন এবং সন্তানোৎপত্তি ক্রিয়াতে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং চিত্রক্ষেত্রে তাদৃশ ঈশ্বরাধিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াই ঐ সকল অবশ্য করণীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি, ভোজনাদি ক্রিয়াতে কি অত্যদ্ভুত ব্যাপার সমস্ত নিয়ত নির্ব্বাহিত হইয়া যাইতেছে! তুমি খাইতেছ ভাত, মাছ, রুটি, লাইন—সেগুলি তোমার শরীরে পরিণত হইয়া হইতেছে বল, বুদ্ধি, চৈতন্য। 'অন্নং ব্রহ্ম—অন্নোবৈ প্রজাপতিঃ'। তুমি শয্যায় শুইয়া ঘুমাইতেছ—তোমার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই—কিন্তু তুমি যখন নিদ্রা হইতে উঠিলে, একেবারে চৈতন্যময়—এবং "সুখমহং স্বাপসম্' জ্ঞানে আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াই উঠিলে! সন্তানোৎপাদনে তুমি নিজের "প্রাজাপত্য" শক্তি অনুভব করিলে, 'বিষ্ণুর' স্মরণ করিলে, তোমার যে সন্তান জন্মিবে, তাহার চরিত্র অতি পবিত্র এবং উদার হইবার উপায় বিধান করিলে—পত্নীকেও সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা জীব-জননী বলিয়া জানিলে।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা এইরূপে পশুধর্ম্মের অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মভাবের আবিষ্কৃতি করিয়া পাশব কার্য্যগুলির পাশবত্ব মোচন করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে এরূপ হয় নাই। সেখানকার লোকদিগের ধর্ম্মচর্য্যা এবং জীবনচর্য্যা পরস্পর পৃথগ্‌ভূত। তাঁহারা ধর্ম্মভাবের অধীন হইয়া সকল কাজ করিতে চাহেন না—ওরূপ করাকে যাজক-তন্ত্রতা বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু

উহাঁরাও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ পশুধর্ম্মগুলির উপর একটী আবরণ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উহাঁরা ভোজন ক্রিয়াটাকে কেবল জঠরজ্বালা নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ না রাখিয়া উহাকে আলাপ পরিচয়ের, আমোদের এবং সুসামাজিকতার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। উহাঁরা পান ভোজনের সহিত স্ত্রী পুরুষ একত্র কথোপকথন এবং নৃত্য গীত বাদ্যের আমোদ বিমিশ্রিত করিয়া ভোজনক্ষেত্রটিকে কেমন রমণীয় করিয়া লইয়াছেন। উহাঁরা শয়নাদি ব্যাপারের পাশব ভাব তত প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা পান নাই। কারণ শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে উহাঁদিগের মধ্যে অনেকেরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তীব্র সুরাপানের অভ্যাস প্রবর্ত্তিত থাকায়, তত্তৎকালে পাশবধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া একেবারে লজ্জার তিরোধান হইয়া যায়।

ফলতঃকথা, আর্য্য প্রণালীতে ধর্ম্মভাবের আধিক্য, ইউরোপীয় প্রণালীতে ভোগ সুখের আধিক্য। আর্য্যপ্রণালীতে স্ত্রী, দেবী। ইউরোপীয় প্রণালীতে স্ত্রী, সখী এবং সহচরী। "আজিকার নিমন্ত্রণে যে স্ত্রীলোকেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের শব্দ অনেকবার বাহির বাটী পর্য্যন্ত শুনা গিয়াছিল"। * * "কে বল দেখি"? * * "কেমন করিয়া জানিব" "ও সেই সুকুমারী—যে চলিলে পায়ের শব্দ হইত না— মুখ তুলিয়া কথা কহিত না—যাহার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়া থাকিত, ও সেই সুকুমারী, আহা বাছার দোষ কি? স্বামী উহাকে ইংরাজদের সহিত কথা কহাইয়াছে তাহাদের সাম্‌নে গান করাইয়াছে—আপনার সঙ্গে মদ পর্য্যন্ত খাওয়াইয়াছে—আর কি ওর লজ্জা রাখিয়াছে? তাই অত গলা হইয়াছে, ধরণ ধারণ সব বদল হইয়া গিয়াছে।"

—-•—

নবম প্রবন্ধ।

—————•••—————

গৃহিণীপনা।

গৃহিণীপনা দুই প্রকার। এক, কর্ত্তৃত্ববিহীন—অপর, কর্ত্তৃত্বসমন্বিত। যে স্থলে গৃহিণী, কর্ত্তার অনুমতি পাইয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সে স্থলে কর্ত্তৃত্ববিহীন গৃহিণীপনা বলা যায়, যে স্থলে গৃহিণী, কর্ত্তার মন বুঝিয়া আপনি বিবেচনাপূর্ব্বক গৃহকার্য্য সম্পাদন করেন, সেইখানে কর্ত্তৃত্বসমন্বিত গৃহিণীপন দৃষ্ট হয়। আমি সকর্ত্তৃত্ব গৃহিণীপনারই বিশিষ্ট সমাদর করিয়া থাকি। অপর প্রকার গৃহিণীর কার্য্যে তাদৃশ কোন গৌরবই নাই—উহা অনুজ্ঞাপালন মাত্র।

আমার বন্ধুবর্গ আমাকে গৃহকার্য্যে উদাসীনবৎ দেখিয়াছেন, এবং তাহা দেখিয়াছেন এবং সেই কথা বলিয়াছেন বলিয়াই আমি মনে মনে শ্লাঘা করি যে, আমি সংসারের কর্ত্তৃত্ব নিতান্ত মন্দ করি নাই। আমার পত্নী গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার 'হাতেই সব,' আমার হস্তে কখন এক কড়া কড়িও থাকিত না। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি স্বয়ং আমাকে গৃহকার্য্যে নিতান্ত উদাসীন মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, গৃহকার্য্যের মূলসূত্রগুলি আমারই স্থানে শিখিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তথাপ ঐ সূত্রের বৃত্তিবিরচন এবং সূত্রানুযায়ী সমস্ত পদসাধন তিনি নিজেই যে করিয়া লইতেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার গৃহিণীপনা সর্ব্বতোভাবে সকর্ত্তৃত্ব গৃহিণীপনাই ছিল।

আমার বিবেচনায় যাঁহারা সংসারাশ্রমে থাকিয়া ঐ আশ্রম কিরূপে জ্ঞান এবং ধর্ম্মবৃদ্ধির উপযোগী হইতে পারে, তাহার কোন চিন্তাই করেন, না, তাঁহারা দোষভাগী। আবার আমার ইহাও বোধ হয় যে, যাঁহারা উন্নত-বুদ্ধি এবং উচ্চাভিলাষী হইয়াও কেবল সংসারের খুটিনাটির চিন্তা তেই সেই বুদ্ধি এবং সেই অভিলাষের পর্য্যবসান করেন, তাঁহারাও দোষ ভাগী। স্ত্রী কি ভগিনী আছেন, তিনি, গৃহস্থালীর যাবতীয় ব্যাপার-

নির্ব্বাহ করিবেন, আমি ভাল খাইব. ভাল খাওয়াইব, মনের সুখে বহি পড়িব, এবং বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ করিব, সংসারের কিছুই দেখিব না, ভাবিব না, অকুলান পড়ে টাকা ধার করিয়া দিব—যাহারা এরূপ করিয়া চলে আমি এমন লোকও দেখিয়াছি। আবার, ঘর প্রস্তুত হইতেছে, স্বয়ং বসিয়া তাহার ছাদ পেটায় এবং বাটীর উঠানে খাওরা কাটি পড়িয়া আছে, দেখিলেই আপনি কুড়াইয়া রাখে, এবং অনেকগুলি কাটি জড় হইলে একগাছি খাওরা বাঁধায়, এ প্রকার লোকও দেখিয়াছি। আমার মতে ঐ দুই প্রকার লোকের কোন প্রকার লোকই সংসারাশ্রমের প্রকৃত পথের অনুবর্ত্তী নহেন—প্রকৃত পথ ঐ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী—সম্পূর্ণ অনবধানতাও নহে, সম্পূর্ণ অনৌদার্য্যও নহে। মনুষ্যের চক্ষু মনুষ্যেরই কার্য্যের উপযুক্ত। উহা দূরবীক্ষণ হইলেও দোষ—অনুবীক্ষণ হইলেও দোষ। গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহিণীকে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবেন—উদ্দেশ্য স্থির করিয়া দিবেন—আর কিছুই করিবেন না। ঔদার্য্য রক্ষা করিতে গিয়া সতর্কতা ত্যাগ করিতে নাই—সতর্ক হইতে গিয়া নীচ হইয়া পাড়তেও নাই।

কিন্তু ইহাও বলি, বরং কিয়ৎপরিমাণে অনবধান হওয়া ভাল. তথাপি নিতান্ত নীচাশয় হইয়া স্বহস্তে সমুদায় খুটি নাটি করা ভাল নয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি তুমিই সংসারের বিষয় স্বয়ং দেখিলে এবং চিন্তা করিলে, তবে তোমার স্ত্রী আর কি করিবেন? শুদ্ধ খেয়ে খেলিয়ে সময় কাটাইবেন? তাহাতে ত তাঁহার বুদ্ধি খুলিবে না—নিজচিত্তজ্ঞতা এবং পরচিত্তজ্ঞতা জন্মিবে না—মন বড় হইবে না। তিনি একটী স্বার্থপর, আদুরে ক্রীড়া সামগ্রী মাত্র হইয়া থাকিবেন। কাজে বুদ্ধি খুলে—বুদ্ধি স্বয়ং প্রথম হইতে কাজ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব পত্নীর হস্তে গৃহকার্য্যের ভার যত দেওয়া যাইতে পারে ততই দেওয়া বিধেয়। তাহা দিলে তুমি নিজে অনেক অবসর পাইতে পারিবে, এবং তাঁহাকেও মানুষ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু গৃহকার্য্য স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং একেবারে উদাসীন হইলে ঐ ব্যবস্থার সমগ্র শুভ ফল ফলে না। নিতান্ত ঔদাসীন্য তাঁহার প্রতি অনাদররূপে প্রতীয়মান হয়। শুদ্ধ প্রতীয়মান হয়, এমত নহে, কালে প্রকৃত অনাদরেই পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার মন গৃহকার্য্যে রহিল, তিনি পৃথিবীতে পা

দিয়া সকল মাটি মাড়াইয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলেন। তুমি হয় ত জগতের হিতচিন্তা অথবা পৃথিবীর ধর্ম্ম-সংস্করণ. এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ব্যোমযান যোগে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে উঠিলে। তোমাদিগের ত আর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবার উপায় থাকিল না। অতএব ঘরের কাজ স্ত্রীর হাতে ফেলিয়া দেও, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত গৃহকার্য্যের কথা কহ। তাহা করিলে দেখিতে পাইবে যে, সামান্য গৃহকার্য্যের অভ্যন্তরে অতি প্রশস্ত ভাব সমস্ত নিহিত থাকে। শুদ্ধ ব্যোমযানে উঠিলেই যে জগতের চমৎকারিত্ব অনুভব করা যায় এমত নহে। যে নিয়মের প্রভূত বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্ব সাধন করিয়াছে, শিশিরবিন্দুর গোলত্ব সাধনেও সেই নিয়মের সমগ্র বল লাগিয়াছে। ব্যাস. বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস হোমর, সেক্‌সপিয়ার, কাণ্ট, কপিল, ও কোম্‌ত, জীবনযাত্রার যে সকল মহৎ সূত্রের আবিষ্কার এবং বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই গৃহকার্য্যের সম্বন্ধে গৃহিণীর মুখ হইতে শুনিতে পাইবে। যদি না পাও, তবে তুমি ঐ দার্শনিক এবং কবি-শ্রেষ্ঠদিগের নাম মাত্র শুনিয়াছ, অথবা তাঁহাদিগের গ্রন্থের পাত উল্টাইয়াছ মাত্র—ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাঁহারা তোমার শরীরে আবির্ভূত হন নাই।

দশম প্রবন্ধ।

গহনা গড়ান।

গহনার উপর কাহার কাহার বড়ই রাগ দেখিতে পাই। গহনায় টাকা বদ্ধ হইয়া থাকে—টাকা বদ্ধ করা অর্থশাস্ত্রের বিধি নয়। গহনাতে টাকার লোক্‌সান হয়—টাকা লোক্‌সান করা গৃহস্থধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার। গহনার দিকে মন পড়িলে নিজের সাজ করিতেই দিন ফুরাইয়া যায়—গৃহস্থালীর কর্ম্মে বিশৃঙ্খলতা ঘটিতে পারে। গহনা পরার নেসা জন্মিলে প্রকৃতি লঘু হইবার সম্ভাবনা। গহনার বিরুদ্ধে এবম্বিধ অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অলঙ্কারনিবারিণী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের মুখে আমি ঐ প্রকার অনেকগুলি কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম মহাশয়ের কথাগুলি বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, কেহই ঐ সকল যুক্তির অনুসারে কাজ করে না। দেখুন, এমন যে "সর্ব্বগুণাদর্শ" ইংরাজ জাতি ইহাঁদিগের মধ্যেও অর্থশাস্ত্রের নিয়মটী রক্ষা পায় না! কোন কোন ইংলণ্ডীয় জমীদার এবং মহাজনের ঘরে ১০।১২ মণ রূপার প্লেট থাকে। ইউরোপীয় বিবিদিগের মধ্যেও এক্ষণে গহনা পরার সাধ বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ তাঁহারা যেরূপ গহনা পরিতে ভাল বাসেন, তাহাতে টাকার লোক্‌সান অধিক হয়। তাঁহাদিগের গহনায় সোণা রূপা অপেক্ষা হীরা মুক্তাই অধিক থাকে। সোণা রূপার গহনা যত টাকায় গড়ান যায় তাহার সিকি বাদ দিয়াই বিক্রয় করা যাইতে পারে। হীরা মুক্তার গহনা বিক্রয় করিতে গেলে কখন কখন অর্দ্ধেক টাকারও অধিক লোক্‌সান করিতে হয়। গহনার সাজ করিতে অনেক সময় যায় বলিতেছেন, কিন্তু কয়েকখানি সোণা রূপার গহনা পরিতে আমাদিগের পরিজন বর্গের যে সময় যায়—বিবিদিগের কাপড়ের, রঙ্গের, পৌডারের সাজ করিতে তাহার শত গুণ অধিক সময় লাগে। আর গহনার নেসায় প্রকৃতির লঘুতা হয় যে বলিলেন, তাহা গহনার দোষ নয়, তাহা নেসা মাত্রেরই দোষ। গহনা

যে উদ্দেশ্যে পরা হয়, প্রকৃতির লঘুতা বা উদারতা সেই উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। যে স্ত্রীলোক গহনা পরে তাহারই প্রকৃতি লঘু, এরূপ বিবেচনা পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন মহামূর্খেরাই করিয়া থাকে।

অলঙ্কারনিবারিণী সভার সভ্যমহাশয় নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন। অনুমান করি, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সভা যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছেন সে কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত সহজ নয়। ইংরাজী বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ দেশময় বিস্তৃত হইলেও তাঁহার সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি অবশ্যই মনে মনে মানিয়া থাকিবেন যে, অশিক্ষিতা বঙ্গমহিলারাই অলঙ্কার প্রিয় নহে। তাহারা কালক্রমে বিবি হইয়া উঠিলে অলঙ্কারনিবারিণী সভার কাজ বাড়িবে বই কমিবে না।

আমি সামান্য গৃহস্থ লোক। প্রথমাবস্থায় আমার মাসিক আয় দেড় শত টাকার অধিক ছিল না, কখন অধিক হইবে এমন মনেও করি নাই। আমি সেই সময় হইতে স্থির করিয়াছিলাম যে, আমার পরিবার মিতব্যয়িতা না শিখিলে আমার ভদ্রস্থতা নাই। এই ভাবিয়া আমি তাঁহার হস্তে মাসিক বেতনের টাকা গুলি দিয়া বলিতাম, "আমি যাহা উপার্জ্জন করি, সকলই তোমার। যাহাতে আমরা ভাল থাকি এরূপ আহার, আবাস পরিধেয় তুমি দিবে, অসময়ের নিমিত্ত কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। আর তোমার অলঙ্কার নাই—তাহাও কিছু কিছু প্রস্তুত করিতে হইবে।" * * *। "না না তাহা নয়। আমার বন্ধুবর্গ অনেকেই সম্পন্ন লোক। তাঁহাদিগের বাটীতে নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে যাওয়া আবশ্যক হইবে। নিতান্ত দুঃখিনীর মত গেলে আমার সুখ হইবে না। অতএব কিছু কিছু বাঁচাইয়া গহনা গড়াইতে হইবে।"

ঐ কথার পর কিছু দিন গেল। আমাদের খাওয়ার পরার কোন কষ্ট নাই। বন্ধুবর্গ আমাদের বাটীতে আসিলে ভোজনাদি করিয়া বলেন, "তোমার বাটীতে রন্ধনের বড় পারিপাট্য—আহার করিয়া এত তৃপ্তি আর কোথাও হয় না।" ছেলেদের পীড়া হইলে সাহেব ডাক্তার আনাইয়াই দেখাইতে পারি। প্রায় প্রতি মাসেই কিছু কিছু সেভিংস্ বেঙ্কেও যায়। আমার সমান আয়বান আর কাহার বাটীতে ওরূপ হয় দেখিতে পাই না।

অন্যের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইলে দেখি, দ্রব্যাদি পাতে যথেষ্ট নষ্ট হয়, অথবা ভাণ্ডারে বাঁচে। আমার বাটীর ভোজে কিছুই নষ্ট হয় না, এবং প্রায় কিছুই বাঁচে না, ঠিক ঠাক হয়। অন্যের বাটীতে পীড়া উপস্থিত হইলে "অত ভিজিট দিয়া কেমন করিয়া ডাক্তার আনা যাইবে" এরূপ ভাবনার কথা শুনিতে পাই, আমার বাটীতে কখন ওরূপ কথা শুনিতে পাই না, ওরূপ কথা দূরে থাকুক, বরং জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় কাহার পীড়ার সংবাদ পাইলে তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হই। প্রথম তিন চারি বৎসর মধ্যে কয়েকখানি গহনাও প্রস্তুত হইয়াছিল।

আমার বিবেচনায় ঐ গহনায় যে টাকা বদ্ধ হইল, তাহা ব্যয়িত হইলে আমার যে উপকার হইত, তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক উপকার হইয়াছিল। একটি ভাল পাচিকা, একটি পাকা মুহুরী, একটি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রাখিতে হইলে আমার যে মাহিনা লাগিত—ঐ গহনা গুলিতে তাহা অপেক্ষা অধিক লাগে নাই। অধিকন্তু লাভ এই, স্ত্রী হিসাব পত্র করিতে শিখিলেন, দ্রব্যসামগ্রীর দর দাম করিতে জানিলেন, ব্রাহ্মণ এবং প্রীতিভোজের ফর্দ্দ করিতে পারিলেন, এবং সর্ব্ব বিষয়েই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। আরও লাভ হইল, আমি পারিবারিক চিন্তা হইতে অনেক অবসর পাইলাম, এবং প্রথমজাত পুত্রটির লেখা পড়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে পারিলাম। আমি ঐ সময়ে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম। সেই বহিগুলি বিক্রীত হওয়ায় আমি এ পর্য্যন্ত যত টাকা পাইয়াছি, তাহার হিসাব করিলে আমার স্ত্রী যে কয়েকখানি গহনা গড়াইয়াছিলেন, তাহার দশ গুণেরও অধিক হইতে পারে।

আমার অর্থাগম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল—গহনা গড়ানও চলিল। নূতন রকমের ভাল গহনা দেখিলেই সেইরূপ গড়ান হয়। কিছুদিন এরূপ হইলে আর গহনা গড়াইয়া তৃপ্তিবোধ হয় না। আবাসবাটী সুন্দর হওয়া চাই—গৃহ সজ্জা ভাল হওয়া চাই, গৃহস্থালীর দ্রব্যজাত পরিমাণে অধিক এবং প্রকারে বিচিত্র হওয়া চাই। ক্রমে সম্ভবরূপ তাহাও হইতে লাগিল। গহনা গড়ান প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। নিজের অলঙ্কারপ্রিয়তা সাধারণ

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয়, আমার মত অনেক গৃহস্থের ঘরে এত অধিক এবং এত প্রকার গৃহোপকরণ নাই।

এ অবস্থাতেও গহনা গড়ান চলিল। নিজের নিমিত্ত বড় একটা নয়—অন্যের গহনা গড়াইয়া দিতে বড়ই আমোদ। সুখ সরোবর পূর্ণ হইয়া আশে পাশে উপচিয়া পড়িতে লাগিল। "অমুক তোমার আত্মীয়, তাহার আরও এত—সেদিন তাহার স্ত্রীকে দেখিলাম, তাহার অমুক গহনাটী আছে, অমুকটি নাই, এটী তাহাকে গড়াইয়া দিব। প্রথমে এত টাকা লাগিবে, তাহা নিজ হইতে দিব—সে মাসে মাসে এত করিয়া দিলেই এত মাসে শোধ যাইবে।" "তাহাকে ঋণগ্রস্ত করিয়া লাভ?" "আমার লাভ কিছুই নাই—তাহার লাভ আছে। আমার ধার তাহাকে শুধিতেই হইবে—সুতরাং বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। ওর ত যত্র আয়, তত্র ব্যয়—এখন প্রায় কিছুই থাকে না।" * * * "অমুককে তুমি ভালবাস—সেও তোমার বাধ্য। কিন্তু তার মা মাগি বৌটীকে দেখিতে পারে না—গহনা পত্র কিছুই দেয় না। আমি এক ফিকির করিয়াছি—বৌকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছি—আমি দিলে আর তার মা কোন কথা বলিতে পারিবে না। সেও মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া আমার ধার শুধিবে;" * * * অমুকের সব ভাল, কিন্তু মদ খাওয়া দোষটা ছাড়াইতে পারিলে ভাল হয়। বৌকে গহনা গড়াইয়া দি—ধার শুধিতে টাকা ফুরাইয়া যাইবে—আর মদ খাইতে পারিবে না।"

এই প্রকার কথা প্রায় শুনিতাম। একদিন ঐরূপ কথা হইয়াছে, এমত সময়ে সুরাপান নিবারিনী সভার কোন সভ্য মহাশয়ের সন্দর্শন পাইয়া তাঁহাকে অলঙ্কারনিবারিণী সভার উদ্দেশ্য জানাইলাম এবং আমার স্ত্রী গহনা গড়াইয়া যে প্রকারে মদ্যপান নিবারণ করিতে চান, তাহারও গল্প করিলাম। সুরাপাননিবারিণীর সভ্য মহাশয় বলিলেন, এক্ষণে যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তা বর্দ্ধিত করাই শ্রেয়স্কর কার্য্য।

আমার বিবেচনায় গহনা গড়ান এমন দুষ্কর্ম্ম নহে যে, উহাকে নিবারণ

করিতে হয়। উহাতে উপকার বই অপকার হইবার সম্ভাবনা অধিক নহে। আমার মতে গহনার জন্য কচ্‌কচি করাই বড় দোষ। স্ত্রী স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া গহনা গড়াইবেন, ইহা ভাল নয়। তিনি গহনা পরিলে তুমি সুখী হইবে. তিনি যেন এই জন্যেই গহনা গড়াইতে চান। ঐ ভাবে গহনা গড়াইলে মিতব্যয়িতা, গৃহকার্য্যে দক্ষতা, শোভাপ্রিয়তা, এবং পরহিতে চিন্তা জন্মিবে, গৃহে লক্ষ্মী থাকিবে, অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত ফলই ফলিবে।

গহনা গড়ান সম্বন্ধে কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরও আর একরূপ বিষম ভ্রম আছে, দেখিয়াছি। আমার এক জন আত্মীয় একটী ভাল চাকুরী করিতেন। তিনি সেই চাকুরিটী ছাড়িয়া দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিয়া যাহা কিছু মূলধন পূর্ব্বে সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া আপনার স্ত্রীর কয়েকখানি গহনা গড়াইয়া দিলেন। ও সময়ে ওরূপ করিলেন কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "আমি চাকুরী ছাড়িলাম বটে কিন্তু স্ত্রীর যাহা প্রাপ্য, তাহা ত তাহাকে পাইতে হইবে।" আমি কিছুই বলিলাম না, কিন্তু মনে মনে তিনটী কেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। "যখন চাকরি ছাড়িলে তখন স্ত্রীর মত করিয়া ছাড়িলে না কেন? গহনা স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য হইল কেন? তাহাকে গহনা পাইতে হইবেই কেন?" তিনি আপন পত্নীর মনের ভাব কিরূপ বুঝিয়াছিলেন—অথবা তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাবের আরোপ করিয়াছিলেন?—"তোমারই চাকুরী গিয়াছে, আমার ত যায় নাই"—এইরূপ ভাব না বুঝিলে আর ওরূপ কথা এবং ওরূপ কাজ হয় না।

———১০———

একাদশ প্রবন্ধ।

কুটুম্বতা

আমাদিগের কুটুম্বতা কাণ্ডটী বড়ই জটিল। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক না চলিতে পারিলে ঐ জটিলতানিবন্ধন যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। কুটুম্বতা কাণ্ডটি অত জটিল বলিয়া আজি কালি অনেকে কুটুম্বতার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু আমার মতে কুটুম্বতার ব্যবহার অনাদরের বস্তু নহে। বাহিরের লোকের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, কুটম্বতা তাহার সর্ব্ব প্রধান। বাহিরের লোকে তোমাকে কেমন চক্ষে দেখে, তাহা জানিবার উৎকৃষ্ট উপায় তোমার কুটুম্ববর্গ। কারণ বাহিরের লোক তোমাকে যেমন চক্ষে দেখে, কুটুম্বেরাও তোমাকে প্রায় তেমনি চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

কুটুম্বেরা যদি আর কিছুতেই তোমার সহিত সমহৃদয় না হন, তথাপি একটী বিষয়ে তাঁহাদিগের সমহৃদয়তা থাকিবেই থাকিবে। কুটুম্বেরা কুটুম্বের গৌরব খুঁজেন। জামাই, বেহাই, শ্বশুর, শ্যালক ইহাঁরা বড় লোক, পাঁচ জনে ইহাঁদিগকে জানে শুনে, এরূপ বলিতে এবং মনে করিতে সকলেরই সুখ বোধ হয়। কুটুম্ব সভা-উজ্জ্বল হইলেই মুখ উজ্জ্বল হইল। কুটুম্বকে ছোটলোক মনে করিতে হইলে আত্যন্তিক দুঃখ জন্মে।

কুটুম্বদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় তাঁহাদিগকে সম্ভবমত আপনার খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং গৌরবের অংশভাগী করা। তুমি যে বড় কাজটী করিবে, তাহা একাকী হইয়া করিও না, তাহাতে আপনার কুটুম্ববর্গের সহায়তা এবং পরামর্শ প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিবে? ঘটক কুলীনকে কিছু দিবে? দুর্গোৎসব কিম্বা শিবপ্রতিষ্ঠা করিবে? কুটুম্ববর্গের সহিত অগ্রে পরামর্শ করিয়া ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যাহাতে খ্যাতি এবং মহিমার অর্জ্জন হয়, এমন কাজ কুটুম্বদিগের নিরপেক্ষ হইয়া করিও না। সাংসারিক সামান্য কার্য্যের পরামর্শে কুটুম্বদিগকে আহ্বান করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুটুম্বের চক্ষে ছোট লোক হইলে তোমার কুটুম্বেরা সত্য সত্যই কষ্ট পান।

কুটুম্বেরা বড় বড় তত্ত্ব চান বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সে প্রবাদ অমূলক নয়। কিন্তু বড় বড় তত্ত্ব চাহিবার হেতু কুটুম্বের অর্থলোভ নহে, তোমারই গৌরবের প্রতি মমতা মাত্র। তত্ত্বের দ্রব্যাদি আসিলে তাঁহারা কি সমুদায় আত্মসাৎ করেন, না, প্রতিবেশিবর্গের বাটী বাটী বণ্টন করিয়া দেন? বণ্টন করিবার সময় তাঁহারা কি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কখন কখন স্ব স্ব ব্যয়ে ঐ দ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন না। এগুলি কি লোভের কার্য্য?

ফলতঃ কুটুম্বকে ধনলুব্ধ জ্ঞান করা নীচাশয়তার চিহ্ন। কুটুম্বেরা তোমার খ্যাতি এবং গৌরব বৃদ্ধির লোভ করেন বটে, কিন্তু তোমার ধনের প্রতি তাঁহাদিগের লোভ নাই। কলিকাতা অঞ্চলের কোন কোন ব্যক্তি তত্ত্ব দেওয়া এবং তত্ত্ব লওয়ার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তত্ত্বের দ্রব্যাদি বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কুটুম্বতার যথার্থ ভাবটী বুঝেন না। আবার কোন কোন পল্লী-গ্রামবাসী কুটুম্ব দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে তাহার মূল্য ধরিয়া টাকা পাঠাইয়া দেন। ইহাঁরাও কুটুম্বতার যথার্থ প্রকৃতি বুঝেন না।

যাঁহারা কুটুম্বতার সুখভোগ এবং ঐ সম্বন্ধের শিক্ষা লাভ করিতে চান আমি তাঁহাদিগকে একটী সামান্য পরামর্শ দিতেছি। যদি তোমার অর্থ-সংস্থান অধিক না থাকে, এবং মিতব্যয়িতা রক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে বার মাসে তের তত্ত্ব করিবার যে প্রথা আছে, তাহা পরিহার কর। বৎসরের মধ্যে যত বার তোমার সুবিধা হয়, তত বার মাত্র তত্ত্ব কর। কিন্তু যখন করিবে তখন ভাল করিয়াই কর। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে, কুটুম্বেরা সন্তুষ্ট থাকিবেন। আবার বলি—শত বার বলি—কুটুম্বকে অর্থলোভী জ্ঞান করিও না। তিনি তোমার গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত হইতে চাহেন, ইহাই মনে করিয়া কাজ কর। এটী কুটুম্বের দোষ, না গুণ? যিনি দোষ মনে করেন, তিনি নিতান্ত কৃপণ,—তিনি টাকার পুঁটুলি গলায় বাঁধিয়া মরুন। যিনি গুণ মনে করেন, তিনি কুটুম্বতা করিয়া বাহ্য সংসারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে এবং সুসামাজিক হইতে শিখুন।

কুটুম্বতা হইতে অহঙ্কারপরিশূন্য বিনীত সামাজিক ব্যবহারের শিক্ষা লাভ হয়। যিনি কুটুম্বতার মূল প্রকৃতিটা না বুঝেন, তিনিই কুটুম্বের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন। দেখ, যাহা তুমি আমি একমালিতে অধিকার করিয়া আছি, তাহা কদাপি পরস্পরকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় না—যাহা একমালির নয়, এমন বিষয়ই অন্যকে দেখাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং কিছু দেখাইতে গেলেই তাহা যে একমালির নয় এই কথা প্রকারান্তরে বলা হয়। অতএব যদি কুটুম্বের নিকট সাহঙ্কার ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ আপনার ধন, গৌরব, খ্যাতি, মহিমা, কুটুম্বকে দেখাইলে, তাহা হইলেই তাঁহাকে এক প্রকারে বলা হইল যে, যাহা দেখাইতেছি, তাহাতে তোমার অধিকার নাই—তাহা আমার নিজস্ব। এরূপ করিলেই কুটুম্বকে তাঁহার অধিকার হইতে ভ্রষ্ট করা হইল, এবং তাঁহার বিরাগের হেতু জন্মিল। কুটুম্ব তোমার গৌরবের অংশভাগী—তাঁহাকে তাঁহার অংশে বঞ্চিত করিতে নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে, যেমন এক পক্ষে কুটুম্বের সমীপে নীচ হইতে নাই, তেমনি পক্ষান্তরে কুটুম্বের নিকট অহঙ্কার করিতেও নাই। এইরূপ দুই দিক বজায় রাখিয়া চলিতে হয় বলিয়াই কুটুম্বতার ব্যবহার যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হয়। কুটুম্বেরাই সুসামাজিক হইতে শিখান। নিজ পরিবার হইতে ঐ শিক্ষালাভ হয় না। প্রণয়াস্পদ বন্ধুবর্গ হইতেও ঐ শিক্ষালাভ হয় না। কুটুম্বেরা এরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়াই এত সমাদর এবং গৌরবের বস্তু।

কোন কোন অশিক্ষিত দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি কুটুম্বতার যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করিয়াও কুটুম্বতার ব্যবহারে প্রকৃত পথের অনুসরণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কুটুম্বদিগের মধ্যে মনে মনে দুইটি দল করিয়া লন। ঐ দুই দলের মধ্যে এক দলের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার করেন, অপরের নিকট বিনীত এবং বিনম্র থাকেন। ইহাঁদিগের চক্ষে কন্যা সম্প্রদাতা কুটুম্বগণ এক দলস্থ, আর কন্যাগ্রহীতা কুটুম্বগণ অপর দলসভুক্ত। ইহাঁরা প্রথম দলের পীড়ন এবং দ্বিতীয় দলের খোসামোদ করেন। এরূপ করাতে যে সামাজিকতার কোন শিক্ষাই হয় না, প্রত্যুত স্বার্থপরতা এবং দুষ্ট চারিটী দুষ্প্রবৃত্তিরই প্রাবল্য হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ব্যবহারের বিষম ফল

গৃহাভ্যন্তরেও কলিত হইয়া উঠে—বধূ এবং কন্যাগণের মধ্যে পরস্পর প্রবলতর ঈর্ষ্যার সূত্রপাত হইয়া যায়।

গৃহকর্ত্রী যদি সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহা হইলে কুটুম্বদিগের মধ্যে ঐ প্রকার দলভেদ এবং কন্যাবধূদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ নিবারণ করিতে পারেন। তিনি কন্যার শ্বশুরের যে প্রকার সমাদর করেন, পুত্রের শ্বশুরেরও সেইরূপ করিয়া থাকেন। মনে কর, কোন গৃহস্থের তিনটী কন্যার এবং একটী পুত্রের বিবাহ হইয়াছে; গৃহকর্ত্রী সুবোধ, তিনি আপন বৈবাহিক চতুষ্টয়ের এইরূপে নাম করণ করিলেন। বড় মেয়ের শ্বশুর বড় বেহাই, মেজো মেয়ের শ্বশুর মেজো বেহাই। কিন্তু পুত্র বধূটীর বয়স তাঁহার তৃতীয় কন্যার অপেক্ষা অধিক, অতএব পুত্রবধূকে সেজ মেয়ের স্থানীয় করিয়া তাঁহার পিতাকে সেজ বেহাই করিলেন। ছোট মেয়ের শ্বশুর ছোট বেহাই রহিলেন। এই ক্ষুদ্র উপায়টী বিলক্ষণ কার্য্যকারী হইল। পুত্রবধূর পিতা কন্যাদিগের শ্বশুরসম্প্রদায় মধ্যেই রহিলেন—ভিন্ন দলসম্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন না। ঐ গৃহকর্ত্রী যখন কুটুম্বদিগের বাটীতে তত্ত্ব পাঠাইতেন, তখন, কন্যাগণের বাটীতেও যেরূপ পুত্রের শ্বশুরালয়েও অবিকল সেই রূপ পাঠাইতেন। তিনি কন্যাগুলির শাশুড়ীদিগকেও পূজোপলক্ষে যেমন বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন, পুত্রবধূর মাতাকেও সেইরূপ দিতেন। তিনি "বৌয়ের বাপ," "বৌয়ের মা," এই দুইটী কথা মুখে আনিতেন না। তাঁহাদিগের উল্লেখ করিতে হইলে "সেজ বেহাই" "সেজ বেহানী" বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।

এইরূপ ছোট ছোট বিষয় লইয়াই গৃহস্থের সংসার ধর্ম্ম। এইরূপ ছোট ছোট কাজেই গার্হস্থ্যাশ্রমের শিক্ষা। যে ছোট কাজটীর উল্লেখ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে কতটা বিবেচনা, কতটা উদারতা আছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হয়।

——•••——

দ্বাদশ প্রবন্ধ।

জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাতি শব্দটী এক্ষণে অনেক স্থলে শত্রুবোধক হইয়াছে। অমুক আমার সহিত জ্ঞাতির ব্যবহার করিলেন, এ কথা বলিলে অমুক আমার প্রতি শত্রুর ব্যবহার করিলেন, ইহাই বুঝা যায়। কেহ কেহ পরিহাস পূর্ব্বক উদাহরণ দিয়াও বলেন, "দেখ, অনুজ সহোদর সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জ্ঞাতি। কিন্তু উহাঁর কার্য্য কি কি? উনি গর্ভস্থ হইয়াই জ্যেষ্ঠকে শ্রীভ্রষ্ট করেন, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতৃস্তন্য এবং মাতৃক্রোড় কাড়িয়া লন, অনন্তর পিতৃ-স্নেহেও ভাগ বসান এবং পরিশেষে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশে বঞ্চিত করেন—ওরূপ পরম শত্রু আর কে আছে?"

কিন্তু জ্ঞাতি শব্দ সর্ব্বকালই এরূপ ভাবার্থ প্রকাশ করিত না। যখন সমাজ বৃহদাকার ধারণ করে নাই, রাজতন্ত্রতা প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হয় নাই, জনগণ স্ব স্ব গোত্রস্বামীর অধীন হইয়াই থাকিত, সেই সময়ে জ্ঞাতি ভিন্ন অপর কেহই সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন এবং মিত্রতার পাত্র হইতে পারিত না। তখন জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ শুদ্ধ জন্মসম্বন্ধ বুঝাইত না। উহাতে প্রকৃত বন্ধুতা এবং মমতাই বুঝাইত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাতিগণ পরম বন্ধুই হইতে পারেন। জ্ঞাতি-দিগের মধ্যে পরস্পর সমহৃদয়তার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। বংশ মর্য্যাদার রক্ষা এবং সেই মর্য্যাদার সম্বর্দ্ধন জ্ঞাতিমাত্রেরই অভিপ্রেত। তুমিও যে পূর্ব্বপুরুষের সম্মান কর যাঁহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাও, যাঁহাদিগের নাম করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান কর, তোমার জ্ঞাতিরাও সেই পূর্ব্বপুরুষের সম্মান এবং সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতে চান, এবং তাঁহাদিগেরই নামে আপনারা পরিচিত হন।

যখন জ্ঞাতিদিগের মধ্যে সমহৃদয়তার এমন দেদীপ্যমান কারণ রহিয়াছে, তখন তাঁহাদিগকে লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইতে

পারে না। স্বয়ং কিঞ্চিৎ অভিমানশূন্য হইতে হয়; পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হয় এবং জ্ঞাতিদিগের সহিত ব্যবহারকালে পূর্ব্বপুরুষের নজির উল্লেখ করিয়া কাজ করিতে হয়। এরূপ করিলে জ্ঞাতিদিগের অন্তঃকরণে প্রতিযোগিতা ভাবের উদ্রেক হয় না. তোমার, সহিত তাঁহাদিগের যে প্রধান বিষয়টিতে একতা আছে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ হইতে থাকে, এবং তুমি অনায়াসেই তাঁহাদিগের অনুরাগ এবং সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পার। জ্ঞাতিদিগের সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র পর্য্যালোচন কর, এবং আপনার ক্রিয়া কলাপে তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারী করিয়া সেই পূর্ব্বপুরুষগণেরই পূজা করিতে থাক।

কালভেদে রীতি নীতি আচার ব্যবহার পূর্ব্বপুরুষদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার হইতে ভিন্ন হইয়া গেলেও পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্মরণ না করা যথেষ্ট অনিষ্টের হেতু। স্বর্গীয় পিতৃপিতামহদিগকে স্মরণ করিলে যদি আর কোন ফললাভ না হয় তথাপি কেহই যে পৃথিবীতে চিরকালের নিমিত্ত থাকিতে আইসেন নাই, এ তথ্যটীও মনোমধ্যে উদিত হইবেই হইবে; এবং তাহা হইলেই যে বহু স্থলে দুষ্প্রবৃত্তির বল খর্ব্ব হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় কি? ইতিবৃত্তে বলে, প্রাচীন মিশরীয়েরা অমিতাচার এবং অযথাচার নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভোজনমন্দিরের মধ্যে এক একটী মনুষ্যকঙ্কাল সংস্থাপিত করিয়া রাখিত। সর্ব্বদা পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করা যাঁহাদিগের অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মনোমন্দিরে যেন ঐরূপ কঙ্কালসমস্ত সংস্থাপিত থাকে; সুতরাং রিপুদমন অবশ্যই তাঁহাদিগের অভ্যস্ত হয়। পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করায় কেবল মাত্র যে, সংসারের অনিত্যতা এবং জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রতীয়মান হয়, এমত নহে। পূর্ব্বপুরুষেরা প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পাত্ররূপেই সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। পূর্ব্বপুরুষেরাই মূর্ত্তিমান দেবতা। অন্যের চক্ষে যিনি যেমন লোক হউন, নিজের বংশধরদিগের চক্ষে বোধ হয় কেহই নিতান্ত মন্দলোক হইতে পারেন না। একটী উদাহরণ দ্বারা এই কথার সপ্রমাণ করিতেছি।

ঠগি উপদ্রব নিবারক সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল শ্লিমান সাহেব, ঝব্বলপুর নগরে

একটী শিল্প বিত্তালয় সংস্থাপিত করিয়া তথায় কতকগুলি ঠগ এবং তাহাদিগের অপত্যবর্গের শিক্ষার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। কোন ঠগ এবং তাহার পুত্র ঐ বিত্তালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া উভয়েই বিলক্ষণ সচ্চরিত্র এবং কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন পরে ঐ ঠগের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র পিতৃবিয়োগে অধীর হইল। বিত্তালয়ের সম্পাদক কাপ্তেন ব্রোণ সাহেব সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তই হউক, আর যে জন্তই হউক, তাহাকে বলিলেন, "তোমার পিতা ঠগ ছিল—কত নরহত্যা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই—তাহার মৃত্যুতে এত শোক করা অনুচিত।" পুত্র উত্তর করিল, "আমার পিতা ঠগ ছিলেন, এবং নরহত্যাও করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যখন ঠগ হওয়া এবং নরহত্যা করা মন্দ কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন না তখন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ঐসকল কার্য্যে দেবীর আদেশ আছে। কোম্পানি বাহাদুরের একবাল (শুভাদৃষ্ট) তখন দেবীকে পরাস্ত করে নাই। কিন্তু তাঁহার সাহস, বীরতা, ধীরতা এবং অধ্যবসায় কেমন ছিল, তাহা ত আপনি জানেন।" ঠগও মরিয়া তাহার পুত্রের হৃদয়ে দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। যে মরে, সেই স্বর্গীয় হয়। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের স্মরণ করেন, দেবতাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাঁহাদিগের মনও পবিত্র হইতে থাকে।

জ্ঞাতিবর্গের সংসর্গ পূর্ব্বপুরুষরূপ দেবতাদিগের পূজার উত্তেজক। অতএব যখন তাঁহাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, তখনই ঐ পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। পূজাকালে অহঙ্কার, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষাদি দুষ্টভাব অবশ্য পরিহার্য্য। পূজার অবসানে পূজার শুভফল আনন্দ এবং প্রীতিলাভ অবশ্যই হইবে।

কিন্তু এমন পরম ধর্ম্মের সাধক—মানস পূজায় প্রবর্ত্তক—যে জ্ঞাতিসংসর্গ, তাহা বহু স্থলেই আমাদিগের বিবেচনার দোষে পারমার্থিক শুভসাধক হইতে পায় না। জ্ঞাতিদিগের সহিত আমাদিগের ঐহলৌকিক স্বার্থ-সম্বন্ধ থাকে। ঐ সম্বন্ধটী পূর্ব্ব হইতেই ছাড়াইয়া রাখা উচিত। পূর্ব্ব হইতে না ছাড়াইলে ঐ স্বার্থ ক্রমে ক্রমে অতি প্রবলরূপ ধারণ করে; এমন কি, উহার চরিতার্থতা অবশ্য করণীয় বলিয়াই গণ্য হয়। তাহা

হইলেই জ্ঞাতি বিরোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং সমস্ত পারমার্থিক প্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তুমি এবং তোমার অনুজ উভয়ে এক পিতৃ মাতৃ রূপ দেব দেবীর উপাসক। দুই জনে নিভৃতে বসিয়া বাপ মায়ের কথা কও—কি পবিত্রতা উপলব্ধ হইবে! কত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে! তাঁহাদিগের ইহলৌকিক লীলা সমস্ত স্মরণ করিতে করিতে তোমাদিগের চরিত্র কেমন অপূর্ব্ব নির্ম্মলতাব ধারণ করিবে। কিন্তু তোমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি অবিভক্ত রহিয়াছে. এখন কোন দোষ দেখিতেছ না। দুই ভ্রাতায় খুব মিল—হরিহর আত্মা। কিন্তু অল্পকালেই দেখিতে পাইবে, ঐ ইহলৌকিক স্বার্থ সম্বন্ধ নিবন্ধন তোমাদিগের পারমার্থিক সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিবে—প্রথমতঃ পিতৃমাতৃপূজায় অনাস্থা হইবে, অনন্তর কেহ কাহাকেও আর মনের কথা বলিতে পারিবে না—এবং পরিশেষে হয় ত উভয়কেই রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে।

অতএব কদাচিৎ জ্ঞাতির সহিত পৈতৃক অর্থ সংস্রব রাখিওনা। এখনই দুই ভাই মিলিয়া পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিয়া লও। দেশাচার ঐরূপ কাটাছেঁড়া ব্যবহারের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে শাস্ত্রে স্পষ্ট উপদেশই আছে। দায়ভাগকার তাদৃশ বিভাগের যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র রক্ষা কর—পরিণামদর্শী হও—পূর্ব্ব পুরুষ পূজারূপ মহৎ ধর্ম্মের পথে কণ্টক রাখিও না। চক্ষু লজ্জা ত্যাগ কর—জ্ঞাতিত্বের শুভফলের আকাঙ্ক্ষী হও।

জ্ঞাতির সহিত পৈতৃক অর্থ সম্বন্ধ শূন্য হইতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞাতি প্রতিপালনে কোনরূপেই পরাঙ্মুখ হওয়া হইবে না। জ্ঞাতির মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, তিনি আপনাকে গোত্রস্বামীর স্থানীয় জ্ঞান করিবেন। গোত্রস্বামী গোত্রের রাজা—কর গ্রহণ করিবার রাজা নন, প্রজাপালক রাজা। তিনি গোত্রস্থ সকলের সুখ সচ্ছন্দতা সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। কাহার কি কষ্ট অসুখ হইতেছে দেখিবেন, এবং সাধ্যানুসারে প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন। গোত্রের কোন ব্যক্তি নীচ, অবমানিত বা অক্ষম হইলে গোত্রস্বামীর গায়ে লাগে। জ্ঞাতির প্রধান যে ব্যক্তি, তাঁহারও জ্ঞাতিদিগের ঐরূপ অবস্থা গায়ে লাগা আবশ্যক।

একধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সর্ব্বদেশেই সর্ব্বকালেই পরস্পর সহায়তা এবং উপকার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। খৃষ্টানেরা খৃষ্টানের, মুসলমানেরা মুসলমানের এবং জৈনেরা জৈনের উপকারে সমধিক রত হয়। যদি এইরূপ এক ধর্ম্মাবলম্বন পরস্পর উপচিকীর্ষার হেতু হয়, তবে এক পূর্ব্বপুরুষের উপাসক জ্ঞাতিগণ কি জন্য পরস্পর উপকারের পাত্র না হইবেন ?

জ্ঞাতিবিরোধ স্ত্রীলোকদিগের কুমন্ত্রণা হইতে জন্মে, এই যে একটী প্রবাদ আছে, তাহা অমূলক নয়। স্ত্রীলোকেরা যেমন সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামী ও পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা দেবর, দেবরপুত্র প্রভৃতির মঙ্গলকামনা তেমন সর্ব্বান্তঃকরণে করিতে পারেন না। সুতরাং যদি শ্বশুর অথবা স্বামী, জ্ঞাতিবর্গ হইতে আপনাদের স্বার্থ বিচ্ছিন্ন না করিয়া সকলকে জড়াইয়া রাখেন, তাহা হইলেই স্ত্রীলোকদিগের মুখে বিরক্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু জ্ঞাতিদিগের হইতে পৈতৃক অর্থ সম্বন্ধ ছাড়াইয়া ফেল—দেখিবে, তোমার সহধর্ম্মিণী কখন জ্ঞাতিপালনে অথবা জ্ঞাতির সমাদরে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

ত্রয়োদশ প্রবন্ধ।

কৃত্রিম-স্বজনতা।

স্বজন অর্থে আপনার মানুষ। আপনার মানুষ নানাপ্রকারে হয়। কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ বা মিত্র। জ্ঞাতি ও কুটুম্বের মধ্যে প্রভেদ করিবার নিয়ম আছে—যথা. কেহ নিকটজ্ঞাতি, কেহ বা দূরজ্ঞাতি; কেহ নিকট কুটুম্ব, কেহ বা দূর কুটুম্ব। অশৌচ অথবা পিণ্ড সম্বন্ধের উপর জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের নৈকট্য দূরত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। সে সকল কথা শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সে বিষয়ে আমার কোন কথা বক্তব্য নাই; জ্ঞাতি কুটুম্বের মধ্যে নৈকট্য দূরত্ব বিচারের একটি অতি সহজ উপায় আছে। তোমার সহিত সম্বন্ধাধীন যাঁহার স্বতন্ত্র রূঢ় আখ্যা হয়, তিনিই তোমার নিকট জ্ঞাতি বা নিকট কুটুম্ব;—যাঁহার যোগরূঢ় আখ্যা হয়, তিনি তদপেক্ষা দূর, এবং, যাঁহার স্বতন্ত্র আখ্যা না হয়, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরজ্ঞাতি বা কুটুম্ব। ভ্রাতা, ভগিনী, খুড়া, জেঠা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তোমার নিকট জ্ঞাতি। তোমার সহিত সম্বন্ধাধীন তাঁহাদিগের তাদৃশ রূঢ় আখ্যা হইয়াছে। ভাইপো, ভাইঝী, খুড়তুতা ভাই, জেঠতুতা-ভাই, ইহাদিগের আখ্যা যোগরূঢ়—ইহাদিগের জ্ঞাতিত্ব দূরতর। জামাই-বেহাই, শ্যালক, শ্বশুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তোমার নিকট-কুটুম্ব। ইহাঁদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূঢ় আখ্যা তোমার সহিত সম্বন্ধজাত। বেহাই পো, শ্যাল-পো. শ্যালজায়া প্রভৃতি যোগরূঢ় শব্দ দূরতর কুটুম্বতাবাচক। আমি যখন জ্ঞাতি অথবা কুটুম্বের উল্লেখ করিব, তখন নিকট জ্ঞাতি কিম্বা নিকট কুটুম্বের কথাই বলিতেছি, বুঝিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতি স্বজন সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, এক প্রকার কৃত্রিম বা পাতান স্বজনতা আছে, আমি তাহারই বিষয়ে কিছু বলিব, মনে করিয়াছি।

স্ত্রীলোকেরা সম্বন্ধ পাতাইতে বিশেষ পটু বলিয়া বোধ হয়। 'সই' 'মকর' 'মিতিন' 'গঙ্গাজল' 'গোলাপফুল' 'বেগুণফুল' 'হোঁপারফুল' এবং

(আজি কালি কলিকাতা অঞ্চলে) 'ল্যাবেণ্ডার" 'পমেটম' প্রভৃতি অসংখ্য বিচিত্র নাম সকলই উহার প্রমাণ। সম্বন্ধ পাতাইবার প্রবৃত্তি স্ত্রীলোক-দিগের যৌবনাবস্থায় অধিক থাকে, বয়সের আধিক্য হইলেও ঐ প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ উপশম হয় না। তখন 'মা' 'ঝী' 'বৌ' 'বেটা" পাতান হইয়া থাকে। পাতান সম্বন্ধের দরুণ যাতায়াত, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, তত্ত্ব দেওয়া ও লওয়া চলে এবং গৃহস্থালীর কার্য্য বহুমুখ এবং সুবিস্তৃত হইয়া উঠে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এই কার্য্যটী পুরুষদিগের অশ্রদ্ধেয়। তাঁহারা ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং কখন কখন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পাতান সম্বন্ধ কি জন্য এত অশ্রদ্ধেয় এবং বিরক্তিকর, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় কেহই তাহার সদুত্তর দিতে পারেন না।

বাস্তবিক, পাতান সম্বন্ধের প্রতি বিরক্ত হইবার প্রকৃত কারণ কিছুই নাই। পৃথিবীতে কেহই চিরকাল থাকিতে আইসে না। দিন কয়েক মাত্র এখানকার আমোদ প্রমোদ—এবং সেই আমোদ প্রমোদও অপর পাঁচ জনকে লইয়া করিতে হয়। আপনি খাইলে পরিলেই কিছু সুখ হয় না পাঁচ জনকে খাওয়াইয়া পরাইয়াই সুখ। যখন আমরা এরূপ অবস্থায় অবস্থিত তখন যে কোন প্রণালীতেই হউক, সংসারে থাকিয়া যত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত সম্পর্ক হয়, ততই ভাল বলিতে হইবে। অনুদার লঘুচিত্তে-রাই নিতান্ত আপনার এবং পর ভাবিয়া চলে। তাহাদিগের মন ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া দেখিতে পায় না। পরকে আপনার করাই প্রকৃত কাজ. ভাবিয়া দেখিলে "নাহং" কে "অহং" করা বই পৃথিবীতে আর কাজ নাই। কিছু দেখিবে, কিছু শুনিবে, কিছু বুঝিবে, কিছু বলিবে, কিছু করিবে. যতই বল, যাহা তোমার নিজস্ব ছিল না, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লওয়া উহার তাৎপর্য্য। জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ত আপনার হইয়াই আছেন, যাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই —তাঁহাদিগকে আপনার করিবার নিমিত্তই সম্বন্ধ পাতাইবার ব্যবস্থা।

পুরুষেরা যে কারণে প্রণোদিত হইয়া যে প্রণালীতে পরস্পর বন্ধুতা করেন স্ত্রীলোকেরাও অবিকল সেই কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই প্রণালীতে

সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকেন। বিশেষ এই, পুরুষদিগের মধ্যে বন্ধুতাভাবের বিশেষ বিশেষ নামকরণ তত অধিক হয় না, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হয়। উহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যেও বন্ধুতার অনেকরূপ নামকরণ হইত। এখনও দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। লেখকের পিতৃ পর্য্যায়স্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে "মিতা" 'সঙাৎ' 'বন্ধু' 'ভাই' পাতাইবার প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। রাজস্থান প্রদেশের 'রাখী বন্ধ ভাই' সহোদর ভাই অপেক্ষাও সমধিক সমাদরের বস্তু। জৈন মতাবলম্বী ওসোয়ালেরা অনেকেই 'ভাই" পাতাইয়া বহুসংখ্যক অজ্ঞাত কুলশীল নিরন্ন ব্যক্তিকেই প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে সর্ব্বদেশেই সম্পর্ক পাতাইবার ব্যবস্থা স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতি সাধারণ ছিল। বৈবাহিক আচার তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিতেছে। আমাদিগের বৈবাহিক ব্যবহারে যে 'মিতবর' এবং 'মিত কন্যা'র সমাবেশ দেখা যায়, তাহা বরের মিতা বা মিত্র এবং কন্যার মিতিন বা মিত্রিণীকে বুঝায়। ইংরাজদিগের মধ্যেও 'ব্রাইডস্ ম্যান' এবং ব্রাইডস্ মেড্—বর কন্যার স্বজন স্বজনীর স্থানীয় হইয়া আছে। ফলতঃ সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারটি মনুষ্যস্বভাব সুলভ প্রণয় প্রবৃত্তির স্বতঃসিদ্ধকার্য্য—উদারতাসাধনের প্রথম সোপান এবং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার পরিচায়ক।

তবে এই প্রথাটী কখন সবল কখন দুর্ব্বল, পুরুষদিগের মধ্যে অল্প স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক, কোন দেশে প্রচলিত, কোথাও বা লুপ্তপ্রায়, এরূপ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল যে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, তাহা ত মনুষ্যজাতি সাধারণ, তবে দেশভেদে, সময়ভেদে, জাতিভেদে, ধর্ম্মজ্ঞানের ইতর বিশেষ হয় কেন? জড়োপাসনা, পৌত্তলিকতা, আত্মোপাসনা প্রভৃতি উপাসনাতে ভেদ জন্মে কেন?—ধর্ম্ম এবং প্রণয়-প্রণালী গঙ্গা যমুনার ন্যায় একই মূল হইতে উৎপন্ন, এক অভিমুখে এক উদ্দেশেই প্রধাবিত, এবং পরিণামে এক হইয়াই চলে। ধর্ম্মোন্নতির সোপানে যেটী পৌত্তলিকতার অবস্থা, প্রণয়োন্নতির সোপানে সম্বন্ধ পাতানটী তাহারই অনুরূপ অবস্থা।

সামাজিক উন্নতির সহিতও ধর্ম্ম এবং প্রণয়োন্নতির একটী গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যত দিন মনুষ্য-সমাজ এক একটী গোত্র অর্থাৎ মিলিতপরিবারের আকার ধারণ করিয়া থাকে, তত দিন ধর্ম্মসম্বন্ধে জড় পদার্থ বিশেষের উপাসনা প্রবল হয়, এবং প্রণয় প্রণালী জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যেই একান্ত সম্বদ্ধ থাকে। অনন্তর সমাজ বহু গোত্র সমষ্টি দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে ধর্ম্ম-প্রণালী পৌত্তলিকতার আকার গ্রহণ করে, এবং প্রণয়প্রবৃত্তি কৃত্রিম-স্বজনতা সংগঠনে নিযুক্ত হয়। পরিশেষে সমাজের জটিলতা ও বিপুলতা সমুদ্ভূত হইলে ধর্ম্ম অনামা একেশ্বরবাদরূপে প্রতীয়মান এবং প্রণয়বৃত্তি আখ্যানশূন্য বন্ধুতাতে চরিতার্থ হইতে থাকে। মনুষ্য সমাজ আরও জটিল এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবীময় সাধারণতন্ত্রতা এবং প্রজা-তন্ত্রতা প্রচলিত হইলে, রাজব্যবস্থা রাজার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতিরেকে কার্য্য-কারিণী হইলে, ধর্ম্ম-প্রণালী কিরূপ রূপ ধারণ করিবে, প্রণয় প্রবৃত্তিই বা কি প্রকারে চরিতার্থ হইবার চেষ্টা পাইবে, তাহা মনে মনে চিন্তনীয়—কথায় ব্যক্ত করিবার নয়।

এতদ্দেশে স্ত্রীলোকদিগের সমাজ এখনও ক্ষুদ্রাকার। এত ক্ষুদ্রাকার যে, অনেক স্থলেই তাঁহারা স্বসম্পৃক্ত ভিন্ন অপর কাহার মুখদর্শন করিতে পান না। যেখানে তাঁহাদিগের সমাজ ঐ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে অপরাপর পরিবারের সহিত তাঁহাদিগের সন্দর্শন এবং সাহচর্য্য জন্মিয়াছে—সেই স্থলেই কৃত্রিম স্বজনতার উদ্গম হইয়াছে। কিন্তু সম্বন্ধ পাতানটি প্রণয়োন্নতির লক্ষণ,—প্রণয়োন্নতির চরম ফল নয়। সেইরূপ পৌত্তলিকতাও ধর্ম্মোন্নতির লক্ষণ—তাহার চরম ফল নয়। কোন অবস্থার সহিত তুলনায় পৌত্তলিকতা অপকৃষ্ট, আবার কোন অবস্থার সহিত তুলনায় উহা উৎকৃষ্ট। সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারটাও সেই প্রকার—কোন অবস্থায় অপকৃষ্ট, এবং কোন অবস্থায় উৎকৃষ্ট। ইহা এক পক্ষে আদরণীয় এবং পক্ষান্তরে অবজ্ঞেয়।

কিন্তু কৃত্রিম-স্বজনতা শ্রদ্ধেয়ই হউক, আর অবজ্ঞেয়ই হউক, উহার অবলম্বনে সংসারাশ্রমী মনুষ্যের যে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি তোমার পরিবার মধ্যে উহার সূত্রপাত

হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় জানিবে যে উহা আর তোমার অশ্রদ্ধার বিষয় হইতে পারে না। তখন যাহাতে ঐ ব্যাপারের শুভ ফল সমস্ত ফলে, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। যেরূপে প্রণয়টী বলবৎ হয়, তাহার উপায় কর। তোমার স্ত্রীর "মকর" "মিতিন" প্রভৃতিকে আপনি "মকর" "মিতিন" প্রভৃতি যথাযোগ্য নামে সম্বোধন কর; সম্ভবমত তাঁহাদিগের সুখ দুঃখের অভিভাবক হও, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির পীড়াদিতে কাতরতা অনুভব কর, সময়ে সময়ে এমন কি তোমার স্ত্রী না বলিতে বলিতে তাঁহার স্বজনীদিগের তত্ত্ব করিতে বল। কৃত্রিম স্বজনদিগের তত্ত্ব করা অতি সহজ ব্যাপার। উহাঁদিগের সহিত প্রণয়ের সম্বন্ধ, মান সম্ভ্রম বংশমর্য্যাদার সম্বন্ধ নয়। তোমার যেমন ইচ্ছা—যেমন সুবিধা—উহাদিগকে তেমনি তত্ত্ব করিতে পার। ইহাঁরা তোমার স্থানে কেবল মাত্র স্মরণের প্রার্থী। অতএব কোটা মাছ দিয়াও উহাঁদিগের তত্ত্ব হইতে পারে। তত্ত্বের সামগ্রী তাঁহারা অপর কাহাকে দেখাইতে অধিকারী নহেন। আপনারা ভোগ করিতে পারেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। কৃত্রিম স্বজনবর্গকে ক্রিয়া কাণ্ডের উপলক্ষে আহ্বান না করিলেও ক্ষতি নাই। যদি আহ্বান কর, তাঁহাদিগের হস্তে কোন কার্য্যের ভার দিও না। কার্য্যের ভার দিলে প্রায়ই জ্ঞাত কুটুম্বদিগের সহিত তাঁহাদিগের মনোমালিন্য এবং মতান্তর হইয়া কষ্টের কারণ হইবে। কিন্তু প্রীতি-ভোজে কৃত্রিম স্বজনগণকে আহ্বান করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাদৃশ স্থলে তাঁহারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

কৃত্রিম-স্বজনদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ভোজাদির উপলক্ষ ব্যতিরেকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনা অসঙ্গত নয়। অসঙ্গত নয় কি—তাহাই ভাল। আপনারা প্রত্যহ যেমন শাক অন্ন খাও, ইহাঁদিগকে লইয়া তাহাই খাওয়াইবে, তাহাতে মানাপমান নাই। কেবল একত্র ভোজন, একত্র অবস্থান প্রীতিপাত্রদিগের পক্ষে যথেষ্ট। কৃত্রিম স্বজনতায় কুটুম্বতার ব্যবহার একান্ত পরিবর্জ্জনীয়। ওস্থলে কুটুম্বতা করিতে গেলেই দোষ জন্মে; স্বজনতার শুভ ফল যে প্রণয়বৃদ্ধি, তাহা না হইয়া, ঈর্ষ্যা, প্রতিযোগিতা, অভিমানাদি সমুৎপন্ন হয়; এবং গৃহকার্য্যে নানাপ্রকার অসুবিধা হইয়া উঠে।

স্ত্রীলোকদিগের হইতেই কৃত্রিম স্বজনতা অধিক পরিমাণে জন্মে। কিন্তু তাঁহারা অনেকেই এই সম্বন্ধের প্রকৃত অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া প্রায়ই কুটুম্বতার সহিত ইহাকে এক করিয়া ফেলেন। পুরুষদিগের কর্ত্তব্য এমন স্থলে অশ্রদ্ধাখ্যাপন অথবা ঔদাসীন্য অবলম্বন না করিয়া স্ব স্ব গৃহিণীকে প্রকৃত-পথবর্ত্তিনী করিয়া দেন! সেটী করাও বড় কঠিন কাজ নয়। তোমার বন্ধু আছেন? হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে বল, তাঁহাকে লইয়া একত্র ভোজন করিবে। ভোজনের নিমিত্ত কোন বিশেষ উদ্যোগ করাও নিষেধ কর। আর এক দিন তোমার বন্ধু তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন; ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ভোজন করিতে বইস। "উদ্যোগ কিছুই হয় নাই।" "নাই, হইয়াছে?" আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক এইরূপ ব্যবহার করিলে তোমার স্ত্রীও তাহার 'মকর' 'মিতিন' লইয়া ঐরূপ ব্যবহার করিতে শিখিবেন। "কৈ তোমার দিদিকে আনিতে লোক পাঠাইলে—কিন্তু তোমার 'মকরের' নিমন্ত্রণ করিলে না?" * * * "ছেলের বে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, ঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ, এ সকল কাজে আমি মকরকে আনিতে ভাল বাসি না। তুমি যখন ওমাসে বাটী হইতে আসিবে, তখন মকরকে আনিয়া দশ দিন রাখিব, মনে করিয়াছি।" যে স্ত্রীলোক ঐ প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি কৃত্রিম স্বজনতা সম্বন্ধে যাহা মনে করা উচিত, তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

-:*::*:

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধ।

অতিথি সেবা।

"এক কপর্দ্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই জনপ্রবাদে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতাম—করিতাম বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে এদেশে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবতী ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। পূর্ব্বে কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী অতিথি আসিলে অতিথির প্রত্যাখ্যান ত প্রায়ই হইত না—বাটীতে যেন একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। গৃহস্বামী নম্রতা এবং ধীরতা অবলম্বন পূর্ব্বক আগন্তুকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন, গৃহ প্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন কি স্বপাকে খাইবেন, অতি সঙ্কুচিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। গৃহপ্রস্তুত অন্নাদি গ্রহণ করিবেন শুনিলে যেন কৃতার্থ হইতেন এবং স্বপাকে খাইবেন শুনিলে বিশিষ্টরূপ শুচি হইয়া আয়োজন করিয়া দিবার নিমিত্ত লোক জনকে আদেশ প্রদান করিতেন। কোন কোন ঘরে তাদৃশ অতিথির ভোজন সমাপন—অন্ততঃ ভোজনার্থ উপবেশন পর্য্যন্ত আপনারা কেহ জলগ্রহণ করিতেন না।

আজি কালি আর ওরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন স্বপাকে ভোজী অতিথি, সহরের কথা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রামেও বড় একটা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। আর যাঁহারা গৃহস্থের বাটীতে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে সম্মত, তাঁহারাও অসময়ে আসিলে গৃহস্থের বিরক্তিকর হইয়া পড়েন। গৃহস্থ তাদৃশ স্থলে বিরক্তি সংগোপনে সতর্ক হয়েন বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে—নিকটে দোকান—সরাই—সদাব্রত অথবা হোটেল আছে, ইঙ্গিতক্রমে এরূপও বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভাল লোক আর প্রায়ই অতিথি হইয়া কোন গৃহস্থের দ্বারস্থ হইতে সম্মত হয়েন না। এখনকার অতিথির মধ্যে অধিকাংশ লোকই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী সন্ন্যাসী বা সাধু; ইহারা সদাব্রতে পেট টানিয়া

এবং গাঁজা খাইয়া বেড়ায়; ফলকথা, প্রকৃতরূপ অতিথি-সৎকার কাল-ক্রমে যে উঠিয়া যাইবে, তাহার উপক্রম দেখা দিয়াছে। যতদিন একান্ন বর্ত্তিতা থাকিবে, যতদিন উদর অথবা স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তার উদ্বেগে এদেশের লোকেরাও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উদ্বেজিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন আতিথ্য ব্যাপার একেবারে লোপ পাইবে না। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সহকারে যতই এদেশের লোকেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবে, এবং পরস্পর অথবা আগন্তুক অপর জাতীয়দিগের প্রতিযোগিতায় একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইবে না, ততই ইউরোপের ন্যায় এতদ্দেশেও আতিথ্যধর্ম্মের হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এখনও সে দিন উপস্থিত হয় নাই—এখনও অতিথি সৎকার করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ধরা যায়—এখনও আমরা এই ধর্ম্মপালনের ফলভোগী হইতে পারি।

আমি এস্থলে যে প্রকার অতিথিসৎকারের কথা মনে করিতেছি, সে প্রকার অতিথি সচরাচর জুটে না। তিনি কোন পরিচিত বা ক্রিয়ার উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন। তিনি কোন ভদ্রলোক—কার্য্যগতিকে অসময়ে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মনে কর—বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নান ভোজন হয় নাই। তুমি কিরূপে তাঁহার সমাদর এবং অভ্যর্থনা করিবে? আমার বিবেচনায় তোমার কর্ত্তব্য যে, যথেষ্ট সত্বরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার স্নান ভোজনের যোগাড় করিয়া দাও—ভাল করিয়া পাঁচটা ব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইবার উদ্দেশে বিলম্ব করিও না। নিজে স্বহস্তে তাঁহার জন্য কোন যোগাড় করিও। সকল কাজ চাকর চাকরাণীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভিন্ন বাটীর অপর সকলের নিমিত্ত যে দুধ থাকে, তাহার কিছু কিছু লইয়া অতিথিকে দাও; অর্থাৎ যাহারা বুঝিতে পারিবার বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন সকলেই বুঝিতে পারে যে, অতিথির জন্য তাহাদিগের খাবার সামগ্রী কিছু কিছু কম হইয়া গিয়াছে। অতিথির নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা জাঁক দেখাইবার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করিও না, কিন্তু যে দিন বাটীতে অতিথি আসিয়াছেন, সে দিন বাটীর অপর সকলের অপেক্ষা

যেন অতিথির খাওয়াটা ভাল হয়, অবশ্য এরূপ চেষ্টা করিও। যদি অতিথির সৎকার করার বাটীর কর্ত্তা, গৃহিণী এবং বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগের কোন উপভোগে কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, তবে অতিথি সৎকারে সমগ্র ফল লাভ হয় না। কিন্তু যেখানে কাহার উপভোগের ত্রুটি না হইয়া অতিথির সম্যক্ সৎকার হয়, সে বাটীতে মিতব্যয়িতার নিয়মগুলিও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় না, এমন বলা যাইতে পারে।

অতিথির সহিত আলাপে তাঁহার পরিচয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিও না। নিজের বিদেশ পর্য্যটন যদি কিছু হইয়া থাকে সেই বিষয়েই কথা কহিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ যদি স্বয়ং কখন অতিথি হইয়া উত্তম সংকার লাভ করিয়া থাক, তবে সেই কথা কহিও; উহা অতিথির বিশিষ্টরূপে হৃদয়গ্রাহিণী হইবে।

কখন কখন এমন সকল লোককে অতিথি হইতে হয়, যাঁহারা স্থানমাত্রের অথবা দ্রব্যবিশেষের প্রার্থী হইয়া থাকেন। আমাদিগের প্রাচীন রীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধে অসমর্থ কোন কোন ব্যক্তি তাদৃশ অতিথির প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, যদি আমার দ্রব্যই খাবেন না, তবে শুদ্ধ জায়গা দিব কেন?—অথবা যদি সিধাই লইবেন না, [illegible] একটু দুগ্ধ কিম্বা মৎস্য দিয়া কি হইবে?—এই সকল [illegible] তিথি সম্পাদনে যে পুণ্য লাভ হয়, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সেই পুণ্যের প্রতি একান্ত লুব্ধ। কিন্তু লোভ মহাপাপ—পুণ্যের প্রতি যে লোভ, তাহাও পাপ। অতএব ঐ পুণ্যের লোভও পরিত্যাগ করা আবশ্যক। যাহার যেটী প্রয়োজন তাহাকে তাহাই দিবার চেষ্টা পাইবে। তোমার ঘরে বসিয়া অতিথি আপনার দ্রব্য খাইবেন, ইহাতে লজ্জা বোধ করা রাজস প্রকৃতির লক্ষণ—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্বভাবের লক্ষণ নয়।

তবে একটী কথা আছে, ওরূপ অতিথির নিকট স্বয়ং থাকিয়া আলাপ পরিচয় করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। তাঁহার জন্য স্বহস্তে কোন যোগাড় করিয়া দিবারও প্রয়োজন নাই।—তাঁহার পরিচর্য্যায় দাস দাসীর নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে অতিথির আজ্ঞা সকল সত্বরে পালন করিবার আদেশ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য দান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। মুষ্টিভিক্ষা দান অতি সৎকার্য্য বলিয়াই আমার বোধ হয়। ভিখারীর শরীর সবল এবং কর্ম্মক্ষম; অতএব তাহার ভিক্ষা করা উচিত নয়, তাহার খেটে খাওয়াই উচিত—এ সকল বিচার গৃহস্থকে করিতে হইবে না। উহা সমাজের বিচার্য্য বিষয়। তোমার দ্বারে যে ভিখারী আসিল তুমি তাহার প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করিয়া এবং চাকর চাকরাণী কাহাকেও কটুভাষা কহিতে না দিয়া এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও, সে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাউক। ঐ ভিক্ষাদান কার্য্যটী বাটীর শিশুদিগের হাত দিয়া করানই ভাল। মুষ্টি ভিক্ষা ভিন্ন আরও নানা প্রকার চাঁদায় গৃহস্থকে অর্থদান করিতে হয়। বিদ্যালয়ের জন্য, পুস্তকালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বাপ মা মরা দায়ের জন্য, বারোএয়ারির জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়া নিবারণের জন্য, গৃহস্থকে প্রায় প্রতি মাসেই কিছু না কিছু দান করিতে হয়। আমার বিবেচনায় ঐ সকল প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যাত করিতে নাই। সকলকেই কিছু কিছু দান করিবার চেষ্টা করা উচিত। তবে একটী কথা আছে—দিব, বলিয়া না দেওয়া, না দেওয়ার চেয়েও অধিক দোষাবহ। বরং চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করিয়া একেবারেই দিব না বলা ভাল, কিন্তু দিতে স্বীকার করিয়া কোনমতেই টালমাটাল করা উচিত নয়। যেটি দিবে বলিবে সেটী ঠিক সময়েই যথা পরিমাণে দিবে। ফলকথা, দান ধর্ম্মের মূল সূত্র এই, দাতা এমন ভাবে দান করিবেন, যেন গৃহীতার বোধ হয় যে, উনি দান করিতে পাইয়া আপনাকে উপকৃত এবং কৃতার্থ মনে করিতেছেন। দান ধর্ম্মের এই মূল সূত্র সম্যক্‌রূপে সংরক্ষিত হইবার জন্যই শাস্ত্রকারেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে দানের মুখ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা, সংসারবিরাগী ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করিয়া আত্মগ্লানির ভাজন হয়েন না। তাঁহারা দান গ্রহণ দ্বারা দাতারই বিশেষ উপকার করিলেন, এরূপ মনে করিতে পারেন।

পঞ্চদশ প্রবন্ধ।

পরিচ্ছন্নতা।

পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা এক পদার্থ নয়—কিন্তু প্রায়ই এক। যে পুরুষ বা স্ত্রী বাহ্যদর্শনে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, সেই যে অন্তরেও বিশুদ্ধ এবং সুব্যবস্থিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু যাহার মন বিশুদ্ধ এবং পরিপাটী তাহাকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই হইতে হয়। বাহ্যব্যাপার সমস্তকে হেয় জ্ঞান করা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিবারই ফল। পৃথিবী কিছু নয়—শরীর কিছু নয়—সংসার কিছু নয়—এ সকলের প্রতি যত্ন এবং আদর করা ক্ষুদ্রাশয়তার লক্ষণ, শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে বটে, কিন্তু দেহ এবং গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত রাখিবার অবশ্যকর্ত্তব্যতাও শাস্ত্রে যথোচিত পরিমাণে উল্লিখিত আছে। গৃহের এবং গৃহস্থিত দ্রব্যের যথোচিত বিলেপন ও সম্মার্জ্জনাদি, স্নান, ভোজন, আচমন, বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার আমাদিগের অবশ্য করণীয় প্রাত্যাহিক কার্য্যের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে দেববিগ্রহ ও ঠাকুরঘর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া সকল গৃহস্থেরই শুচিতার এবং পরিচ্ছন্নতার এক একটী আদর্শ পাইবার উপায় করা হইয়াছে। ঠাকুর ঘর যে ভাবে রাখ, আয়াসের সকল ঘর সেই ভাবে রাখিলেই হইল। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের ঘর এবং মহাগুরু স্বামীর ঘর কি ঠাকুর ঘর নয়?

বস্তুতঃ শুচিতাপ্রিয় য়িহুদীদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ অল্প হয়। তাহার কারণ এই যে, গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত অতি সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আদেশ আছে, এবং য়িহুদীরা আপনাদের শাস্ত্রের আদেশ সমস্ত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপালন করে। পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিতে সকলেই চায়—উহা ধর্ম্ম্য, স্বাস্থ্যকর এবং সাক্ষাৎ সুখপ্রদ। কিন্তু এ কথাও বলি, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য।

ব্যাপার; লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্যক্ ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা রক্ষার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টায় লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানও ঘটিয়া উঠিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, এই জন্যই পরিচ্ছন্নতা সাধনের মূল মন্ত্রগুলি, লক্ষ্মী সাধনের মূলমন্ত্র হইতে অভিন্ন। ঐ মন্ত্রের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

দ্রব্যের অপচয় সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী ব্যাপার। গৃহোপকরণ প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে হইলেই তাহাদিগকে ছড়াইয়া রাখিবার যো নাই; যথাস্থানে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হয়, এবং তাহা রাখিলেই গৃহের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদিত হয়।

সকল দ্রব্য হইতেই কোন না কোন প্রয়োজন সাধন হইতে পারে। ছেঁড়া কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, কুটনার খোসা, ঘরের আবর্জ্জনা—এমন সকল পদার্থও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। ছেঁড়া কাগজ এবং ছেঁড়া নেকড়া ঘরের যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিও না, একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রাখ; দিন কয়েকের মধ্যেই এত জমিয়া যাইবে যে, বদল দিয়া নূতন কাগজ পাইতে পারিবে। আনাজের খোসা, ডাইলের ভুষি ঘরে ছড়াইয়া রাখিলে ঘর নোঙ্‌রা দেখাইবে, তুলিয়া একটা কোন পাত্রে জমা কর; পোষিত গরু বাছুর ছাগলাদির খাদ্য হইবে। ঘর ঝাঁইট দিয়া যে ধূলা এবং আবর্জ্জনা পাওয়া যায়, তাহাও জড় করিয়া ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। অতএব পরিচ্ছন্নতা সাধনের একটী প্রধান সূত্র এই যে, ঐ প্রকার দ্রব্য সকল রাখিবার পৃথক পৃথক স্থান এবং পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবে, এবং দ্রব্য সকল যার যে স্থান তথায় রাখিতে অভ্যাস করিবে—নিজে অভ্যাস করিবে, এবং পরিজনকেও অভ্যাস করাইবে। ঐরূপ করা এবং করান অভ্যস্ত হইলেই অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যাইবে, এবং ঘরদ্বার ঝরঝরে দেখাইবে।

দ্রব্যজাত বে-কেজো করিয়া রাখা সম্পত্তিরক্ষা এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং গৃহের দ্রব্যজাত যে অবস্থায় থাকিলে বে-কেজো হয়, এমন অবস্থায় রাখিতে নাই। কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া কি অন্যরূপে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেই তাহাকে অবিলম্বে সারাইয়া কিম্বা বদলাইয়া

লওয়া উচিত। এই নিয়ম প্রতিপালন অভ্যস্ত হইলে অনেক অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়া এবং ঘরও পরিচ্ছন্ন থাকে।

গৃহ এবং গৃহস্থিত দ্রব্যাদি শীঘ্র বিনষ্ট হইতে দিলে সত্বরেই ধনক্ষয় হয়। রৌদ্র জল বায়ু এবং কীটাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরন্তরই ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্য সকলকে এমন অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, যাহাতে ঐ প্রকার ক্ষয় যতদূর সম্ভব, নিবারিত হইতে পারে। সেঁতসেঁতে না হইলে, ময়লা না ধরিলে, মরিচা না পড়িলে, দ্রব্য সকল অধিক দিন টিকে। অতএব গৃহ এবং গৃহোপকরণ সমস্ত যাহাতে যথাপরিমাণ শুষ্ক, পরিষ্কার এবং ঝকঝকে থাকে তাহার জন্য যত্ন করা অভ্যাস করিতে হয়। তাহা করিলেই পরিচ্ছন্নতা সাধিত হয়।

গৃহ-বাসী প্রাণিমাত্রকে যে পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, তাহা অর্থশাস্ত্র এবং শারীর শাস্ত্র উভয় শাস্ত্রেরই অভিমত। ও বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন; এই মাত্র বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব যে, গৃহপালিত জীব-গণের, আপনাদিগের সন্তান সন্ততিগণের এবং দাস দাসী প্রভৃতি পরিজন-গণের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিলেই সমুদায় কাজ হইল না। গৃহিণীকেও সুবেশা হইয়া থাকিতে হয়। যে গৃহিণী সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া স্বয়ং পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জ থাকিতে চাহেন না, তাঁহার অন্তরে একটী গূঢ় অভিমান আছে—সেটী ভাল নয়; যিনি চেষ্টা করিয়াও পারেন না, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত জ্ঞান এখনও সুপক্ক হয় নাই। যিনি বাঁদী এবং বিবি উভয়ই হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী—তিনিই সম্পত্তি এবং শোভা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

——(*)——

ষষ্ঠদশ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

চাকর প্রতিপালন

চাকরেরা চুরি করে, এখন অনেকেই এই কথা বলেন; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চাকরদিগের যত দোষ হয়, সমুদায়ই প্রায় মনিবের দোষে জন্মে। চৌর্য্য, শঠতা, ধূর্ত্ততা, মিথ্যা কথন—এ সব ভীরুতার কার্য্য—দৌর্ব্বল্যের অবশ্যম্ভাবি ফল। তুমি ভৃত্যের পীড়ন কর, ঐরূপে তাহার প্রতিশোধ পাইবে।

কর্ত্তার জানা উচিত যে, যাহারা তাঁহার নিতান্ত অধীন তাহাদিগের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার অবৈধ। তাহাদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলে নিজের মন কঠিন এবং প্রবৃত্তি নীচ হয়; ও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগের দোষের সংশোধন হয় না। কোন কোন বাটীর কর্ত্তা চাকরকে মারেন। বলিতে কি, যিনি ওরূপ করেন, তিনি আমার চক্ষের বড়ই নীচ-প্রকৃতিক। তুমি প্রহার করিলে যদি চাকরও প্রহার দ্বারা তাহার শোধ দিতে পারিত, তবে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যখন চাকরের সাধ্য নাই যে, তোমার গায়ে হাত তুলে, তখন তুমি কি বিবেচনায় তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হও? যদি বল, বাপ ত ছেলেকে মারিতে পারেন, কিন্তু ছেলের সাধ্য নাই যে, বাপের গায়ে হাত তুলে। আমিও তাহাই বলি, যে ভাবে ছেলের গায়ে হাত তুলিয়া থাক, চাকরের গায়েও সেই ভাবেই হাত তুলিতে পার। কিন্তু আজি কালি ছেলেকেও প্রহার করা কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষাবিধান হইতে শারীরদণ্ড প্রায় উঠিয়া গেল। কিন্তু ছেলের প্রতি প্রহারের প্রয়োগ ন্যূন হইয়া চাকরের প্রতি উহা বাড়িতেছে কেন?

নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, চাকর মারা রোগটি আমাদিগের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। উটী অবৈধ অনুকরণের ফল। ইংরাজ মনিবেরা এ দেশীয় চাকরদিগকে মারেন। যাঁহারা সাহেবদিগের সকল কাজই সোণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারাও চাকরদিগকে মারেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, ইংরাজেরা স্বজাতীয় চাকর দিগের

গায়ে হাত বড় একটা তুলেন না। ফলতঃ স্থূলকথায় শারীর দণ্ডটী মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবার নহে। উহা পশুর প্রতিই প্রয়োগ হইতে পারে। বিজিত, বিমর্দ্দিত, অবজ্ঞাত মনুষ্যগণকে গর্ব্বিত স্বভাব লোকে পশুবৎ জ্ঞান করিতে পারে। কিন্তু একবর্ণসম্ভুক্ত, একভাষা ভাষী, এক ধর্ম্মাবলম্বী চাকর মনিবে এরূপ জ্ঞান সম্ভবে না। মনিব ধনশালী বলিয়া মানুষ, আর চাকর ধনহীন বলিয়া পশু হইতে পারে না। অমন স্থলে চাকর পশু হইলে মনিবও পশু হইবেন।

আমার একজন আত্মীয়ের সহিত চাকর মারা রোগ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, "এখনকার চাকর মনিবে পূর্ব্বাপেক্ষা পার্থক্য বাড়িতেছে। তখনকার মনিবেরা কিয়ৎপরিমাণে চাকরদিগের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহারা চাকরদিগের সহিত সমকক্ষভাবেই অনেক বিষয়ের আলাপ করিতেন, এই জন্য তখনকার চাকরদিগের মনিবের প্রতি অধিকতর স্নেহ মমতা জন্মিত। এখনকার মনিবেরা উন্নত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা চাকরদিগের প্রতি অনুজ্ঞামাত্র করিতে পারেন, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া আলাপ করিতে পারেন না। এই জন্য চাকরে মনিবে স্নেহ সম্বন্ধ অল্প হইয়াছে, এবং মনিবেরা চাকরদিগকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।" আত্মীয়বরের মতে এটী সভ্যতা বৃদ্ধির একটী লক্ষণ।

আমার বিবেচনায় ঐ মীমাংসা যথাযথ নহে। আমাদিগের মাতৃভূমি পরাধীন। পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বদেশীয় উচ্চপদস্থদিগের অবস্থার অবনতি। কোন জাতি যত দীর্ঘকাল পরাধীনতা ভোগ করিবে, সেই জাতির উচ্চপদস্থেরা ততই অবনমিত হইবেন—কদাপি উন্নমিত হইবেন না। তদ্ভিন্ন, সাম্যবাদী ইংরাজ জাতির প্রভুতায় এদেশীয় নীচপদস্থ লোকেরা উন্নত বই অবনত হইতেছে না। রাজব্যবস্থা এতদ্দেশজাত সকল লোককেই সমচক্ষে দেখিতেছে। শিক্ষাপ্রণালী দীন দুঃখী প্রজাব্যূহের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী করিতেছে। বর্ণভেদ, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রথা সমাজের অন্তর্ভূত মর্য্যাদা রক্ষা করিত, সেই সকল প্রথাও দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। এখন এতদ্দেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য বৃদ্ধির কোন কারণ নাই।

প্রত্যুত তাহার বিপরীত কারণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ফলকথা, পরাধীনতা সত্বে কখন কোন সমাজের অন্তর্ভূত উচ্চাংচভাব সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না। উহা ক্রমশঃ অপনীত হইয়াই যায়। আমাদিগের মধ্যে যে তাহাই হইতেছে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। ব্রাহ্মণ বাটীর ভোজে তিলি, তামুলি, কামার, কুমার সকলেই এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া খায়। আমরাও সর্ব্বোচ্চ ইংরাজ জাতির সমক্ষে পরস্পর পার্থক্যভাব পরিহারপূর্ব্বক একপঙ্‌ক্তিক হইয়া আসিতেছি। এখন যিনি বড় হইব মনে করিতেছেন, তিনি কেবল খুঁড়িয়ে বড় হইতেছেন। বাস্তবিক যাঁতার চাপে, সকল কলায় একসা হইতেছে।

আমার চাকরটী পূর্ব্বে একটি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল। সে বোধোদয়, চারুপাঠ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পুস্তক গুলির কিছু কিছু জানে, যখন আমার ছোট ছেলেটী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ বলিয়া লয়, সে দাঁড়াইয়া শুনে এবং ভুল হইলে দুই একটি ধরিয়া দিতে পারে। তাহারই বাপ, আমার পিতৃঠাকুরের নিকট চাকুরী করিত। সে লেখা পড়ার কোন ধার ধারিত না। আমার পিতৃঠাকুরের এবং আমার চাকরের বাপের মধ্যে যে অন্তর ছিল, আমাতে এবং আমার চাকরে তত অন্তর নাই, অথচ আমার পিতা তাঁহার চাকরের গায়ে [illegible] তুলিতেন না। আমি আমার চাকরকে মারিলেও মারিতে পারি—অন্তত: যদি [illegible] আমার [illegible] ব্যক্তি আমার বিশেষ কোন নিন্দা করিবেন, বোধ হয় না।

কিন্তু আর ও সকল কথায় কাজ নাই। বিচারের, হেতুবাদের, যুক্তি-কাটাকাটির সীমা পাওয়া দুর্ঘট। মনে করিলেই নূতন যুক্তি, নূতন হেতুবাদ, নূতন তর্ক, বাহির করা যাইতে পারে। তুল্য বুদ্ধিমান [illegible] মধ্যে বিতণ্ডার শেষ হয় না। অতএব একটি প্রকৃত বৃত্তান্ত ব[illegible] ভদ্র পরিবারের সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল [illegible] চাকর কখন কিছু চুরি করে নাই। টাকা, পয়[illegible] পড়িত, কিন্তু পাইলেই আনিয়া দিত। ঐ[illegible] বলিতেছিলেন—"আমি মনে করি, চাকুর[illegible] ছেলে[illegible]ধিক দয়ার পাত্র। ছেলেরা তোমার আমার [illegible], কাছেই থাকে [illegible] মা, চা[illegible]

তখন তাই পায়। ছেলেদের ব্যারাম হইলে তুমি আমি কাছ ছাড়া হই না। চাকরেরা পীড়ার যাতনায় অধীর হইয়া 'বাবা গো' 'মা গো' করিয়া চীৎকার করে; উহাদের বাপই বা কোথায়? মাই বা কোথায়? তুমি আমিই ওদের বাপ মা। তুমি চাকরকে বড় বিশ্বাস করিলে ত তাহার হাতে বাক্সের চাবিটী দিলে, কিন্তু চাকর তোমারই দয়ার উপর আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া রহিয়াছে।"

ঐ বাটীতে চাকরদিগের সাময়িক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম ছিল। প্রতি-বর্ষেই চাকর চাকরাণীদিগের কিছু কিছু মাহিয়ানা বাড়িত। ঐ বাটীতে চাকরেরা ইচ্ছা করিয়া বেতন ফেলিয়া না রাখিলে কাহার বেতন বাকী থাকিত না। সকলেই কড়া গণ্ডা বুঝিয়া পাইত।

ঐ বাটীতে চাকরদিগের মধ্যে যাহার যে কাজ, তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু একজনের পীড়া হইলে কি কেহ ছুটী লইলে অপরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহার কাজ আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত।

ঐ বাটীতে ছুটীর জন্য চাকরের মাহিয়ানা কাটা যাইত না। পীড়ায় চিকিৎসার এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যয়ও তাহারা সংসার হইতে পাইত, এবং কখন কাহাকেও হাঁসপাতালে পাঠান হইত না।

ঐ বাটীর চাকরেরা মিথ্যাবাদী এবং চোর হইত না।

—————

সপ্তদশ প্রবন্ধ।

—•(০)•—

পশ্বাদি পালন।

মনুষ্যের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে এই ভূমণ্ডল এমন অনেক প্রকার প্রাণীর নিবাসভূমি ছিল, যাহাদিগের নাম গন্ধও এক্ষণে নাই। মনুষ্যের সমকালে প্রাদুর্ভূত প্রাণিগণও অনেকে বিকৃত, পরিবর্ত্তিত এবং লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে মানুষের বুদ্ধি এবং ক্ষমতা যত বাড়িতেছে, অন্যান্য জীবগণের মধ্যে ততই কোনটী বা বিনাশ দশার সমীপবর্ত্তী হইতেছে, কোনটী বা মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। যে জীব মানুষের কোন কাজে লাগে, সেই জীবই বাঁচিতে পায়; যে মানুষের কোন কাজে না লাগে, সে জন্তুর আর বাঁচিয়া থাকিবার অধিক আশা করিতে পারা যায় না। জীবলোকের মধ্যে চিরকালই এইরূপ এক জীব অন্য জীবকে নষ্ট করিয়া আসিতেছে। ভূমণ্ডলের জীবপ্রতিপালন শক্তি যতই অধিক হউক ঐ শক্তি অসীম নয়। সুতরাং অন্যত্র এক প্রকার জীবের বৃদ্ধিতে অপর প্রকার জীবের বিকৃতি, হ্রাস এবং বিনাশ সাধিত হইয়া যায়, মনুষ্যের বৃদ্ধিতে সকল জন্তুর সেই দশা হইয়া যাইতেছে। এখন মানুষ পৃথিবীর রাজা। তিনি আপনার কোন কাজে লাগাইবেন বলিয়া যাহাকে রাখেন, সেই থাকে। তাঁহার সংরক্ষিত জীবের মধ্যে গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তু প্রধান—কতকগুলি পক্ষীও মনুষ্য-কর্ত্তৃক পালিত হয়—যথা, টিয়া, কাকাতুয়া কোকিল, ময়না, দোয়েল, শ্যামা প্রভৃতি। প্রায় এমন গৃহস্থের ঘর নাই, যাহাতে কোন পশু বা পক্ষীর পালন না হইয়া থাকে, অনেক পশু পক্ষী মনুষ্যের সাক্ষাৎ প্রয়োজনসাধন করে। গোরু হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়, ঘোড়াদ্বারা যাতায়াতের সৌকর্য্য হয়, ছাগ মেষাদির দুগ্ধ এবং মাংস মনুষ্যের খাদ্য। কুক্কুর বাটীর চৌকীদার—বিড়াল ইঁদুর মারে। কিন্তু এই সকল দৈহিক এবং বৈষয়িক প্রয়োজন-সাধন ভিন্ন পশু পক্ষ্যাদি পালনবশতঃ গৃহস্থের অনেকগুলি আধ্যাত্মিক উপকারও লাভ হইতে পারে। আমি তাহারই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

পশ্বাদি পালনদ্বারা অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ হইতে উহাদিগের সুখ দুঃখ সৌন্দর্য্য অসৌন্দর্য্য ঔচিত্য অনৌচিত্যবোধ পৃথগ্‌ভূত নয়। ঐ সকল বিষয়ে মনুষ্য এবং পশু উভয়েরই বুদ্ধি এবং সংস্কার একবিধ —কেবল মাত্রায় ভিন্ন। মাত্রা ভেদ পরস্পর মনুষ্যদিগের মধ্যেও আছে। যাহা হউক, মনুষ্যের বুদ্ধি ও পশ্বাদির সংস্কার যে এক পদার্থ এই তথ্যটীর জ্ঞান আজ পর্য্যন্তও সকল লোকের মধ্যে সমপরিমাণে সুপরিস্ফুট হয় নাই। ইহা আমাদিগের আর্য্য শাস্ত্রকারেরাই বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহারা বলিতেন জীব নিজ কর্ম্মবশে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সকল জীবই এক—বিভিন্ন নয়। খৃষ্টানেরা এবং মুসলমানেরা ওরূপ বলেন না। তাঁহাদিগের মতে পশ্বাদির শরীরে অবিনাশী আত্মা বিদ্যমান নাই—উহা কেবল মাত্র মনুষ্য শরীরেই আবির্ভূত। কিন্তু যে সকল নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিত পশ্বাদির প্রকৃতি পরীক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, মনুষ্য এবং পশুতে ওরূপ পার্থক্যের আরোপণ অমূলক কল্পনা মাত্র। তাঁহারা জানেন যে, একই অপ্রতর্ক্য শক্তি জড়পদার্থে জড়ধর্ম্মরূপে, উদ্ভিদে অন্তঃসংজ্ঞারূপে, পশুপক্ষ্যাদিতে অস্ফুট সংস্কাররূপে—এবং মনুষ্যে প্রজ্ঞারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় এই মায়াপ্রপঞ্চময় জগতের মধ্যে এক নিত্য সদসদাত্মক বস্তুর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গৃহীমাত্রেই আপনাপন পালিত পশু পক্ষ্যাদির বৃত্তি সমুদায় অভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত জ্ঞান লাভের পথ স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। যিনি ঐরূপ করিয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন যে, পশু পক্ষ্যাদি যে কেবল কাম ক্রোধ ঈর্ষ্যাদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া থাকে এরূপ নহে. তাহারা ধীশক্তির সহযোগে, কি করিলে কি হইবে, ইহা নির্ণয়পূর্ব্বক যথোচিত কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্টসাধন করিতে পারে—অত্যাচারে বশীভূত হইয়া আপনাদিগের বাসনা দমন করিতে পারে—এবং যদি কদাচিৎ অনুচিত কাজ করিয়া ফেলে, তবে তিরস্কৃত হইলে অপ্রতিভ হয়। একটী প্রকৃত বিবরণ বলিলে এই কথাগুলি অধিকতর স্পষ্ট হইবে।

কোন ব্যক্তি একটী বিড়াল পুষিয়াছিলেন। তিনি এক দিন ভোজন

করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার দুইটী ছোট নাতিনী এক পার্শ্বে, এবং বিড়ালটী অপর পার্শ্বে। কর্ত্তা আহার করিতে করিতে নাতিনীদিগকে এবং বিড়ালটীকে কিছু কিছু দিতেছেন; এমন সময়ে নাতিনীরা হঠাৎ কান্না ধরিল। কর্ত্তা তাহাদিগের কান্না থামাইবার নিমিত্ত প্রবোধ দিতে লাগিলেন। উহারা থামে না—কোন কোন ছেলে কান্না ধরিলে আর থামিতে চায় না। নিউটন জড়ের গুণ আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, জড়পদার্থ স্থির আছে ত স্থিরই থাকে, যদি চলিতে আরম্ভ করে তবে চলিয়াই যাইবে সেই জড়ধর্ম্ম যেন ঐ সকল ছেলেকে একবারে পাইয়া বসে, এবং তাহাদিগের কান্নাকে চিরস্থায়ী করিয়া তুলিবার উপক্রম করে। নাতিনীরা সেইরূপ কান্না ধরিল। কর্ত্তা তাহাদিগকে ভুলাইতেই ব্যস্ত—তাঁহার খাওয়া হয় না—বিড়ালটীও কিছু পায় না। বিড়ালটী ক্ষণকাল এই ব্যাপার দেখিল। সে যে পার্শ্বে ছিল, সেই পার্শ্ব হইতে উঠিয়া নাতিনীদিগের নিকট গেল, আপনার ডাহিন থাবাটী অল্পে অল্পে উঠাইল—যেন দেখাইল যে সে নখর বাহির করে নাই, এবং একটী নাতিনীর গালে একটী চড় মারিল! বিড়ালের চড়ে নাতিনীটী অমনি চুপ করিল। সে চুপ করায় অপরটিও চুপ করিল। বগির চাকার এক খানা থামিলেই দুই খানা থামে। বিড়াল আপনার স্থানে আসিয়া বসিল।

প্রকৃত ব্যাপারটী যেমন দেখিয়াছি অবিকল লিখিলাম। যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনি বুঝিয়া লউন—বিড়াল, নিজ খাদ্যের অপ্রাপ্তির হেতু কর্ত্তার অমনোযোগ; সেই অমনোযোগের কারণ নাতিনীদিগের কান্না; সেই কান্না নিবারণের উপায় তাহাদিগের গালে চড় এবং সেই চড় কেবল মাত্র ভয় প্রদর্শনের জন্য—তাহাদিগকে কষ্ট প্রদানের জন্য নয়, অতএব নখর অপ্রকাশ রাখা উচিত—এই সকল ভাব নিজ মনোমধ্যে পরিগ্রহ পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিল কি না?—ইহারই মধ্যে ধীশক্তি আত্মসংযম এবং ঔচিত্যবোধের সম্যক্ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না?

পশুদের পালনে স্থির প্রতিজ্ঞতা অভ্যস্ত হয়। পশুকে বশ করিবার মূল মন্ত্র নির্ভীকতা। অশ্ব, মহিষ গোরু, কুকুর প্রভৃতিকে দেখিয়া যদি [illegible] ভয়ের অনুভব করিলে, তবে সেই ভয়ের লক্ষণ তোমার

আকার ইঙ্গিতে অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। যে পশু হইতে তোমার ভীতির সঞ্চার হইতেছে, সে অবশ্যই তাহা বুঝিবে, এবং তাহা বুঝিলেই আর তোমার বশ হইবে না। জীব মাত্রেই বীরের বশ। যাঁহারা ঘোড়া চড়েন, কুকুর পোষেন, তাঁহারা সম্যক্‌রূপে এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন। ঘোড়াকে তাহার নিজ অভিলাষানুযায়ী কাজ করিতে দেওয়া অবিধেয়—সে তোমারই ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া চলিবে, দুই একবার যত্নপূর্ব্বক এরূপ করিতে পারিলেই ঘোড়া তোমার বশ হইল। কুকুরকেও কথা শুনান অভ্যাস করাইবার নিমিত্ত স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। যে আজ্ঞা পালন করায় কুকুর তাহারই অধিক বশ হয়, যে আজ্ঞাপালন না করায় তাহার বশ হয় না। যাঁহারা পশুদিগকে বশীভূত করিতে অভ্যাস করেন, মানুষ বশ করিবারও একটী প্রধান উপকরণ তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়া উঠে। ইউরোপীয়েরা এই কথার প্রমাণ। তাঁহাদের ঘোড়া কুকুর প্রভৃতি যেমন বশ এমন কাহার নয়—পৃথিবীতে তাঁহাদের যেমন প্রতাপ এমনও আর কাহার নয়।

তৃতীয়তঃ, পশ্বাদির সুপালন করিতে হইলে গৃহস্থকে নিয়তাচার হইতে হয়। উহাদিগের শরীর এবং আবাস যথোচিত সুপরিষ্কৃত রাখা চাই, এবং উহাদিগকে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত পরিমাণে আহার দেওয়া চাই। গৃহী খামখেয়ালী হইলে—আজি করিলাম কালি করিলাম না, এখন দেখিলাম, তখন দেখিলাম না—এরূপ করিলে পশ্বাদির পালন হয় না। গৃহস্থ নিয়তাচার না হইলে পশ্বাদি সর্ব্বদা পীড়িত হয় এবং প্রায়ই মারা পড়ে।

পালিত জীবের প্রকৃতিভেদে তাহাদিগের পালন কার্য্য বাটীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি সমর্পণ করা যাইতে পারে। কুমারীগণ পক্ষিদিগকে, কুমারেরা কুকুর, ছাগল, মেষাদিকে, চাকরেরা অশ্ব গবাদিকে আহার দিবে। কিন্তু গৃহকর্ত্রীকে প্রত্যহ যথা সময়ে সকলগুলির তত্ত্বাবধান অবশ্য করিতে হইবে। শুদ্ধ কাণে শুনিয়া থাকিলেই চলিবে না—প্রত্যেক পশু পক্ষীকে প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখিতে হইবে।

একটী পরিবার একটী ব্রহ্মাণ্ড। গৃহকর্ত্রী ঐ ব্রহ্মাণ্ডের পালিকা—তিনি সম্যক্ নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য কাহার হস্তে ইহার পালন ভার সমর্পণ করিতে

না। মহাবল ভীমেরও হস্তে পৃথিবীর পালনভার দিনৈকের নিমিত্ত হওয়ায় অপালন বশতঃ অনেকগুলি জীবের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গৃহিণী স্বয়ং না দেখিলে পোষিত পশুদিগেরও সেইরূপ অপালন এবং বিনাশ হয়।

অষ্টাদশ প্রবন্ধ।

পিতামহ ঠাকুর।

বাল্যকালে আমি অনেক লোকের মুখে তাঁহাদিগের স্ব স্ব পিতামহ পর্য্যায়স্থ লোকের গল্প শুনিতে পাইতাম; এখন আর তত লোকের মুখে তাঁহাদিগের পৈতামহিক বিবরণ শুনিতে পাই না। কেন যে এরূপ হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। সামাজিক ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বশতই হউক, কিম্বা মনুষ্যের আয়ুষ্কালের খর্ব্বতা বশতই হউক, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যে পৈতামহিক ঘনিষ্ঠতা কম হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ ঘনিষ্ঠতার হ্রাস বিবেচনায় ঐ সম্বন্ধটীর লাঘব হওয়া বিলক্ষণ ক্ষোভের বিষয়। পিতামহের সহিত পৌত্রের সম্বন্ধটীর বড় মধুর। উহাতে গুরুতা এবং লঘুতা জড়িত হইয়া এমন অপূর্ব্ব পদার্থ জন্মে যে তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে গেলে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইতে হয়।

পিতামহ ঠাকুর, পিতার পিতা মহাগুরুর মহাগুরু—ঈশ্বরের ঈশ্বর তিনি কেমন ভয় এবং ভক্তির পাত্র। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়াও আমাদিগের বাক্যমনের অগোচর থাকেন না। আমাদিগের ক্রীড়া কৌতুকে হাস্য পরিহাসে, কষ্টি নষ্টিতে যোগ দেন—শুদ্ধ যোগ দেন না, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া কৌতুকাদির উত্তেজনা করেন। বঙ্গভাষায় পিতামহকে যে ঠাকুর দাদা বলে, তাহা ভালই বলে। তিনি ঠাকুর অর্থাৎ দেবতা, এবং তিনি দাদা অর্থাৎ ভাই, সমকক্ষ ব্যক্তি—দেবত্ব এবং সমকক্ষতা একাধারে

পিতামহের স্নেহ, পিতৃস্নেহ অপেক্ষা গাঢ়তর না হউক, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মধুরতর পদার্থ। পিতৃস্নেহে অনিষ্টের আশঙ্কা প্রবলতর, অনিষ্টাশঙ্কিতার ভাগ অত্যধিক। পিতামহ তত অনিষ্টের শঙ্কা করেন না, তত পরিণামও ভাবেন না। তিনি পৌত্রটীকে লইয়া কেবল মাত্র আনন্দ-ভোগেই মুগ্ধ থাকেন। শিশু পৌত্রও যেমন ভূত ভবিষ্য কিছুই চিন্তা করে না, কেবল বর্ত্তমান সুখভোগেই পরিতৃপ্ত থাকে, পিতামহের অন্তঃকরণও কিয়ৎপরিমাণে সেই অবস্থায় অবস্থিত। পিতা, পুত্রকে লইয়া যখন ক্রীড়া করেন, তখনও ক্রীড়াব্যপদেশে কি কি সুশিক্ষা প্রদান করিবেন, তাহার চিন্তা করিতে থাকেন। পিতামহ যখন পৌত্রকে লইয়া খেলা করেন, তখন আপনিও প্রকৃতরূপে তাহার খেলুড়ি হইয়া উঠেন। পিতা যখন পুত্রের মুখে কোন খাদ্য সামগ্রী দেন, তখন উহা তাহার শরীরের পক্ষে উপকারী হইবে কি না, ভাবিয়া দেখেন; পিতামহ যখন পৌত্রকে খাওয়াইয়া দেন, তখন আর কিছুই না ভাবিয়া আপনিই যেন সেই তরুণ রসনা সহকারে খাদ্যসামগ্রীর রসাস্বাদন করেন।

ফলতঃ, পিতা মাতার অন্তঃকরণে পুত্র সম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় ভয় চির-বিরাজমান। পিতামহের অন্তঃকরণে ঐ ভয়ের ভাব স্বল্পতর—সুখবোধেরই প্রাচুর্য্য। লোকে কথায় বলে আসলের চে'য় সুদের মায়া বড়—আসল পুত্র, সুদ পৌত্র। বাস্তবিক সুদের উপর মায়া খুব বটে, সুদ পাইলে যার পর নাই সুখ হয়; কিন্তু আসলের উপর ভয় বেশী। সুদ ছাড়া যায়—আসল ছাড়া যায় না। আমাদিগের শাস্ত্রে বিধাতাকে পিতামহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। আমার মতে পিতৃসম্বোধন অপেক্ষা পিতামহ সম্বোধন বিধাতার প্রতি সমধিক সঙ্গত। ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতিগণ—বিভিন্ন জীব শক্তি। ব্রহ্মা জীব শক্তি রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। কিন্তু জীবশক্তি-জনিত প্রতি প্রাণীর রক্ষার জন্য বিধাতাকে তেমন সযত্ন বোধ হয় না। তিনিও আসল রাখিয়া সুদ ছাড়িতে পারেন।

পিতামহের অন্তঃকরণে পৌত্র সম্বন্ধে ভয়ের ভাব লঘু হয় বলিয়া তিনি পৌত্রের প্রকৃতি সমধিক পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারেন। বাপ মায়ের মন সন্তান সম্বন্ধে সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। এই তাহাকে খুব ভাল ছেলে মনে

[illegible] আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন, আবার পরক্ষণেই অতি সামান্য কারণে তাহার বুদ্ধি চরিত্র এবং ভাগ্য মন্দ হইবে ভাবিয়া দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন। পিতামহের অন্তঃকরণ সেরূপ আন্দোলিত হয় না। তিনি পৌত্রের দোষ গুণ প্রায় যথাযথ পরিমাণেই দেখিতে পান।

পিতামহ পৌত্রের দোষ গুণ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পান, অথচ তিনি বয়স্যভাবও ধারণ করিতে পারেন, এই দুই কারণের একত্র সমাবেশ হওয়াতে পিতামহ ঠাকুরই শৈশবের অদ্বিতীয় সুশিক্ষক। মাতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদাত্রী হইতে পারেন বলিয়া প্রথিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা দেবীর নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, স্যর উইলিয়ম জোন্স সাহেবের বিদ্যানুরাগিতা তাঁহার মাতার শিক্ষাগুণেই জন্মিয়াছিল; প্রেসিডেন্ট গারফীল্ডও তেমন মা না পাইলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বনকুটির হইতে সৌধ-রাজভবনে আগমন করিতে পারিতেন না। পিতামহের স্থানে প্রাথমিক শিক্ষালাভের ফলবত্তা ওরূপ কোন সুপ্রসিদ্ধ বিবরণের উল্লেখ করিয়া সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু তাহা না হউক, যদি পিতামহের স্থানে প্রথম শিক্ষালাভ কাহার ভাগ্যে ঘটে তবে তিনি বুঝিতে পারেন যে সেই শিক্ষার ফলবত্তা মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষাও অধিক।

"ছেলেটা আমার চেয়ে ঠাকুরের নিকটে থাকিতে অধিক ভালবাসে—ঠাকুরের সহিত ওর সব পরামর্শ—তাঁহার সহিতই উহার মনের মিল"—এইরূপ কথা অনেক পুত্রবতীকেই বলিতে হয়। শাস্ত্রেও বলে, পৌত্র জন্মিলে পুত্রের পিতৃ ঋণ পরিশোধ হয়। যাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবে, তাহাকে উত্তমর্ণের হস্তে সমর্পণ না করিলে ঋণ পরিশোধ হইবে কিরূপে?

——(*)——

উনবিংশ প্রবন্ধ।

—:•::•:—

পিতামাতা।

এক দিন কোন আত্মীয়ের সহিত আমার ঘোরতর বাদানুবাদ হইয়াছিল। বিচারের বিষয়—"কে বড় ?—বাপ কি মা ? আজি কালি এমন দিন পড়িয়াছে যে, উচ্ছৃঙ্খল মনুষ্যবুদ্ধি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে যাইতেছে। তর্ক, নারদ ঋষির ন্যায় ত্রিলোক মধ্যে অব্যাহতগতি হইয়াছেন।

যাহা হউক, আমাদিগের দুই জনে তুমুল বিচার বাধিয়া গেল। অন্যান্য যুক্তি প্রদর্শনের মধ্যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় লইয়াও বাদানুবাদ হইল। আত্মীয়বর "গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী" এই বচনটীর আবৃত্তি করিয়া মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। আমি ওরূপ কোন স্পষ্ট বচনের জোর পাইলাম না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মাতৃদেবী কৌশল্যার নিবারণসত্বেও পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ বনগমন করিয়াছিলেন, এবং বিষ্ণুর অবতার ভগবান পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, এই সকল পৌরাণিক ইতিবৃত্তদ্বারা পিতৃপ্রাধান্য সমর্থন করিতে লাগিলাম। পরস্পরের বিদ্যা বুদ্ধির ঘর্ষণে ক্রোধস্ফুলিঙ্গও মধ্যে মধ্যে উদ্গত হইতে লাগিল। মতভিন্নতার হেতুবাদও উল্লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। আত্মীয়বর বলিলেন,—"আপনি বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা এবং তেজস্বিতার পক্ষপাতী, এই জন্য পিতৃপ্রাধান্যের পক্ষ, আমি সরলতা এবং নম্রতার ভক্ত, এই জন্য মাতৃ প্রাধান্যের পক্ষ।" আমি উত্তর করিলাম, "সরলতা এবং নম্রতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ন্যূন নহে—আমি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের বিদ্বেষ্টা।" "মাতৃপক্ষ অবলম্বনে উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বর্দ্ধন কি প্রকারে হয় ?" আমি বুঝাইয়া বলিলাম—

"দেখুন, এখনকার অনেক লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে চায়। সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করাতেই যেন একটা ভারী বাহাদুরি আছে, এরূপ মনে করে। যাহারা এরূপ করে, তাহারাই পিতৃভক্তি অপেক্ষা মাতৃভক্তির অধিক গৌরবও করে, এবং যে প্রকার কৌশলে পারে আপনারা

যে খুব মাতৃভক্ত তাহাই লোককে জানায়। মাতৃভক্তির খোসনাম বাহির করা সহজ ব্যাপার। কাহার মাতৃভক্তি সত্য সত্যই কিরূপ, তাহা বাহিরের লোকের পরীক্ষা করা প্রায় অসাধ্য। তদ্ভিন্ন মাতৃভক্তি প্রকাশ করিতে আপনাকেও বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় না; প্রায় কোন স্বার্থত্যাগই করিতে হয় না। বাপ ছেলেকে আপনার কথা শুনাইতে চান, কিন্তু উপযুক্ত পুত্রের কথা শুনাই মায়ের কর্ত্তব্য। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব পুত্রের পক্ষে পিতৃভক্তি রক্ষা করা যেমন কঠিন, মাতৃভক্তি রক্ষা করা কখনই তেমন কঠিন হইতে পারে না। মাকে 'তুমি বুঝিতে পার না' বলা চলে; বাপকে ও কথা বলিবার যো নাই। পিতৃভক্তির অপেক্ষা মাতৃভক্তির প্রাধান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের পোষক।"

আত্মীয়বর একথার কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিচারটীতে জয়ী হইবার নিমিত্ত তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। অতএব তিনি কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—"চলুন, দুই জনে আপনার পিতৃ ঠাকুরের নিকটে যাই, এবং তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানি; তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন উভয়ে তাহাই স্বীকার করিব।" আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম না যে, পিতা ঐ বিচারের মীমাংসা করণে অক্ষম হইবেন; এবং তাঁহার সহজ ঔদার্য্যই তাঁহাকে স্বপ্রতিপক্ষ পক্ষের পক্ষপাতী করিয়া তুলিবে। তাহাই হইল—আমি হারিলাম। হারিলাম বটে, কিন্তু এই বিচারসম্বন্ধে নিজ পত্নীর অভিমতি জানিতে ইচ্ছা হইল। তিনি বলিলেন —"ছেলেরা তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে ভক্তি করিতে পারে না। তোমার প্রতি ভক্তি করিলেই তাহাদের আমার প্রতি ভক্তি করা হয়। গাছের মাথায় জল দিলেই গোড়ায় জল পায়। ছেলেরা তোমাকে ভাল করিয়া রাখিলে আমি অবশ্যই ভাল থাকিব। তোমাকে কিছু দিয়া আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করা তাহাদিগের অসাধ্য। তোমার প্রতি ভক্তিই ভক্তি— আমার প্রতি ভক্তি কিছুই নয়। আমাকে যাহা বুঝাইবে, ভাল হউক মন্দ হউক, আমি তাহাই বুঝিব। তোমাকে যাহা বুঝাইতে পারিবে তাহাই সত্য।"

ঐ কথাগুলির অভ্যন্তরে একটী প্রধান তথ্য নিহিত আছে। পুরুষের সম্মান তাঁহার নিজের সাক্ষাৎ সম্মান না হইলে হয় না, স্ত্রীলোকের সম্মান

স্বামীর সম্মানেই হইতে পারে। সেই জন্যই মাতৃভক্তি পিতৃভক্তির অন্তর্নি-বিষ্ট হওয়া উচিত। মায়ের কথা না শুনিয়া বাপের কথা শুনায় মায়ের অপমান বোধ হইতে পারে না; কিন্তু বাপের কথা না শুনিয়া মায়ের কথা শুনিলে বাপের অপমান বোধ হয়। শিব ভগবতীর পূজা একত্র হওয়াই শাস্ত্রানুমত। যদি ভগবতীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়, তাহা শিবপূজার পরে। শিব শরীরেই ভগবতীর পূজা করিবার বিধি আছে; ভগবতীর শরীরে শিব পূজার বিধি নাই।

—•••—

বিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

পুত্র কন্যা

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পুত্র এবং কন্যা সন্তানে যত ইতর বিশেষ করিতেন শুনা যায়, আমরা বোধ হয় আর তত করি না। অনেকেই বলিয়া থাকেন, পুত্র ও যে পদার্থ কন্যাও সেই পদার্থ। বাস্তবিক তাহাই কি?

পুত্র কন্যায় বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আছে। কন্যার ভার অল্প, পুত্রের ভার অধিক। কন্যার লালন, পালন, শিক্ষাসম্পাদন বড় অধিক করিতে হয় ত ১৪ ১৫ বৎসর মাত্র। তাহার পরে কন্যার ভার জামাতার প্রতি অর্পিত হয়। পুত্রের লালন, পালন, শিক্ষাসম্পাদন এবং বৃত্তিসংস্থান ২০।২৫ বৎসরেও শেষ হয় না। অতএব গৃহস্থ লোকের পক্ষে কন্যার ভার অপেক্ষা পুত্রের ভার অনেক অধিক।

পক্ষান্তরে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সহিত সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ হয়। ঐ সম্বন্ধের শেষ নাই বলিলেও চলে। একত্রাবস্থান, পরস্পর পরামর্শগ্রহণ, অন্যোন্যের সহায়তা করা, যাবজ্জীবন চলিতে পারে—চলিয়াও থাকে। যাঁহাকে কন্যাদান করিলে তিনি কায়মনে ভাল থাকিলেই কন্যার সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে। তিনি ভাল না থাকেন, অথবা ভাল না হয়েন, তুমি বিশেষ কিছুই করিতে পার না। নিজ সামর্থ্যানুসারে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিতে পার, জিজ্ঞাসা না করিতে করিতেও পরামর্শ প্রদানে উন্মুখ হইতে পার, কিন্তু তাঁহার উপর তোমার কোন জোর খাটে না। যাহাতে হাত না থাকে, বোধ হয়, তাহাতে মমতাও ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া আইসে। সুতরাং কন্যা সন্তানের সম্বন্ধে যে প্রকারে হউক, এক প্রকারে নিশ্চিন্ততা ঘটিয়া যায়।

পুত্র সন্তানকে কাহাকেও দান করা হয় না। পুত্রবধূকেও পুত্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিবার ত অধিকার আছেই, স্থলবিশেষে সাক্ষাৎ শিক্ষা-দানেও অধিকার হয়। ঐ অধিকার থাকাতে ক্রমশঃ মমতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। সুতরাং কন্যা অপেক্ষাও পুত্রবধূ অধিকতর স্নেহভাগিনী হইয়া

উঠেন। পুত্র, পরকে আপনার করিয়া দিতে পারে ; কন্যা আপনার হইয়াও পর হইয়া যায়।

কিন্তু আপনার কন্যার সুখ দুঃখের হর্ত্তা কর্ত্তা আর একজন হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া কন্যা সম্বন্ধে মনে এক প্রকার ঔদাসীন্য জন্মে—এবং সেই ঔদাসীন্য নিবন্ধন কন্যার প্রতি মনটী বড়ই নরম হইয়া থাকে। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে পিতা যেন হারান ধন ফিরে পান। তাঁহার আর কাহার দিকে মন থাকে না। কন্যার সহিত কথোপকথন করিবেন, দৌহিত্র দৌহিত্রীকে লইয়া কোলে পিঠে করিবেন, কন্যা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন এই সকল সাধ যায়। বাস্তবিক কি কন্যার প্রতি তাঁহার মমতা অধিক ; সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে!

কোমত দর্শনের স্থলবিশেষে উপদেশ আছে যে, মনুষ্যগণ ভূত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের তিনটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারীরূপে কল্পনা করিয়া পূজা করিবেন। মাতা অতীতকালের অধিষ্ঠাত্রী, ভার্য্যা বর্ত্তমান কালের অধিষ্ঠাত্রী এবং কন্যা ভবিষ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী। পণ্ডিতবর কোমতের কন্যা সন্তান হইয়াছিল বোধ হয় না। তাহা হইলে তিনি জানিতেন যে, যদিও স্থূলদর্শনে কন্যাসন্তান ভবিষ্যকালের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়েন, তথাপি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহার বৈপরীত্যই লক্ষিত হয়। কন্যা সন্তান সম্বন্ধে মানসিক দৃষ্টি ভবিষ্যকালকে লক্ষ্য করে না—অতীত কালকেই লক্ষ্য করে। কন্যাসন্তান যখন বড় প্রীতির পাত্র হয়, তখন 'হারাধন' রূপেই প্রীতি পায়। কন্যাকে লইয়া যে সুখ হয়, তাহা স্মৃতির সুখ, আশার সুখ নয়, কন্যা সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু ভাবিতে যাই, তাহা তাহার এবং আপনার অতীত কাল লইয়াই ভাবি—তাহার বিষয়ে ভবিষ্য ভাবনা প্রায় কিছুই করি না। সে ভাল থাকুক, তাহার খুব ভাল হউক, এরূপ আশীর্ব্বাদ এবং প্রার্থনা করি বটে ; কিন্তু তাহার এমন হউক, এই হউক, অথবা ঐ হউক,—এরূপ কোন কামনাই কন্যার সম্বন্ধে মনোমধ্যে স্বতঃ উত্থিত হয় না।

কন্যা সম্বন্ধে মনুষ্য মনের এই ভাবটী সাধারণতঃ জানা থাকা ভাল। এইটী অনেকের জানা নাই—বিশেষতঃ অল্প বয়সে প্রায়ই কেহ জানিতে পারে না। এই অজ্ঞতা সাংসারিক অনেক কষ্টের কারণ হয়। বিশেষতঃ পুত্রবধূর এবং

পুত্রের মনে প্রায়ই ঐ অজ্ঞতা নিবন্ধন ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন কর্ত্তা তাঁহাদিগের অপেক্ষা কন্যাগণের ও তৎসন্তানবর্গের প্রতি সমধিক স্নেহবান। বাস্তবিক কর্ত্তার স্নেহ দুহিতা ও দৌহিত্রাদির প্রতি যতই অধিক থাকুক, পুত্র পুত্রবধূর উপরেই তাঁহার মমতা অধিক। দুহিতা দৌহিত্রেরা কর্ত্তার 'হারান ধন' বলিয়াই তাহাদিগকে পাইয়া কর্ত্তার অত ভদ্গতভাব। কন্যা বাটীতে আসিলে কর্ত্তার মনে কত পূর্ব্ব বিবরণ, কি ভাবে উঠিতেছে, তাহা কে বলিবে? স্মৃতি জাগরূক হইয়া পূর্ব্বানুশোচনার কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তজ্জন্যই চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবারির বিসর্জ্জন হইতেছে।

আবার বলি, যাহার উপর জোর খাটিতে পারে বলিয়া মনে মনে বোধ হয়, তাহারই প্রতি মমতা থাকে। যাহার উপর কোন জোর চলে না, তাহার প্রতি মমতাও ন্যূন হইয়া যায়। কোন ছেলেকে একটী পুতুল দেখাইয়া বল, ঐটী তোমার পুতুল, এই বলিয়া পুতুলটী একটী উচ্চস্থানে রাখিয়া দেও—ছেলে যেন পুতুলটী ছুঁতে ধরিতে না পারে। সে ছোঁবার ধরিবার জন্য একবার, দুইবার চারিবার কাঁদিবে। তাহার পর আর কিছুই করিবে না। পুতুলের প্রতি তাহার বিশেষ মমতাই জন্মিবে না। আমরাও বড় ছেলে বইত নয়? আমাদিগের কন্যাসন্তান ঐরূপ পুতুল—আমাদের বটে, কিন্তু আমরা উহাকে লইয়া কিছুই করিতে পাই না বলিলেই হয়। আর কত কাঁদিব—ক্রমে ক্রমে মায়া ছাড়িয়া দি।

কন্যাসন্তানের পৈতৃক বিষয়ে অধিকারী হওয়া উচিত কি না? মুসলমানদিগের আইনে, ফরাসীদিগের আইনে, ইটালীদিগের আইনে এবং অপরাপর নব্য ইউরোপীয় আইনে, কন্যাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিবার বিধি আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে এবং ইংরাজদিগের শাস্ত্রে সেরূপ বিধি নাই। দায়ভাগের ব্যবস্থা কেবল মাত্র প্রজার মনের ভাব বুঝিয়া প্রস্তুত হয় না। অর্থশাস্ত্র এবং রাজনীতিশাস্ত্রের কতক বিচারও ব্যবস্থার প্রণয়নে প্রবেশিত হইয়া থাকে। সে সকল শাস্ত্রের বিচার বড় জটিল, তাহা বহুমুখ এবং দেশের অবস্থা ও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়। অতএব ও বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

আমি বলি, পিতা আপন জীবদ্দশাতেই কন্যা সন্তানদিগকে কিছু কিছু দিবেন—একে বারে নয়—মধ্যে মধ্যে দিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কন্যা সন্তানের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার না হওয়াই ভাল। তাই ভগিনীতে জ্ঞাতিবিরোধের পথ খুলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

একবিংশ প্রবন্ধ।

ভাই ভগিনী।

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধটী বড় সুমিষ্ট। শৈশব হইতে একত্রে থাকা, একত্রে শিক্ষালাভ, একত্রে সুখ দুঃখ ভোগ, এই সকল কারণে ভাই ভগিনীদিগের মধ্যে একটি গূঢ়রূপ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা থাকিলেও, তাহাতে ঈর্ষা থাকে না। পরস্পরের মধ্যে সাহায্যদান থাকিলেও অহঙ্কার থাকে না; পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ থাকিলেও আত্মগ্লানি থাকে না। ভাই-ভগিনীদের সম্বন্ধটী মূলতঃ সাম্য সম্বন্ধ এবং সকল অবস্থাতেই ঐ সাম্য ভাবটী উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। উহাদিগের মধ্যে কালক্রমে যিনি যত ছোট হউন, কখনই তাঁহার অন্তর্ভূত সাম্য-ভাবটী একেবারে অপনীত হইয়া যায় না। আমরা এক বাপ-মায়ের ছেলে, ভাই ভগিনীরা কখনই এই তথ্যটী ভুলিতে পারে না এবং যাহারা ঐ তথ্যটী বিশিষ্টরূপেই স্মরণ রাখিতে পারে, তাহারাই পরস্পরের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিতে পারে।

ঐ সূত্রটী স্মরণ থাকিলে এবং উহার অনুযায়ী কার্য্য করিলে যে, ভাই-ভগিনীরাই আপনাপন কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মবৃদ্ধি করিতে পারে তাহাই নহে; ঐ সূত্রই উহাদিগের পরস্পর কর্ত্তব্যাবধারণের পথ। ঐটী মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে, পিতা-মাতাও উহাদিগের পক্ষে ধার্য্য পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনাদের করণীয় সুনির্ব্বাহিত করিতে পারেন। আপনাদিগের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পর সাম্যভাব উদ্রিক্ত হইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হয়; অতএব শৈশব হইতেই ঐ সাম্যভাবের বীজ তাহাদিগের হৃদয়ে বপন করা কর্ত্তব্য।

এই কাজটি সুসম্পন্ন হইবার কয়েকটী অন্তরায় আছে। এক অন্তরায় কন্যা-পুত্রের ইতর বিশেষ। যিনি যাহা বলুন, সকল সমাজেই ঐ পার্থক্য আছে, এবং তাহা থাকিবার যথেষ্ট কারণও আছে। অপর কোন কারণের এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই মাত্র বলিব যে, একটী

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই, কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের জীবনী-শক্তি শৈশবে অধিকতর ক্ষীণ থাকে। সূতিকাগারে অনেক ছেলে মারা যায়—কিন্তু কন্যা সন্তান দুইটীর স্থলে পুত্র সন্তান পাঁচটী মারা যায়; আর পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা সন্তান ছয়টীর স্থানে পুত্র সন্তান আটটী মারা যায়; আর দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা সন্তান দশটীর স্থানে পুত্রসন্তান চৌদ্দটী মারা যায়, আর ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কন্যা সন্তান চৌদ্দটীর স্থানে পুত্র সন্তান পনরটী মারা যায়। ষোল সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, পুত্রের জীবন কন্যার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়ায়। এই নৈসর্গিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়াই সকল সমাজে কন্যার অপেক্ষা শৈশবে পুত্রের প্রতিপালন যত্ন কিছু অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আধিক্য নিবন্ধন কন্যাদিগের হৃদয়ে যে বিশেষ ঈর্ষা জন্মে তাহা বোধ হয় না। কন্যাদিগের ধীশক্তি পুত্রদিগের ধীশক্তি অপেক্ষায় অধিক শীঘ্র পরিস্ফুট হয়, এবং যাহার ধীশক্তি পরিস্ফুট হয়, সে স্বভাবভেদে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করিতে বা মুরব্বি আনা করিতে ভাল বাসে। আমি ইংরাজের বাটীতে ইংরাজের ছেলেদের মধ্যেই দেখিয়াছি, পাঁচ বৎসরের বালিকা সাত বৎসর বয়সের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের প্রতি অনুগ্রহশীলা হইয়া তাহাকে খাবার বাঁটিয়া দিতেছে এবং আপনি ভ্রাতার অপেক্ষা অল্পভাগ লইতেছে! স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধি আছে যে, প্রথমে কন্যা সন্তান হওয়া ভাল, তাহার পরে পুত্র। কন্যা অতি অল্পবয়সেই অন্যের যত্ন করিতে পারে। ফলকথা, কন্যা সন্তানের অপেক্ষা পুত্র সন্তানের একটু বেশী যত্ন হইলেই যে উহাদিগের মধ্যে সাম্যভাব উদ্রেকের বিশেষ ব্যাঘাত হয় তাহা নহে।

ছোট ছেলের এবং ডাগর ছেলের মধ্যেও একটু ইতর বিশেষ হয়। ছোটকে আগে খাওয়াইতে হইবে, সে আবদার করিলে তাহাকে আগে ভুলাইয়া শান্ত করিতে হইবে, তাহার খেলানাটি বিশেষ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহার হারাইয়া গেলে বড়র স্থানে লইয়া তাহাকে দিতে হইবে, সে অধিকক্ষণ কোলে পিঠে থাকিবে। এইরূপ ইতর বিশেষেও ছেলেদের মধ্যে যে সাম্যভাবের সংস্থাপন আবশ্যক তাহার বিঘ্ন হয় না। ছেলেরা সত্য সত্যই তত নির্ব্বোধ নয়। উহারা বেশ বুঝিতে পারে যে,

ছোট এবং দুর্ব্বল এবং অক্ষমদিগের প্রতি একটু অধিক যত্নের প্রয়োজন এবং উঁহারা নিজেও সেই যত্ন করিবার জন্য বিলক্ষণ আগ্রহশীল হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ অমন সকল স্থলে সাম্যভাব প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করা অনৈসর্গিক, অনাবশ্যক, অসাধ্য এবং হানিকর। বাপ মা ঐ সকল বৈষাম্য রক্ষা করুন। ও সকল বৈসাম্যের হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং শিশুদিগেরও বোধগম্য, কিন্তু বাপ মা যেন সত্য সত্যই একটী ছেলেকে বেশী এবং অপর একটীকে কম ভাল না বাসেন—অর্থাৎ ছেলেদের মধ্যে অহেতুক কোন ইতর বিশেষ না করেন। তাহা করিলেই স্ব স্ব সন্তানদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা জন্মিয়া যাইবে এবং সে ঈর্ষ্যা যাবজ্জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইবে না, কিন্তু সহেতুক বৈসাম্যেও কোন কোন স্থলে দোষ হয়। যদি একটী ছেলে অন্য ছেলেদের অপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া বাপ মায়ের আদুরে হয়, তবে অপর সকল ছেলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষ করে। যদি একটী অধিক বুদ্ধিমান মেধাবী এবং আবিষ্ট বলিয়া বিশেষ সমাদর পায়, তাহা হইলেও ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা প্রবলা হয় না এবং বয়োবৃদ্ধিকে তাহা একেবারেই অন্তর্হিত হয়। যদি অনেকগুলি কন্যাসন্তানের পর একটী পুত্র সন্তান হয় অথবা অনেক গুলি পুত্র জন্মিবার পর একটী কন্যা জন্মে, তবে তাদৃশ পুত্র বা কন্যা কিছু বেশী আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে—এবং সেরূপ হইলে ভাই ভগিনীর মধ্যে কিছু ঈর্ষ্যার উত্তেজনা করে, কিন্তু সে ঈর্ষ্যা অতি প্রবলা হইয়া চরিত্রদূষিত করে না। পিতা মাতা যত দূর পারেন, এই সকল সহেতুক বৈসাম্য জনিত ঈর্ষ্যার কারণ নিবারণ করিয়া চলিবেন, আর পুনর্ব্বার বলি, অহেতুক বৈসাম্য কোন মতেই হইতে দিবেন না। আমাদের দেশে একটা উপধর্ম্মমূলক বৈসাম্য আছে—সেটা বিশেষ যত্ন সহকারে নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যে সময়ে পিতামাতার কোন বিশেষ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে যে সন্তান জন্মে, তাহার প্রতি একটু বিশেষ অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা হইয়া থাকে এবং পিতা মাতার তাদৃশ আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্যের ভুক্তভোগী সন্তান প্রায়ই দুর্ব্বল বা কঠিন প্রকৃতিক হইয়া পড়ে। তাদৃশ সন্তান ভাইভগিনীর প্রতি সমীচীন ব্যবহারে কদাপি সমর্থ হয় না। এই 'পয়া' 'অপয়া' কথা দুইটী তে অনেক

সুখ নষ্ট এবং অসুখের বৃদ্ধি করিয়াছে—সহর অঞ্চলে ও শব্দটার তেমন প্রাদুর্ভাব নাই; কিন্তু পল্লীগ্রামে উহাদিগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। এই সকল স্থলে পিতা-মাতা একটু সতর্ক হইয়া চলিলে এবং সন্তানগুলিকে পরস্পর সাহায্যদানে উন্মুখ করিয়া তুলিলে গৃহবাসের সুখ বিশিষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হয়। বড়-ভাই, বড় ভগিনী, ছোট ভাই ভগিনীদিগকে কাপড় পরাইয়া দিবে, খাওয়াইবে, মুখ হাত ধুইয়া দিবে, তাহাদের জুতা, কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিবে, খেলেনা সাজাইয়া দিবে, তাহাদিগকে লইয়া খেলা করিবে—এইরূপ হইলে পিতা মাতার বিশেষ আনন্দ জন্মে এবং ছেলেদের মধ্যেও সৌভ্রাত্রভাব সুসম্বদ্ধ হয়। আমার বিবেচনায় বড়দিগের মধ্যে ছোটদিগের কাজ কর্ম্ম ভাগাভাগী করিয়া দেওয়া ভাল নয়। মনে কর, যেন কোন গৃহস্থের ক,খ,গ তিনটী কন্যা এবং চ,ছ দুইটী পুত্র আছে। ক,চয়ের কাজগুলি করিবে এবং খ ছয়ের কাজগুলি করিবে, এবং তাহা করিয়া ক, চকে এবং খ ছকে আপনাপন ভাগে বুঝিবে, এরূপ ব্যবস্থা ভাল নয়। ক, সকলের জ্যেষ্ঠা, সে গ.এবং চ এবং ছ এই তিনেরই খাওয়া দাওয়া দেখুক, খ ও গ,চ এবং ছএর বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিবার ভারপ্রাপ্ত হউক,—এইরূপে সকল ছোটগুলিকেই সকল বড়গুলি আপনাদিগের প্রতিপাল্যের মধ্যে পাউক। ইহাই সুব্যবস্থা।

আজি কালি একান্নবর্ত্তী সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে প্রায়ই এরূপ ব্যবস্থা করা হয় না; এবং তাহা করা হয় না বলিয়াই মিলিত পরিবারের অনেকটা সুখ কম হইয়া যাইতেছে। যদি মিলিত পরিবারের মধ্যে সকল ভ্রাতার সকল সন্তানগুলিকে একদলস্থ মনে করিয়া বড় ছেলেগুলির দ্বারা ছোট, ছেলেদের কাজ লওয়া যায়—তবে মিলিত পরিবারের মধ্যে সুখ এবং ধর্ম্ম সাধনা উৎকৃষ্টতর হয়—

যে পরিবারের ছেলেরা এইরূপে বিবেচনা-পূর্ব্বক পালিত এবং শিক্ষিত হয়, সে পরিবারে ছেলের ছেলের ঝগড়া কম হয়, তাহাতে বয়োধিকদিগের যোগ কম হয় এবং অল্পকারণে অন্তর্বিচ্ছেদ হইতে পারে না।

সেরূপে পালিত পরিবারের মধ্যে ভাই-ভগিনীদিগের পরস্পর মনের মিল অতি সুমধুর হইয়া উঠে। ছেলেবেলায় ত এ থাইল বেশী, ও পরিল

ভাল, এ সকল কচকচির কোন উল্লেখই হয় না; বড় হইয়া উঠিলে পরস্পরকে সাহায্যদান করা, অতি সহজ ব্যাপারই হইয়া থাকে। এক জনের কোন জিনিষটী আছে, আর একজনের নাই বা হারাইয়া গিয়াছে, যাহার নাই বা হারাইয়াছে, সেই উহা পায়—কেমন করিয়া পায় তাহার কোন উচ্চবাচ্য হয় না। 'তুই নেনা' বা "তুমি নাওনা" কখন কখন এই কথা দুই একবার শুনা যায় মাত্র। একজনের পাঠশিক্ষা হইয়াছে, খেলিতে যাইবার সময় হইয়াছে, কিন্তু ভগিনীটীর হয় নাই—যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ খেলিতে যাওয়া হয় না। একটীর পীড়া হইয়াছে, আর বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি থাকে না—কান্না কাটনার এবং আমোদ প্রমোদের চেঁচাচেঁচি হয় না।

আরও বয়োবৃদ্ধি হইলে, ভগিনীদিগের বিবাহ হইয়া গেলে, শ্যালকদিগের সহিত ভগিনীপতিদিগের বিলক্ষণ মনের মিল জন্মে। ভগিনীদিগেরও পরস্পর সৌহার্দ্দ ন্যূন হইয়া যায় না। যদি এক ভগিনীর বড় মানুষের বাটীতে বিবাহ আর একটীর সামান্য গৃহস্থের বাটীতে বিবাহ হইয়া থাকে, তথাপি ভগিনীদিগের মধ্যে তাচ্ছিল্য বা ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে না। কিন্তু সকল কন্যাকে সমান ঘরে (সঘরে) বিবাহ দিবার চেষ্টা করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

ভ্রাতৃবর্গের বিবাহ হইবার পর এবং পিতা মাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সূত্রপাত হইয়া থাকে। কিন্তু সুপালিত পরিবারের মধ্যে এবং পৈতৃক ধনের বিভাগ স্পষ্টরূপে করা থাকিলে প্রায়ই তাহা হইতে পায় না। যদি ভাইয়ে ভাইয়ে সত্য সত্যই মনের মিল থাকে তবে তাঁহাদিগের পত্নীগণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন হইতে পারে না। যায়ে যায়ে ঝকড়া বাধাইবার মূল (১ম) ছেলেয় ছেলেয় ঝকড়া, (২য়) ঝিয়ে ঝিয়ে ঝকড়া। ঐ দুইটীই অতি সামান্য বিষয় এবং অল্প মাত্র সাবধানতায় উহাদিগের প্রতিবিধান হইয়া যায়। ভ্রাতাদিগের মধ্যে উপায়ক্ষমতার ইতর বিশেষ নিবন্ধন যদি মনোমালিন্যের সম্ভাবনা হয় তাহার প্রতিবিধানের উপায় একটী মাত্র—পৃথগন্ন হওয়া। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্মতি ক্রমেই তাহা করা ভাল, মনোমালিন্য পর্য্যন্ত জন্মিতে দেওয়া অনুচিত, আর যাঁহার উপায় কম অথবা

সন্তানাদি অধিক, তাঁহার দ্বারাই পৃথগন্নতার প্রস্তাব হওয়া বিধেয়। কিন্তু পৃথগন্ন হইয়া গেলেও ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনের ঐক্য সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে সংরক্ষিত হইতে পারে এবং তাহা না হইলেই উহাদিগের স্বভাবে দোষ জন্মে। পৃথগন্ন হইলেও পরস্পর সাহায্য চলিবে, সহানুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বিষয় বিশেষে সম্মিলিত পরামর্শ হইবে এবং একযোগে অনুষ্ঠান চলিবে। সৌভ্রাত্র এবং সৌভাগিনত্ব ইহারা নিত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধের রক্ষায় পবিত্রতা সাধন হয়, আত্মগৌরবের কোন কারণ হয় না; ইহা রক্ষা না করায় পবিত্রতার হানি হয় এবং লোকনিন্দাও জন্মে।

ইউরোপীয়দিগের স্থানে আমরা পারিবারিক কোন ধর্ম্মই প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিতে পারি না। উহাঁদের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মনীতি এবং সমাজনীতির অনৈক্য নিবন্ধন আমাদিগের পারিবারিক নীতিও ভিন্নরূপ। উহাঁদিগের মধ্যে অর্থের গৌরব কিছু অতিরিক্ত। এইজন্য উহাঁরা স্বজনের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে অথবা স্বজনকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে বড়ই নারাজ। কিন্তু সত্য সত্যই অর্থ সাহায্য ত অপর সকল প্রকার সাহায্য অপেক্ষা উচ্চতর সাহায্য নয়। শারীরিক পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা, বুদ্ধিশক্তির পরিচালন দ্বারা, প্রভাবশালিতার প্রয়োগ দ্বারা, এবং প্রীতি ভক্তি এবং উৎসাহ প্রদান দ্বারা, যে সাহায্য হয় তাহা অর্থ সাহায্য অপেক্ষা অনেক অধিক। ঐ সকল সাহায্যের আদান প্রদানে যখন কোন আপত্তি হয় না, তখন টাকার সাহায্য সম্বন্ধেই অতটা লজ্জাবোধ এবং মানসিক সঙ্কোচ হয় কেন? আমার বিবেচনায় অপরের স্থানে অর্থ সাহায্য গ্রহণে যে দোষ এবং লজ্জা, ভাই ভগিনীর মধ্যে সে দোষ এবং লজ্জার কোন হেতুই নাই। ভাই-ভগিনীর মধ্যে অর্থ সাহায্যের যদি প্রয়োজন থাকে এবং অর্থ সাহায্য না করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজে নিন্দা হয়। সুতরাং যিনি ওরূপ সাহায্য করিতে না দেন, তিনি আপনার স্বজনদিগকে নিন্দাভাগী করেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইহার ভিন্নভাব। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

(১) অনেক গুণশালী গারফীল্ডের এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন গারফীল্ডকে তাঁহার শৈশবাবস্থায় কোলে করিয়া দুই ক্রোশ পথ

লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিতেন এবং সায়ংকালে পুনর্ব্বার বিদ্যা- লয় হইতে কোলে করিয়া বাটীতে আনিতেন। ঐ জ্যেষ্ঠার বিবাহ হইয়া গেলে গারফীল্ড কিছুকাল তাঁহারই বাটীতে থাকিয়া লেখা পড়া এবং শিল্প- কার্য্য শিক্ষা করেন। গারফীল্ড ভগিনীর বাটীতে বাসাখরচ দিতেন এবং জ্যেষ্ঠা তাহা লইতেন; বলিতেন, গারফীল্ডকে বাসা খরচ না দিতে দিলে, সে ভগিনীপতির বাটীতে থাকিতে লজ্জিত হইবে। (২) গারফীল্ডের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন সময় কনিষ্ঠের পাঠের সাহায্যার্থে নিজ পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থ প্রদান করিতে চাহিলে; গারফীল্ড তাহা লইলেন, কিন্তু প্রথমে আপনার লাইফ-ইনস্যুরর করিয়া উহার প্রমাণপত্রখানি জ্যেষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করি- লেন। গারফীল্ডের জীবনচরিত লেখক ঐ উদাহরণগুলিকে সৌভ্রাত্রভাবের বিশেষ পরিচায়ক বলিয়াই মনে করিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যজাতীয়, লোকের চক্ষে ঐগুলি বিশেষ সৌভ্রাত্রের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। যে জাতি ধনকেই পরম পদার্থ বলিয়া পূজা করে, তাহাদিগের চক্ষে ঐ গুলি বিশেষ ভ্রাতৃবাৎসল্যের চিহ্ন স্বরূপ হইতে পারে। আমার বিবেচনায় জ্যেষ্ঠাকে বাসা খরচ না ধরিয়া দিলে এবং জ্যেষ্ঠের হস্তে লাইফ ইনস্যুরের সার্টিফিকেট জমা করিয়া না দিলে, গারফীল্ড উহাঁদিগকে অধিকতর সুখী করিতে পারিতেন। অন্ততঃ আমার মতে উহাই ভাই ভগিনীর প্রতি উচিত ব্যবহার হইত। আর গারফীল্ড ইউনাইটেড সাম্রাজ্যের সম্রাট সভাপতি হইলে পর ঐ জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ভ্রাতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ কৌতূহল হইয়া আছে। কিন্তু চরিত্র- লেখকের মনে ঐ কৌতূহল উঠে নাই—তিনি ঐ বিষয়ে নির্ব্বাক্।

———•(•)•———

দ্বাবিংশ প্রবন্ধ।

পুত্রবধূ।

স্ত্রী। বৌয়ের মুখ দেখা বড় ভাগ্যের কথা। লে হবে—বাঁচিবে—বের যোগ্য হবে—বে হবে—তবে বৌয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌয়ের মুখ দেখা বড় ভাগ্যের কথা।

পুরুষ। তবুও ত শাশুড়ীরা বৌকে ক্লেশ দেয়। কেন ক্লেশ দেয় বলিতে পার?

স্ত্রী। সকল কারণ বোধ হয় জানি না, বলিতেও পারি না। যে কয়েকটী মনে হয়, বলিতেছি। এক কারণ যে শাশুড়ী নিজে বৌ যন্ত্রণা ভুগিয়াছে, সে বৌয়ের যত্ন শিখে নাই। সে মনে করে, আমার প্রতি যেমন করিয়াছে, আমিও তেমনি করিব।

পুরুষ। এতে একটু না জানা দেখায়, আর একটু দাদতোলা দেখায়। আর?

স্ত্রী। আর এক কারণ, যদি আপনার স্বামী না থাকে, ছেলের বশে থাকিতে হইবে এমন বোধ হয়, তাহা হইলেও বৌকে যন্ত্রণা দেয়।

পুরুষ। শাশুড়ী মনে করে, ছেলের ভালবাসার উপর আমার সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে—বৌ সেই ভালবাসা সমুদায় আত্মসাৎ করিবে, এই শঙ্কা করিয়া বৌয়ের প্রতি বিদ্বেষ করে। কিন্তু এ ত বিধবা শাশুড়ীদিগের কথা হইল। সধবা শাশুড়ীরাও কি বৌয়ের প্রতি অত্যাচার করে না?

স্ত্রী। করে বই কি—কিন্তু বিধবাদের চেয়ে ঢের কম করে। বিধবা শাশুড়ী যত দেখিয়াছি, প্রায় সকলেই বৌ-কাঁটকী। * * *।

পুরুষ। * * * ত বিধবা নয়—সে বড় বৌ-কাঁটকী না?

স্ত্রী। তার স্বামী অক্ষম—ছেলেই রোজগারী। তার বৌয়ের প্রতি অযত্ন বিধবা শাশুড়ীরই অযত্নের মত।

পুরুষ। ভাল; তার বেলা যেন ও কথা বলা যায়। কিন্তু * * * র বেলা কি বলিবে? তার স্বামী ত অক্ষম মনুষ্য নয়? কিন্তু তোমারই মুখে শুনিয়াছি, সে বৌয়ের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করে।

স্ত্রী। তার কথা ছেড়ে দাও। সে চিরকালই কনে বৌ থাকিবে—তার চুল পাকিতে গেল, তবু বৌয়ের রূপের নিন্দা করে। সধবা শাশুড়ীরা বৌ কাঁটকী হইলে বৌয়ের রূপের নিন্দা করিতেই চায়।

পুরুষ। ওরা বৌয়ের রূপের নিন্দা করে কেন?

স্ত্রী। আপনার রূপ ভাল বলিবার জন্য। যার ছেলের বে হয়ে বৌ হয়েছে, তার বয়স অবশ্যই হয়েছে। যাদের মনে মনে রূপের গৌরব বেশী, তারা আপনাদের বয়স বেশী ভাবিতে ভাল বাসে না।

পুরুষ। সধবা স্ত্রীলোকদিগের ত আপনার বয়স অধিক হইয়াছে, ভাবিতে নাই। সধবা স্ত্রীলোকদিগের যতই বয়স হউক, তিনি একজনের চক্ষে চির কালই ছেলে মানুষ। স্বামী থাকিতে মেয়ে মানুষের বুড়ী হইবার যো নাই।

স্ত্রী। তা সত্য—কিন্তু তা বলে কি বৌয়ের হিংসা করা উচিত? বৌ ত তাকে বুড়ী করে নাই? বয়স হয়েছে—ছেলে হয়েছে—ছেলের বে দিয়েছে, তবে বৌ হয়েছে। বৌ আর আপনি এসে শাশুড়ীকে বুড়ী করে না।

পুরুষ। তবে বৌ যন্ত্রণার মূল চারিটি—এক শাশুড়ীর অজ্ঞতা, দ্বিতীয় তাঁর দাদ তুলিবার ইচ্ছা, তৃতীয় তাঁর মনের ভয়, চতুর্থ তাঁর হিংসা। কিন্তু এ সব ত শাশুড়ীর দোষই বলিলে—বৌয়ের দোষ কি কিছু থাকে না।

স্ত্রী। আমার বোধে ত বৌয়ের দোষ কিছুই হইতে পারে না। ছেলে মন্দ হয়, বাপ মার দোষে—স্ত্রী মন্দ হয়, স্বামীর দোষে—বৌ মন্দ হয়, শাশুড়ীর দোষে।

পুরুষ। আমার বৌমা, কেমন হবেন?

স্ত্রী। তোমার জানা আছে, আমি ছেলে বেলায় একটু বৌ-যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম—সেইজন্য তোমার মনে মনে ভয় আছে, পাছে আমিও আমার বৌ মাকে যন্ত্রণা দি। কিন্তু আমি ত আমার নিজের শাশুড়ীর স্থানে কোন যন্ত্রণাই পাই নাই। আমাকে যন্ত্রণা দিয়াছিল অপর লোকে।—* ** আমি অক্ষম স্বামীর হাতেও পড়ি নাই। হিংসাটী আমার মনে উঠিতে পারে কি না, তাহা তুমিই ভাল বলিতে পার। আমি এই জানি যে, আগে আমার যেমন আদর ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

পুরুষ। তুমি বৌ মার যত্ন কিরূপ করিবে?

স্ত্রী। তাহা বলিতে পারি না। তবে এই বলিতে পারি, একটি পাখীকে তার কোটর থেকে আনা হইবে, তাকে পোষ মানাইতে হইবে—সে সুখ না পেলে পোষ মানিবে কেন? যাহাতে সে আপনার কোটর ভুলে, আপনার বাপ মাকে ভুলে, বাপের বাড়ী যাইতে না চায়, তাকে এরূপ করিয়া তুলিতে হইবে।

পুরুষ। যে মা ছেলেকে সত্য সত্য ভাল বাসে, সে কখন বৌয়ের উপর বিরূপ হয় না। দেখ, ছেলে যদি বৌকে না ভালবাসে, তবে ছেলেরও দুর্ভাগ্য, ছেলের মায়েরও দুর্ভাগ্য।

স্ত্রী। যে বৌকে দেখিতে পারে না, সে ছেলেকেও ভালবাসে না, সত্য! যারা বৌকে ভালবাসে না, তারা প্রায়ই ছেলের আবার বে দেবার চেষ্টা করে। আর একটা বে দিলে যে পরে ছেলের ক্লেশ হইবে, তা কি তারা জানে না? তারা জেনে শুনেই ছেলের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইয়া ছেলেকে যাবজ্জীবন কষ্টে ফেলে। তেমন মায়ের কথা না শুনায় ছেলের পাপ হয় না।

পুরুষ। এগুলি খুব পাকা কথা। কিন্তু আমার বোধ হয়, বৌ যন্ত্রণার আর একটী মূল আছে, সেটী তোমার মনে পড়ে নাই। সে মূলটী একটি মেয়েলী শ্লোকে পাওয়া যায়—

'চন্দ্রমুখী মেয়ে আমার পরের বাড়ী যায়।
আর খাঁদা নাকি বৌ এসে বাটায় পান খায়॥'

এতেই বৌ যন্ত্রণার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর মূলটী আছে। এই মূলটী শুদ্ধ শাশুড়ীর চেষ্টায় অপনীত হইতে পারে না। ছেলে এবং বৌ দুই জনকে বিশেষতঃ ছেলেকে ঐ মূলটী নষ্ট করিবার নিমিত্ত মায়ের সহায়তা করিতে হয়। বৌ যদি ননদটীকে দেখিতে না পারে, এবং ছেলে যদি বৌয়ের সেই বিদ্বেষ নিবারণ না করে, তাহা হইলে কোন্ মায়ের মনে দুঃখ না হয়? তখনই বোধ হয়, ছেলেও যে পদার্থ, মেয়েও সেই পদার্থ—ছেলের বে দিলাম বলিয়া কি আমার পেটের মেয়েরা পর হইয়া যাইবে? এইরূপ ভাবিয়া যে ক্রোধ জন্মে, তাহা নিতান্ত অন্যায্য বলিয়াও মনে করিতে পারি না।

স্ত্রী। আমি অত শত বুঝিতে পারি না। আমি এইমাত্র বুঝি— আমিও যে পদার্থ, বৌ মাও সেই পদার্থ। আমি আজ ঘরের গিন্নি, যা করি তাই হয়। কালি বৌ-মা ঘরের গিন্নি, যা করিবেন, তাহাই হইবে। আমি আপনার ছেলে বেলার কথা মনে করিব। তখন আপনি যাহা চাহিতাম. বৌ-মাও তাই চায়—তখন আমি যা মনে করিতাম, বৌ-মাও তাই মনে করে। এইরূপ করিয়া বৌ-মার মন বুঝিতে পারিব—সেই মন বুঝিয়া চলিব।

—:*::*: —

ত্রয়োবিংশ প্রবন্ধ।

কন্যা পুত্রের বিবাহ।

কন্যার বিবাহের দায় চিরকালই বড় দায়—আজি কালি এ প্রদেশে ঐ দায়ের কথায় কিছু বেশী রকম আন্দোলন হইতেছে। আন্দোলনের মূল কথা, কন্যার বিবাহে ব্যয়বাহুল্য বড়ই বাড়িয়াছে। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ঐ আন্দোলন সংক্রামিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ লইয়া এবং পণ দিয়া বিবাহ দিবার, উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। দ্রাবিড়ভূমির অপরাপর স্থলে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিবার রীতিই সমধিক প্রবল। আর্য্যাবর্ত্তে, সারস্বত এবং আদি-গৌড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও পণ লইয়া এবং পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা আছে। সুতরাং কি দাক্ষিণাত্যে কি পঞ্জাব প্রদেশে কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও কন্যার বিবাহে অধিক ব্যয় হয় বলিয়া বিশেষ কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। ক্ষত্রিয় এবং রাজপুত প্রভৃতি রাজারাজড়ার মধ্যে হইয়াছে, এবং সেই আন্দোলন তাঁহাদিগের হীনাবস্থার দ্যোতক। বিহার প্রদেশে এবং বঙ্গভূমিতে অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সকল উৎকৃষ্ট বর্ণের মধ্যেই এই বিষয়ের অধিক আন্দোলন হইতেছে। আবার দেখা যায় যে, ঐ সকল প্রদেশে কুলীন মৌলিক বলিয়া দুইটী থাক জন্মিয়া গিয়াছে; এবং কি ব্রাহ্মণ কি অপর জাতীয় সকল লোকের মধ্যেই ব্রাহ্মবিবাহের অর্থাৎ পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা সমধিক পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রদেশেই বরকর্ত্তারা পণের নিমিত্ত জিদ করিয়া থাকেন। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, অনেকের সংস্কার এইরূপ যে, কুলীন মৌলিক ভেদটী কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। তাহা নয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় কান্যকুব্জদিগের এবং বিহার প্রদেশীয় মৈথিল-দিগের মধ্যেও বাঙ্গালারই অনুরূপ কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেখানে কুলীন মৌলিক ভেদ, সেইখানে আপনার অপেক্ষা বড় ঘরে কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত ইচ্ছাটী প্রবল হইয়া

থাকে, এবং যেখানে ঐ ইচ্ছা প্রবলা, সেইখানেই বরকর্ত্তার কুলমর্য্যাদা-স্বরূপ তাঁহাকে পণ দিতে হয়।

পুত্রের বিবাহে পণ গ্রহণের প্রকৃত মূল এই। কিন্তু আজি কালি ঐ মূল গাছের উপর একটা কলম লাগিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কন্যাকর্ত্তার স্থানে যে পণের জন্য পীড়াপীড়ি হয়, তাহা কেবল কুলমর্য্যাদা বলিয়া নয়। কুলের মান দিন দিন খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে, কিন্তু পণের হার দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এই—অর্থকরী ইংরাজীবিদ্যার সমাদর বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানেরা কুলীন-সন্তানদিগের স্থান গ্রহণ করিতেছেন—কুলীন সন্তানদিগের ন্যায় তাঁহারা বহুবিবাহ করেন না; প্রত্যুত পত্নীর ভরণ পোষণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের আদর বেশী—আবার তাঁহাদের সংখ্যা কুলীন সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প সুতরাং তাঁহাদের দরও খুব বেশী। দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার অপেক্ষা বিবাহযোগ্য ইউনিবর্সিটী সন্তানের সংখ্যা চিরকালই অনেক কম থাকিবে—প্রত্যুত ঐ ন্যূনতা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে; সুতরাং বরের দর বাড়িতেই থাকিবে, কদাপি কম হইবে না। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে, যেখানে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দিবার প্রথাই প্রচলিত, সে সকল স্থানেও আজি কালি ইউনিবর্সিটী সন্তানদিগকে আর বড় একটা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইতেছে না। তাঁহারা দানে কন্যা পাইতেছেন। কিছুকাল পরে তাঁহারাও, আমাদের মত পণ না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সদ্বংশজাত এবং সুশিক্ষিত বরপাত্রের দর বাড়িতেই থাকিবে। সুতরাং ঐ দর কমাইবার জন্য যতই বাগাড়ম্বর হউক তাহাতে কোন বিশেষ ফললাভ হইবার নহে। যেখানে বংশমর্য্যাদা স্বীকৃত যেখানে উচ্চ বংশে কন্যা দিবার ইচ্ছা, যেখানে গুণের গৌরব, সেইখানেই ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত হইবে, এবং পণ দিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তটী স্থির নিশ্চয় বুঝিলে সুবোধ ব্যক্তি কন্যার বিবাহে পণ দিতে হয় বলিয়া আর কাঁদা কাটা করিবেন না। তিনি আপনার কন্যার বিবাহের নিমিত্ত কিরূপে যত্নশীল হইবেন, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। ঐ ব্যাপারে সংস্কারের চেষ্টা যে অপচেষ্টা তাহার অধিক প্রমাণের

প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সংস্কারকবর্গের পথ-প্রদর্শক ইংরাজেরা কন্যার বিবাহে যথেষ্ট ধন ব্যয় করেন নাচ গান ভোজাদিতে করেন, বস্ত্রালঙ্কারাদিতে করেন—আর যৌতুকদান বিশেষ রূপেই করেন।

আমার বিবেচনায়, পিতা আপনার পুত্র অপেক্ষা জামাতা যাহাতে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে উৎকৃষ্ট বই অপকৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে পাপভাগী হয়েন। রূপ শব্দে সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্য দুইই বুঝিতে হইবে—গুণের মধ্যে বিদ্যাবত্তা অবশ্যই ধরা যাইবে। কুল দেশীয় চিরপ্রচলিত অর্থে—বংশমর্য্যাদা, বিদেশীয় অর্থে—ধনশালিতা, এই উভয় অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। আর শীল—দেশীয় অর্থে লওয়াই ভাল—যাহাতে নম্রতা, সৌজন্য, গুরুভক্তি, সত্যাচার বুঝায়—উহার আধুনিক অর্থ—সাহস বা তেজস্বিতা, রূঢ়তা বা সত্যবাদিতা, স্বদেশীয়ের প্রতি দাম্ভিকতা এবং বিদেশীয়ের সমীপে চাটুকারিতা—এই সকল অর্থে না ধরাই ভাল। কিন্তু কন্যার পিতা যতই চেষ্টা করুন—উল্লিখিত সমস্ত গুণসমন্বিত এবং সমস্ত দোষবিবর্জ্জিত সর্ব্বতোভাবে মনোমত পাত্র কখনই পাইবেন না। এই জন্য একটী সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। কন্যার জন্য যে পাত্রটীকে দেখিবেন, সেটীকে সর্ব্ব বিষয়ে আপনার পুত্রের সহিত তুলনা করিয়া লইবেন—পুত্র না থাকে ভ্রাতুষ্পুত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিবেন। কেহই তুলনাযোগ্য আপনাদিগের বংশধর না থাকে আপনার নিজের সহিতই তুলনা করিয়া বুঝিবেন—পাত্রটী উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট। এইরূপে উৎকর্ষের একটী সীমা না করিয়া লইলে আপনার কন্যা কাহাকেও দিয়া মনের ক্ষোভ মিটে না। আর অনেক স্থলে বিসদৃশ বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হওয়াতে পরিণামে উভয় কুটুম্বের পক্ষে ক্লেশজনক এবং কন্যাজামাতা উভয়েরই ধর্ম্ম ব্যাঘাতক হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ কন্যাদান সু-ঘরে এবং সমান ঘরে করাই বিধেয়—এই জন্য আপনার পুত্রাদির সহিত তুলনা করিয়াই বর-পাত্রের নির্ব্বাচন করিবে—কিছু উচ্চ অবশ্যই লইবে, কিন্তু খুব উচ্চে হাত বাড়াইবে না।

কিন্তু আজি কালি কন্যার দায়ে একবারে নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছায় খুব উচ্চ দেখিয়াই লোকের কন্যাদানে প্রবৃত্তি হইতেছে। বরপাত্রের দর বাড়িয়া উঠিবার সেটীও একটা অবান্তর কারণ। কিন্তু খুব উচ্চ ঘরে কন্যা দেওয়ায় নিজের এবং কন্যার উভয়েরই অনাদর হয়। আবার, খুব নীচ ঘরে দিলেও অন্য প্রকারে সেই ফলই ফলে। নীচ ঘরের লোকেরা মনে করে কন্যার পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি যাই করুন, আর যতই করুন, তাঁহারা অনাদর করিতেছেন, এবং তাই ভাবিয়া তাঁহারা আত্মগৌরব হানির শঙ্কায় আপনারাই সমধিক পরিমাণে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব কন্যার বিবাহ সমান ঘরেই দিবে—ছোটতে ত যাবেই না—কিন্তু বড়র দিকেও বড় বাড়াবাড়ি করিবে না।

আর একটী বিষয় নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রূপ, গুণ, কুল শীল প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে আপনার পুত্রাদির সহিত বরপাত্রের তুলনা করিতে হয়, তাহার মধ্যে কোন ইতর বিশেষ করা যায় কি না। কার্য্য কালে অবশ্যই করিতে হয়। আমার মতে শীল বা চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা বড়, গুণ তাহারই নীচে, রূপ তাহার নীচে এবং কুল সকলের নীচে ধরিলেও চলিবে—অধিক দোষ হইবে না। আজি কালি কিন্তু কুলের এক ভাগ যে অর্থশালিতা তাহারই প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়া আছে। তাহা যে অকারণ বা অন্যায্য তাহা নহে, তবে অধিক ধনবত্তার প্রতি দৃষ্টি করিবার ততটা প্রয়োজন নাই—মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান থাকিলেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। আরও একটী কথা বলি। পিতা কন্যাকে আপনার শক্তির অনুসারে ধনরত্নসমন্বিতা করিয়া দান করিবেন—যদি পারেন কন্যাকে কিছু বিষয় দিবেন—বরপক্ষের পীড়াপীড়ির প্রতীক্ষা করিবেন না। যদি এরূপ চেষ্টা করেন, তবে বরকর্ত্তা যে টাকার নিমিত্ত দাওয়া করিয়া থাকেন তাহাও কতকটা কমিয়া যাইবে। বরকর্ত্তার যে দাওয়া কমিবে, তাহার কারণ শুদ্ধ তাঁহার চক্ষুলজ্জা নহে। ঐ দাওয়ার মূলে একটী প্রকৃত তথ্য আছে। কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে কিছু সম্পত্তি দান করিলে দাওয়ার ঐ মূলটীই আর থাকিবে না। দাওয়ার প্রকৃত মূলটীই এই—নিসর্গতঃ কন্যাসন্তানদিগেরও পিতৃধনে কতক অধিকার আছে

আমাদিগের ব্যবহারশাস্ত্রে ঐ নৈসর্গিক অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু নৈসর্গিক শক্তি সকলের মূর্দ্ধি বত্তী। বরকর্ত্তা জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সেই নৈসর্গিক বলে বলীয়ান। কন্যাকে কিছু সম্পত্তি প্রদান করিলেই ঐ শক্তির পূজা হইয়া যায়, তিনি আর বরকর্ত্তার সহকারিণী হইয়া থাকেন না। এই জন্যই তাঁহার পণের দাওয়া কমিয়া যায়। পূর্ব্বকালের গোষ্ঠীপতিরা কন্যাজামাতাকে ভূ সম্পত্তি দান করিতেন, এই জন্য তাঁহারা কুলীন সন্তানদিগকে জোর করিয়া আনিলেও বরকর্ত্তৃ-পক্ষীয়েরা উচ্চবাচ্য করিতে পারিতেন না।

আমাদিগের দেশে যেমন কন্যার বিবাহকে অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার মনে করে, পুত্রের বিবাহকে সেরূপ মনে করে না। পুত্রের বিবাহে ভদ্রবংশীয়-দিগের প্রণ লাগে না—পুত্র বিবাহিত হইলেও তাহার সুখ দুঃখ কতকটা পিতামাতারই আয়ত্তাধীন থাকে—পুত্রবধূকে আপনাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লওয়া যায়। আর দেশে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় বৌ মনে না ধরিলে ছেলের আবার বে দেবো, এরূপ ভাবও একটু মনে মনে সঞ্চিত থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কার্য্যতঃ বহুবিবাহ প্রথা অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে, যখন ক্রমে ক্রমে কন্যাকাল উত্তীর্ণ করিয়া লোকে কন্যার বিবাহ দিতেছে, যখন বিজাতীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে পুত্র এবং পুত্রবধূর বশ্যভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে, তখন পুত্রের বিবাহ দেওয়া কন্যার বিবাহের ন্যায় দায় বলিয়া গণ্য না হউক, উহাতেও যে অনেকটা বিবেচনা, সতর্কতা এবং দূরদর্শিতার প্রয়োজন, তাহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ একটু ভাবিয়া দেখিলেই নিশ্চয় প্রতীতি হয় যে, পুত্রের বিবাহ বিবেচনা করিয়া দিতে না পারিলে একেবারে তোমার বংশের মধ্যে দুরপনেয় দোষ প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব পুত্রের বিবাহ দেওয়াও কেবল হাসিখেলার ব্যাপার নহে। আজি কালি পুত্রের পিতা কেবল আপনার পণের দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। টাকার লোভে কেমন একটাকে যে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ছেলের গলায় বান্ধিয়া দিতেছেন, তাহার প্রতি বড় লক্ষ্য করেন না। এরূপ করায় কি পুত্রের প্রতি অতি কঠোর অত্যাচার করা হয় না? তাই বলি, পুত্রের বিবাহ দিয়া অধিক টাকা কাড় [illegible]

পরিত্যাগ কর, এবং পুত্রবধূটী কিরূপ হইলে তোমার কুললক্ষ্মী হইয়া উঠিবে, তাহারই বিশেষরূপ চিন্তা কর। বিশেষ করিয়া দেখ।

(১) কন্যাটী সুন্দরী কি না, অর্থাৎ তোমার পুত্র কন্যাদিগের অপেক্ষা তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব অধিক কি না।

(২) কন্যাটীর স্বভাব নম্র এবং উদার কি না। রূপ দেখিয়াই স্বভাবের অনেকটা বুঝা যায়। তাহাকে কিছু কথা কহাইয়া ও সমবয়স্কাদিগের সহিত তাহার ব্যবহার কিরূপ তাহা শুনিয়াও অনেক বুঝা যাইতে পারে।

(৩) কন্যার পিতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মশীল এবং বিদ্যাবান ছিলেন কি না।

(৪) কন্যার মাতা সাধুশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্মে দক্ষা কি না। এই চারিটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পর টাকা কড়ির দিকে দৃষ্টি করিলে তত হানি নাই। কিন্তু কন্যাটী যদি ঐ সকল বিষয়েই ভাল হয়, তবে পুত্রের সুখ এবং বংশের উন্নতি, এই উভয় দিক দেখিয়া পুত্রার্থে তাদৃশী কন্যারত্নকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। আর যদি গ্রহণ করাই স্থির হইল, তবে টাকা কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করা বড়ই নীচতা জানিবে। ফল কথা, পুত্রের বিবাহে শুল্ক পাওনার দিক না দেখিয়া তাহার ভাবি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বংশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়।

বিবাহ ব্যাপারটী ইহ পারলৌকিক সকল প্রকার সুখ দুঃখের সহিত অতি ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ। ইহাতে সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক সমস্ত নীতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজনই আছে। অদ্যাপি পৃথিবীর কোন দেশের বৈবাহিক ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভিনিবেশ হয় নাই—তাহা হইলে মনুষ্যজাতির যে কতদূর উন্নতি হইত, তাহা যে সকল স্থলে ঐ তথ্যের কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োগ হইতে পাইয়াছে, তত্তৎস্থলের উৎকর্ষ দর্শনেই অনুমিত হইতে পারে। ইউরোপ খণ্ডের অনেকানেক দেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে পশুজনন কার্য্যটী একটী প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য আজি কালি ইংলণ্ডের ঘোড়া, গোরু, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি পশুগুলি অপর সকল দেশীয় ঘোড়া গোরু প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের জলবায়ু ঐ সকল জন্তুর পক্ষে

বিশেষ উপকারী নয়। কিন্তু তাহা না হইলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুযায়ী কার্যদ্বারা ঐ সকল পশুর বংশ ক্রমে ক্রমে সমূহ উৎকর্ষ লাভ করিয়া আসিয়াছে—জলবায়ুর দোষে উহার অপকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই।

কিন্তু ততদূর জানিয়া শুনিয়া নরনারীর দাম্পত্য সম্বন্ধের সঙ্ঘটন এখন ইউরোপেও হয় নাই। আর এতদ্দেশে রাশি, গণ, নক্ষত্র এবং শারীর লক্ষণ প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক যাহা হইত, তাহার যৌক্তিকতাবোধটী বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি বলিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের বৈবাহিক ব্যাপারটা যে পরিমাণে বৈজ্ঞানিক নীতির বিরুদ্ধ হইতে পারিত, বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকায় উহা এখনও ততদূর বিকৃত হয় নাই। নচেৎ অপরাপর প্রাচীন জাতীয়দিগের ন্যায় এতদিনে আমাদেরও বিনাশ সাধন হইয়া যাইত। যদি এখনও আমরা উৎসাহযুক্ত হইয়া আপনাদের বৈবাহিক কার্য্যটীতে ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথাসম্ভব প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে অধঃপাত নিবারণের এবং ভাবি উৎকর্ষ সাধনের বীজ বপন করা হইতে পারে। এই সম্বন্ধে দুই একটি স্থূল কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

(১) পরস্পর অতি বিসদৃশরূপ দম্পতীর মিলনে উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে না।

[২] পাত্র পাত্রীতে একই অঙ্গের দোষ থাকা ভাল নয়। তাহাতে সন্তান অপকৃষ্ট হয়। শারীর গুণের মিলনে সন্তান ভাল হয়।

[৩] উল্লিখিত দুইটী নিয়ম বর এবং কন্যা উভয়ের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত যত খাটিবে ততই ভাল।

[৪] বর এবং কন্যার ঊর্দ্ধতন এক পুরুষের মধ্যে যেন কোন সংক্রামক রোগ না থাকে।

[৫] স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অতি গাঢ়তম প্রণয় থাকিলে সন্তান ভাল হয়।

[৬] পিতা মাতার শারীরিক এবং মানসিক দোষ গুণ তাঁহাদের সন্তানে বর্ত্তে।

—:*::*:—

চতুর্বিংশ প্রবন্ধ।

জেঁয়াচ্।

এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে শব্দটী আছে, উহার কোন সংস্কৃত মূল দেখা যায় না—উহা কোন অভিধানেও নাই—কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যেও ঐ শব্দটী দেখিতে পাই নাই। আমার বোধ হয়, এই আধুনিক শব্দটী বঙ্গভাষার মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় নাই—কিন্তু ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

জেঁয়াচ্'—অর্থে জীববৎসা স্ত্রী। যে প্রসূতির প্রথম সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তাহাকেই জেঁয়াচ্' বলে। এই আধুনিক শব্দের সৃষ্টি কি হেতু হইল? নূতন পদার্থ উপস্থিত হইলেই তাহার নামকরণ হইয়া নূতন শব্দের উৎপত্তি হয়। জেঁয়াচ কি একটী অসামান্য নূতন বস্তু? পূর্ব্ব কালে 'মৃতবৎসা' বা 'মড়ুঞ্চে' শব্দের প্রচলন ছিল। তখন মৃতবৎসারাই নূতন বস্তু ছিলেন—এখন বুঝি জেঁয়াচেরাই সেইরূপ নূতন বস্তু হইয়াছেন? আমার বোধ হয় যে, প্রধানতঃ ইদানী বঙ্গদেশ মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এবং বাল্যবিবাহ প্রথার যে যৎকিঞ্চিৎ দোষ আছে, তাহা সংশোধন করিয়া চলিবার চেষ্টা না হওয়াতেই এই দুর্ঘটনাটী ঘটিয়াছে।

আধুনিক জেঁয়াচ্ শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! শুনা আছে, য়িহুদীজাতির আরাধ্য দেবতা কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তজ্জাতীয় প্রথমজাত সমস্ত সন্তানকে এক রাত্রি মধ্যে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রতিও কি কোন দেবতার তাদৃশ অভিসম্পাত পড়িয়াছে যে, এতদ্দেশজাত অধিকসংখ্যক প্রথমজাত সন্তান রক্ষা পাইতেছে না—অকালে কালকবলগ্রস্ত হইতেছে?

পঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি হিন্দু কি মুসলমান কোন জাতীয় লোকের মধ্যেই 'জেঁয়াচ্' শব্দের প্রতিরূপ কোন শব্দ প্রচলিত নাই। কিন্তু বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ জেঁয়াচ্ শব্দ জন্মিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গবাসী

মুসলমানদিগের মধ্যে 'আকড়' শব্দটীর সৃষ্টি হইয়াছে। যে মুসলমান জাতীয়া প্রসূতির প্রথম সন্তান জীবিত থাকে, তাহাকে 'আকড়' [অকষ্ট ?] বলে। বঙ্গদেশের মধ্যে কেন এই ব্যাপার উপস্থিত হইল ?

প্রথম সন্তানের মৃত্যু সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। অপত্যবিয়োগ যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর নাই বলিলেও চলে। যাহার সন্তান-বিয়োগ হইয়াছে, তাহারই হৃদয় ক্ষত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথম সন্তানের বিয়োগ যন্ত্রণা কিছু বিশেষ যন্ত্রণা। প্রথম সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে বাৎসল্যভাব জন্মে তাহা অতি অপূর্ব্ব। বাৎসল্যভাবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং ঐ ভাবের অভিনব সুখোপলব্ধি প্রথমজাত সন্তানকে লইয়াই হয়। প্রথম সন্তানের প্রতি মমতা অতি প্রগাঢ়। প্রথম সন্তানটী নিতান্তই নিজস্ব। যম ঐ নিজস্বের লোপ করিয়া মমতার ভ্রম ঘুচাইয়া দিলে একেবারে আকাশ হইতে রসাতলে পড়িতে হয়। তাহার পর আর যত সন্তান জন্মে কাহার প্রতি আর তেমন মমতা জন্মে না। সন্তান সত্য সত্যই আপনার নয়, এই ভাব চিরজাগরূক হইয়া উঠে; তাহাদিগের সকলেরই উপর যমের ভাগ আছে জানিয়া আর পূর্ব্বের মত গাঢ় মমতা জন্মিতে পায় না। উহারা নিজস্ব নহে—অন্যের গচ্ছিত ধন—নাড় চাড়, কিন্তু আপনার বলিয়া মনে করিও না। অথবা উহারা ত থাকিবেই না—তবে রেখে যেতে পারিলে হয়, মনোমধ্যে নিরন্তর এই ভাব উদিত থাকিয়া আপনার জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মাইয়া দেয়। আমাদিগের যুবো যে ঔদাসীন্য, মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অধ্যবসায়বিহীনতা দৃষ্ট হয়, তাহার অন্যতম কারণ আমাদিগের প্রথমজাত সন্তানগুলির অকালমৃত্যুর প্রাচুর্য্য।

যৌবনকালে বিবাহ হইল, সন্তান জন্মিল, কার্য্যতৎপরতা অবশ্যই জন্মিবে। প্রিয়তম পুত্র এবং প্রিয়তমা ভার্য্যাকে সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত স্বতঃই প্রবলতর ইচ্ছা হইবে। যাহাদিগের কোন পাছটান নাই, তাহাদিগের অপেক্ষা পুত্রকলত্রবান ব্যক্তির সহস্র গুণে সাবধানতা এবং পরিণামদর্শিতা সমুদ্ভূত হইবে। শুদ্ধ আপনার জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রমশালিতার উত্তেজক সাক্ষাৎ স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহার স্ত্রী-পুত্র আছে, তাঁহার পরি-

শ্রমোন্মুখতার হেতু স্বার্থ এবং পরার্থ উভয় সম্মিলিত। তিনি অবশ্যই অধিকতর পরিশ্রম করিতে পারিবেন।

তদ্ভিন্ন আশ্রমী ব্যক্তি পরিশ্রমক্লান্ত হইলে অতি সহজেই শরীর এবং মনের ক্লান্তি দূর করিতে পারেন। তিনি পুত্রকলত্রাদি লইয়া কিয়ৎক্ষণ যাপন করিলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হন। আশ্রমবিহীন ব্যক্তির ক্লান্তি দূর করিবার তেমন সহজ উপায় কিছুই নাই। কার্য্যপরিবর্ত্ত অথবা কার্য্যবিরামে মাত্র তাঁহার উপায়।

এত সুবিধা সত্ত্বেও আমাদিগের যুবাপুরুষগণ শ্রমবিমুখ, অধ্যবসায়শূন্য, কার্য্যতৎপরতাবিহীন ও অপর দেশীয় বৃদ্ধ লোকদিগের অপেক্ষাও সমধিক নিস্তেজ এবং নির্জ্জীব হইয়া আছেন। আমার বোধ এই যে, ইহাঁদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই প্রথমজাত সন্তান নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য অল্প বয়স হইতেই ইহাঁদিগের হৃদয়কন্দরে স্ব স্ব জীবনের প্রতি অনাস্থা জন্মে। পৃথিবীর কিছুই কিছু নয়, এই বোধটী অকালে উদিত হয়, এবং সেই জন্যই ইহাঁরা যৌবনাবস্থায় বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ দেশের স্ত্রীলোকেরাও যে, অতি শীঘ্র প্রাচীন অবস্থা প্রাপ্ত হন, উল্লিখিত দুর্ঘটনাই তাহার একটী মুখ্য কারণ। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের নাম 'সধবা"—তাহার দ্বিতীয়ই 'জেঁয়াচ'। আমার 'জেঁয়াচ' নাম ঘুচিয়াছে, ঈশ্বর করুন, যেন অপর নামটী থাকিতে থাকিতেই যাইতে পারি"—পূর্ণ যৌবনা বঙ্গমহিলাদিগের মুখে ঐরূপ কথা অসাধারণ নহে।

——(*)——

পঞ্চবিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

নিরপত্যতা।

বিবাহ হইলেই গৃহাশ্রমে প্রবেশ হয়—প্রণয় সঞ্চার হইলেই দম্পতীর স্বার্থপরতার সংস্কার আরম্ভ হয়। কিন্তু স্বার্থপরতার সংস্কারকি?—পরার্থে উহার বিস্তৃতি। যতক্ষণ ঐ বিস্তৃতি হইতে থাকে ততক্ষণই সংস্কার হইতে থাকে। বিস্তৃতি স্থগিত হইলেই সংস্কারও স্থগিত হয়। যতক্ষণই তোমার স্বার্থ আর কাহার স্বার্থের সহিত সম্মিলিত হইতে যাইতেছে, ততক্ষণই তোমার স্বার্থের সংস্কার হইতেছে, যখন মিলিয়া গেল—দুই স্বার্থে এক স্বার্থ হইল, তাহার পর আর স্বার্থের বিস্তৃতিও হইল না—সংস্কারও হইতে পারিল না। এই জন্যই বলিলাম যে, দম্পতীর প্রণয়ে তাহাদিগের স্বার্থ-সংস্কারের আরম্ভ মাত্র হয়। দম্পতীর পরস্পর আকর্ষণ এত প্রবল যে, ঐ আকর্ষণ প্রভাবে দুইটী জীবন অতি অল্পকালের মধ্যেই দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইয়া সম্মিলিত এক জীবনের ন্যায় হইয়া উঠে। উহাদিগের মধ্যে স্বার্থ পরার্থ বোধের অবসর লুপ্তপ্রায় হয়, অথবা প্রকৃতিভেদে যতদূর লুপ্ত হইবার তাহা হইয়া ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া পড়ে। ফলকথা, বাহ্য জগতে যেরূপ অন্তর্জগতেও তাই। দ্রব্যের প্রকৃতি ভেদে কোথাও যোগাকর্ষণ, কোথাও বা রাসায়নিক আকর্ষণ. কোথাও দুইটী আত্মার. নৈকট্য সম্বন্ধমাত্র—কোথাও বা দুইটীতে মিলিয়া একটী অপূর্ব্ব বস্তু।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে আমার আর একটী কথা মনে পড়িল। অনেক দিন হইতে আমার সংস্কার হইয়া আছে যে, দম্পতীর পরস্পর সম্মিলনের পরিমাণ এবং প্রকারভেদ প্রায়ই তাহাদিগের সন্তানের আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। যদি তাহাদিগের সম্মিলনের প্রকৃতি বাহ্যজগতের যোগাকর্ষণের অনুরূপ হয়, তবে সন্তানে কখন পিতার আকার প্রকার কখন বা মাতার আকার প্রকার অধিক পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, অথবা পিতৃবংশীয় কিম্বা মাতৃবংশীয় পূর্ব্বগত কোন পুরুষ বা স্ত্রীর ভাব ধারণ করে। যদি দম্পতীর সম্মিলন বাহ্যজগতের রাসায়নিক সম্বন্ধের অনুরূপ হয়, তবে প্রায়ই

সন্তানেই উহাদিগের উভয়ের আকার প্রকার অথবা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আকার প্রকার পরস্পর সম্মিলিত ভাবাপন্ন হইয়া দৃষ্ট হয়। আমার এই সংস্কারটী এত দৃঢ়সম্বন্ধ নয় যে, উহাকে আমি অব্যভিচারী তথ্য বলিয়া মনে করিতে পারি—কিন্তু এই ভাবটী প্রথমে যখন আমার মনে উঠিয়াছিল, তাহার পর আমি যত দেখিয়াছি বা পড়িয়াছি * তাহাতে ইহা অপ্রাকৃত বলিয়া বোধ হয় নাই।

যাহা হউক, সন্তান জন্মিলে যে দম্পতীর প্রণয় দৃঢ়তর হয়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দশ সহস্রের মধ্যে দুই চারিটী নিতান্ত পশুধর্ম্মা ভিন্ন এই কথা অপর সকলের পক্ষেই খাটে। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতার একীভূত স্বার্থপরতা আবার বিস্তৃত এবং সুসংস্কৃত হইতে থাকে। কি করিলে ছেলে ভাল থাকিবে, কি করিলে সে ভাল হইবে, কেমন উপায় করিতে পারিলে তাহার অবস্থা আপনাদিগের অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে এই সকল চিন্তা আসিয়া পিতা মাতার হৃদয়কে আশ্রয় করে। তাঁহারা আপনাদের সুখের দিকে আর বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না—স্বার্থপরতার পুনঃসংস্কার হইয়া উহা পরার্থপরতার উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করে। সন্তান এইরূপে পিতা মাতার জীবনের সংস্কারক হয়। বাপ মা সন্তানের জন্য যে কত শত করেন, শাস্ত্রে এবং লোকের মুখে তাহারই ভূয়োভূয়ঃ ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সন্তান যে পিতা মাতার অশেষ উপকার করে, তাহা শাস্ত্রের ইঙ্গিত মাত্রে উক্ত হইয়াছে; কোথাও সুবিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। সন্তান পিতা মাতার নিরয়-ত্রাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদানাদি দ্বারা। আমার বিবেচনা এই পরকালে যাহা কিছু হয়, তাহার সূচনা ইহকাল হইতে হওয়া চাই †। সন্তান ইহলোক হইতেই নিরয়ত্রাণের কোন উপায় করিয়া দেয়

---

* অয়ং ন কেবলমস্মৎ সংবাদিন্যাবৃত্তিঃ—

অপি জনকসুতায়াস্তচ্চ তচ্চানুরূপং
স্ফুটমিহ শিশুযুগ্মে নৈপুণোন্নেয়মস্তি।
ননু পুনরিব তন্মে গোচরীভূতমক্ষ্ণো
রভিনবশতপত্রশ্রীমদাস্যং প্রিয়ায়াঃ।

† যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। সন্তান দ্বারা যে পিতা মাতার স্বার্থের সংস্করণ হয় তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু অপত্য কর্তৃক আরব্ধ সংস্করণ-কার্য্য অল্পকাল মধ্যে নিবৃত্ত হয় না। উহা সন্তানের পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত চলিতে পারে—ফলতঃ যত দিন পিতা মাতা নিজ সন্তানের জীবনকে আপনাদিগেরই জীবনের অনুবৃত্তি মাত্র বোধ না করেন, তত দিন সন্তান দ্বারা স্বার্থপরতার সংস্কার হইতে থাকে। কিন্তু সন্তানের জীবনকে আপনাদিগের জীবনের অনুবৃত্তি ভাবিয়া সন্তানকে ঠিক আপনাদিগেরই মত করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিলে সন্তানের নিজের বৃত্তি সকলের সঙ্কোচসাধন করা হয়, তেমন স্থলে পিতা মাতার স্বার্থপরতার সংস্কারে ব্যাঘাত জন্মে। সন্তানের জ্ঞানোন্মেষ হইবামাত্র পিতা মাতার বোধ হইতে থাকে যে, তাঁহারা নিজে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সন্তানও সেই দুষ্কর্ম্মাসক্ত হইবে, আপনারা নিশ্চেষ্ট হইলে সন্তানের অবস্থার উৎকর্ষসাধন হইবে না। বস্তুতঃ সন্তান পালন করিতে করিতেই শিক্ষাপদ্ধতির যে কত নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, মানবহৃদয়ের যে কত অপরিজ্ঞাত তথ্য পরিজ্ঞাত হয়, কার্য্যের বিঘ্নবৈষম্য সমুদায় উৎসাহশক্তির উত্তেজনায় যে কিরূপ দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। একটী উদাহরণ দিতেছি। প্রথম সন্তানের জন্ম হইলে কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষা শিশুপালন এবং চিকিৎসাবিধান এমন উত্তমরূপে শিখিয়া লইয়াছিলেন যে, অনেক সময়ে কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং তাঁহার উপদেশ পাইয়া কৃতকার্য্য হইত। ছেলেটী দুর্ব্বল ছিল। ক্রমে তাহার শরীর সুস্থ এবং সবল হইল। তাহার শিক্ষা কার্য্যের বিধান করিতে করিতে শিক্ষা পদ্ধতির সমুদায় সূত্র পিতার আয়ত্ত হইয়া গেল। ছেলেটীকে বিলক্ষণ মেধাবী এবং বুদ্ধিমান্ দেখিয়া পিতার ইচ্ছা হইল ইউরোপে প্রেরণ করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন, তজ্জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা জন্মিল এবং স্ত্রী পুরুষে মিতব্যয়িতা শিখিলেন।

ঐ ব্যক্তির একটী কন্যা হইল। কন্যাটী বাড়িতে লাগিল—লেখা পড়ায় মনোযোগ প্রদর্শন করিতে লাগিল—বুদ্ধি এবং সুশীলতায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। পিতা কন্যাকে তদুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসনা করিলেন; কিন্তু ধনবান নহেন বলিয়া পাছে সুপাত্র সংযোজন না হয়, এইরূপ ভয়

হইতে লাগিল। তিনি ধনবৃদ্ধির উপায় করিতে না পারিয়া ভাবিলেন যদি পাঁচ জনে আমাকে ভাল বলিয়া জানে, তবে মেয়ের বিবাহের নিমিত্ত ভাল ছেলে যুটিতে পারিব। এই ভাবিয়া তিনি যশোলিপ্সু হইলেন।

উঁহার আর একটী পুত্র হইল। পুত্রটী অতি সুন্দর। প্রাচীন-সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ কোন মহাপুরুষ ছেলেটীকে দেখিয়া বলিলেন, এ ছেলেটী অতি ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, সদয়স্বভাব এবং বহুলোক পালক হইবে। ঐ কথায় অনায়াসে পিতা মাতার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহারা আত্মগৌরব-সম্পন্ন হইলেন এবং ওরূপ পুত্রের বাপ মায়ের উচ্চপ্রকৃতিক হওয়া আব-শ্যক বোধ করিয়া আপনারা উন্নতিপরায়ণ হইলেন।

ঐ ব্যক্তির আর একটী পুত্র হইল। সেটী যখন চারি পাঁচ বৎসরের তখন তিনি একদিন তাঁহার মনিবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মনিব বলিয়া ফেলিলেন, তোমার যত দূর উন্নতি হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—আর কি হইবে? ইংরাজ জাতীয় মনিবের ঐ হৃদয়শূন্য বিরস বাক্য যেমন কাণে গেল অমনি হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—ছেলেটীকে মনে পড়ায় প্রজ্বলিত ক্রোধের দমন হইল এবং মুখ হইতে এমন ভাবে যুক্তি পরম্পরা নির্গত হইল যে মনিব একেবারে মুষ্টিমধ্যে আসিলেন—প্রদত্ত পরামর্শ সমস্ত শিরোধার্য্য জ্ঞান করিলেন এবং ঐ ব্যক্তির উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথোচিত যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক প্রীতিবর্দ্ধন সন্তান আলস্য, নিশ্চেষ্টতা, নিরুৎসাহতা, অপযত্ন, অসমীক্ষ্য-কারিতা প্রভৃতি নিরয় হইতে পিতা মাতাকে বিমুক্ত করে এবং সেই জন্যই সন্তানকে নরকত্রাতা বলা যায়।

যে দম্পতীর সন্তান না জন্মিল, তাঁহাদিগের প্রণয় বর্দ্ধিত বিস্তৃত এবং উচ্চতর সংস্কারপূত হইতে পারে না; অসমীক্ষ্যকারিতা দোষ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নই করিতে হয়; অধ্যবসায় এবং উৎসাহশীলতা অল্পকালেই স্তিমিততেজ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নিরয় হইতে নিস্তার পাইবার উপায় কি? অসামান্য ঔদার্য্য এবং দূরদর্শিতা গম্ভীরতাসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার উপায় আপনিই করিয়া লইবেন—নিরয় ... অর্থাৎ পিতা মাতার পুণ্যের বলেই তিনি তরিয়া যাইবেন, অপর

সাধারণ লোকের পক্ষে নিরপত্যতাজনিত দোষ অতিক্রম করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এই জন্যই বিশেষ দুরূহ যে, মনুষ্য রাগদ্বেষাদি ভাব দ্বারা যত পরিচালিত হয়, বুদ্ধিদ্বারা তত পরিচালিত হয় না; বুদ্ধি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চায়, তাহা অপেক্ষা রাগদ্বেষাদি ভাব যে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে চায়, তৎপ্রতি সমধিক আগ্রহ জন্মে। নিরপত্যতা নিবন্ধন এই এই দোষ জন্মিতে পারে, অতএব সেই সকল দোষ যাহাতে না হইতে পায় এমন করিয়া চলিব, এরূপ অল্প লোকেই বুঝিতে পারে, এবং যাহারা বুঝিতে পারে, তাহারাও সকলে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দোষ অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয়ের দোষ নিবারণ করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু লোকে বাহ্য অবলম্বনদ্বারা উভয় স্থলেই দোষের প্রতীকার চেষ্টা করিয়া থাকে। চক্ষু দুর্ব্বল হইলে চসমা লওয়া হয়, কর্ণ দুর্ব্বল হইলে স্পীকিং-ট্রম্পেট ব্যবহৃত হয়, পা খোঁড়া হইলে লাঠি ধরা হয়। মানসিক দুর্ব্বলতার হেতু উপস্থিত হইলেও ঐ প্রকারই করিয়া থাকে; অর্থাৎ চসমা, স্পীকিং-ট্রম্পেট এবং লাঠি ধরার ন্যায় নিরপত্যেরা পোষ্যপুত্র লয়, কিম্বা বিড়াল কুকুর ময়না পোষে—অথবা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহার সেবায় রত হয়। তাহাও মন্দ নয়। ইহাতেও কতকদূর হইতে পারে—এবং সেই জন্যই লোকে করে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, নিরপত্যতা হইতে কি কি দোষ জন্মে, তাহা বুঝিয়া মনে মনে চেষ্টা করিয়া সেই সেই দোষের প্রতিবিধান করিতে পারিলেই ভাল হয়—বাহ্য অবলম্বন গ্রহণে তেমন উত্তম হয় না।

সাধারণ গৃহস্থশ্রেণীর পক্ষে নিরপত্যতা এমনি দুর্ভাগ্য যে, কিছুতেই উহার সম্যক্ প্রতিবিধানের সম্ভাবনা নাই। ছেলে হয়ে যাওয়ার চেয়ে ছেলে না হওয়া ভাল, যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থকর্ত্রীর বাক্য শুনিয়া কি মনে করিবেন? গ্রন্থকর্ত্রী বলেন, "চিরান্ধ হওয়া অপেক্ষা একবার মাত্র সূর্য্যের মুখ দেখিয়া অন্ধ হওয়া ভাল।" আমার অনেক ছেলে মেয়ে হইয়া গিয়াছে তথাপি একবারও মনে হয় না যে, তাহারা না হইলে ভাল হইত। যাহার সন্তান হইয়া যায় সে অন্যের ছেলেকে পাইলে আপনার করিয়া লইতে পারে।

—:*::*:—

ষড়্‌বিংশ প্রবন্ধ।

সন্তান পালন।

সংসারাশ্রমীদিগের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের চরম ফল তাঁহাদিগের সন্তানে বিদ্যমান থাকে। জ্ঞানচর্য্যা, ধর্ম্মচর্য্যা, পতি পত্নী প্রেম, পিতৃ মাতৃ সেবা কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব, লৌকিকতা, মিতাহার, মিতাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, দাতৃত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সংসারাশ্রমের বিহিত ভাব, সকলেরই ফল সেই আশ্রমসম্ভূত এবং সেই আশ্রম-পালিত সন্তানে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই সন্তান ভাল হইলে মাতাপিতার পুণ্য সূচিত হয়, সন্তান মন্দ হইলে তাঁহাদের অপুণ্য সূচিত হয়। যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহাদিগের পার্থিব পরলোকে (অর্থাৎ সন্তানে) ঊর্দ্ধগতি, যাহারা পুণ্যশালী নয়, তাহাদিগের পার্থিব পরলোকে (অর্থাৎ সন্তানে) অধোগতি। উল্লিখিত নিয়মের কদাচিৎ ব্যভিচার হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন—নিয়মটীকে সাধারণতঃ অব্যভিচারী বলিয়াই মনে করা ভাল।

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই হৃদয়ে ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি সমধিক আস্থা। পরকালের নিমিত্তই আমাদিগের সব। হিন্দু জাতীয়েরা আহার বিহার পরিচ্ছদাদিতে অপর জাতীয়দিগের অপেক্ষা যে স্বল্প-যত্ন, হিন্দু জাতীয়দিগের সকল কার্য্যেই যে ঈশ্বরের স্মরণ এবং সকল কর্ম্ম ফলেরই ঈশ্বরে সমর্পণ, নিষ্কামতাই যে হিন্দুদিগের একান্ত শিক্ষণীয়, পারলৌকিক সদ্গতি সাধনার্থ হিন্দুদিগের মধ্যে যে কঠোর তপশ্চরণ এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন, এ সমুদয়ের একমাত্র কারণ হিন্দুদিগের পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস এবং নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ইহলৌকিক সুখ অপেক্ষা পারলৌকিক সুখের প্রতি অধিকতর লালসা। এটী হিন্দুজাতির দোষ নহে—পরম গুণ। বর্ত্তমান সুখৈশ্বর্য্যাদি অপেক্ষা যাঁহারা ভাবী সুখৈশ্বর্য্যের প্রতি অধিকতর লোলুপ, তাঁহাদিগের মধ্যে পশুধর্ম্ম অপেক্ষা মনুষ্যধর্ম্মই প্রাণতর।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রকৃতি এরূপ উচ্চ হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে যে কতকগুলি কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে তজ্জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ উচ্চ প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বস্থলে সাধিত হইতেছে না। তাঁহারা অতীন্দ্রিয় পরকালের ভাব বুঝিবার নিমিত্ত ইহলৌকিক বা পার্থিব পরকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং অনেক সময়ে অতীন্দ্রিয় পারলৌকিক উন্নতির প্রকৃতপথেও পদার্পণ করিতে পারিতেছেন না। পরলোক ইহলোকের পরিণাম মাত্র—শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়থাই সিদ্ধ এই তথ্যটী কদাপি ভুলিতে নাই। সকলেরই অন্তঃকরণে এই তথ্যটীকে জাগরুক রাখা আবশ্যক যে, সন্তানদিগকে উৎকৃষ্টতর দেহমনঃসম্পন্ন করিয়া যাইতে না পারিলে কোন নরনারীর পারলৌকিক উর্দ্ধগতি সম্পাদিত হইতে পারে না। 'পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং"—পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করিবে এটী বিধিবাক্য, সন্তান বাৎসল্যের পরিচায়ক স্বরূপাখ্যান মাত্র নয়। কিন্তু শুদ্ধ ইচ্ছা করিলেইত হইবে না; যাহাতে পুত্র তোমাকে পরাজয় করিতে পারে, তাহার উপায় তোমাকে করিয়া দিতে হইবে।

প্রথমতঃ পুত্রের শরীর যাহাতে নীরোগী, পটু এবং বলিষ্ঠ হয়, তাহা করিতে হইবে। তজ্জন্য সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বকাল হইতে আপনাদিগের শরীর নীরোগ, শুচি এবং সক্ষম করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। সুতরাং মিতাচার, মিতাহার, পরিচ্ছন্নতা ব্যায়ামচর্য্যা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইল। পিতৃ মাতৃ শরীরে অপক্ক রস ক্লেদাদি থাকিলে তাহা সন্তানের শরীরে সংক্রমিত হইয়া তাহাকেও রুগ্ন-দেহ করে। পিতৃ মাতৃ শরীর শুচি এবং সবল হইলে তজ্জাত সন্তানের দেহও নীরোগ এবং বলশালী হয়। একটী পুরাতন গল্প বলি—

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিরাম গোস্বামী নামে একজন ঘোঢ়াসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। ঘোঢ়াসিদ্ধেরা একপ্রকার দেবাধিষ্ঠিত পুরুষ। তাঁহারা যাহাদিগকে প্রণাম করেন, যদি তাহাদিগের শরীরে দৈবশক্তির আবির্ভাব না থাকে, তাহা হইলে প্রণাম করিবামাত্র তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সন্তান জন্মিল, অভিরাম একদা গুরুদর্শনে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "অভিরাম! আমার একটী পুত্র হইয়াছে।" অভিরাম

ঠাকুর পুত্র দর্শনে গমন করিলেন, এবং সূতিকাগারের দ্বার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে প্রণাম করিলেন। শিশুটী তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এইরূপ তিন চারি বার হইলে মহাপ্রভু তিন বর্ষের নিমিত্ত স্ত্রীসহবাস পরিহারপূর্ব্বক অনেকগুলি যোগের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া পুনর্ব্বার সন্তানোৎপাদন করিলেন। আবার অভিরাম আসিলেন—আবার ঠাকুরপুত্রকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু এবারে শিশুটীর কোন হানিই হইল না; প্রত্যুত শিশুটী পদোত্তলনপূর্ব্বক যেন পিতৃশিষ্যকে আশীর্ব্বাদ প্রদানের ইঙ্গিত প্রকাশ করিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ঐ সন্তানটীই পরে বীরভদ্র নামে বিখ্যাত হইয়া সমস্ত বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাবল্য সংস্থাপন করেন। এই গল্পে একটি প্রকৃত তথ্য নিহিত আছে।

আমার কোন কোন আত্মীয়ার পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইতেছে শুনিয়া আমি তাঁহাদিগের স্বামিদিগকে পরামর্শ দিয়াছি যেন পুনর্গর্ভধারণের কাল বিলম্বিত হয়। কালবিলম্বে গর্ভস্রাব দোষ সারিয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয়, যদি একটী সন্তান জন্মিবার ৪।৫ বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার গর্ভধারণ না হয়, তবে প্রসূতির শরীর ক্ষয় হয় না, এবং সূতিকাগৃহেও এত অধিক সন্তানের অকাল মৃত্যু সংঘটন হয় না।

গাঢ়তম প্রণয় সম্বদ্ধ দম্পতীর সন্তান সুষ্ঠুশরীর এবং সুষ্ঠুমনা হইয়া থাকে। এই জন্য স্ত্রী পুরুষে পরস্পর কলহ বিসম্বাদ সর্ব্বদা পরিহার্য্য— বিশেষতঃ যখন গর্ভ ধারণ হইয়া গিয়াছে, তখন গর্ভিণীর মনে কোন প্রকার উদ্বেগ জন্মাইতে নাই।

ফলকথা, সন্তানোৎপাদন এবং সন্তানের পালন সম্বন্ধে অনেক নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সে সমুদায়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করাও এই প্রবন্ধে সম্ভবে না। মূল কথা এই—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে হইবে। আপনারা সুস্থশরীর না হইলে সন্তান সুস্থশরীর হইবে না আপনারা অকৃত্রিম ধর্ম্মশীল না হইলে সন্তানও ধর্ম্মশীল হইবে না; আপনারা বিদ্যাচর্চ্চায় উন্মুখ না হইলে সন্তানের বিদ্যানুরাগ জন্মিবে না; আপনারা মিতব্যয়ী না হইলে সন্তানকে সম্পত্তিশালী করিতে পারিবে না। সদুপায় ধর্ম্মাচারের বীজ কোথায়—ইহার অনুসন্ধানে বহুদেশের

পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে যত্ন করিয়া আসিতেছেন। কেহ বলেন, প্রীতিই ধর্ম্ম-বীজ। কেহ বলেন, অপৌরুষেয় শাস্ত্র হইতেই মনুষ্যগণ ধর্ম্ম বীজ লাভ করেন। কেহ বলেন, পরোপকার ভিন্ন ধর্ম্ম বীজ হয় না। কাহারও কাহারও মতে অধিকসংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণে সুখ যাহাতে সাধিত হয়, তাদৃশ কার্য্যই ধর্ম্ম কার্য্য। এবম্প্রকার বিবিধ মতবাদের যেটাকে অবলম্বন করা যাউক, কার্য্যকালে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত আবার বিচার এবং যুক্তিসংগ্রহ করিতে হয়। আমি বলি, সাধারণতঃ গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে একটী অপেক্ষাকৃত সহজ নিয়ম বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে—আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে সর্ব্বতোভাবে—কোন এক বিষয়ে নহে—সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট করিবার চেষ্টা কর—ধর্ম্মসাধন হইবে। মোটামুটি সমুদায় ধর্ম্মচর্য্যা ঐ এক ভিত্তিমূলে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরেও দেখ, যাঁহারা আপনাদিগের অপেক্ষা সন্তানকে উৎকৃষ্টতর করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা উন্নতিশীল মানবজীবনের সার্থকতা সাধন করেন। তাঁহাদের ইহলোক পরলোক উভয় লোকই রক্ষিত হয়। যাঁহারা তাহা না পারেন, তাঁহাদের ইহলোকে মনস্তাপ এবং পরলোকে অধোগতি।

সপ্তবিংশ প্রবন্ধ।

—•(०)•—

শিক্ষা-ভিত্তি।

সন্তান সন্ততিকে লেখা পড়া শিখাইতে হয়, এই বোধটী এক্ষণকার প্রায় সকল লোকেরই মনে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বেও যে এ দেশে ঐরূপ বোধ না ছিল, কিম্বা এক্ষণকার অপেক্ষা কম ছিল, তাহা নহে। তবে পূর্ব্বকার গতানুগতিক লোকের ঐ বোধ অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রখর ছিল; এক্ষণে স্বচিন্তা বা উদরচিন্তা অথবা অভিনব শিক্ষা দ্বারা প্রণোদিত নব্যদিগের ঐ বোধটী অপেক্ষাকৃত প্রখর এবং সতেজ হইয়াছে। পূর্ব্বকার ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরের ছেলের হাতে খড়ি দাও, তাহাকে পাঠশালায় পাঠাও, পাঠ অভ্যাস করাও—না করে "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ" বচনার্থ স্মরণ করিয়া যাহা করিতে হয় কর। যাহা করা উচিত সন্তানকে বলিয়া দাও—যাহা না করা উচিত তাহাও বলিয়া দাও—বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—উচিত না করিলে মার—অনুচিত করিলেও মার। তাহা করিলেই শিক্ষা নীতির পদ্ধতি জ্ঞান এবং তাহার মুখ্য অনুষ্ঠান হইল।

নব্যকালে ঐ পদ্ধতি দূষ্য হইয়াছে, এখন ছেলের হাতে খড়ি দিতেই হয় না; এখন তাহাকে ফাঁকি জুঁকি দিয়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়, ছেলে যেন টের না পায় যে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে—অথচ শিখিয়া ফেলে। ইউরোপে কোথাও কোথাও নিয়ম হইয়াছে যে, ছেলেকে যদি পরকীয় ভাষা শিখাইতে হয়, তবে ঐ পরকীয় ভাষা কহিতে পারে, এমন চাকর বা চাকরাণী তাঁহার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে উহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে ছেলে তাহাদিগের ভাষাটী শিখিয়া ফেলিবে। কোন দ্রব্যের গুণ, ধর্ম্ম ব্যবহারাদি শিখাইতে হইলে কথায় বলিয়া দিলে হইবে না। সেই দ্রব্য আনিয়া ছেলেকে দিতে হইবে, সে ব্যবহারে আনিয়া তাহার গুণাদি বুঝিয়া লইতে আরম্ভ করিবে এবং স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিয়া

লইবে। ভাষা এবং বাহ্য পদার্থ শিক্ষার সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানোৎপাদনের জন্যও ঐ প্রণালী অবলম্বনের কতক চেষ্টা হইয়াছে। কোন সুবিখ্যাত নামা ইংরাজ তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আদ্যোপান্ত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছেলেকে বিধি বা নিষেধ মুখে কিছু না শিখাইয়া যাহাতে সকল বিষয় সে ঠেকিয়া শিখে এমন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ কথা খুব পাকা কথা, তাহার সন্দেহ নাই—ঠেকে শিখিলে শিক্ষা যেমন বদ্ধমূল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব উল্লিখিত গ্রন্থকার যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, সম্ভবমত তদনুসারে চলিবার চেষ্টা করা উচিত।

কিন্তু বিধি নিষেধ দ্বারা শিক্ষা দানের কোন স্থলই কি নাই? মানব-প্রকৃতিতে কি ভূয়োদর্শন ভিন্ন জ্ঞানলাভের আর কোন পন্থাই নাই?—ঠেকে শেখা বা ভূয়োদর্শন দ্বারা শেখা—একথার তাৎপর্য্য সুখ দুঃখ ভোগ দ্বারা শিক্ষা লাভ করা। ছেলে একটী কাজ করিল—যথা দীপ-শিখায় হাত দিল—তাহার হস্তে তাপ লাগিল, তাহার দুঃখ হইল, সে বুঝিল যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে অতএব আগুনে হাত দিতে নাই। যদি পৃথিবীর সকল ব্যাপারই ঐরূপ হইত অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তজ্জনিত দুঃখ সুখের ভোগ হইত, তাহা হইলেই ঐরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারিত। কিন্তু পৃথিবীর অধিক ব্যাপারই ওরূপ নহে। অনেকস্থলেই সুখ দুঃখ কালব্যবধানে সংঘটিত হয়। ছেলে মিষ্টান্ন খাইল—খাইতে বেশ লাগিল—তাদৃশ দ্রব্য ভোজনের সুখই তাহার মনকে আকর্ষণ করিল। দুই চারি দিন পরে তাহার পীড়া হইল। শিশু সেই মিষ্টান্ন ভোজনের সহিত তাহার পীড়ার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারিল না। তাহাকে ঐ সম্বন্ধ বুঝাইয়া না দিলে তাহার কোন শিক্ষা-লাভই হইবে না। অতএব বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বুঝা-ইয়া দিলে যে শিক্ষা হয়, তাহার মূল ঠেকে শেখা নহে, তাহার মূল শিশুর বিশ্বাস মাত্র। অতএব বিশ্বাসকেও শিক্ষার একটী স্বতন্ত্র ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা বিশ্বাসের উপর শিক্ষার সোপান স্থাপন করিতে একান্ত নারাজ, তাঁহাদিগের সকল কাজ ত প্রকৃত প্রস্তাবে চলেই

না, পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের বৃথা চেষ্টাদ্বারা শিক্ষা-প্রণালীর কতক অঙ্গভঙ্গ হইয়া যায় মাত্র।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের নিদান খুঁজিতে খুঁজিতে যেখানেই উপস্থিত হওয়া যাউক, উহা শুদ্ধ সুখ দুঃখের বিচারের মধ্যে পাওয়া যায় না। উহা সকলেই আপন আপন হৃদয়ের মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণে কর্ত্তব্যজ্ঞানের বীজ প্রথমে কিরূপে উপ্ত হয়, যদিও তাহা না বলিতে পারা যায়, উহা কিরূপে প্রকট হইয়া উঠে, তাহা একটু অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। একটী প্রকৃত বিবরণ বলি—কোন গৃহস্থের বাটীতে দুই জনে সময়ে সময়ে সতরঞ্চ খেলিতেন। তাঁহাদিগের একজনের একটী দেড় বৎসর বয়সের বালিকা ঐ স্থানে বসিয়া থাকিত। সে সতরঞ্চের 'বল' লইবার জন্য হাত বাড়াইলেই তাহার পিতা প্রসারিত হস্তটী ধরিয়া বলিতেন—"হাত দিও না"। কিছু দিন এইরূপ হইলে, এক দিন বালিকাটী খেলার কাছে বসিয়া আছে, দক্ষিণ হস্তটী 'বল' লইতে প্রসারিত করিয়া বাম হস্তে আপনার প্রসারিত হস্তকে ধারণ করিল এবং আপনিই আপনাকে পুনঃ পুনঃ বলিল, "হাত দিও না"। এই ব্যাপারটীতে কি বুঝায়? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা হৃদয়শালী পুরুষের যেরূপে অভ্যুত্থান হয়, এই ব্যাপার কি তাহাই স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে না? বালিকাটী যেন একেই দুইটী ব্যক্তি হইয়া পড়িয়াছে—তাহার এক জন সতরঞ্চের বল গ্রহণ করিতে উদ্যত, অপরে তাহাকে নিবারণ করিতেছে। যে নিবারণ করিতেছে, সে তাহারই হৃদয় মুকুরস্থ পিতার প্রতিবিম্ব।

অতএব বিধিনিষেধ দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞানের উদ্রেক বিধান করা একান্ত আবশ্যক। তাহা করিলেই সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে—কেবল দুঃখ সুখ বিচারের উপর কর্ত্তব্য বোধের সংস্থাপন কখনই কার্য্যকালে দৃঢ় থাকে না—নিষ্কাম ধর্ম্ম সেবায় প্রবৃত্তি দেয় না—এবং বিধি প্রতিপালন করাই যে পরম ধর্ম্ম তাহার জ্ঞান জন্মায় না—কর্ত্তব্যবোধের ভিত্তি ওরূপে সংকুচিত করিলে হিন্দুধর্ম্ম যে তাদৃশ জ্ঞানের অত্যুচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে।

——(*)——

অষ্টাবিংশ প্রবন্ধ।

———•(•)•———

সন্তানের শিক্ষা।

কথায় বলে ছেলেকে মানুষ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, ঐ কাজটী কোন পিতা মাতার সাধ্যায়ত্ত নয়, এবং কেহ তজ্জন্য চেষ্টাও করে না। ইংরাজ আপনার ছেলেকে ইংরাজ করিবারই চেষ্টা করেন, এবং তাহাই করিতে পারেন। চীনীয় আপন সন্তানকে চীনীয় করিবার নিমিত্তই যত্ন করেন, এবং তাহাই করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন জাতির বিশেষ ধর্ম্ম এবং গুণের দ্বারাই স্বীয় বংশধরদিগকে বিভূষিত করিতে চাহেন—কেহই মনুষ্য সাধারণ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সন্তানের পালন এবং শিক্ষাসম্পাদন করেন না। তবে যে সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম্মগুলি সকল জাতিতেই বিদ্যমান আছে, জাত্যনুযায়িনী শিক্ষা প্রদান করিতে করিতে সেই সকল ধর্ম্ম সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যশিশুরই শিক্ষা হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব সকল দেশেরই শিক্ষা-প্রণালী মনুষ্যসাধারণধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশেই প্রবাহিত হওয়া থাকে। ফলকথা, তাহাই হইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

তাহাই হইতে পারে এই জন্য যে, মনুষ্য মাত্রেরই মন পূর্ব্ব পুরুষ-দিগের সংস্কার এবং আপনাদিগের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার সমস্তের সমবায়ে সংগঠিত হয়; সংস্কার, সজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আইসে; প্রত্যক্ষী-ভূত ব্যাপারের সমধিক ভাবও সজাতীয় জনগণের কার্য্যকলাপ। এই জন্য জাতীয় ভাব পরিহার করা মানবের অসাধ্য। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া যেমন উড্ডয়ন হয় না—জল ছাড়িয়া যেমন সন্তরণ সম্ভবে না—ত্বক্‌সীমার বহির্ভাগে যেমন স্পর্শজ্ঞান হইতে পারে না—তেমনি জাতীয়-ভাব পরিশূন্য হইয়া কোন ব্যাপারের অনুষ্ঠানও মনুষ্যকর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে না।

তদ্ভিন্ন, সমাজের হিতাহিত লইয়াই সমাজান্তর্গত মনুজগণের হিতাহিত। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকল অবস্থায়, সকল সমাজের হিতাহিত এক নয়। বর্ব্বর, অর্দ্ধসভ্য, পূর্ণ সভ্য প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের হিতাহিত অনেকাংশেই পরস্পর বিভিন্ন। বিজিত এবং বিজেতা, দুর্ব্বল এবং সবল, দৃঢ় এবং শিথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সমাজের হিতাহিতও এক নয়। অভ্যুদয়োন্মুখ এবং পতনপ্রবণ জাতির হিতাহিতও এক নয়। সুতরাং সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানও কাজেই ভিন্নরূপ হওয়া আবশ্যক।

সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী অনুষ্ঠানই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই আমাদিগের শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপিত হয়, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। আমরা বাঙ্গালী—আমাদিগের সমাজ যে ভাবাপন্ন তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন কি? এইটী সুপরিস্ফুটরূপে অবধারিত করিয়া আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা যাহাতে ঐ সকল প্রয়োজনসাধনে সক্ষম হয়, তাহার উপায় করিয়া দেওয়াই আমাদিগের প্রকৃত শিক্ষা দান। মনুষ্যত্ব সাধন মস্ত কথা। মনুষ্যত্ব যে কি এবং উহা যে কি নয়, বা কি হইতে পারে না, তাহা এ পর্য্যন্ত বোধ হয় কেহই স্পষ্টরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারেন নাই। অতএব কিরূপ হইলে ছেলেটী প্রকৃত মনুষ্য হইবে, তাহা না ভাবিতে গিয়া কিরূপ হইলে ছেলেটী সমাজের অভাব মোচনে সাহায্য করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করা আবশ্যক। আমি তাদৃশ চিন্তাসম্ভূত কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী দুর্ব্বলশরীর। অতএব ছেলের শরীর সবল করিবার নিমিত্ত যত্ন করা আমাদিগের আবশ্যক। শৈশবাবধি ব্যায়ামচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া দেওয়া পিতা মাতার কার্য্য।

(২) বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গ্রাম যদিও স্বভাবতঃ কোন জাতীয় লোকের অপেক্ষা হীনতেজ নয় তথাপি শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়গণ বহুস্থলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধিতে অক্ষম হইয়া থাকে। দর্শনাদি দ্বারা দূরতা, নৈকট্য, সংখ্যা, ভাব প্রভৃতির অববোধ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রায়ই ঠিক হয় না। অতএব বাল্যাবধি ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা পিতা মাতার কার্য্য।

(৩) বাঙ্গালীর স্মৃতি শক্তি অতীব প্রখরা। যাঁহারা বাঙ্গালীর নিন্দা করেন, তাঁহারাও ঐ কথা স্বীকার করেন; কিন্তু বলেন, ইহাদের ধীশক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তি তেমন অধিক নয়। নিন্দকদিগের সহিত বিচারে প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতি একটী স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি নহে। মনোবৃত্তি মাত্রেরই কারণ-শক্তির নাম স্মৃতি—অর্থাৎ স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সকল মনোবৃত্তি কার্য্যকারিণী হয়। সুতরাং স্মৃতিকে প্রখরা বলিলে মনোবৃত্তি মাত্রেই তেজস্বিনী বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোবৃত্তি তেজস্বিনী বলিয়াই শিক্ষার একটী দোষ জন্মে। ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট না হইলেও বাঙ্গালীর মন সেগুলি গ্রহণ করিয়া রাখে—একেবারে পরিত্যাগ করে না, তাহাতে কার্য্যকালে ক্ষতি হয়, এবং কৃতিসামর্থ্যও ন্যূন হইয়া পড়ে। এই জন্য বাঙ্গালীর ছেলেকে শিখাইবার সময় যাহাতে ভাব সমস্ত সুপরিস্ফুট হয়, তজ্জন্য কি শিক্ষক, কি পিতা মাতা, সকলেরই যত্ন করা বিধেয়।

(৪) অন্যান্য মনোবৃত্তি যেমন প্রবলা, বাঙ্গালীর দূরদর্শিতা এবং কল্পনা শক্তিও তদনুরূপ। তদ্ভিন্ন, শরীরের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বাঙ্গালী ভীরুস্বভাব। এই দুই এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালীর ছেলের অনৃতবাদিতা দোষ জন্মিতে পারে। যাহাতে তাদৃশ দোষ না জন্মে, তজ্জন্য পিতা মাতার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দূরদর্শিতা বর্দ্ধিত করিয়াই অনৃতবাদিতার শাসন করা বিধেয়। সত্যই টেঁকে, মিথ্যা কখন টেঁকে না, এই তথ্যটি সর্ব্বদা সন্তানের মনে জাগরূক রাখা আবশ্যক।

(৫) বাঙ্গালী প্রবলতর জাতীয়দিগের পদমর্দ্দিত হইয়া ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যাইতেছে। অতএব আশার বৈফল্য বশতঃ সন্তানের ভবিষ্যতে যতই ক্লেশ হউক, পিতা মাতার কর্ত্তব্য তাহাকে উচ্চাশয়সম্পন্ন করেন। যেমন সান্নিপাতিক বিকারপ্রাপ্ত রোগীর পক্ষে ধাতু উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়, তেমনি বাঙ্গালীর মনে উচ্চ আশার উদ্রেক করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। দুবেলা দুমুটা খেতে পেলেই হইল, এবম্বিধ বাক্য সন্তানের কর্ণগোচর হইতে দিতে নাই।

(৬) বঙ্গদেশের বায়ু সজল এবং উষ্ণ; বাঙ্গালীর শরীরও দুর্ব্বল;

বাঙ্গালী সচরেই শ্রম বিমুখ। অতএব সন্তান যাহাতে শ্রমশীল হয়, তজ্জন্ত পিতা মাতাকে নিরন্তর সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে সকল বাঙ্গালী শ্রমশীল, তাঁহাদিগেরও পরিশ্রম দোষশূন্য নয়; একবার খুব হয়, আবার কিছুই থাকে না। এরূপ অনিয়মে দুর্ব্বল শরীর আরও ভাঙ্গিয়া যায়। ছেলেকে ওরূপ করিতে দিতে নাই। যেরূপ পরিশ্রম সয় বয়, সেইরূপ নিয়মিত পরিশ্রম অভ্যাস করাইতে হইবে।

(৭) এক্ষণকার বাঙ্গালী নিস্তেজ। নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষ্যা করিয়া থাকে। ঈর্ষা দোষটী সত্বর যাইবার নয়; তবে উহার বেগ ফিরাইতে পারা যায়। অতএব ঐ ঈর্ষা যাহাতে সজাতীয়ের প্রতি না জন্মে, অন্য জাতীয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(৮) বাঙ্গালীর স্বভাবে অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি অযথারূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অনুকরণ উৎকর্ষ সাধনের একটী প্রধানতম পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু অযথা অনুকরণ এক প্রকার আত্মহত্যার সংঘটন হয়। অতএব বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে আত্মগৌরব সম্বর্দ্ধিত করিবার উপায় করা আবশ্যক। পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি স্মরণে আত্মগৌরব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। এই হেতু বাঙ্গালীর ছেলেকে সংস্কৃত বিদ্যার স্বাদ গ্রহণ করাইবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয়। যখন ছেলে ইংরাজী পড়িবে, তখন ইংরাজী গ্রন্থে কোন উৎকৃষ্ট ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহার অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর ভাব যে সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

(৯) বাঙ্গালীর সহানুভূতি নিজ সমাজের মধ্যে তেমন অধিক হয় না। বাঙ্গালী আর বাঙ্গালীর প্রশংসায় যথোচিত পরিতৃপ্ত অথবা বাঙ্গালীর তিরস্কারে তাদৃশ ক্লিষ্ট হইতেছে না। ইংরাজের প্রশংসা এবং ইংরাজের নিন্দাই বাঙ্গালীকে যেন বেশী লাগে। এটী সাংঘাতিক দোষ। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কিছুই অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তবে বোধ হয়, ছেলেকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় কিয়ৎপরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা অর্থাৎ কিছু কিছু বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া এবং যাহাদিগের লিখিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহাদিগকে বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতে দেওয়া ভাল।

(১০) দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা একণে দরিদ্র জাতি। আমাদিগের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। গান বাজনা, আমোদ প্রমোদ, বিজয়ী ধনশালী প্রবল প্রতাপ ইংরাজদিগকে সাজে; আমাদিগের মধ্যে গান তামাসা নাটকাভিনয়াদি কাণ্ড কোন মতেই শোভা পায় না। অতএব সন্তানকে বিলাসী হইতে দিতে নাই। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন। সমাজের যে অবস্থা, তাহার অনুরূপ ব্যবহারই সমাজান্তর্গত সকল লোকের পক্ষে বিধেয়। বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে, সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইকর্গস্ হইতে হইবে; কারণ বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।

বশ্যতা ব্যতিরেকে একতা জন্মিতে পারে না। একটী গল্প বলি। এক খানি জাহাজে একজন অনভিজ্ঞ নূতন কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন অপেক্ষা সমধিক অভিজ্ঞ দুই চারি জন লোক তাঁহার অধীনে ছিল। একদিন কাপ্তেন জাহাজ চালাইতেছেন, এমন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, "জাহাজ যে বেগে যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে আর এক ঘণ্টার মধ্যে একটী মগ্ন শিলায় আহত হইয়া বিনষ্ট হইবে।" অপর একজন বলিল, "তবে এ কথা কাপ্তেনকে বলনা কেন?" সে উত্তর করিল—"সে কি! কাপ্তেন আপনার কর্ম্ম করিতেছেন—তাঁহার কথা শুনা মাত্র আমাদের কাজ, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলে গায়ে পড়া হইয়া কি তাঁহাকে কিছু বলিতে আছে?" কেহ কিছু বলিল না। জাহাজ বিনষ্ট হইল। এরূপ বশ্যতা পাগলামি বটে—কিন্তু হিন্দুদিগের উন্নতি কালেও ঐরূপ পাগলামি ছিল; রামায়ণ ও মহাভারতপাঠীদিগের তাহা অবিদিত নাই। যে দিনে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ওরূপ পাগলামি পুনর্ব্বার জন্মিবে, সে দিন বাঙ্গালীর শুভ দিন।

বহুকাল হইতে বাঙ্গালীরা অসামরিক জাতি। এই জন্য বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত বশ্যতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বলবানের নিকট

দুর্ব্বলের যে অধীনতা এবং নম্রতা, তাহাকে বশ্যতা বলা যায় না। বাঙ্গালী প্রায়ই বাঙ্গালীর বশ হইতে চায় না। অন্য জাতীয়েরা বশ হয়, এবং তাহাই হইয়া আছে। বশ্যতা ভক্তিমূলক—ভক্তি শৈশবে শিক্ষণীয়, এবং পিতা মাতাই প্রথম হইতে ভক্তির আস্পদ হইয়া ঐ ভাবটীকে অঙ্কুরিত এবং সম্বর্দ্ধিত করিতে পারেন। যে বাঙ্গালী পিতা মাতাকে ভয় ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, সে বাঙ্গালী নেতারও বশীভূত হইতে পারিবে। যে বাঙ্গালী ছেলেবেলায় পিতা মাতাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে দুই চারিখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া বা লোকের মুখে দুই একটী ইংরাজী মতবাদ শুনিয়া বাবাকে মূর্খজ্ঞান করিবে, এবং বাবার সজাতীয় বাঙ্গালী মাত্রকেই তাচ্ছিল্য করিয়া একটী প্রকাণ্ড বিচারু হইয়া উঠিবে।

—:*::*: —

ঊনত্রিংশ প্রবন্ধ।

গৃহ-শূন্যতা।

স্ত্রীবিয়োগ হইলেই 'গৃহ শূন্য' বলে। এ কথা কেন বলে? সত্য সত্যই ত স্ত্রীবিয়োগ হইলেই একবারে গৃহটী শূন্য হয় না। ছেলে মেয়ে, ভাই ভগিনী, বাপ মা, সকল থাকিতেও ত মানুষের স্ত্রীবিয়োগ হইতে পারে? তবে গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা সার পদার্থটী যায় বলিয়াই কি লোকে কলত্রবিয়োগ শোকটীকে বাড়াইয়া ঐ কথা বলে? আমার বোধ হয় তাহা নহে। স্ত্রীবিয়োগ হইলে বাস্তবিকই গৃহটী শূন্য হয়, অর্থাৎ গৃহটি শূন্য হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করিয়াই চলা উচিত হয়। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার বলিতে স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নাই। মা বল, আর ছেলে বল, ইহাঁদিগেরও তুমি ভিন্ন অন্য টান থাকে; কিন্তু স্ত্রীর তোমাকে লইয়াই সব।—তোমারও স্ত্রীকে লইয়াই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আমোদ, প্রমোদ, সমুদায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন যে, স্ত্রীবিয়োগ হইলে আর সংসারাশ্রমে থাকিতে নাই—বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করা বিধেয়। স্ত্রী গেলে আর ঘরে থাকিও না—বনে যাও তপশ্চরণ কর।

কিন্তু এখন আর বনে যাওয়া পোষায় না। বনও পূর্ব্বের মত অধিক এবং ঘন ঘন নাই। শরীরের অভ্যাসও পূর্ব্বের মত নাই, এবং ধর্ম্মকার্য্যের প্রকৃতিও এখন পূর্ব্ব হইতে ঈষৎ ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইতেছে। এ সকল পরিবর্ত্ত হইলেও আমার বিবেচনায় শাস্ত্রোক্ত উপদেশের মূল তাৎপর্য্যের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয় নাই—শূন্য গৃহে থাকিতে নাই—ধর্ম্ম কার্য্যে অবশিষ্ট জীবিতকাল যাপন করা কর্ত্তব্য।

গৃহ-শূন্য ব্যক্তি সংসার লইয়া থাকুন, দেখিতে পাইবেন ক্রমে ক্রমে তাঁহার ধর্ম্মহানি হইয়া আসিবে। তিনি যাহাকে বড়ই আপনার বলিয়া মনে করিতেন, দেখিবেন তাঁহার অধিকতর আপনার অপর কেহ আছে। তাঁহার ব্যথিত, বিচ্ছিন্ন, বিদগ্ধ হৃদয় হইতে তিনি যাহাদিগের উপর স্নেহ

বর্ষণ করিবেন, তাহারা কেহই পূর্ণমাত্রায় ঐ স্নেহের প্রতিদানে সমর্থ হইবে না। তিনি আপনার প্রীতিসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে উপহার দিবেন, তাহারা কেহই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিবে না। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দানে তাহাদিগের কাহার অধিকার নাই।

এরূপ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ কি সরস থাকিবে? তাঁহার মন কি তিক্ত হইয়া উঠিবে না? অবশ্যই নীরস এবং তিক্ত হইবে। তিনি ক্রমে ক্রমে কঠিনহৃদয়, স্বার্থপর অথবা বিরক্তচিত্ত এবং ক্রোধন-স্বভাব হইয়া উঠিবেন। তবে গৃহশূন্য ব্যক্তির গৃহাশ্রমে থাকা কিরূপে ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল হইবে? আর যাহা ধর্ম্মোন্নতির অনুকূল নহে, তাহা কিপ্রকারেই বা সুখের কারণ হইতে পারে? ফলতঃ গৃহশূন্য ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া থাকা ধর্ম্মহানির এবং অসুখের কারণ। যিনি শূন্য গৃহে থাকেন, তাঁহার কার্য্যকলাপেরও অনেক বিপর্য্যয় ঘটে। কার্য্যমাত্রেই কিছু কটুতা এবং কিছু মধুরতার প্রয়োজন। ভয় এবং মৈত্র উভয় সম্মিলিত না হইলে কাহাকেও দিয়া ভাল করিয়া কোন কাজ করান যায় না; এবং কটুতা ও মধুরতা, ভয় ও মৈত্র, পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ পদার্থ যে, উহাদিগের একত্র সন্নিবেশ কিঞ্চিৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই করিতে হয়। যত দিন দুইজন আছ একজন ভয়ের এবং একজন প্রীতির আধার স্বরূপ থাকিয়া অতি সুচারুরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পার। কিন্তু একজন গেলে অপর এক জনকেই বিভিন্ন দুইটী মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। সেটী ধারণ করা কিছু সহজ ব্যাপার নয়—এবং সহজ নয় বলিয়াই কাজ করা কঠিন হইয়া উঠে।

তদ্ভিন্ন, কার্য্য সঙ্কোচের আরও একটি কারণ উপস্থিত হয়। মনে কর, তুমি বাটীর কর্ত্তা— তুমি সংসারটীর কেন্দ্রস্বরূপ—তোমাকে বেষ্টন করিয়াই সকলে যথাস্থানে অবস্থিত আছে। এমন সময়ে তুমি গৃহিণীকে হারাইলে। অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারিবে, তোমার কর্তৃত্ব আর অক্ষুণ্ণ নাই। তুমি সংসারের কেন্দ্রীভূত থাকিতে পার না। সমস্ত পরিধিটী সঞ্চালিত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে—তুমি স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াছ। তবুও কি কেন্দ্র হইয়া থাকিতে চাও? থাক দিন কতকের মধ্যেই দেখিতে পাইবে, তোমার কথার আর তেমন বল নাই। সকলেই কথা শুনিবে—বা

বলিবে তাই করিবে; কিন্তু পূর্ব্বে তোমার আজ্ঞা যেমন ঈশ্বরের আজ্ঞার ন্যায় সর্ব্বদোষপরিশূন্য মঙ্গলময় বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তেমন হইবে না। ঐ আজ্ঞা দোষগুণে মিশ্রিত, বিচারসহ হইয়া পড়িয়াছে। "বাবার আর মনের ঠিক্ নাই; যা বলেন তা ত করিতে হইবেই, কিন্তু ওরূপে না বলিয়া যদি এইরূপে বলিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।" পরিজনের মনের ভাব এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিলেও কি আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কাজ করিতে বা করাইতে ইচ্ছা থাকে? যদি কার্য্যের ইচ্ছাই সঙ্কুচিত হইল তবে আর একাগ্রচিত্ত হইয়া কিরূপে কার্য্যব্যাপৃত থাকিবে? যদি কার্য্যব্যাপৃত না থাকিলে তবে জীবনের সুখই বা কিসে রহিল?

গৃহশূন্য ব্যক্তির যে সামান্য ভোগসুখের ব্যাঘাত হয়, তাহা বলিবার অপেক্ষা করে না। তথাপি একটী উদাহরণ দিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইতেছি। খাওয়ার প্রধান সুখ কি? অতি সুস্বাদ দ্রব্যেরও গলাধঃকরণ হইয়া গেলে আর স্বাদ বোধ থাকে না। আর উদরপূর্ত্তির সুখ দ্রব্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না; অপর একজন তোমার ভোজনতৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত হইতেছে, এই বোধ হইতে ভোজনের প্রধান সুখ জন্মে। স্ত্রী গেলে আর সে সুখ থাকে না। ছেলে, মেয়ে, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনেরা খাওয়া দেখেন, খাওয়ার কাছে বসেন, কিন্তু খাওয়া দেখিয়া আপনারা সুখী হইবেন বলিয়া তাঁহারা খাওয়ার কাছে আইসেন না। তাঁহারা ভালমানুষী করিয়া তোমাকে খাওয়াইতে আইসেন। তাঁহারা যেমন ভালমানুষি করিয়া আইসেন তুমিও তাঁহাদিগের সমীপে সন্তোষপ্রকাশ কর। ইহাতে ভাল মানুষির কাটাকাটি হয়, দয়ার এবং কৃতজ্ঞতার আদান প্রদান চলে। তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, তুমিও তাঁহাদিগের উপর অধিক ভার দিতে অনিচ্ছুক হও। তুমি আর খাবার ফরমাইস্ কর না, অথবা যদি কর, অন্যের নাম করিয়াই কর। নিজের খাবার কথা বলা বড় লজ্জাকর। কলত্রবিহীন গৃহীরা বড়ই নিমন্ত্রণপটু। তাঁহারা সর্ব্বদাই নিমন্ত্রণ করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে ভাল বাসেন, এবং তাহা করিয়া বাটীর ঝি বৌকে বড়ই জ্বালাতন করেন। পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণ করিয়া

খাওয়াইবার অন্য কারণও আছে। কিন্তু যে কারণের উল্লেখ করা গেল, তাহা যে একবারেই নাই, তাহাও নহে।

না বলিতে বলিতে আগে হইতে মন বুঝিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা সেই একজনের বই আর কাহার নাই। "তোমার মনে রহিল এই—কিছুই ফুটিয়া বলিবে না—আমি কেমন করিয়া বুঝিব."—এ কথা বলা সকলের পক্ষেই খাটে—কেবল স্ত্রীর পক্ষে খাটে না। স্ত্রীকে মন বুঝিতেই হইবে। মন না বুঝিতে পারিলে স্ত্রীর ত্রুটি ধরা যাইতে পারে; এবং স্ত্রীও স্বয়ং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হন। আর কাহার পক্ষে মন না বুঝিতে পারা ত্রুটি নয়।

অনেকগুলি কৃতী সুসন্তানের পিতা কিঞ্চিৎ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "—মহাশয়! ছেলেদের কোন দোষ নাই। তাহারা নিতান্ত আজ্ঞাবহ। যদি বলি, তবে বাঘের দুধ আনিয়া যোগায়। কিন্তু আমি যে অনেক কথা বলি না, বলিতে পারি না, তাহারা এইটী বুঝে না।" ঠিক কথা। অনেক কথাই বলা যায় না, এবং বলিতে বলিতে বুঝিয়া লইতে পারে, এমন লোক একজন বই হয় না। এ অবস্থায় গৃহবাসে আমোদ কি?"

তবে কি করিব? ঘরে থাকিতে নাই—অথচ বনে গিয়া তপ জপ করিবার কাল গিয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। অবস্থা-ভেদে এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সাধারণতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে, যতদূর পার, সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাক। আর সংসারের অন্তর্ভূত একজন হইয়া থাকিও না। উপদেশ, পরামর্শ, সাহায্য দান মাত্র করিয়া নিবৃত্ত হও। কেহ অন্যায্য ব্যবহার করিলে বিরক্ত হইয়া তাহার দণ্ডবিধান করিতে উদ্যত হইও না। কাজটী ভাল হয় নাই, এবং কি জন্য ভাল নাই এই মাত্র বুঝাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হও। বীতরাগ এবং ক্রমশঃ মমতাবিহীন হইয়া যতদূর পার কর। ছেলের পীড়া হইয়াছে জানিলে প্রতিবিধানার্থ যাহা আবশ্যক বোধ হয় বলিয়া পাঠাও। প্রয়োজন হয়, স্বয়ং তাহার নিকটে যাও, চিকিৎসা করাও, কিন্তু আরোগ্যলাভ হইলে আর ক্ষণমাত্র তাহার নিকটে থাকিও না। পুনর্ব্বার যেমন দূরে ছিলে, তেমনি থাক। সংসারের সহিত এতাবন্মাত্র সম্পর্ক রাখ। তাহার

ভিতরে থাকিয়া আর কখনও সুখী হইতে পারিবে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিও না। এইরূপে থাকিতে পারিলে বনে না গিয়াও বানপ্রস্থাশ্রমের শুভফল ফলিতে পারে। পরিজনের প্রতি অভিমানী হইতে হইবে না, মন যথাসম্ভব সরস থাকিবে, এবং ক্রমে ক্রমে মনের উদারতা সম্বর্দ্ধিত হইবারও উপক্রম হইবে।

মনুষ্যের মন স্নেহবিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না। বেঁচে থাকিলেই ভাল বাসিতে হয়; অন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইতে হয়। লতিকা সজীব থাকিলেই আকর্ষ বাহির করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে থাকিয়া একবার পবিত্র প্রীতির স [illegible] হইয়াছে, তাহার মন নিতান্তই কোমল পদার্থ হইয়া গিয়াছে। সে মন প্রণয়পদার্থের সৃষ্টি না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

কিন্তু সেই সৃষ্টির ব্যাঘাতক দুইটী কারণ আছে। এক, যাহা কিছু তাঁহার প্রীতির পাত্র হইবার নিমিত্ত সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই অনিত্য, অস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া উপলব্ধ হওয়াতে এবং সেই আস্থার ত্রুটি জন্মে। আস্থার অভাবে প্রীতি জন্মিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ, অভিমান। "আমি যতই কেন স্নেহ করি না, ও ব্যক্তি তাহার সম্যক্ প্রতিদান করিতে পারিবে না—তবে আমারই বা স্নেহ [illegible]?" এ ভাবটীও প্রীতিসঞ্চারের ব্যাঘাতক।

যে স্থলে ঐরূপ অনাস্থা এবং অভিমান জন্মিতে না পারিবে, যথায় ক্ষণভঙ্গুরতা অথবা অকৃতজ্ঞতার সন্দেহ না উঠিবে, এমন স্থলে স্নেহ সঞ্চারিত হইবার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

গৃহশূন্য কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে স্বদেশবাৎসল্যই বল, আর ঈশ্বরপরায়ণতাই বল, এইরূপ ভাব বিলক্ষণ প্রবল হইতে পারে। এখনকার কালে যাঁহার ঐরূপ হইল, তিনিই গৃহশূন্য হইয়া প্রকৃত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিংশ প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ।

—"And such was she"—'সে স্ত্রীও এমনি ছিল,' অর্থাৎ 'যে স্ত্রী গিয়াছে সে তোমারই মত বা ইহাঁরই মত ছিল"—এ কথা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, সাহেবেরা বলিতে পারেন। তাঁহাদিগের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, দেহ এবং মন যেমন হইবার তেমনি হইয়া থাকিয়া উঠিলে তাহারা পছন্দ করিয়া বিবাহ করেন, অতএব তাঁহারা যেমন একটী দেখিয়াছিলেন, আবার তেমন একটী দেখিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আর 'সেও এমনি ছিল' একথা বলিবার যো নাই। 'তুমি বা ইনি ঠিক তাহার মত'—আমি কাহাকে এ কথা বলিব? আর কেহ কি আমার নিজের হাতে গড়া, গায়ে মাখা, মনে ধরা জিনিস্? আমরা ছেলেবেলা দুজনে মিশেছিলাম, আমি তাঁহাকে আমার মনের মত করে তুলেছিলাম, নিজেও তাঁহার মনের মত হইয়া গিয়াছিলাম। সুতরং সে যাহা ছিল, তাহার নিজেরই মত, আর আমার মনের মত। অপর কেহ আর তেমন থাকিতে পারে না। আর কেহ তাহার চেয়ে ভাল থাকে, থাকুক, কিন্তু তেমন থাকিবে কেমন করে?

শাস্ত্রকারেরা এই বিষয়টী বুঝিতেন। এই জন্য যে স্থলে তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রণয়, অথচ, একাধিক দারপরিগ্রহ বর্ণন করিতে হইয়াছে, সেই স্থলে একটী কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা নায়ক নায়িকার মনে এই ভাবের কল্পনা করিয়া দিয়াছেন যে, "সেই মরে এই হইয়াছে।" দক্ষকন্যা সতীই হিমালয় কন্যা উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মহাদেব এরূপ বুঝিয়াই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন। ব্রজেশ্বরী রাধিকা রুক্মিণী দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ইহাই জানিয়াছিলেন। রতি দেবীও প্রদ্যুম্নকে পুনরুজ্জীবিত মদন বলিয়া জানিতেন। আমার কোন বন্ধু একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রথমাই এই

দ্বিতীয়া হইয়া জন্মিয়াছে, ভাবিতে পারিলে আমার সুখ হইত।" যথার্থ কথা। তেমন ভালবাসা দুইবার হয় না—দুই জনের উপরেও তেমন হয় না। যে ভালবেসেছে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বেদবাক্যটী বুঝিয়াছে। এই জন্য অদ্বৈতবাদী পবিত্রমনা ব্যক্তির পক্ষে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ অসম্ভবপর।

যে সন্ন্যাসী হইয়াছে, সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবে দুইবার বিবাহ করিলে মহা সঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুইয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত জন্মিবে, পবিত্রতা বিনষ্ট হইবে।

এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে কোমতের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই একাধিকবার বিবাহ করিবে না। আমাদিগের শাস্ত্রেও বলে, প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না।

একটী প্রকৃত বিবরণ বলি। আমার যে বন্ধুর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি একজন বিজ্ঞ এবং বিশুদ্ধমনা পুরুষ। তিনি এই নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব পত্নীর যে দিন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়, সেই রাত্রি তিনি একাকী শয়ন করিয়া পূর্ব্ব পত্নীর ধ্যান করেন। দ্বিতীয়ার শয়নাগারে গমন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্পূজিতা সর্ব্বতোভাবে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা এবং যথোচিতরূপ সমাদৃতা হইয়াও বৎসরের মধ্যে যে ঐ এক রাত্রি তাদৃশ ব্যবহার হয়, তজ্জন্য নিতান্ত অভিমানিনী হইয়া থাকেন। এত অভিমানিনী হন যে, ঐ সময়ে অধীরা হইয়া স্পষ্টই বলেন, 'যদি তাঁহাকে ভুলিতেই পারিবে না, তবে আমাকে বিবাহ করিলে কেন? ঐ অভিমানিনীর অভিমান কি অন্যায্য? আমার মতে অন্যায্য নয়। বিনা সম্যক্ অধিকারে প্রণয় প্রবৃত্তির পরিতোষ নাই।

কিন্তু যাঁহারা এক স্ত্রীর বিয়োগ হইলে আর বিবাহ না করেন, তাঁহাদেরই যে কি সুখ হয়, তাহাও বুঝিতে পারি না। আমার মাতৃদেবীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন পিতৃঠাকুরের ভোজনপাত্রে দুই ভাগ অন্ন ব্যঞ্জন দিতে হইত। তিনি ভোজন করিতে বসিতেন। কিন্তু নিজ ভাগও সমগ্র গ্রহণ করিতে পারিতেন না। চক্ষু ছল ছল করিত—শোকাবেগে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। মাতৃদেবীর লোকান্তর গমনের পর পিতৃঠাকুর পঞ্চবিংশতি বর্ষ জীবিত ছিলেন। বরাবরই ঐরূপ দেখিয়াছি। তবে কালেও ত শোকের হ্রাস হয় না? পিতৃঠাকুর যে দিন দেহত্যাগ করেন, সেই দিন বলিয়াছিলেন, "আমাকে গঙ্গাযাত্রা করাও—দেখ, এতদিনের পর আমাকে লইতে আসিতেছে—আমি তাহাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি।" পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পিতৃঠাকুরের সম্পূর্ণ বিশ্বাসই ছিল। তথাপি তাঁহার উল্লিখিত বাক্যের মধ্যে 'এত দিনের পর' 'আবার দেখিতে পাইয়াছি' এই গুলি থাকাতে কি বুঝায়?—তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত বিয়োগযন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হয়। অতএব দ্বিতীয় দার পরিগ্রহে অসুখ, এবং অপবিত্রতা;—অপরিগ্রহে অসুখ মাত্র; সুখ কোন পক্ষেই নাই—এই সিদ্ধান্ত স্থির।

তবে সুখ কিসে হইতে পারে, তাহা কোন সময়ে যেরূপ মনে উঠিয়াছিল, তাহা বলিতেছি। শিকার করিবার বাই হইয়াছিল। ছিটে গুলি পোরা বন্দুক হাতে করিয়া পাখী মারিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম একটা পুষ্করিণীর ধারে একটা গাছের একটা ডালে দুইটা পাখী কাছাকাছি বসিয়া আছে। বন্দুক তুলিয়া খাড়া করিতেছি, এমন সময়ে ঐ দুইটা পাখীর একটা উড়িয়া গেল, অপরটা কিছুক্ষণ ছিল। কিন্তু বন্দুক ছুঁড়িতে পারিলাম না। একই ফায়ারে যদি দুইটাই মারিতে পারিতাম, তাহা হইলেই মারিতাম। মনে মনে যমরাজকে বলিলাম আমাদের দুইজনকেও যেন একবারে মারেন। যদি যম সেই প্রার্থনা শুনিতেন তাহা হইলেই সুখ হইত।

—:o::o:—

একত্রিংশ প্রবন্ধ।

——•.•)•——

বহু বিবাহ।

ইহার পূর্ব্বগত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে এই প্রস্তাব নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইবে। যখন এক স্ত্রী গতায়ু হইলেও অপর দারপরিগ্রহ অবৈধ, তখন এক পত্নী বিদ্যমান থাকিতে অপর স্ত্রীর পাণিগ্রহণের কথা উল্লেখ করিতেই পারা যায় না। বস্তুতিক তাহাই বটে। তথাপি ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে দোষ কি?

এক পুরুষকে কি একাধিক স্ত্রী ভাল বাসিতে পারে না?—পারে। এক পুরুষ কি একাধিক স্ত্রীকে ভাল বাসিতে পারে না?—তাহাও পারে, কিন্তু এই যে ভালবাসা এ তেমন ভালবাসা নয়।

বাস্তবিক, ভালবাসার ক্রম আছে—বিলক্ষণ ইতর বিশেষ আছে। ভালবাসা এমন আছে, যাহার জন্য সব ছাড়া যায়—যাহাকে ভালবাসি তাহার ভালর জন্য তাহাকেও ছাড়িতে পারি, এই ভালবাসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট! ঐ পবিত্র প্রণয়াগ্নিতে স্বার্থপরতার পূর্ণাহুতি হইয়া যায়—আত্মলোপ জন্মে। তাহার সুখেও আমার সুখ নয়—তাহার সুখই সুখ। যুধিষ্ঠির স্বর্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে এই ভালবাসার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার যাবতীয় পুণ্যরাশি একটি ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সেণ্টপলও এই ভালবাসার প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন, "আমার ইচ্ছা হয়, আমার পিতা মাতা প্রভৃতির উদ্ধারের নিমিত্ত আমি স্বয়ং নিরয়গামী হই।" আর এক প্রকার ভালবাসা আছে, যাহার জন্য আর সব ছাড়িতে পারি কেবল তাহাকে ছাড়িতে পারি না। এ ভালবাসা পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তথাপি বড় সামান্য পদার্থ নয়। ইহা সম্পূর্ণ আত্মবিলোপের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব। সন্ন্যাসী হওয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া যাওয়া, গঞ্জনা লাঞ্ছনা অপমানকে তৃণজ্ঞান করা, এই সকল ব্যাপার এইরূপ ভালবাসা হইতে ঘটে। আর

একরূপ ভালবাসা আছে, যাহাতে কিছুই বিসর্জ্জন দিবার ইচ্ছা, আপনা হইতে মনে উঠে না, কিন্তু কোনরূপে কেহ মনে উঠাইয়া দিলে কিছুতেই অসম্মত হই না। অন্যের জন্য টাকা খরচ করা, পরিশ্রম স্বীকার করা, এইরূপ ভালবাসার সাধারণ স্থল। অপর একরূপ ভালবাসা আছে, তাহাতে যাহাকে ভালবাসি তাহাকে না পাইলে ক্ষোভ মিটে না, ফাঁক ঘুচে না, নিজের সুখ পূর্ণ হয় না। এইটী সর্ব্বনিকৃষ্ট—ইহা প্রবৃত্তির উত্তেজক মাত্র। কিন্তু ইহাও ভালবাসা, সুতরাং ভাল জিনিস। তবে ইহাতে স্বার্থের প্রথম সংস্কার মাত্র হয়—স্বার্থকে পরার্থ অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে—স্বার্থকে বিস্তৃত করে। স্থূল স্থূল এই চারি প্রকার প্রণয়ের মধ্যে যে নর নারী প্রথম দুই প্রকারের ভুক্তভোগী তাঁহাদিগের পক্ষে দ্বিতীয় পরিণয়, কি বহুবিবাহ, কোনটীই সঙ্গত নয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকার প্রণয়ের স্থলে দ্বিতীয় পরিণয় ত চলেই—বহুবিবাহও অসাধ্য হয় না।

ফলতঃ ধর্ম্মচর্চ্চায় যেরূপ, প্রণয়চর্চ্চাতেও সেইরূপ—অধিকারিভেদে ব্যবস্থা ভেদ। সকল মানব মানবী অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা না পারে, তাহাদিগের পক্ষে প্রণয়ের উচ্চোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করা অসাধ্যপ্রায় হয়। এই জন্য একাধিক পরিণয় ধর্ম্মব্যাঘাতক। যাঁহার একাধিক বিবাহ হয়, তাঁহাকে প্রায় চিরজীবনই প্রণয়োন্নতির নিম্নবর্ত্তী সোপানে অবস্থিতি করিতে হয়। তাঁহার স্বার্থপরতার সম্যক্ সংশোধন হয় না। তিনি যাবজ্জীবন পশ্বাচারী থাকেন, কখন বীর এবং দিব্যভাবের অধিকারী হয়েন না।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারি না। আর একটী বিষয় বিচার্য্য আছে। জগতের একটী অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড এই যে, ইহার ব্যাপার সকলই পরস্পর সংশ্লিষ্ট—এক হইতে অপরে পরিণত—কিছুই সম্যক্ স্বতন্ত্র নহে। যাহা অতি উচ্চ, তাহাও, নীচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভূত নয়। দেখ, মনুষ্য অবধি জড় পদার্থের ধর্ম্ম, উদ্ভিদের ধর্ম্ম, পশুর ধর্ম্ম, এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম এই চারটী ধর্ম্মই একত্র মিলিত। পশুতে জড়ধর্ম্ম, উদ্ভিদ্ ধর্ম্ম, এবং পশুধর্ম্মের সমাবেশ—কেবল মনুষ্যত্ব নাই। উদ্ভিদে, জড়ধর্ম্ম এবং উদ্ভিদ ধর্ম্ম, দুইটীই থাকে—উপরের দুইটীরই অভাব।

জড়ে জড়ত্বমাত্র বিদ্যমান থাকে। ফলতঃ জগতের সর্ব্ব বিষয়েই এইরূপ। উৎকৃষ্টের অভ্যন্তরে নিকৃষ্টের অবস্থান। আমাদিগের মনোভাবও এই নিয়মের বহির্ভূত নয়। প্রণয়ের যে চারিটী প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, তন্মধ্যেও এই নিয়ম বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বোচ্চ প্রণয় ভাবের অভ্যন্তরে অপর তিনটী ভাবই আছে। তৃতীয়ের অভ্যন্তরে নিম্নের দুইটী। দ্বিতীয়ের অভ্যন্তরে তাহার নীচেরটী, এইরূপ।

উল্লিখিত তথ্যের প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে প্রণয় পদার্থের যথার্থ প্রকৃতির অবরোধ হয় না, প্রণয় পরীক্ষায় নানাপ্রকার ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, এবং প্রণয়িদিগের পরস্পর ব্যবহারেও দোষ এবং মনে মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে।

আমার বোধ হয় যে, একত্বের মধ্যে অনেকত্বের সমাবেশ করিবার প্রয়োজন আছে। সৌন্দর্য্যের একটী প্রধান উপাদান অনেকত্ব। একই সূর্য্য প্রতিদিন উঠিতেছেন, প্রতিদিন অস্ত গমন করিতেছেন। কিন্তু দুই দিনের শোভা ঠিক সমান নয়। মানস আকাশের সূর্য্যকেও তাহাই করিতে হয়—এক, অথচ এক নয় হইতে হয়। গায়ত্রী দেবী তিন সন্ধ্যায় তিন রূপ ধারণ করেন—একরূপে ধ্যানগম্যা হয়েন না। চির দিন একই রকম, সকল বিষয়েই সমান ভাব, সকল কথাতেই এক ধেয়ে উত্তর কখন ভাল লাগে না। নিতান্ত 'মাটির মানুষদিগের' স্বামী বশ হয় না—নিতান্ত মোট্ বাঁধা পুরুষেরাও কামিনীদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন না।

যে পুরুষ এক আপনাতে এবং আপনার এক পত্নীতে অনেকত্বের সমাবেশ করিতে না পারেন, তিনি পবিত্র প্রণয়বীজের যথাযোগ্য পোষণে অশক্ত। তাঁহার বৃক্ষের মূলেই কীট লাগিয়া থাকে—গাছটী কখন যথোচিতরূপে বাড়িতে পায় না—এবং পরিণামে হয়ত বিতৃষ্ণারূপ ফলোৎপাদন করে।

—:•::•:—

দ্বাত্রিংশ প্রবন্ধ।

বৈধব্য-ব্রত।

যখন পুরুষদিগের পক্ষেই দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ ধর্ম্মব্যাঘাতক, তখন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যে দ্বিতীয় পরিণয় অবিধেয়, সে কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যে যে কারণে পুরুষদিগের দ্বিতীয় বার বিবাহ অনুচিত, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সে সকল কথাই খাটে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় পরিণয়ে কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে। কিন্তু আমি ও সকল বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি বলিয়াছি যে, পুরুষেরও দ্বিতীয় বার বিবাহ করা অনুচিত।—আমি বলিয়াছি যে, গৃহশূন্য ব্যক্তি স্বদেশবৎসলরূপেই হউক, আর ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াই হউক, তপশ্চরণ করিবেন। এখন দেশের এবং সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বিধবা কি করিবে, আর পরিবারের অপর সকল লোকেই বা বিধবার প্রতি কি ভাবে চলিবে আমি সেই কথাই কিছু বলিব।

বৈধব্য একটী মহৎ ব্রত। ব্রতটী পরার্থে আত্মোৎসর্গ; আত্মোৎসর্গ ব্রতের অনুষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়—কেহ জেনেশুনে করেন, কেহ না বুঝিয়া করেন, কেহ অল্পমাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় করেন—কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের শিক্ষা এবং ইহার পালন ধীরে ধীরে নির্ব্বাহিত হয় তজ্জন্য ইহার ক্লেশানুভব অল্প হয়—স্থলবিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে চাপিয়া পড়ে, এই জন্য সে বিকল হইয়া যায়। এত বিকল হয় যে, সে যে একটী মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল তাহা বুঝিতেই পারে না—সে বুঝে "আমি জন্মের মত গেলুম"। বাস্তবিক সে নিজের পক্ষে জন্মের মতই যায়। সে একেবারেই উদাসীনী, সর্ব্বত্যাগিনী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্যাগী উদাসীন ব্যক্তিদিগের প্রতি মনুষ্যসাধারণের মনের [illegible] হয়? সকল মনুষ্যই সংসারবিরাগীদিগের প্রতি [illegible] ভক্তি

এবং অবিচলিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। বিধবাও তদ্রূপ ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। তবে একটী কথা আছে। যাঁহারা জ্ঞানপথাবলম্বী হইয়া সংসারের প্রতি একান্ত তিতিক্ষা বশতঃ সংসারত্যাগী হয়েন, তাঁহাদিগের মানসিক বল এবং দৃঢ়তার প্রতি যতটা ভক্তি হয়, যাঁহারা সাংসারিক দুঃখে পরিতপ্ত ও দৈব দুর্ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া সংসার ত্যাগ করেন, তাঁহাদের প্রতি ততটা প্রগাঢ় এবং বিশুদ্ধ ভক্তি হয় না—তাঁহাদের প্রতি যে ভক্তি হয়, তাহার সহিত অনেকটা দয়াও মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি জানি, ৺কাশীধামে একটী অতি পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ আছেন, যিনি প্রথমে শুধু দৈব বিড়ম্বনা বশতঃই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠদ্দশাতেই পুত্রকলত্র গতাসু হইয়াছিল। তিনি সেই দুঃখেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করেন। এক্ষণে যোগাভ্যাস এবং অন্যান্য তপশ্চরণদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রতি অগাধ প্রীতিসম্পন্ন, অতি সদালাপী, মধুরভাষী এবং পরোপকার-পরায়ণ হইয়া সকলের প্রীতি, ভক্তি এবং বিশ্বাসভাজন আছেন। ঐ মহাপুরুষই বিধবাদিগের আদর্শস্থলীয়। তাঁহার ন্যায় দৈববিড়ম্বনা নিবন্ধন সন্ন্যাসাশ্রমগ্রস্ত বিধবারও কর্ত্তব্য, আত্মদান এবং পরোপকার ব্রত পালন-দ্বারা আপনাকে তেমনি শুচি, শান্ত এবং সুখী করিয়া তুলেন।

যে পরিবারে কোন স্ত্রীলোক বিধবা হইয়াছে, সে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিই যেন বিধবার প্রকৃত অবস্থা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত না হয়েন। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষ সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, বিধবা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াছে। দৈববিড়ম্বনা কর্ত্তৃক সেই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছে অতএব সে একান্ত দয়ার পাত্রী; এমন উচ্চ ব্রত ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহাকে বিশেষরূপেই ভক্তি করিতে হইবে। বিধবার প্রতি এই মিশ্রভাব অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিলে, তাহার তপস্যার বিঘ্ন অল্পই হইবে, তাহার অশন বসন জন্য অনেকটা ক্লেশ ন্যূন হইবে এবং তাহার হৃদয়ে আত্মগৌরবের প্রাচুর্য্য যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে তেমনি সে সমস্ত ব্যাপারে সুদক্ষ হইয়া উঠিবে।

পরিবারস্থিত বিধবার পালনে কর্ত্তার কোন অংশেই অমনোযোগী

হইলে চলিবে না। বিধবারা যে-ব্রতের ব্রতী হইয়া পড়ে তাহাতে বয়স এবং অবস্থাভেদে তাহাদিগের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, এবং তাহাদিগের সুপালনার্থ বিভিন্নরূপ ব্যবহারেরও প্রয়োজন হয়। এক প্রাচীন বা প্রৌঢ়া সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দিবে—তীর্থাদি দর্শনের অভিলাষ সম্পন্ন করিতে দিবে—ইহাঁদিগের সহিত বিনা পরামর্শে সাংসারিক বন্দোবস্ত করিবে না—এবং ইহাঁদিগকে যাহা কিছু বলিতে হইবে তাহা বাটীর কর্ত্তা নিজেই বলিবেন—ঝি বৌয়ের মুখ দিয়া কদাপি বলিবেন না। বিধবা মাতাকে স্ত্রীর মুখ দিয়া কিছু বলিতে গিয়া অনেক যুবা মাতৃস্নেহ হারাইয়াছেন। এই সকল বিধবার সন্তানেরা যাহাতে বাটীর সমবয়স্ক এবং সমবয়স্কা অপরাপর পুত্র কন্যার সহিত দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্দবন্ধনে সম্বদ্ধ হয়, প্রথম হইতেই তাহার উপায় করিয়া যাইতে হইবে। দ্বিতীয়, যুবতী সসন্তানা বিধবা—ইহাঁদিগকে নিজ-সন্তানের যত্নে যত ইচ্ছা সময় ক্ষেপণ করিতে দিবে, কিন্তু ঐ সন্তানের সমবয়স্ক অথবা তাহার হইতে কিছু অল্পবয়স্ক বাটীর অন্য ছেলেও যাহাতে ঐ যত্নের ফলভাগী হয়, বিশেষ চেষ্টাপূর্ব্বক তাহারও উপায় বিধান করিবে। বিধবার হৃদয় যেন স্নেহ বিস্তার করিবার পথ পায়, যেন কোন মতেই ঐ স্নেহরাশি অল্পমাত্র স্থানে বদ্ধ থাকিয়া দূষিত না হয়, এবং বিধবার হৃদয়ে আত্মপর বোধটী উত্তেজিত করিয়া ঈর্ষ্যা দ্বেষাদির প্রভাবে তাহার প্রকৃত ব্রতভঙ্গ না করে। বিধবা যাহাতে বাটীর সকল ছেলেকেই ভালবাসে, তাহা করিতে না পারিলে, তাহার প্রতি উচিত ব্যবহারের ক্রটি হইতেছে বুঝিতে হইবে। তৃতীয়, নিঃসন্তানা বালবিধবা—ইহাঁদিগের প্রতিপালন, শুদ্ধ ভাত কাপড়ের প্রতিপালন নয়, ইহাঁদিগের ধর্ম্মোন্নতি সাধন, অতি কঠিনতম ব্যাপার। এই জন্য বিশেষ কঠিন যে, ইহাঁদিগের বাল্যের সাহজিক স্বার্থপরতার অতি প্রধান সংস্কার দুইটী বাকী রহিয়া গিয়াছে—উহা পতিপ্রেমাগ্নিতে দ্রবীভূত হইয়া কখন পাত্রান্তরে বিসৃত হয় নাই—সন্তানবাৎসল্যরসে পরিষিক্ত হইয়া কাহাকেও নাড়ীছেঁড়া ধনরূপে প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাঁদিগের মন উদার না হইয়া ক্ষুদ্র, প্রীতিপূর্ণ না হইয়া শুষ্ক এবং

সদয় না হইয়া ঈর্ষ্যাপ্রবণ হইয়া পড়িবার বড়ই সম্ভাবনা! তবে একটী ভরসা আছে। এতদ্দেশের সদ্বংশজাতা বালিকাগণের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রগাঢ় ভক্তিবীজ উপ্ত হইয়া থাকে। পিতৃ মাতৃ ভক্তি, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, শাস্ত্র শাসনে ভক্তি, ইহাদিগের যেন সহজাত ধর্ম্ম। তাহারই উপর অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়, এবং বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে, ঐ ভক্তিবীজ হইতেই অতি বিপুল প্রীতির উদ্গম হইয়া ইহাদিগের জীবনক্ষেত্রকে সরস, শীতল এবং আত্মপর উভয়ের সুখপ্রদ করিয়া তুলিতে পারে। যেরূপে সতর্ক হইয়া চলিলে, বালবিধবার সুপালন হয়, তাহার কয়েকটী নিয়ম বলিতেছি।

(১) বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে, কর্ত্তা স্বয়ং ইহাদিগের আহারের নিয়ম করিয়া দিবেন। এত দুগ্ধ, এই ফল, এইরূপ অন্ন ব্যঞ্জন, বিধবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যেমন দেবতার নামে যে দ্রব্যাদি সমাহৃত হয়, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও খাওয়াইতে নাই, তেমনি বিধবার নিমিত্ত যাহা বাটীর কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা বাটীর অপর কাহাকেও প্রদান করিতে নাই।

(২) বিধবার শয়ন দুই একটী শিশু সন্তানের সমভিব্যাহারে করাইবে। বিধবাকে ছেলেদের আবদার সহাইবে।

(৩) বিধবাকে সাংসারিক কার্য্যে বিশিষ্টরূপে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। শুদ্ধ অনুজ্ঞা দ্বারা নয়, বিধবাকে সধবা স্ত্রীলোকদিগের গৃহকার্য্যের সহকারিণী করিয়া দিবে!

(৪) যদি পার. বিধবাকে সংস্কৃত শিখাইবে—অন্ততঃ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনাইবে; এবং তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করাইবে।

(৫) বিধবাকে ব্রতাদি করিতে দিবে—নিজে তাহা করিতে বলিবে না, কিন্তু করিতে চাহিলেই করিতে দিবে এবং ব্রতাদির উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করিবে না। শরীরের খাটুনি তাহার, টাকা তোমার। বাটীর সধবা স্ত্রীলোকেরা যেন ঐ সকল ব্রত অথবা তদনুরূপ ব্রত করিতে না পারেন, এবং তাঁহাদের ব্রতাদি উদ্‌যাপনে যেন অল্পতর ব্যয় এবং অনধিক আড়ম্বর হয়।

(৬) বিধবাকে কোন অনুজ্ঞা করিতে হইলে কর্ত্তা তাহা স্বয়ং করিবেন—স্ত্রী, কন্যা, কিম্বা পুত্রবধূ প্রভৃতি অপর কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করিবেন না। কিন্তু অনুজ্ঞা যেন সত্য সত্যই কর্ত্তার নিজের হয়,—অর্থাৎ নিজেই দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন অনুজ্ঞা করেন—গৃহিণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং স্বয়ং তাঁহারই মুখস্বরূপ না হয়েন। নিতান্ত স্ত্রৈণ কর্ত্তার দ্বারা বিধবার সুপালন প্রায়ই ভালরূপ হইয়া উঠে না।

উল্লিখিত নিয়মগুলি বুদ্ধিপূর্ব্বক পালিত হইলে বালবিধবার যে কিরূপ ধর্ম্মোন্নত সংসাধিত হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতে পারিবেন। বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি, অভ্যাগত, কুটুম্ব, স্বজনদিগকে খাওয়াইতে ভাল বাসে, স্বয়ং সবল এবং সুষ্ঠুশরীরী হয়, এবং ঈর্ষ্যাদি দোষ পরিশূন্য হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাটীতে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে বাটীতে একটী জীবন্ত দেবী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান। যে পরিবার মধ্যে এরূপ বিধবার অবস্থান, সে পরিবারের স্ত্রীপুরুষেরা নিরন্তর ঋষি চরিত্রের দ্রষ্টা এবং ফলভোক্তা। তাহার "পরার্থজীবন" ব্যাপারটী কি, তাহা শুদ্ধ মুখে বলে না, এবং পুস্তকে পড়ে না—উহার জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পায়।

যখন মদ্যসেবী মাংসাহারী ইউরোপীয়দিগের কন্যাগণও ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে চির কৌমার ব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্য পবিত্র আর্য্যবংশোদ্ভবা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

চির-কৌমার।

মানুষ গৃহাশ্রমী হইবে, দার পরিগ্রহ করিবে, পরিবার পরিবৃত হইয়া থাকিবে—ইহাই সাধারণ নিত্যধর্ম্ম এবং সেই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই পারিবারিক প্রবন্ধগুলি বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহাশ্রমী হইয়াও অর্থাৎ সংসার মধ্যে থাকিয়াও বিনা দার পরিগ্রহে থাকা একান্ত অসাধ্য অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে। বিবাহ করা এবং পরিবার প্রতিপালন করা দিন দিন অধিকতর অর্থসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। গৃহী হইতে গেলেই বিবাহ করিতে হয়, এই যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহা কালগতিকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। অকুলীন ব্রাহ্মণ সন্তানেরা অনেকেই বিবাহ করিবার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারেন না—এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবার যে ধর্ম্মপথা ছিল, সেই প্রথারও সমাদর ন্যূন হইয়া আসিতেছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের মধ্যে বড় লোক এবং ছোট লোক অনেকেই বিবাহ করেন না, বা করিতে পারেন না, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া নব্যেরা অনেকে বিবাহ করা না করা নিজ ইচ্ছাধীন ব্যাপার, অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার কার্য্য নহে—এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব পারিবারিক প্রবন্ধের শেষ ভাগে চির-কৌমার বিষয়ক বিচার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

আমার বিবেচনায় চির কৌমার ব্রত ধারণ করিবার যোগ্য নরনারী পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমাণেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পারিবারিক ধর্ম্মের সুপালন দ্বারা যে সকল পূর্ব্ব পুরুষের শরীর ও মন সুসংযত হইয়াছে, তাদৃশ পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণ যে সকল সন্তানে সম্যক্ অনুপ্রবিষ্ট, তাঁহারাই চির কৌমার ব্রত ধারণে অধিকারী হইতে পারেন। এই প্রকার লোকের কাম প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, এবং অন্তঃকরণ পরার্থ চর্য্যাপূত হইয়া থাকে। কালে যে এ প্রকার মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে না, আমি এরূপ মনে করি না—প্রত্যুত আমি দেখিয়া আসিতেছি, যে, ঐ দুইটী লক্ষ-

ণের মধ্যে যেখানে একটী থাকে, অপরটীও প্রায়ই সেইখানে থাকে। কাম প্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা এবং পরার্থ পূত-চিত্ততা অনেক স্থলেই একাধারে বিদ্যমান হয়।

তদ্ভিন্ন, আমার দৃঢ় প্রতীতি এইরূপ যে, জীব সংখ্যার এবং আহার-সামগ্রীর বৃদ্ধির নিয়ম এক্ষণে যেরূপ পরস্পর নিরপেক্ষভাবে চলিতেছে, কালে মনুষ্যেরা আপনাদিগের মধ্যে ঐ নিয়ম সেরূপ নিরপেক্ষ ভাবে চলিতে দিবে না; পরস্পর সাপেক্ষ করিয়া লইবে। এক্ষণে মানব সংখ্যার বৃদ্ধি যে ক্রমানুসারে হয়, আহার সামগ্রীর বৃদ্ধি সে ক্রমানুসারে হয় না, তাহাতেই অনেক স্থলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি দুর্ঘটনা সমস্ত ঘটিয়া থাকে। সমাজে এই প্রাকৃতিক তথ্য যত অধিক পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইবে, সেই তথ্য জ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া বৈবাহিক ব্যবস্থার যত উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এবং ঐ সকল ব্যবস্থা যত অধিক পরিমাণে প্রতিপালিত হইবে, ততই এমন সকল সন্তান জন্মিবে, যাহাদের কামপ্রবৃত্তি সহজেই দুর্ব্বলা এবং পরার্থপ্রবণতা বলবতী। যখন আমার প্রতীতি এবং অভিলাষ এইরূপ, তখন যে আমি চির-কৌমার অবস্থার পক্ষপাতী বই কদাপি তাহার বিরোধী হইতে পারি না, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে আমি এই বলি, যে সে ব্যক্তি এই ব্রত পালনের অধিকারী নহে। সাধারণ ইংরাজদিগের মধ্যেও কেহ কেহ বিবাহ করে না, তাহার একমাত্র কারণ তাহারা সাংসারিক ধর্ম্ম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে চায় না অথবা তাহার স্ত্রী পুত্র পালনের ভারে আক্রান্ত হইতে নারাজ। তাহারা একমাত্র স্বার্থপরবশ হইয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। আমি তাদৃশ চির-কৌমারের একান্ত বিদ্বেষ্টা।

যদি কাহার চির-কৌমার ব্রত ধারণের প্রকৃত অভিলাষ হয়, তবে কয়েকটী বিষয় বিশেষ অনুধাবনপূর্ব্বক তাঁহার বুঝিয়া দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, তিনি আপনার দেহকে সম্যক্রূপে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিবেন কি না? দেহ অবিশুদ্ধ হইয়া গেলেও যে অন্তঃ-করণ বিশুদ্ধ থাকিতে পারে এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া অবিধেয়। দেহ এবং মনকে বিভিন্ন পদার্থ না ভাবিয়া বাহ্য ও আন্তর এই বিভিন্ন প্রত্যক্ষের

বিষয়ীভূত বলিয়া উহারা একই পদার্থের বিবিধ আভাস মাত্র, ইহাই মনে করা ভাল। পশুধর্ম্মের আচরণে যে দিব্যাচারের ব্যভিচার হয় না—অথবা সংগোপনে বিগর্হিত ব্যবহারের অনুষ্ঠানে যে আত্মগ্লানি জন্মে না এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনই প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে। অতএব এই সকল কথার তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া কেহ চির-কৌমার ব্রতের অধিকারী বটেন কি না তাহা তাঁহাকে স্বয়ংই অবধারণ করিয়া লইতে হয়। যদি এই সকল কথার বিচারপূর্ব্বক কেহ কৌমারব্রত ধারণ করেন, এবং পরে বুঝিতে পারেন যে, তিনি ব্রত পালনে অশক্ত, তাহা হইলে তাঁহার ব্রত ত্যাগ করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য; তাহাতে সঙ্কল্পভঙ্গজন্য দোষ হইবে বটে, কিন্তু সে দোষ কপটাচার অপেক্ষা অল্প দোষ; তাহাতে অসারল্য এবং কপটতার বৃদ্ধি এবং সমুদায় বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির বিকৃতি হয় না; সঙ্কল্প ভঙ্গহেতুক চরিত্রের দুর্ব্বলতা মাত্র জন্মে।

চির-কৌমার ব্রতাভিলাষীর আর একটি বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক—যিনি সম্যক্‌রূপে ব্যাজশূন্য প্রীতি দান, অর্থাৎ প্রতিদান না পাইয়াও প্রীতি দান করিতে পারেন কি না। আমি ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করি, অতএব মঙ্গলময় ঈশ্বর অবশ্যই আমার মঙ্গল করিবেন, এরূপ ভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে চির কৌমার ব্রত পালন অসাধ্য ব্যাপার। ঈশ্বর আমার প্রতি অনুগ্রহই করুন, আর নিগ্রহই করুন, আমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মে আমি তাঁহাতে অনুরক্ত থাকিব—তাঁহার নিগ্রহেও আমার অনুরাগ বাড়িবে—যাঁহার মনে এরূপ আত্মগৌরব আত্মপ্রতীতি এবং অসীম প্রেম বিদ্যমান আছে, অথবা বিদ্যমান হইবার উপক্রম হইয়া আছে——তিনিই চির কৌমার ব্রত ধারণের প্রকৃত অধিকারী। তিনি স্ববন্ধু, স্বকুল, স্বজাতি, স্বদেশ সমুদয় মনুষ্য বা সমস্ত জীবহিতার্থ আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারেন। ভীষ্মদেব, শুকদেব প্রভৃতি তেজস্বী বিশুদ্ধাত্মারা ঐরূপ লোক ছিলেন। তেমন তেজস্বিতার এবং পবিত্রতার আধার হইতে পারিব বলিয়া যিনি আপনাকে মনে করিতে পারেন, তিনিই চির-কৌমার ব্রত ধারণের যোগ্য পাত্র।

আমার এই কথাগুলিতে কেহ যেন মনে না করেন যে, চির-কৌমার ব্রতের অধিকারী কেহই নাই—আমি প্রকারতঃ এই ভাবই ব্যক্ত করিতেছি। আমি মনুষ্যবর্গের ক্রমোন্নতিশীলতায় একান্ত বিশ্বাসবান্—আমার কখনই বোধ হয় না যে, ভীষ্মদেবের ন্যায় তেজস্বী অথবা শুকদেবের ন্যায় পবিত্রতাসম্পন্ন পুরুষ আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না অথবা এইক্ষণেও বর্ত্তমান নাই। ভীষ্মদেব, এবং শুকদেব কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, অথবা তাদৃশ পুরুষের পূর্ব্বে কল্পনা হইয়া গিয়াছে, ইহাই পরবর্ত্তী কালে তাদৃশ মহাত্মাদিগের উৎপত্তির কারণস্বরূপ হইয়া আছে। মানুষের উন্নতি কেবলমাত্র বৈষয়িক ব্যাপারেই সম্বদ্ধ থাকে, ধর্ম্মপ্রণালীতে ব্যাপক হইতে পারে না, যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা উন্নতির বহু লক্ষণ মাত্রই দেখেন, উহার প্রকৃত হেতু বুঝেন না। মনে উন্নত ভাবের প্রবেশ ও সঞ্চয় নিবন্ধন স্নায়ুমণ্ডলের এবং শারীর ধর্ম্মের উৎকর্ষ, এবং সেই উৎকর্ষের পুরুষানুক্রমিক সংক্রমণ যে মনুষ্যের উন্নতির প্রকৃত হেতু তাঁহারা এই গূঢ় তত্ত্বটী বুঝেন না। যখন একটী ভীষ্ম জন্মিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই দশটী ভীষ্ম শত ভীষ্ম সহস্র ভীষ্ম হইয়া গিয়াছেন, হইয়া আছেন, এবং হইতে পারেন।

অতএব ভীষ্ম এবং শুকদেবের নামোল্লেখ করিয়া আমি চির-কৌমার ব্রতধারণের অসাধ্যতা প্রতিপাদন করি নাই—সেই ব্রহ্মচারিদিগের আদর্শ মাত্র দেখাইয়াছি। কোন্ কোন্ গুণের প্রাচুর্য্যে ঐ ব্রত সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই বলিয়াছি। ভীষ্মের নাম করিয়া অস্বার্থপরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, ত্যাগশীলতা এবং ভক্তিমত্তার প্রয়োজন দেখাইয়াছি, এবং শুকদেবের নাম করিয়া জ্ঞানচর্চ্চার এবং ঐকান্তিকতার আবশ্যকতা বলিয়াছি। প্রকৃত বীর এবং প্রকৃত জ্ঞানানুরক্ত ব্যক্তিরাই চিরকৌমার ব্রত পালনের অধিকারী।

যে জাতীয় লোকের মধ্যে বীরভাব এবং বিদ্যানুরাগ অধিক সেই জাতিতেই চিরকৌমার ব্রতের আধিক্য হইতে পারে। কিন্তু বীজবৃক্ষ সম্বন্ধের ন্যায় কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনেক স্থলে পরস্পর এরূপ সাপেক্ষ যে উহাদিগের একের উপস্থিতিতে অন্যের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়।

অতএব বাঙ্গালীর মেয়ে ছেলেদের মধ্যে যথোচিত পাত্র বিবেচনা করিয়া চির-কৌমার ব্রতধারণের পথ খুলিলে এদেশেও পুনর্ব্বার প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব ও বিশ্বানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে। সকল ছেলেকে এবং সকল মেয়েকেই যে উদ্বাহসূত্রে সম্বন্ধ হইতে হয় এটী একটি মহদ্দোষ।

কোন সাধুশীলা বুদ্ধিমতী বলিয়াছিলেন,"—মেয়েটীর বিবাহ না হইলে কোন ক্ষতি হয় না; সে, তাহার ভাই ভগিনী এবং ঐ ভাই ভগিনীগণের পুত্র কন্যার প্রতি ঐকান্তিক যত্নপরায়ণা হইয়াই সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারে।"

চতুস্ত্রিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—
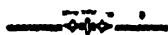
ধর্ম্ম-চর্য্যা।

এক একটী পরিবার সমাজের এক একটী অণুবন্ধন। ঐ বিভিন্ন অণু-গুলি যত প্রকার প্রবন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, তন্মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন প্রধানতম। সুতরাং কোন সমাজে যে ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত থাকে, অবিকৃত অবস্থায় সেই সমাজের অন্তর্গত প্রতি পরিবারের মধ্যেও সেই ধর্ম্ম-প্রণালী প্রচলিত থাকিবে। তাহা না থাকিলে জনগণের মধ্যে পরস্পর মমতার হ্রাস, বিদ্বেষের প্রাবল্য, অবধাচারের বৃদ্ধি এবং সমাজবন্ধনের শৈথিল্য জন্মে।

এক্ষণে আমাদিগের হিন্দু সমাজের আর অবিকৃতভাব নাই। এখন সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি অনেকের সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা রক্ষা হইতেছে না। গোঁড়া, গণ্ডমূর্খ এবং পরম জ্ঞানী ভিন্ন অপর অনেকেরই মনে সন্দেহের এক আধটু বিষময়ভাব লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। দেশের জল বায়ু বিদূষিত হইয়া উঠিলে যেমন তদ্দেশনিবাসী সকলেরই কিছু না কিছু স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তেমনি সামাজিক ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইলে সমাজের অন্তর্গত পরিবার মাত্রেই কিছু না কিছু দোষের সংশ্রব হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করিবার কোন উপায়ই নাই।

কিন্তু যদিও সর্ব্বতোভাবে ঐ দোষ অতিক্রম করা আমাদিগের সাধ্যাতীত, তথাপি বিচক্ষণতা সহকারে চেষ্টা করিলে যে, কতক দূর না হয়, এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ ঐ সকল দোষ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সামাজিক ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য কতক আইনের জোরে, কতক শাসনকর্ত্তৃবর্গের প্রভাবে, আর কতক অন্যদীয় মুখাপেক্ষতার বলে, যে কোনরূপে হউক, এক প্রকার সারিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পারিবারিক বন্ধনের যদি কিছু মাত্র শৈথিল্য জন্মে, তবে তজ্জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং তজ্জনিত দুঃখের প্রতীকার ইহজন্মেও হয় না, পরজন্মেও হয় না। সামাজিক ধর্ম্ম-বিপ্লবের দোষ পরিবারের মধ্যে

সংক্রামিত না হয়, তাহার উপায় কি? আমি যতদূর বুঝিয়াছি, সেই উপায়গুলিই সোদাহরণ উল্লেখ করিব।

(১) ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে চিরন্তন ধর্ম্মেই শুদ্ধ বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকিব, এরূপ মনে করিলে চলে না। বুদ্ধিবৃত্তিকে খেলাইতে হয়, এবং যুক্তি সহকারে শাস্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করিতে হয়। নিজ পরিবারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল তর্কের প্রয়োজন নাই বটে—কিন্তু অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মব্যাপারের যৌক্তিকতা পরিবারবর্গকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উদাহরণ—

"চণ্ডীপাঠ শুনিলে পুণ্য হয়; তাহার কারণ এই যে, চণ্ডীগ্রন্থে মৃত্যু-ভয়ের প্রকৃতি এবং সেই ভয় নিবারণের একমাত্র উপায় যে, অবিনাশিনী আদ্যাশক্তিতে শ্রদ্ধা, তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে;—আজি বাটীতে চণ্ডীপাঠ হইতেছে—চল, দুই জনে গিয়া শ্রবণ করি—তোমাকে স্থূল স্থূল তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিব।" * * * "মৃত্যুভয় মহিষাসুর কত রকমে আকার পরিবর্ত্ত করিয়া আসিল, এবং যেমন একরূপ নষ্ট হইল, অমনি আর একটী রূপ ধারণ করিল, কিছুতেই একবারে গেল না; পরিশেষে তাহার দমন হইয়াই থাকিল।"

(২) ধর্ম্মবিপ্লবের সময় যে কোন মতবাদ বাহির হইতে আসিবে, তাহাই গ্রহণ করা উচিত নয়। সমাজের একান্ত বিগর্হিত আচার অবশ্যই পরিবর্জ্জনীয়। উদাহরণ—

"বাপুরে! তোমাকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া এই হইল যে, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি ত্যাগ করিলে; পরে অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অপেয় পানও করিবে—যেন সে দিন পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত থাকিতে না হয়।" * * * "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনই অভক্ষ্য ভোজন বা অপেয় পান করিব না—আপনার সাক্ষাতে যাহা খাইতে না পারি, এমন কোন পদার্থ আমার গলাধঃকৃত হইবে না।"

(৩) ধর্ম্মবিপ্লবে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরস্পর বিরোধ হয়, সে সমুদায় যে ব্যাপকতর মতবাদের অন্তর্ভূত, তাহাই অবলম্বন করা অভ্যাস করিতে হয়। যতদূর পারা যায়, নিজের মনকে বিদ্বেষদূষিত হইতে দিতে নাই। উদাহরণ—

"অপর সকল ধর্ম্মই মিথ্যা—কেবল আমাদের ধর্ম্মই সত্য।" * * *
"তাও কি বলিতে আছে?—সকল ধর্ম্মেই ত ভাল মানুষ আছেন? ভাল মানুষের ধর্ম্ম সত্য বই কি মিথ্যা হইতে পারে? ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষকে ভাল করা বই ত নয়?"

(২) ফল কথা ভক্তি এবং প্রীতি যে ধর্ম্মবীজ, এবং পূজার প্রকৃত ভাব যে একাগ্রতা, তাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া পরিবারের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইলে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়; সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়; পরিবারবর্গকে মনোগত সন্দেহাদি ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত সাহস প্রদান করিতে হয়; এবং তাহাদিগের সহায়তা অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়।

এই সকল পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ বলিয়াই হউক, কিম্বা সহিষ্ণুতার অভাব নিবন্ধনই হউক, অথবা বিবেচনার ক্রটিবশতঃই হউক, অনেকানেক সুবোধ, শান্তপ্রকৃতিক এবং পরিবারের প্রতি বিলক্ষণ স্নেহসম্পন্ন ব্যক্তিও নিজ পরিজনকে ধর্ম্মবিপ্লবের অনিষ্টকারিতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাপন বিশ্বাসের বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকলাপের এমত ভাবে * অনুষ্ঠান করেন, যেন দেশে ধর্ম্ম-বিপ্লব কিছুই উপস্থিত হয় নাই। 'নাই বলিলে সাপের বিষ থাকে না'—উঁহাদিগের যেন সত্য সত্যই সেই বিশ্বাস। বাস্তবিক তাহাও কি হয়? যখন দেশের জলবায়ু দূষিত হইয়াছে, তখন কি শুদ্ধ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিলেই পীড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে? তখন ব্যায়ামচর্য্যা, জল সংশোধন, উচ্চাবাস এবং পবিত্রাহারের সম্যক্ প্রয়োজন হয়।

যাঁহারা ঐরূপ আচার করেন, আমি তাঁহাদিগকে "ভাক্ত" 'কপট' প্রভৃতি কটু বাক্য বলিয়া গালি দিতে পারি না। তাঁহারা যে তাদৃশ অনৃতাচার নিবন্ধন দুর্ব্বলমনা হইয়া পড়িবেন, সে শঙ্কাও বড় একটা করি না। তাঁহা-

* গৃহস্বামীর কার্য্য পরিবারবর্গের অনুকরণীয়। অতএব কিছু অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ভগবান বলিয়াছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং"।

দিগের চরিত্র যে সারল্য পরিহার পূর্ব্বক ক্রমশঃ কুটিলতা প্রাপ্ত হইবে এ কথাতেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাই। আমি এই বলি যে, তাঁহাদিগের অবলম্বিত উপায়ে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। আমি শত শত স্থলে দেখিয়াছি, যাঁহারা পরিবারের মধ্যে অভিনব ধর্ম্মসন্দিগ্ধতার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা সংস্কারকার্য্যে একান্ত উদ্যত ব্যক্তি-দিগের অপেক্ষাও পারিবারিক ধর্ম্ম বিপ্লবের অনিষ্ট ভোগ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি [illegible] কুমার্গ প্রচার করিয়াছে এবং অভক্ষ্য ভোজন, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা যে সকল আভ্যন্তরিক নিকৃষ্টতর প্রবৃত্তিচয় তাহাতে সর্ব্বতোভাবে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত মনের ভাব সংগোপন করিয়া রাখেন তাঁহারা সামাজিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা অবৈধ। তাঁহারা আপনাদের জীবনকালটি এক প্রকারে কাটাইবার চেষ্টা করেন, এবং মনে করেন, সামাজিক ধর্ম্ম বিপ্লবে কোন অনিষ্ট ভোগ করিবেন না। কিন্তু ধর্ম্মবৃদ্ধির নিদানভূত এবং সংসারের সকল সুখের আকরস্বরূপ যে নিজ সমাজ, সে যে দুঃখ পাইতে লাগিল, দিন দিন দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিল, সাংঘাতিক পীড়ায় নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, তাহার দুঃখ মোচনের, বলাধানের এবং রোগোপশমের নিমিত্ত তাঁহারা কোন কষ্টই স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা শুদ্ধ আপনা-দের সুখের নিমিত্তই নিজ নিজ পরিবারকে ধর্ম্মবিপ্লবের দোষ হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য যত্ন করিলেন। তাঁহাদের এবম্প্রকার স্বার্থবুদ্ধি বৈফল্যে পরিণত হওয়াই উচিত, এবং তাহাই হইয়া থাকে।

প্রকৃত দোষ না থাকিলে কখনও কোন বিপ্লবের বীজ সমাজ মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। বাস্তবিক, আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মপ্রণালীতে কতকগুলি অন্যায়, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে অনেক স্থলেই কেবল আচারের আঁটাআঁটি বাড়িয়া ধর্ম্মভাবের অন্তঃসারশূন্যতা জন্মিয়াছে; আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কতকগুলি কুসংস্কার সমাজের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল দোষ বুঝিতে

পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য যে, কায়মনোবাক্য ঐ সকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। যদি বল ঐ সকল বিষয়ে যত্ন করিতে গেলেই ত পরিবারের মধ্যে ধর্ম্ম ভেদ জন্মিবে, আমি বলি—সেটী ভ্রম। নিজে বাহাদুরী করিতে না গিয়া পরিবারস্থ সকলকে আপনার সহিত একমত ভাবিয়া চল, তাহাদিগকে আপনার সহায় করিয়া লও—কোন্ দোষটী পরিহার্য্য, এবং কোন্ গুণটী অনুকরণীয়, বিচক্ষণতা সহকারে এবং পরিষ্কাররূপে তাহার নিরূপণ করিয়া দেও, দেখিতে পাইবে, পরিবারবর্গ বিলক্ষণ উৎসাহ সহকারেই তোমার পদচিহ্নে পদক্ষেপ করিয়া চলিবে।

পৃথিবীতে যত পেগম্বর বা নরদেব এ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মহম্মদকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ বোধ হইবার একটী কারণ এই যে, মহম্মদ আপন পরিবারবর্গকেই সর্ব্বাগ্রে নিজ ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ পরিজনদিগের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হয়েন—অনন্তর জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং পরিশেষে জন সাধারণের মধ্যে নিজ মতবাদ প্রচার করেন। আমি সকলকেই কিছু মহম্মদ হইতে বলিতেছি না—কিন্তু পবিত্রমনা এবং প্রকৃতদর্শী ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের এটী একটী প্রকৃত লক্ষণ, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে এখন যে সকল অমুচিকীর্ষু সংস্কারকের ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায় না। বাহাদুরী করাটী তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহারা বিজাতীয় রীতির পক্ষপাতী হইয়া আপনাদিগকে সজাতীয়গণের অগ্রণী বলিয়া অন্যকে দেখাইতে চান। তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা স্ব স্ব পরিজনের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমি শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন স্বীয় গর্ভধারিণীর কোন আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া বলিয়াছিলেন—"মা! আমি কি তোমার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি? —আমি জগতের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি!!"

ধর্ম্ম-সংস্কার কার্য্যে নিজ পরিজনকে সহায় করিবার চেষ্টা করিলে প্রভূত শুভ ফল উৎপন্ন হয়; সংস্কার কার্য্যে পাদবিক্ষেপটী একটু ধীরে

ধীরে হইতে থাকে—সুতরাং প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিয়া পড়িবার সম্ভাবনাও অধিক হয় না।

কোন বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিমতী হিন্দুমহিলার সহিত একজন খৃষ্টানীর যেরূপ কথোপকথন শুনিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপন করিব।

"দিদি!—তোমাদের মত লোকের আর হিন্দু থাকা সঙ্গত হয় না—তোমরা আলো পাইয়াছ, আর কেন অন্ধকারে থাক?" ● ● ● ●

"সে কি দিদি!—অন্ধকার কোথায়?—ঘরের দোর জানালা সব খোলা আছে—অন্ধকার কৈ?—বাহিরেও বড় একটা বেশী আলো নাই, তবে যথেষ্ট রৌদ্র আর ধূলা আছে বটে।"

পঞ্চত্রিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

আচার রক্ষা।

কোন দ্রব্য, সেটী যতই কেন স্বচ্ছ হউক না, তাহার দ্বারা কিছু না কিছু আলোক সংরুদ্ধ হইবেই হইবে। এই যে আমাদের দেশে ইংরাজী বিদ্যার 'সুবিমল জ্যোতিঃ' বিকীর্ণ হইয়াছে—তাহাতেও অনেকটা সত্যের অপলাপ হইয়া দেশীয় জনগণের অপকার করিতেছে। দেখ ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় আচার পদ্ধতির বিলোপসাধন হইতেছে। স্বপ্নেও মনে করিও না যে তাহাতে সমূহ হানি হইতেছে না। আচার পদ্ধতির লোপে গৃহকার্য্যের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছে, স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, লোক সকলের আয়ুকাল খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে, এবং আত্ম-গৌরবের ত্রুটি হওয়াতে জাতিসাধারণের মধ্যে নীচানুকরণ প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদিগের আচার-প্রণালী ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত হইয়া নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাল, কি আমাদিগের ধর্ম্মটী ভাল, এই কথা লইয়া যথেষ্ট লড়াই চলিতেছে—তাঁহাদিগের দ্বৈতবাদ ভাল, কি আমাদের অদ্বৈতবাদ ভাল, ইহার অনেক বিচার হইতেছে। এবং সেই বিচারে আমরা যে যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সহায়তা পাইতেছি, তাঁহাদিগকেই একেবারে মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতেছি। কিন্তু আমাদিগের আচারপদ্ধতি কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা ত আর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলিয়া দিতে পারেন না। সুতরাং কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারই স্থানে এদেশের উপযুক্ত আচার শিক্ষার সুবিধা হইতেছে না।

ধন্য য়িহুদী জাতি; সেই জাতির দশা আমাদিগের অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা ত আমাদের নিজের দেশে আছি—আমরা ত এখনও সকলে একত্র হইয়া আছি—তাহাদের নিজের দেশও নাই, নিজের জাতিও নাই। তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বদেশে নানা জাতীয়ের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি তাহারা আপনাদিগের আচার প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে

এবং সেই গুণে য়িহুদীরা যে দেশে থাকুক, তাহারা তত্রদেশবাসিদিগের অপেক্ষা সুস্থশরীর, দীর্ঘায়ুঃ এবং ধনশালী হইতেছে।

আচার-প্রণালীটী সামান্য জিনিস নয়। আমাদিগের "কৃতবিদ্যেরা" আচার পদ্ধতির প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিতান্তই অদূরদর্শিতার কাজ করিতেছেন। এক জন বিশিষ্ট কৃতবিদ্যের সহিত আমার কোন সময়ে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

আমি। ধর্ম্মের বড় বড় কথা লইয়াই আমরা তর্ক করি—কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট যে আচার প্রণালী ছিল, তাহার গুণাগুণ কিছুই বিচার করি না—এটী আমাদের একটী ভ্রম।

তিনি। আচার প্রণালী লইয়া আর কি বিচার করা যাইবে? ওগুলি ত যাজক সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত ব্যাপার বই আর কিছুই নহে।

আমি। আচার প্রণালী যে যাজকবর্গেরই মনঃকল্পিত বস্তু, তাহা আমার বোধ হয় না। প্রকৃতির সম্যক্ পর্য্যালোচনা দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল জ্ঞানিবর্গের বোধগম্য হয়, আচার পদ্ধতিতে তাহাই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। আচার পদ্ধতি সাক্ষাৎ প্রকৃতির আদেশ।

তিনি। প্রকৃতির আদেশ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত কোন শাস্ত্রপদ্ধতি শিখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বোধ হয় না। কারণ প্রকৃতির আদেশগুলি অতি স্পষ্টাক্ষরেই প্রকৃতির সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অন্যান্য জীবদিগের—গো, মহিষ, বিড়াল, কুক্কুরাদির কোন আচার পদ্ধতি শিখিবার প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমি। তাহা সত্য বটে—কিন্তু সেই জন্যই পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে বিধ্বংসের প্রাকৃতিক নিয়মটী অতি বলবত্তররূপে কার্য্যকারী। কত কত প্রকার পশু পক্ষী পৃথিবীতে জন্মিয়া একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষ সেই যে অতি প্রাচীনকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই অবধি আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। পশু পক্ষ্যাদি পৃথিবীর দেশ-বিশেষে এবং কাল বিশেষে অবস্থিতি করিতে পারে—মানুষ সর্ব্বস্থানে সকল সময়ে থাকিতে সমর্থ। তাহার কারণ, মানুষ দেশভেদে এবং কালভেদে আপনার আচার ভিন্ন করিয়া লইতে পারে।

তিনি। তবে কি মানুষের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মই যথেষ্ট নয়?

আমি। মানুষের পক্ষে মনুষ্য-প্রকৃতির যে নিয়ম তাহা যথেষ্ট—কিন্তু পশু প্রকৃতির নিয়ম মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তিনি। অশন ভোজনাদি ব্যাপারে মনুষ্য প্রকৃতি কি পশু-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন?

আমি। ভিন্ন বৈ কি?—মনুষ্যের প্রকৃতিতে পরিণামদর্শিতা অতীব বলবতী। মনুষ্য-প্রকৃতিতে ভাবি-সুখেচ্ছা বর্ত্তমান সুখেচ্ছা অপেক্ষা তেজস্বিনী, মনুষ্যের প্রকৃতিতে কার্য্য কারণ সম্বন্ধবোধ অতি দূর সীমা অতিক্রম করিয়া চলে, এবং মনুষ্যের বাক্‌শক্তি এবং তজ্জাত ভাষা এবং লিপি-প্রণালী থাকাতে একজন অপর ব্যক্তিকে আপনার অভিজ্ঞতা দান করিতে পারে—এই সকল কারণে মনুষ্য-প্রকৃতি পশু-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তুমিও যেমন প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বল, আমিও তাই বলি, তবে মনুষ্যের পক্ষে বলিতে হইলে আমি বলি, মনুষ্য-প্রকৃতির অনুসরণ কর। প্রজাপাল শাস্ত্রকারেরাও বোধ হয় সেই জন্য, অর্থাৎ পরিণামদর্শী মনুষ্য-প্রকৃতির অনুসরণ করাইবার জন্য, আচার পদ্ধতির প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য প্রকৃতির অনুসরণ করিতে গেলেই পরিণামদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতার সমাদর করিতে হয়। যখন যেটা ভাল লাগিল, যাহাতে প্রবৃত্তি হইল, অমনি তাহাই করিতে গেলে চলে না। এই জন্যই আচার শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদিগের দেশের জল বায়ু এরূপ যে, এখানে এমন কতকগুলি পীড়া হয়, যাহা ইউরোপে হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে সে সকল পীড়ার নাম পর্য্যন্ত নাই। এখানে এমন কয়েকটা ব্রতের বিধান আছে, যাহার অনুষ্ঠানে ঐ পীড়াগুলির দোষ বৃদ্ধি হইতে পায় না। সে ব্রতগুলি আমাদিগেরই শাস্ত্রকারদিগের নির্দ্দিষ্ট। সেগুলি পালন করা কি আবশ্যক নয়? ব্রত করিতে গেলেই উপবাসাদির ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু ওরূপ ক্লেশ স্বীকার পশু-প্রকৃতির বিরুদ্ধ। ফলকথা, শ্রেয়ঃ এবং প্রেয় উভয়ের একটা চিরন্তন ভেদ আছে *—আচার

---

* "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃশ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে। কঠোপনিষৎ।

পদ্ধতি সেই ভেদ অবগত হইয়া কোন্‌টি প্রেয় না হইয়াও শ্রেয়ঃ, তাহা বিধিবাক্য দ্বারা দেখাইয়া দেয়। * * *

মতবাদ লইয়া ঝগড়া করায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়িতে পারে। কিন্তু দেশের প্রকৃত্যনুযায়ী আচার রক্ষা করায় শরীর দৃঢ় মন সবল এবং গৃহ পবিত্র থাকে

* * * * *

"বৌ মা সাবিত্রী ব্রত করিতে চাহেন—কিন্তু কোলে ছোট ছেলে—সাবিত্রী ব্রত করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়, তাহা ত সহিবে না ?" * * "ঠিক কথা—সাবিত্রী যখন ব্রত করিয়াছিলেন, তখন ত তাঁহার বিবাহ মাত্র হইয়াছিল—ছেলে হয় নাই—বৌ মা জন্মাষ্টমীর ব্রত করেন—আমার মানা নাই। তবে সাবিত্রী ব্রতের বদলে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে স্বামীর মঙ্গল চিন্তনপূর্ব্বক জলগ্রহন করুন।—মা প্রত্যহ বাবার পাদোদক খাইতেন, জান ত। সাবিত্রী ব্রতের বদলে সেই মহাব্রত"। * * *

"তুমি একাদশীর ব্রত কর শুনিয়া সে দিন উমেশের স্ত্রী বড়ই আশ্চর্য্য মানিল—বলিল, এত ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াও উনি একাদশী করেন—আর আমার ভাই বৎসর কয়েক মাত্র পড়িয়াই একেবারে সাহেব হইয়াছে—কিছুই মানে না"। * * * "একাদশীর ব্রত করা কাহার কাহার পক্ষে বড় ভাল। যাহাদের শরীরে বাত শ্লেষ্মাধিক্যের কোন লক্ষণ থাকে, তাহারা এই ব্রতের বিশেষ উপকার বুঝিতে পারে।" * * * "শ্যামাচরণের মা বিধবা। অত বয়স হইয়াছে—কিন্তু সকলের হাতেই খায়।" * * "ওটা ভাল নয়। যাহারা বিশিষ্টরূপ শুদ্ধাচারে থাকিতে চায়, তাহাদের যার তার হাতে খাওয়া উচিত নয়। সামান্য স্পর্শদোষই খুব দোষ—তাহাতে এক জনের শরীরের পীড়া এবং প্রকৃতির দোষ অপরের শরীরে যাইতে পারে। পাকস্পর্শ দোষ তাহা অপেক্ষাও অতি গুরুতর দোষ—কি আশ্চর্য্য ! ইংরাজেরা সামান্য স্পর্শদোষটা খুব মানে, কিন্তু যার তার হাতে খায়—ওরা হাড়ি মেথরের হাতেও খায়।"

———

ষট্‌ত্রিংশ প্রবন্ধ।

—:*::*:—

গৃহে ধর্ম্মাধিকরণ।

এক একটী পরিবার এক একটি রাজ্য। তবে রাজকার্য্যে বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে হয় এবং অভ্যন্তরেও শান্তি সংস্থাপন করিতে হয়, পরিবারের কর্ত্তাকে বহিঃশত্রু লইয়া ততটা মারামারি করিতে হয় না। চোর, তস্কর, সাহসিক, ফেরেব্বাজ প্রভৃতির দৌরাত্ম্য হইতে সমাজ-শাসন এবং তাহারই প্রতিভূ স্বরূপ রাজশাসন, পরিবাররূপ রাজ্যগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু পরিবারের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা গৃহস্বামীরই কর্ত্তব্য—উহাতে সামাজিক শাসনের বা রাজশাসনের বড় একটা হাত নাই। ছেলের ছেলের ঝকড়া, মেয়ের মেয়ের ঝকড়া, ছেলের বুড়োর ঝকড়া, শাশুড়ি বৌয়ে ঝকড়া,—এই সকল কাণ্ডে গৃহের আভ্যন্তরিক শান্তির সর্ব্বদাই ব্যাঘাত হয়। অতএব ঐ সকল কষ্টকর ব্যাপার যাহাতে আদবেই হইতে না পায় এবং অধিক না হইতে পায়, হইলে সত্বর নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং সমধিক পরিমাণে অশুভ ফল প্রসব না করে, তাহার জন্য যত্নবান এবং সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পারিবারিক শান্তিরক্ষার মূলসূত্রও যাহা, সামাজিক শান্তিরক্ষার মূল সূত্রও তাহাই—অকৃত্রিম অপক্ষপাতিতা। যে পরিবারের কর্ত্তা বিনা পক্ষপাতে ঝকড়া থামাইতে পারেন এবং দোষীর তিরস্কার ও নির্দ্দোষীর পুরস্কার করিতে পারেন, তিনি পরিজনদিগকে শান্তিসুখে রাখিয়া শুদ্ধ আপনি সুখী হইতে পারেন এমত নহে, তিনি পরিবারবর্গের মধ্যে ধর্ম্মের সকল বীজই বপন করিয়া আপনার জীবদ্দশা সফল করিতে পারেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, বিনয়, কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ, সকলেরই মূলে ন্যায়ানুগামিতা থাকা আবশ্যক। পরিবারের মধ্যে সেই ন্যায়ানুগামিতার অভাব হইলে সমাজেও উহার অভাব হইবে এবং সত্যনিষ্ঠার ও প্রভাব হ্রাস হওয়াতে সমাজও হীনবল হইয়া পড়িবে।

আমাদিগের এই দুঃস্থ অধঃপতিত দেশে ক্ষমা, দানশীলতা প্রভৃতি কোমল সদ্‌গুণ সকলের যত গৌরব, ন্যায়পরতা, সত্যাচার, বাক্‌নিষ্ঠা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কঠোর সদ্‌গুণ সকলের গৌরব তেমন অধিক নহে। কিন্তু যেমন স্ত্রী পুরুষের মিলনেই সংসারের উৎপত্তি এবং সুখ, তেমনি ঐ কোমল এবং কঠোর উভয় প্রকার গুণের মিলনেই সৎকার্য্যের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম। কোমল গুণগুলি কঠোর গুণগুলির অভাবে প্রকৃত পথে থাকিতে পারে না। এই জন্য অনেক স্থলেই আমা-দিগের দয়া বাক্য মাত্রে, ক্ষমা অশক্তিতে, এবং দানশীলতা কেবলমাত্র মনে মনে থাকিয়া যায়—উহারা ক্রমেই বন্ধ্যা হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা যেরূপ তাহাতে উভয় উঠিন এবং কোমল সদ্‌গুণ সকলের যথাযথ সাধন হইতে পারে। কেবল মাত্র পারি-বারিক কার্য্যের প্রতি একটু নিবিষ্টমনা হইতে হয়। প্রাচীনেরা যেমন 'দূরহউক গে আর পারি না' বলিয়া ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আলস্য সুখভোগ করেন, তেমন করিলে হয় না, এবং নব্যেরা যেমন এ সকল আমাদিগের সামাজিক নিয়মের দোষ' বলিয়া আত্ম সমাজকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাহা করিলেও চলে না। পারিবারিক সকল কার্য্যেই বিশেষ মনোনিবেশ করিতে হয়। পরিবার এমন কোন অলৌ-কিক যন্ত্র নয় যে বিনা যত্নে উহা আপনা হইতে অবিকল চলিয়া যাইবে এবং আপনা হইতেই সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম প্রসব করিতে থাকিবে।

ছেলের ছেলের ঝকড়া— কি এত সামান্য ব্যাপার যে তুমি ঐ ঝক-ড়ার নিদান কিছুই বুঝিবে না, উহার ক্রম কিরূপ, তাহা দেখিবে না এবং উহার চরম ফল কি হইবে, তাহা ভাবিবে না? ছেলেদের ঝকড়ার নিদান প্রধানতঃ তিনটী,—(১) উহাদিগের অসীম স্বার্থপরতা, (২) প্রহার করায় ও কামড়ানয় এবং আঁচড়ানয় উহাদিগের স্নায়ু এবং পেশী সঞ্চালন জন্য সুখানু-ভূতি, (৩) উহাদিগের আপনাপন পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি বয়োধিকদিগের পরস্পর আন্তরিক বিদ্বেষভাবের অনুকরণ। এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটী কারণ হইতে যে সকল বিবাদ, বিসম্বাদ, মারামারি, পেটাপেটি জন্মে, সেগুলি ছেলেরা একটু বড় হইয়া উঠিলে, তাহাদের কিছু জ্ঞান জন্মিলে, প্রায়

আপনা হইতেই কমিয়া যায়। শৈশব হইতে সে গুলির নিবারণের প্রকৃত চেষ্টা করিতে পারিলে ছেলেদের স্বভাব বিশেষরূপেই ভাল হয়—কিন্তু না পারিলেও নিতান্ত অধিক দুষ্ট হয় না। কিন্তু তৃতীয় কারণ হইতে যে সকল বিবাদের উদ্রেক হয়, সে গুলিকে মূলেই দমন করা আবশ্যক। ঐ সকল বিবাদ প্রায়ই সহোদরদিগের মধ্যে হয় না। খুড়তুতা, জ্যেঠতুতা, মামাতুতা পিশতুতা প্রভৃতি জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভাই ভগিনীদিগের মধ্যেই সংঘটন হইয়া থাকে। যখন ঐরূপ বিবাদ পুনঃ পুনঃ হইতেছে দেখিবে, অথবা ক্রীড়াকালে বিভিন্ন সোদরবর্গ বিভিন্ন দলস্থ হইয়া খেলা করিতেছে দেখিতে পাইবে, তখনই নিশ্চয় জানিও যে পরিবারের অভ্যন্তরভাগে অপ্রকটরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়া আছে। বয়স্য ভাব ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব; তাহা না হইয়া সহোদার্য্য ভাব প্রবলতর হইলে, একটু জ্ঞাতি বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, বুঝিতে হয়। তখন আর মুহূর্ত মাত্র উদাসীন থাকিও না। ছেলেদের ঝকড়া হইলেই, কেন উহা হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করা চাই, এবং একেবারে পক্ষপাত পরিশূন্য বিচারে যে ছেলেটী দোষী সপ্রমাণ হইবে, তাহাকে অবশ্য অবশ্য দণ্ড দেওয়া চাই। বয়সের হিসাবে দণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইবে, কেহ বা সামান্য অনাদর পাইবে, কেহ বা ধমকানি খাইবে, কেহ বা মার খাইবে। দণ্ডটী যেন এরূপ হয় যে, বাটীর ছেলে, চাকর, চাকরাণী সকলেই দোষীর নিন্দা করিয়া দণ্ডের ঔচিত্য ব্যাখ্যা করে। যে বাটীতে সহোদরদিগের মধ্যেই অধিক ঝকড়া হয় বিশেষতঃ যদি বড়টী ছোটটীর পীড়ন করে তবে অন্তর্ভুক্ত পক্ষপাতিতাদোষ সূচিত হয়। ছেলেদের বাপ অথবা মা কিম্বা উভয়েই কোন ছেলেকে অধিক কাহাকেও অল্প ভাল বাসেন, ইহাই বুঝা যায়। সে বিবাদও পূর্ব্বরূপে অতি সত্বর নিষ্পন্ন হওয়া আবশ্যক, এবং দণ্ডও পূর্ব্বরূপ হওয়া উচিত। বাপ মা ছেলেদের মধ্যে পক্ষপাত করিয়া থাকেন, এ কথা প্রকাশ করিয়া না বলাই অধিক স্থলে শ্রেয়ঃ।

বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ঝকড়ার কথা বাটীর কর্ত্তাকে না শুনিতে হইলেই ভাল হয়। কারণ সকল কথা কর্ত্তার কাণে উঠিলে স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতা ম্লান হইয়া যায়। কিন্তু যদি গৃহিণী বুদ্ধিমতী, সহনশীলা এবং পক্ষপাতপরিশূন্যা হয়েন, তাহা হইলেই কর্ত্তার না শুনা চলে, নচেৎ

তাঁহাকে অবশ্যই শুনিতে হয় এবং ঠিক বিচার করিয়া নিন্দা, ভৎর্সনা, দুঃখপ্রকাশ এবং ক্রোধপ্রকাশের দ্বারা দণ্ডদান করিতে হয়।

ছেলের বুড়ার ঝকড়া—যে বাটীতে ইহা হয়, অর্থাৎ যুবক যুবতীরা বৃদ্ধ বৃদ্ধার সহিত ঝকড়ায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং তাঁহাদিগের কথায় রুক্ষ উত্তর প্রদান করেন, সে বাটী অতি অধম। সে বাটীতে ধর্ম্মের মূল বীজ যে ভক্তি তাহারই একান্ত অভাব। কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন বাটীর কর্তৃত্ব তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তবে কি করিবে, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচারপূর্ব্বক যুবক যুবতীর দোষ হইলে তাহাদিগের সম্ভবমত কঠিন দণ্ড দিবে, বৃদ্ধ বৃদ্ধার দোষ হইয়া থাকিলে, তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবে. বৃদ্ধ বৃদ্ধার অভিমানের ভয় করিবে না, অবুঝ অপরাপর লোকদিগেরও নিন্দার ভয় করিবে না। কিন্তু আপনি যে উচিত বিধান করিয়াছ, তাহাও কাহার নিকটে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইবে না—বয়োধিকদিগের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত ভাবে থাকিবে এবং তদ্বিষয়ে অল্প কথাই কহিবে। কিন্তু আর একটী কথা আছে। যদি বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নিতান্ত বয়োধিকতাবশতঃ অথবা পীড়াবশতঃ বাস্তবিক ক্ষীণবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকেন, তবে যে যুবক বা যুবতী তাঁহাদিগের প্রতি রুক্ষ উত্তর দান করিয়াছে, সেই প্রকৃত দোষভাগী। সে স্থলে তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান উচিত হইবে।

বয়সের এবং সম্পর্কের গৌরব রক্ষা করিয়া চলা আমাদিগের জাতীয় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। পরিবারের মধ্যে এই ধর্ম্মটীর সম্যক্ পালন হওয়া আবশ্যক। ঐ মর্য্যাদাটী রক্ষা করিয়াও গৃহ বিবাদের মীমাংসায় পক্ষপাতশূন্য বিচার হইতে পারে—প্রত্যুত ঐ মর্য্যাদা রক্ষা করিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে পক্ষপাতশূন্য বিচার হয়।

বিধবা শাশুড়ী তাঁহার পুত্রবধূর সহিত যে ঝকড়া করেন, তাহা থামানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। একটী উদাহরণ দিতেছি। "মা! আজ অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বকিতেছিলে কেন?—বাহিরবাটী হইতে শুনা যাইতেছিল যে"। * * "সাধে চেঁচাই! বৌ যে খুব চোপা করিতে শিখিয়াছে, কোন কথাই ত আর শুনিতে চায় না" * * * "কি কথা শুনে নাই।" * * * "তোর আর সে সকল খবরে কাজ কি?" * * * "আমার কাজ

আছে বই কি মা?—এই দেখ বাড়ীর ভিতরে অত গোলমাল—সেটা কি ভাল? লোকে নিন্দা করিবে যে। আর দেখ, বিবাদে অনেক দোষ হয়, ছেলে পিলে খারাপ হয়, খাওয়া দাওয়া মন্দ হয়, সংসারে মনের সুখ থাকে না—আর ঘর লক্ষ্মীছাড়া হয়।" * * "বটে!! থাক্ তোর ঘরের লক্ষ্মী নিয়ে তুই থাক্—আমার যেম্‌নে দুই চক্ষু যায় আমি চলিয়া যাইব —হা বিধাতা! আমার কপালে এই ছিল * * *" "মা!—আমি আর এখন এখানে থাকিব না। বাহিরে যাই। খাবার সময়ে ডাকিলে আসিব। কিন্তু বাহির হইতে যেন চেঁচাচেঁচি শুনিতে না পাই।"

* * * * * *

"মা! ভাত খাইতে ডাকিলে আসিলাম—কি হইয়াছিল, এখন বল।" * * * "আর সে কথার কাজ নাই—হবে আবার কি?—তুই খা, খা" * * * "তাই বল বেটি! কেবল চেঁচিয়ে হাট করেছিলি। আর যারা সব আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছিল, সবাই ঐ গোল শুনে আমাদের বাড়ীর নিন্দা করে গেল। বলিল তোর মা! বৌকে দেখিতে পারে না।" "তা বলবে বই কি?—ওদের বাড়ীতে বুঝি কোন চেঁচাচেঁচি হয় না?" * * * "হয় হউক্‌গে মা! কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না।" * * "তুই খা খা—আর ওসব কথায় কাজ নেই।"

* * * * *

"আজি সকালবেলা মা তোমাকে বক্‌ছিলেন। কেন বক্‌ছিলেন তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না—তুমি কোন কথার জবাব দেও নাই ত।" "না॥ * * * "লক্ষ্মী আমার।" * * * "কেন মা! আজি তোমার বৌ অত কাঁদিতেছে কেন। আমি ঘরে যাইয়াই দেখিলাম বড়ই কাঁদিতেছে, কি হইয়াছে? * * তুমি জান, আমি উহাকে এমন সকল বিষয়ে কখন কিছু জিজ্ঞাসা করি না, আর আপনা হইতেও কখন কিছু বলে না। * * * তুমি বল তোমার বৌ অত কাঁদছে কেন? * * * বলিবে না? তবে (ভগিনী) উমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানি—এমন সকল কাণ্ডে চুপ করিয়া থাকা ভাল নয়।—"উমা!—কি হয়েছিল রে!—বৌ অত কাঁদচে কেন?" উমা বলিল—"মা আজ বৌকে বড় শক্ত গালাগালি দিয়াছেন—

ভাইখাকী বলিয়াছেন।” * * * “মা! আমার একটী কথা শুন—তুমি গালিটী মনের সহিত দাও নাই বটে—কারণ তুমি আমার শ্যালাদের বেশ ভালবাস, কিন্তু কথাটা শুনিতে বড়ই কটু। ভেবে দেখ তোমার মেয়ের শাশুড়ী যদি তাহাকে ভাইখাকি বলিয়া গালি দেয়, তবে তোমার মনটী কেমন হয়?—ভাল বাজ,কর নাই বাছা!—এ রকম করিলে বড়ই নিন্দা হবে—আর অকারণে মনে নির্ঘাত দুঃখ দেওয়া—তা কি ছেলের, কি মেয়ের, কি পড়সীর, কি বৌয়ের, বড়ই পাপ।” * * * *

যে বাটীতে শাশুড়ী বৌয়ের মধ্যে ঐরূপ ন্যায় রক্ষিত হইয়াছিল, দুই বৎসরের মধ্যে সেই বাটী নির্ব্বিবাদ শান্তিময় নিকেতন হইয়া উঠিল। প্রতিবেশী মাত্রেই বলিত, কোন শাশুড়ী বৌকে অমন আপনার পেটের মেয়ের মত ভালবাসিতে পারে না!

আর একটী বাটীর কথা বলি। এ বাটীতেও বিধবা মা, ছেলে কর্ত্তা। ছেলে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, মাতৃভক্তি করিতে হয় শুনিয়াছেন, মায়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলাই পরম ধর্ম্ম স্থির করিয়া লইয়াছেন। মা বলিলেন—‘বাবা!—আমার হাড় ভাজা ভাজা হইল’। তুমি এমন সোণার চাঁদ, তোমার কপালে এমন একটা পেঁচা যুটিল। আমিও তোমার সংসার লইয়া সুখী হইব বলিয়া যে আশা করিয়াছিলাম, সে সব নিষ্ফল হইল। বাবা! তুই আর একটী বে কর—আমি বৌ নিয়ে ঘরকন্না করিয়া সুখী হই।” ছেলে চুপ করিয়া রহিলেন—বলিলেন না যে, এই বিবাহ তাঁহার পিতা দিয়া গিয়াছেন—ঐ পত্নী ত্যাগ করায় সেই পিতার অবমাননা করা হয়—মনে করিলেন না যে, স্ত্রী কি দোষ করিয়াছে, তাঁহার মায়ের মনে ধরে নাই এই বই ত নয়, তাহার জন্য কি নিরপরাধিনী একবারে আসন্ন হইবে, ভাবিলেন না যে পত্নী সেই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা, কোথা তাহাকে হৃষ্টচিত্ত ও সুস্থ রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য, না তাহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। মাস কয়েকের মধ্যে মাতৃভক্ত পুত্র দ্বিতীয়বার পরিগ্রহ করিয়া সগর্ভা প্রথমা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই অবধি মায়ের অসুখ বড়ই বাড়িয়া গেল—ছেলে তাঁহার কথায় সকল কাজই করিতে পারে, এই ভাবিয়া তিনি নানা প্রকার ফাই ফরমাইস করিতে লাগিলেন—নিজের

একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া দাঁড়াইলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাতা পুত্রের মুখ দেখাদেখি রহিল না, দুই জনের অন্ন পৃথক্ এবং আবাস বাটী পৃথক্ হইল—বড় টানে সব ছিঁড়ে গেল। দ্বিতীয় পক্ষী কোথায় গেলেন তাহার ঠিকানা হইল না। প্রথমাই গৃহলক্ষ্মী এবং কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন।

ফলকথা, মাতৃভক্তিই বল আর যাহাই বল, ন্যায়ানুগামিতার সহিত থাকিলেই সবরক্ষা পায়। উহাই ধর্ম্ম—উহাই সকলকে ধারণ করে। অত-এব পরিবারের মধ্যে ন্যায়পরতার একটী উচ্চতম আসন স্থাপন করিয়া রাখ।

— :*::*:—

সপ্তত্রিংশ প্রবন্ধ।

——•(•)•——

গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা।

আমাদিগের সমাজ মধ্যে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যাইতেছে, যাহা পারিবারিক ব্যবস্থারও অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া অনেকটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতেছে। সদ্বিবেচক গৃহস্থের কর্ত্তব্য যতদূর পারেন, ঐ দোষের প্রতিবিধান করিয়া চলিবেন। যে সামাজিক পরিবর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি এই কথা বলিতেছি, অল্প কথায় বলিতে গেলে তাহাকে বাবুয়ানা বা চৈক্কণ্য-লালসা বলা যায়। আমাদের দেশে একপ্রকার চিক্কণাই বা বাহ্যবাবুয়ানা বড়ই বাড়িতেছে এবং বাড়িয়া সর্ব্বনাশের উপক্রম করিতেছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা দেশের ধন কম হইয়া যাইতেছে—পূর্ব্বে যাহারা দোল দুর্গোৎসব করিত, তাহারা অনেকে এক্ষণে নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে, প্রতিদিন দুই বেলা দুই বার পেট ভরিয়া খাইতে পায় এমন লোকের সংখ্যা বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে যে ব্যবসায় বাণিজ্য দেশীয়দিগের হস্তগত ছিল, তাহা ক্রমেই বিদেশীয়দিগের আয়ত্ত হইয়া পড়িতেছে, পূর্ব্বে যাহারা হাজার, দশ হাজার, লক্ষ টাকা প্রতিবর্ষে সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহারা এক্ষণে আর সঞ্চয়ের মুখ দেখিতে পায় না, ঋণদায়ে জড়িত হইতেছে, যে সকল প্রদেশে ভদ্র লোকেরা নিত্য পুরি রুটি খাইত, তাহারা এখন কেবল ভাত খাই-তেছে। কিন্তু দেশের দৈন্যদশার এই সকল লক্ষণ সত্বেও দেশীয় লোকের মধ্যে এক রকম চিক্কণাইয়ের চাইল প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে।

এইরূপ হইবার কারণ দুইটী। এক ইংরাজদিগের অনুকৃতি। দ্বিতীয়, ইংরাজদিগের প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদের বহুল বিস্তার। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা বলিলেন—"আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র দল ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন করিবে; অত-এব বাবুয়ানা ভক্ত ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে যাহাতে উঁহাদের গৌরবের ত্রুটি না হয়, এমত দৌলতমন্ত এবং খোসপোষাকী হইয়া উঁহাদিগের চলা উচিত।" এই বলিয়া তাঁহারা সিবিলিয়ান দলের এমনি বেতন বৃদ্ধি করিলেন যে, পৃথিবীর কোন দেশে কস্মিন্ কালে রাজকর্ম্মচারীদিগের অমন বড় বেতন

আর হয় নাই। এখন দিন দিন বর্দ্ধিতদারিদ্র্য ভারতবর্ষীয়েরা আর সিবিলিয়ানদিগের বাবুয়ানাকে হাত বাড়াইয়া নাগাইল পায় না। এখন যত বড় বাড়ী, তেজী ঘোড়া, সকলই সিবিলিয়ানদিগের; তাঁহাদের নিজের হইলেও তাঁহাদের, আর দেশীয় রাজা রাজড়াদিগের হইলেও, তাঁহাদের। ইংরাজদিগের এই ভয়ানক নবাবী দেখিয়া দেশীয়েরা তাহার অনুকরণ চেষ্টা করিতেছে। যে দুই জন, দশ জন পারিতেছে, তাহারা বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, সাজ, লেবাস, পোষাক সকলই ইংরাজী ধরণের করিতেছে; আর মধ্যবিত্তেরা যেন তেন প্রকারেণ কোঠা বাড়ী, অফিস যান গাড়ী, কোন এক রকম ঘড়ি, পাণ্টালুন, কোট, ক্যাপ এবং চুরোটের চেষ্টা দেখিতেছে। ছোট লোকেরাও ঠিক ইহাদের লেজ ধরিয়া যাইতেছে—পেটের ভাত থাক্ আর নাই থাক্, একটু ওয়োসারওয়ালা ধুতি এবং পিরাণ পরিতেছে, এবং পেট ভরিয়া মুড়ি মুড়কি জলখাবার না খাইয়া এক পয়সার জিলাপি বা এক পয়সার বরফ জিহ্বাগ্রে দিয়া বাবুয়ানা করিতেছে! এ সকল হওয়াতে কোন কোন অর্থশাস্ত্রিকদিগের মতে বড়ই উপকার! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে উপকার কিছুই নাই।* তবে দেশে ধনাগম থাকিলে কথঞ্চিৎ ইহা সহ্য হইতে পারে, মারা পড়িতে হয় না। কিন্তু দরিদ্রের হাতো বাবুয়ানা বড়ই সাংঘাতিক। শরীরের শোণিত বৃদ্ধির সহিত চৈক্কণ্যের বৃদ্ধি হইলে স্বাস্থ্য বুঝা যায়, শোণিত লাঘবের সহিত যে চৈক্কণ্য জন্মে সেটী মারাত্মক ক্ষয়রোগ। আমাদের সমাজ মধ্যে এই রোগের সঞ্চার হওয়াতে পারিবারিক প্রণালীর মধ্যে অনেকটা দোষ প্রবেশ করিয়াছে। আমরা ইংরাজ মাত্রকেই খুব খোসপোষাকী বাবু হইয়া বেড়াইতে দেখিতে পাই। উহাঁরা স্বদেশে কি ভাবে থাকেন তাহার কিছুই জানিতে পারি না। সুতরাং যে এক অনুকরণ শক্তি আমরা খাটাইয়া থাকি, পারিবারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে, আমাদিগের সে শক্তিটীও আর পূর্ণমাত্রায় খাটিতে পায় না। আমরা কেহই স্বচক্ষে দেখিতে পাই না, ইংরাজেরা কিরূপে আপনাদিগের গৃহকার্য্য সকল

---

* "Luxury supports a state as the hangman's rope supports a criminal" Laveleye.

নির্ব্বাহ করেন। আমরা দেখিতে পাই না যে, উহাঁরা স্ত্রী স্বরূপে নিত্য নৈমিত্তিক খরচের খাতা রাখেন—উহাঁদের বিবিরাও ঘর ঝাঁইট দেন—রসুই করেন—বাসন মাজেন—কাপড় কাচেন—কাচিয়া ইস্তিরী করেন—ছুঁচের কাজ করেনই—আর পল্লীগ্রামে মেয়েমর্দ্দে, ক্ষেত্রে খাটেন—গোয়াল কাড়েন। এ সকল ব্যাপার আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রন্ধনাগারে গিয়া নিত্য কি কি ব্যঞ্জন পাক হইবে স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং রন্ধন কার্য্যের কতকটা সাক্ষাৎ পর্য্যবেক্ষণ করেন? কয়জন জানেন যে, উহাঁর কন্যা এলিস্ একজন বড় কুলীনের ঘরে বিবাহিতা হইয়া অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন তিন চারিটী ছেলের মা হইয়াও একটী মাত্র বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন অপর পরিচারিকা রাখিতে পারেন নাই? একটি দুগ্ধবতী গাভী রাখিতে পারিলে তাঁহার ছেলেগুলির পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ যুটিত, তাঁহার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। রাজকুমারী এলিস্ সহস্তেই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ যে তিনিই দুঃখিনী হইয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ করিতেন, তাহা নহে। ইউরোপখণ্ডের সকল দেশের কি গৃহস্থ, কি বড় মানুষ, সকল ঘরের স্ত্রীলোকেরাই স্ব স্ব হস্তে এবং স্বস্ব শরীরের বল প্রয়োগে আপনাপন গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। উহাঁদের দাস দাসীর সংখ্যা তত অধিক নয়, এবং এখনও ঘর ঝাঁইট প্রভৃতি গৃহকার্য্যগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রযোগে সম্পন্ন হয় না।

ইংরাজদিগের দেখাদেখি বাহ্য আড়ম্বর এবং চৈক্কণের প্রতি লালসা হওয়ায়, ইংরাজদিগের স্বদেশের ব্যবহার কিরূপ তাহা অপরিজ্ঞাত থাকায়, ইংরাজদিগের গৃহকার্য্যের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা না জানায়, আর ইংরাজদিগের মৌখিক সাম্যবাদে উন্মত্ত হওয়ায়, আমাদিগের অপরাপর যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহার ত ইয়ত্তা নাই—গৃহাভ্যন্তরে বড়ই বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে। ছেলেরা ইংরাজি শিখিয়া সাহেব হইলেন। মেয়েরা ইংরাজি না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল। যে বাটিতে মাসে একশত টাকা আসিল, সে বাটির স্ত্রীলোকেরা আর ভাত রান্ধেন, ঘর ঝাঁইট দেয় না, বিছানা

শুকায় না, তোলে না, পাতে না, বাটনা বাটে না, কুটনা কুটে মাত্র আর সব কাজ চাকর চাকরাণীতে করে—উহাঁরা বহি পড়েন, কার্পেট বুনেন তাস খেলেন! ফল কি হয়? গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটী হইয়া যায়—যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদ্রাকার, স্বল্পবল, রুগ্নদেহ হইয়া জন্মে, সর্ব্বদাই পীড়িত হয়, স্বল্পায়ুঃ হইয়া থাকে, অথবা অকালেই চলিয়া যায়।

দেশে অনেক রকম সংস্কারের আন্দোলন হইতেছে, বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার উল্লেখ ত সর্ব্বদাই হইতেছে—কিন্তু অযথা অনুকরণজাত এই সমূহ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য স্ত্রীলোকদিগের যে মহতী শিক্ষাটুকু ছিল, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যায় না কখন যে শুনিতে পাওয়া যাইবে তাহা বলিয়াও বোধ হয় না। তবে যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছেন, যদি তাঁহাদের মধ্যে কেহ ইংরাজ পরিবারের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিয়া থাকেন এবং এদেশে সেই বিবরণ প্রচলিত করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ের উপলব্ধি হওয়াতে কতকটা উপকার দর্শিতে পারে। যতদিন তাহা না হইতেছে এবং ইংরাজের যথাযথ অনুকরণের পথ প্রকাশ না হইতেছে, অন্ততঃ সেই পর্য্যন্ত একটু স্থির থাকিয়া গৃহকার্য্যের পূর্ব্ব প্রচলিত দেশীয় ব্যবস্থাগুলি রক্ষা করাই বিধেয়। এখনকার দিনে সেই ব্যবস্থা রক্ষার এবং প্রত্যানয়নের জন্য যে সকল সদুপায় করা যাইতে পারে নিম্নে তাহারই কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) গৃহকর্ত্তা যদি বৃদ্ধ না হয়েন, তবে প্রতিদিন স্বহস্তে কতকটা গৃহ-কার্য্য করিবেন।

(২) বাটীতে ছুতার এবং রাজমিস্ত্রির অত্যাবশ্যক দুই চারিটী যন্ত্র থাকিবে। গৃহোপকরণের এবং গৃহের ছোট খাট মেরামতগুলি, বাটীর প্রৌঢ় পুরুষেরা স্ব স্ব হস্তেই সম্পন্ন করিতে শিখিবেন এবং করিবেন।

(৩) গৃহ কার্য্যের পরিমাণ বুঝিয়া ঐ কার্য্যের কতকটা, বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে বিভাজিত করিয়া দিতে হইবে, অর্থাৎ যদি বাটীতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প এবং খাবার লোকের সংখ্যা অধিক হয়, তবে বেতনগ্রাহী

পাচককে পাক কার্য্যের ভার দিবার প্রয়োজন হইবে বটে, কিন্তু তথাপি কতকটা কাজ বাটীর স্ত্রীলোকদিগের হাতেই থাকিবে। স্ত্রীলোকেরা ঘর ঝাঁইট, বাটনাবাটা, বাসন মাজা প্রভৃতি সকল কাজই কিছু কিছু করিবেন। চাকর চাকরাণীর সংখ্যা বাড়াইবে না—স্ত্রীলোকেরা যতটুকু পারেন না, কেবল সেই টুকু করিবার জন্য বেতনগ্রাহী লোক থাকিবে।

(৪) প্রত্যেক বেতনগ্রাহীর কাজ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; যদি সেই নির্দ্দিষ্ট কাজ অপেক্ষা কাহাকেও কিছু অধিক বা বিশেষ ফরমাইস করিতে হয়, তাহা গৃহকর্ত্রী ভিন্ন অপর কোন স্ত্রী পুরুষ কেহই করিতে পারিবেন না।

(৫) বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া গৃহকর্ত্রীর ভার। তিনি উহাদিগের শরীরের অবস্থা এবং বয়স বিবেচনা করিয়া কার্য্যের ভার দিবেন এবং যত দূর পারেন একই কাজ একজনকে নিত্য দিবেন না।

(৬) গৃহকর্ত্রীর নিজের কাজ—সব। তিনি গোয়াল ঘরে গিয়া দেখিলেন, গাভী গোবরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। অমনি স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া লইবেন। ঠাকুর ঘরে গিয়া দেখিলেন শ্বেত চন্দন ঘষা হইয়াছে, রক্তচন্দন ঘষা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ স্বয়ং রক্তচন্দন ঘষিয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিবেন। তিনি বাটনার কাছে গিয়া হরিদ্রাবাটা একটু হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, বেশ বাটা হয় নাই একটু খিচ আছে। অমনি স্বয়ং বসিয়া বাটিয়া দিবেন। কুটনার কাছে গিয়া দেখিলেন, আলুগুলা বড় ডাগর ডাগর হইয়াছে, ঝোলের যোগ্য হইয়াছে, ডালনার যোগ্য হয় নাই। তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে খানকতক কুটিয়া দেখাইয়া দিবেন। পাকগৃহে গিয়া দেখিবেন, দুই তিনটা ব্যঞ্জন চড়িয়াছে—একটা উনানে কিছুই চড়ে নাই। সেটীতে একটা ব্যঞ্জন স্বয়ং রাঁধিবেন। সব ঘরে বেড়াইবেন—যে ঘর সুপরিষ্কৃত হয় নাই, যাহার বিছানা বালিস নোঙরা, অমনি তাহাকে ডাকিয়া যথোচিত আদেশ প্রদান করিবেন। কর্ত্তা গৃহকর্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তাহার মধ্যে কার্পেট বুনা, হার্ম্মোনিয়ম বাজান, বহি পড়ার এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াইবারও সময় নিরূপিত থাকিবে।

(৭) অন্তর্ব্বাটীর ভোজনে বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন, এবং গৃহস্বামিনী স্বয়ং অথবা স্থলবিশেষে অপর কেহ কথা-প্রসঙ্গে বলিবেন কে কোন্ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছে।

(৮) গৃহিণী দেখিবেন যেন খাওয়া হইয়া গেলেই স্থান পরিষ্কৃত হয়, পাতে যাহা পড়িয়া থাকে তাহা লইয়া কাকে ডুবাডবি না করে, এবং যাহারা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে তাহারা উহা লইয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য একটী কথা আছে। আমি যে ভাবে গৃহকার্য্যের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি, সে ভাবে চলিতে গেলে একটী দূরদর্শী শাসন কর্ত্তার ন্যায় কিছু কঠোর হইয়া চলিতে হয়। তোমার অর্থাগম এরূপ যে, তুমি বিনা ক্লেশে দুই চারিটা অধিক চাকর চাকরাণী এবং দুই একটা অতিরিক্ত পাচক পাচিকা রাখিতে পার। হয় ত, তোমার ঘোড়া গাড়ী আছে, তাহাতে সহিস, কোচম্যান, ঘেষেড়া প্রভৃতি বেতনভোগী নিযুক্ত রহিয়াছে। এ সকল সত্ত্বেও বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করাইলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। সেই অসন্তোষ নিবারণের উপায়, তাঁহাদিগের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াই হইতে পারে, কতকটা তুমি নিজে কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ নিয়ত নির্ব্বাহ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেও হইতে পারে, কতকটা বেতনভোগীর সংখ্যা অল্প করাতে যে টাকা বাঁচিবে সেই টাকা ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে ব্যয় করিলে হইতে পারে. আর কতকটা ঐ টাকা হইতে উহাঁদিগের অলঙ্কারাদি পুরস্কার প্রদানের দ্বারাও হইতে পারে। সকল বাটীতে ইহার সকল উপায় খাটিবে না। যে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের যেমন শীল এবং শিক্ষা, সে বাটীতে ইহার কোন উপায় অধিক, কোনটী অল্প কার্য্যকারী হইবে, এবং কোনটি বা অকিঞ্চিৎকর হইবে। শেষের উপায়টি সর্ব্বনিকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার একটী গুণ আছে—উহা অতি সত্বরে প্রতিবেশিনীদিগের মনে লাগিবে এবং তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাটীতেও তোমার বাটীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

——•(•)•——
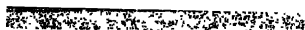
অষ্টত্রিংশ প্রবন্ধ।

কাজ করা।

অনেক কালের কথা মনে হইল—আমার সমাধ্যায়ী কোন ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন—"ও হে! যদি সত্য সত্যই ভাল করিয়া ইংরাজি শিখিতে চাও, তবে, আমি যেমন করিয়াছি তেমনি কর—ইংরাজি পড়, ইংরাজি লেখ, ইংরাজিতে কথা কহ, ইংরাজিতে চিন্তা কর এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতেও শিখ।" যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তিনি, আমিরা যে শ্রেণীতে পড়িতাম, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। আমি ইংরাজি বহি পড়িতাম এবং ইংরাজিতেই পত্রাদি লিখিতাম বটে, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অপর কাহার সহিত, ইংরাজিতে কথা কহিতাম না। আর ইংরাজিতে চিন্তা করিবার নিমিত্ত ত কখনই চেষ্টা করি নাই—প্রত্যুত যদি চিন্তাকালীন পাপড়ি ভাঙ্গা ইংরাজি গৎ মনে হইতেছে জানিতে পারিতাম—তৎক্ষণাৎ নিজ মাতৃভাষায় সেই ভাবগুলির পুনরালোচনা করিয়া বুঝিতাম, ভাবগুলি যথাযথ কি না। এইরূপ করায় ইংরাজিতে চিন্তা করা এবং ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখা আমার ভাগ্যে কখনই ঘটে নাই।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজকর্ম্ম ইংরাজিতেই করিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ইংরাজিতে চিন্তন অভ্যাস না করায় ইংরাজি লেখায় আমার বড়ই কষ্টানুভব হইত, এবং যাহা ইংরাজিতে লিখিলাম তাহা বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহাতে অনর্থক শব্দবিন্যাস রহিল কি না, কোন কথা যেরূপে লিখিলাম সেই কথা তদপেক্ষা সংক্ষেপে এবং বিশদরূপে লেখা যায় কি না, এই সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া দেখিতে হইত—সুতরাং ইংরাজি লেখা আমার তেমন শীঘ্র সরিত না। অন্যে, এমন কি আমা হইতে যাঁহারা অল্প ইংরাজি জানেন তাঁহারাও যত শীঘ্র ইংরাজি লিখিয়া যাইতে পারেন, আমি কখনই তাহা পারি নাই। ইংরাজি লিখিতে আমার বিলম্ব হয়, এবং কাগজে অনেক কাটা কুট হয়।

কিন্তু আমাকে অনেক কাজ কর্ম্মই ইংরাজীতে করিতে হইয়াছে, অনেক বড় বড় চিঠি এবং রিপোর্ট ইংরাজিতে লিখিতে হইয়াছে, প্রতিদিন গড়ে ৫০।৬০ খানি পত্রের জবাব ইংরাজীতে দিতে হইয়াছে, এবং অন্যের লিখিত ইংরাজির দোষ সংশোধন করিয়া অনেক স্থলেই লইতে হইয়াছে। কিন্তু আমি শীঘ্র শীঘ্র ইংরাজী লিখিতে পারি না। ইংরাজিতে চিন্তা করিবার অনভ্যাস রূপ মহৎ অন্তরায় সত্ত্বেও যেমনরূপে ঐ সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম, এবং ঐ সকল কাজ ভাল করিয়াছি বলিয়া প্রশংসা লাভও করিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে অপর একটী কথা বলিয়া রাখি। আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যিনি যখন আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, যতই কেন কাজ হাতে থাকুক না, আমি নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাদের সহিত বসিয়া বাক্যালাপ করিতাম। অনেক কাজ পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্কতা বা চাঞ্চল্যপ্রদর্শন করিতাম না। তাঁহাদের কাহাকেও পাইলে কাজ কর্ম্ম একেবারে ভুলিয়া গিয়া আলাপ করিতাম। তাঁহারা জানিতেন, এত কাজ থাকিতেও যে ওরূপে সময়াতিপাত করিতে পারি তাহার কারণ কার্য্যে লঘুহস্ততা।

ফলকথা, তাহা নহে। আদৌ কোন বিষয়েই আমার ক্ষিপ্রকারিতা গুণ নাই। ক্রমে বহুকালের অভ্যাস বশতঃ কোন কোন বিষয়ে একটু লঘুহস্ততা জন্মিয়াছে বটে—কিন্তু সে সামান্য বিষয়ে এবং অতি সামান্য মাত্রায় এবং ইংরাজি লেখায় কিছুমাত্র নহে।

তবে ইংরাজিতে এত কাজ কেমন করিয়া করিতাম? কাজে অনেক সময় দিতাম। এত সময় কোথা হইতে পাইতাম? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি।

কিন্তু সে কথাও বলিবার পূর্ব্বে আর কয়েকটি কথা বলিয়া রাখি। আমি কাজ কর্ম্মে বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। আমি কখনই মনে করিতাম না যে পরের কাজ করিতেছি। যাহা করিতেছি, তাহা আপনারই কার্য্য। কৈফিয়ৎ দিতে হইলে পাছে পরের কাজ বোধ হইয়া যায় এবং আনন্দের ত্রুটি হয়, এইজন্য যাহাতে কৈফিয়ৎ দিতে না হয়, এমন করিয়াই

কাজ করিতাম। ইংরাজ মনিবের কাছে কাজ করিয়া মনের এই ভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন। উঁহারা প্রায়ই দেশীয় লোকের মনের তাদৃশ ভাব রক্ষা করিতে দেন না। এতই মনিবানা ফলান যে, কাজটী তাঁহাদিগের, আমরা তাঁহাদিগেরই অনুজ্ঞাপালক চাকর মাত্র এই ভাবটী ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে ঐ বিষয়ে সাবধান হইতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই হউক, অথবা শুভাদৃষ্ট বশতঃই হউক, আমি কখন ঐরূপ দুর্ভাগ্যে পড়ি নাই। আমার কাজ চিরকালই আমার নিজের কাজ এবং স্বদেশের কাজ ছিল।"

আর একটী কথা এই। বাল্যকাল হইতে আমার সংস্কার যে, ভোগে প্রকৃত সুখ নাই কর্ম্ম সম্পাদন করাতে সুখ। কেমন করিয়া এই সংস্কার হইয়াছি। তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র মনে পড়ে, পিতৃঠাকুর আমার পাঠগৃহে সর্ব্বদা লিখিতেন 'ধ্যানমধ্যয়নং তপঃ" আর আমার বাপ্জির পর, [illegible] হইলে প্রতি প্রত্যূষে অন্ততঃ একবার করিয়া শুনাইতেন "যৎ করোমি জগন্মাত স্তদা তব পূজনং" আমার দৃঢ় বিশ্বাসও এই, একাগ্রচিত্তে কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করাই প্রকৃত পূজা। এখন কাজ করিবার নিমিত্ত আমার সময় সংগ্রহ কিরূপে হইত তাহা বলি।

(১) আমি দ্রব্যাদি সমস্ত এবং কাগজপত্রাদি বেশ গুছাইয়া রাখিতে জানি—কাগজটা, কলমটী, কালির দোয়াতটা এবং যে সকল পত্রের উত্তর লিখিতে হইবে সে গুলি যথাস্থানেই থাকে—ও গুলি খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার সময় যায় না।

(২ আমি ইংরাজি পুস্তকাদিতে যাহা যাহা পড়িতাম, মনে মনে তাহা মাতৃভাষায় অনুবাদ না করিয়া ছাড়িতাম না। সুতরাং কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করা বিধেয়, তাহার অনেকটা আমার স্থির থাকিত। অভিমত স্থির করিবার নিমিত্ত আমার অল্প সময়ই যাইত। কয়েকখানি পুস্তক ভিন্ন, ইংরাজী বহিগুলিতে এত শব্দের আধিক্য এবং পৌনরুক্ত্যের বাহুল্য যে, মাতৃভাষায় তাহাদিগের মানসিক অনুবাদ করা নিতান্ত আবশ্যক, এইরূপে একবার ঝাড়িয়া না লইলে তুঁষের ভাগ অধিক এবং তণ্ডুলের

ভাগ নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। ফলতঃ মাতৃভাষায় অনুবাদরূপ সূর্প দ্বারা ইংরাজি গ্রন্থগুলিকে ঝাড়িয়া লইবার পরামর্শ আমি সকল ইংরাজী পাঠককেই দিতেছি।

(৩) আমি কখনই ইংরাজির শব্দবিন্যাস-পারিপাট্য লিখিবার জন্য ভাল ভাল ইংরাজী শব্দ বা ইংরাজি গৎ অভ্যাস করি নাই। ইহাতে উপকার কি অপকার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তবে ইংরাজি শব্দ-বিন্যাসের উপর কিছুমাত্র নেসা না থাকায় কাজের সময়, অর্থাৎ পত্রাদি লিখিবার সময়, শব্দ খুঁজিতে আমার অল্প সময়ই যাইত, এ কথা বলিতে পারি।

উপরের (২) এবং (৩) চিহ্নিত কথাগুলির দ্বারা আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয়ে কি বলিতে বা করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পক্ষে অভ্যস্ত ইংরাজি শব্দ এবং ইংরাজি গৎরূপ যে বিষম অন্তরায় আছে আমার সে অন্তরায় ছিল না, এবং সেই জন্য মতলব স্থির করিতে অল্প সময়ই যাইত। কেমন করিয়া মতলবটী প্রকাশ করিব—ইহা লইয়াই যত কষ্ট এবং যত মারামারি। সেই মারামারি করিবার সময়, অনেকটা নিদ্রা হইতে কতকটা ভোজন হইতে এবং এক আধটুকু পরিজনদিগের সহিত আলাপের কাল হইতে, সংগ্রহ করিতাম। তদ্ভিন্ন, আমাকে ত ঘরের কোন খুটি নাটি লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, সে জন্যও অনেকটা সময় পাইতাম। এইরূপে সময়ের সংগ্রহ করিয়া ধীরে সুস্থে বসিয়া আস্তে আস্তে ইংরাজী লিখিতাম—কি লিখিতাম তাহা মনে মনে আর একজন হইয়া, প্রায়ই নিজের প্রতিপক্ষ পক্ষ হইয়া, পড়িতাম। সেই কল্পিত প্রতিপক্ষের চক্ষু দিয়া ভুল ধরিতাম—আপনার চক্ষু দিয়া ভুল সুধরাইতাম—যথেষ্ট কাটকুট হইত—কোন কোন পত্রাদি ফিরাইয়া ফিরাইয়া দুই তিন বার করিয়া লিখিতে হইত।

একবার কোন সুদূর স্থানে গিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া দেখিলাম, অনেকগুলি কাগজপত্র জমা হইয়া আছে। ওমনি কাগজগুলি লইয়া বসিলাম। পড়িতে পড়িতে যেগুলির জবাব তদ্দণ্ডে দেওয়া যাইতে পারে বোধ হইল, সেগুলির একটী স্বতন্ত্র তাড়া করিলাম, যেগুলির উত্তর বিশেষ

ভাবিয়া অথবা অন্য কাগজ পত্র দেখিয়া দিতে হইবে বোধ হইল, তাহার দ্বিতীয় তাড়াবন্দি করিলাম। প্রথম গুলির উত্তর লিখিলাম। যতক্ষণ সে কাজটী শেষ না হইল, ততক্ষণ উঠিলাম না। "অনেক বেলা হইয়াছে —খাওয়া দাওয়ার পর কাগজ পত্র লইয়া বসিলেই ভাল হয়।" "তা ত হয় কিন্তু ঐ কাগজের মোট বিদায় না হইলে ত খাইতে বসিয়াও কোন সুখ হইবে না"—বাটীর ভিতরে এরূপ কথোপকথন প্রায়ই শুনিতে পাইতাম।

"আজি বিকালে অমুকের আসিবার সম্ভাবনা আছে; কতকটা কাজ বাকি রহিয়াছে, না সারিয়া রাখিলে কথোপকথনের সুখোপভোগ হইবে না; তোমারও যদি কোন কাজ বাকি থাকে তাহা এই সময়ে সারিয়া লও।" * * "রাত দুপুরে বসে ও কি হচ্চে?—খাওয়া নাই, ঘুম নাই— অসুখ করিবে।" "না অসুখ হবে না, আমি ত একবার ঘুমাইয়াছিলাম। আর এইটা না লিখিলেই নয়—কালি না পাঠাইতে পারিলে"—"কি হবে?" "একটু বাহাদুরির ক্রটি"—"হউক গে"! সে রাত্রিতে কিছুই লেখা হইল না সত্য, কিন্তু অন্যান্য রাত্রিতে হইত।

—:*::*: —

ঊনচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—(*)—

একান্নবর্ত্তিতা।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং বিহার প্রদেশে মিতাক্ষরানুযায়ী এবং বাঙ্গালায় দায়ভাগানুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত। মিতাক্ষরায় এবং দায়ভাগে একটী অতি গুরুতর বিষয় লইয়াই মতভেদ আছে। মিতাক্ষরায় পৈতৃক ধন সম্পত্তিতে জাতাজাত সমস্ত সন্তান সন্ততির এক এক প্রকার স্বত্ব স্বীকৃত হয়। দায়ভাগে ওরূপ স্বত্ব স্বীকৃত হয় না—দায়ভাগের মতে ধনসম্পত্তিতে পিতারই নিব্যূঢ় স্বত্ব—তিনি স্বেচ্ছাতঃ উহার দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ব্যবহারিক স্মৃতিশাস্ত্র দুইটীতে এরূপ প্রভেদ কি জন্য জন্মিয়াছে, তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত কোন একটী মীমাংসা করিতে পারা যায় না। তবে মোটামুটি এরূপ বলা যাইতে পারে যে, বাণিজ্যবৃত্তির বাহুল্যে ধন সম্পত্তির বিভাগানুকূল ব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে, এবং বাঙ্গালা প্রদেশে সুনাব্য নদী সকলের প্রাচুর্য্যবশতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং বেহার প্রদেশ অপেক্ষায় এখানে বহুকাল হইতে বণিক্‌বৃত্তির অধিক সুবিধা এবং প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিয়াছে। আজি কালি এ দেশের সমস্ত ব্যবসায় ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইয়া গেলেও ও সকল প্রদেশের অপেক্ষা বাঙ্গালায় বণিকবৃত্তি পরায়ণ দেশীয় লোকের সংখ্যা অধিক। এই তথ্যের সহিত আমাদিগের দায়ভাগের ব্যবস্থার, কার্য্য-কারণরূপ কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বাঙ্গালীর ব্যবস্থাশাস্ত্র ঐরূপ হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের সুবিধা হইয়াছে এবং তাহা হওয়াতে ভাই ভাই পৃথগন্ন হইবারও প্রথা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে অধিক প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যেও পৃথগন্ন হওয়ায় যে লোক-নিন্দা না হয় এমত নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে এবং বিহারে উহার যত নিন্দা এবং অন্তরায়, বাঙ্গালায় তত নয়। বস্তুতঃ দায়ভাগকার মনুসংহিতার একটী বচন * ধরিয়া অতি স্পষ্টাক্ষরেই

* এবং সহবসেয়ুর্ব্বা পৃথগ্ বা ধর্ম্মকাম্যয়া।
পৃথগ্ বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ ক্রিয়া॥

পৃথগন্ন হইয়া থাকিবার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের এই একপ্রকার প্রশংসারূপ উত্তেজনা সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা পৃথগন্ন হইতে ইচ্ছা করেন না, এবং পৃথগন্নবর্ত্তী পরিবারের নিন্দা করিয়া থাকেন। এরূপ হইবার কারণ—আর যাহাই থাকুক, এতদ্দেশীয় জনগণের দারিদ্র্য দশা যে একটি তাহার মধ্যে মুখ্য, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ হয় না। যদি বাঙ্গালীদের প্রতি পরিবারে একজনমাত্র কৃতী এবং উপায়ক্ষম না হইয়া অনেকেই কৃতী এবং উপায়ক্ষম হইত, তাহাহইলে পৃথগন্ন হইয়া থাকিতে কষ্ট অল্প হইত, দায়ভাগকার যেরূপ কহিয়াছেন সেরূপ ধর্ম্ম্য কার্য্যেরও আধিক্য হইত, এবং পৃথগন্নবর্ত্তিতা, পরিবারের সম্পত্তিশালিতা এবং বলবত্তার পরিচায়ক বলিয়া নিন্দনীয় না হইয়া বিশেষ প্রশংসার যোগ্য বলিয়াই পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ পৈতৃক ধনবিভাগের সৌকর্য্য, সকল ভাইগুলির কিছু কিছু উপার্জ্জনক্ষমতা, তাঁহাদিগের পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার অধিকার—এগুলি দেশের মঙ্গল এবং উন্নতির পক্ষে অতীব প্রার্থনীয়। এই সকল ভাবিয়া আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকে পৃথগন্নবর্ত্তিতার নিন্দা না করিয়া বরং তাহার প্রশংসাই করিতে শিখে।

কিন্তু একান্নবর্ত্তিতারও অনেকটা গুণ আছে। কৃষিপ্রধান দেশে এবং দরিদ্রতার বাহুল্যে যে, একান্নবর্ত্তিতার একান্ত প্রয়োজন এবং অবশ্যম্ভাবিতা আছে, সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়াও, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অনেকানেক ধর্ম্মভাবের বিশেষ উন্মেষ এবং সংরক্ষণ হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রধানের নিকট বশ্যতা অতি বড় গুণ। ইহা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষিত হয়। পরার্থে নিজের উপার্জ্জিত ধনাংশের নিয়োগে যে স্বার্থসঙ্কোচের অভ্যাস হয়, সেটীও সামান্য গুণ নহে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে এই গুণটীরও অভ্যাস হয়। ফলতঃ বশ্যতা, ত্যাগশীলতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি অনেকানেক মূল ধর্ম্মের শিক্ষা একান্নবর্ত্তিতার ফল, এবং ঐ সকল ফল জন্মে বলিয়াই আমাদিগের দেশে উহার একটা প্রশংসা হইয়া আসিয়াছে।

ঐ প্রশংসার অভ্যন্তরে আরও একটী প্রবল কারণ থাকিতে পারে। এ দেশে পরিবার সমস্ত একান্নবর্ত্তী বলিয়া লাইফ ইনসুর‍্যান্স বা জীবন-

কীবার প্রয়োজন নাই। 'পুরর ল' বা দরিদ্র পালন আইনেরও আবশ্যকতা হয় নাই। অথবা এরূপেও বলা যায় যে ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত ঐ সকল ব্যবস্থার অভাবে এদেশে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার না থাকিত তবে দুঃখ কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। পরিবার-সমস্তের একান্নবর্ত্তিতা এদেশে উল্লিখিত ব্যবস্থা সকলের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সংসাধিত করিয়া দেয়।

তবেই দেখা গেল যে, পৃথগন্নবর্ত্তিতার শুভ ফল কতকগুলি এবং একান্নবর্ত্তিতারও শুভ ফল অপর কতকগুলি। উভয় প্রকার শুভ ফলের একত্র সমাবেশ করিতে পারিলেই ভাল হয়। এবং আমার বোধে যদি বিজাতীয় রীতি নীতির প্রাদুর্ভাব বশতঃ আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্মভাবের ত্রুটি না হয়, তবে উল্লিখিত দ্বিবিধ শুভ ফলের একত্র সমাবেশ হইতে পারে। বিশেষতঃ যখন দেশ এত দরিদ্র এবং দেশের জনগণও একান্ন-বর্ত্তিতার পক্ষপাতী তখন জাতীয় ধর্ম্মভাবের সংরক্ষণপূর্ব্বক একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকাই বিধের বলিয়া বোধ হয়। যেরূপে একান্নবর্ত্তিতা রক্ষা করা যাইতে পারে, এবং তাহার অশুভ ফল অধিক পরিমাণে প্রসূত না হইয়া শুভ ফলই অধিক হয়, তাহার উপায়—

প্রথমতঃ—সুস্থকায় ব্যক্তিমাত্রেরই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত। একজনকে অপর একজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে নাই।

দ্বিতীয়তঃ—আপনাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বাটীর কর্ত্তা করিয়া মান্য করা এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী হইয়া চলা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—যাহা কর্ত্তৃক যাহা উপার্জ্জিত হইবে, তৎ সমুদায় কর্ত্তার হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ—কর্ত্তার উচিত (১) সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করা। (২) খরচ পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব রাখা। (৩) সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হওয়া।

এই নিয়মগুলি যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইলেই ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিতে পারে। কিন্তু এক্ষণে কাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে আরও একটী নিয়ম রক্ষা করিলেই হয়। সে নিয়মটী—

পঞ্চমতঃ—পারিবারিক সমস্ত ব্যয় সমাধা করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে,

তাহা আয়ের অনুসারে ভ্রাতৃগণের নিজ নিজ বিশেষ সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাম, হরি এবং কৃষ্ণ তিন ভাই—রামের বার্ষিক আয় ৩ হাজার, হরির ৪ হাজার এবং কৃষ্ণের ২ হাজার, সর্ব্বশুদ্ধ ৯ হাজার। ইহাদিগের বাটীর বার্ষিক ব্যয় ৪ হাজার, সুতরাং ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ৫ হাজার। ঐ পাঁচ হাজারের মধ্যে—

(১) ৯: ৫:: ৩: ১৫/৯ = ১৬/৯ হাজার, রামের নিজ সম্পত্তি।

(২) ৯: ৫:: ৪: ২০/৯ = ২২/৯ হাজার, হরির নিজ সম্পত্তি।

(৩) ৯: ৫:: ২: ১০/৯ = ১১/৯ হাজার, কৃষ্ণের নিজ সম্পত্তি।

যে পরিবারে আর্য্যধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি মর্য্যাদা অধিক, সে পরিবারে উল্লিখিত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই সকল দিক বজায় থাকিবে—একান্নবর্ত্তিতার সমস্ত শুভফল ফলিবে, এবং পরবর্ত্তী পুরুষদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের স্থল অল্প হইবে।

কিন্তু একটী কথা আছে। এটী ধর্ম্মবুদ্ধির উপযোগী ব্যবস্থা। ইহাকে সম্যক্ রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে অপর একটী বিষয়ে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কোন ভাইয়ের উচিত নয় যে, আপনার আয় অন্যাপেক্ষায় নিতান্ত ন্যূন থাকিতে আপনার পরিবারের (স্ত্রী সন্তানাদির) সংখ্যা সম্বর্দ্ধিত অথবা নিজ খরচ পত্রের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেন। তাহা করিতে গেলেই তিনি নিজ ভার অন্যের উপর ক্ষেপণ করিয়া পরগ্রাহিতা দোষেই দূষিত হইলেন।

"আমাদের এই দরিদ্র দেশে কোন ব্যক্তিরই কুড়ে, অকর্ম্মণ্য এবং উপার্জ্জনে অক্ষম হওয়া উচিত নহে।" * * * "তবে যদি কেহ টাকা রোজগার করিতে না পারে সে কি মারা যাইবে?" * * * "তার মারা পড়িয়া কাজ নাই—কিন্তু সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়া অন্যের বোঝা ভারি করার তাহার অধিকার নাই।—ভিখারীকে ব্রহ্মচারী হইতে হয়।" * * * "তাই মনে করিয়াই কি যত দিন চাকরী না হইয়াছিল নিজ হাতে কাচা চেলা করিতে আর বাহিরে থাকিতে?" * * * "হতে পারে যে একটা কিছু মনে উঠিয়াছিল।"

চত্বারিংশ প্রবন্ধ।

অর্থ সঞ্চয়।

আমাদিগের দেশ বড়ই দরিদ্র। ইহা যে কত দরিদ্র, তাহা অনেকেই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারেন না। 'ঊনবিংশ শতাব্দী চলিতেছে' 'দেশের উন্নতি হইতেছে'—ইংরাজদিগের এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া কৃতবিদ্যেরা শুক পক্ষীর ন্যায় ঐ শব্দগুলির উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছেন। 'ঊনবিংশ শতাব্দী' ও ইংরাজের—'উন্নতি' ও ইংরাজের; ঐ সকল উক্তির সহিত তোমার আমার কোন সম্পর্ক নাই। যত কাল যায় সকল জাতীয়েরই উন্নতি হয়, ইতিহাস এমন কথা বলে না। যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালকের দেহ পুষ্ট হইতে থাকে বটে, কিন্তু বর্ষীয়ানদিগের তাহা হয় না—তেমনি ইংরাজের উন্নতি ঊনবিংশশতাব্দীতে হইতেছে বলিয়া আমাদিগেরও সে উন্নতি হইতেছে না—আমাদের অবনতিই হইতেছে।

সমাজের অবনতির চিহ্ন অনেকগুলি *—এবং সকলগুলিই দারিদ্র্যের সূচক, অতএব এক দারিদ্র্যকেই অবনতির লক্ষণ বলিয়া ধরা যায়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৮৮০ অব্দে ব্রিটন দ্বীপে প্রতি ব্যক্তির গড়ে বার্ষিক আয় ৩৩০, ফ্রান্সে ২৯০ পোর্টুগালে ৮০, তুরস্কে ৪০, এবং ভারতবর্ষে ২৭ টাকা বই নয়। ঐ সকল দেশের মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধেই এমন কথা কেহ বলেন না যে, সেখানকার লোকেরা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, এখানকার পাঁচ কোটী লোক, অর্থাৎ সমস্ত জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ অর্দ্ধাশনে কালাতিপাত করে।

এই বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন দেশে দানধর্ম্মের বড়ই সমাদর। এখানকার লোকেরা যেন শুষ্ককণ্ঠ চাতকপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বিন্দুপাতের [illegible]আশা করিয়া থাকে এবং কথঞ্চিৎ কোথা হইতে কণামাত্র প্রাপ্ত হইলেই

---

* [illegible]

[illegible]

আনন্দ কোলাহল করিয়া উঠে। এ দেশে দান ধর্ম্মের যে এতটা প্রশংসা, তাহার কতকটা ঐ চাতক পক্ষীদের সহর্ষ কল কল ধ্বনি।

কিন্তু সকলই তাহাই নয়। এতদ্দেশীয় জনগণের প্রগাঢ় ধর্ম্মভাবও ঐ প্রশংসার কতক কারণ। এদেশের লোকের হৃদয়ে পরকালে শ্রদ্ধা এত দৃঢ় যে, ইহারা ইহলৌকিক কার্য্যকলাপকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরই জ্ঞান করিয়া থাকেন। পৃথিবী ত চিরকালের বাসভূমি নয়—সাংসারিক দুঃখ সুখ ত অধিক কাল স্থায়ী হয় না—অতএব পার্থিব বিভব সঞ্চয় করিতে গিয়া অনর্থ কষ্ট পাইবার আবশ্যক কি, যদি কাহারও দান করিবার ক্ষমতা হইয়া থাকে, সে হাতের সুখে এবং মনের আনন্দে দান করিয়া লউক; লোকে যশ গাহিবে, পরকালেও দিব্য গতি হইবে, যকের ন্যায় টাকার পুঁটুলি চৌকী দিয়া কি জন্য থাকিব? চক্ষু মুদিলে ত কেহ কাহার নয়—কোথায় বা পুত্র—কোথায় বা কলত্র!

তবে কি আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ মমতা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ন্যূন? তাহা ত কোন ক্রমেই নহে। তবে সেই স্নেহ মমতা বিবেচনার দোষে পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকারী হইতে পায় না। যেমন "লাইফ ইনস্যুর" করা থাকিলে, কাহার কাহার মিতব্যয়িতা কমিয়া যায়, সম্মিলিত পরিবারের মধ্যে বাসনিবন্ধন আমাদিগেরও এক প্রকার "লাইফ ইনস্যুর" হইয়া থাকে, এবং আমরা খরচপত্রের তত আঁটা আঁটি করিয়া চলিতে শিখি না। যদি মরে যাই, রোজগারী দাদা অথবা ভাই আছেন, অবশ্যই আমার কন্যাদের বিবাহ, আমার পুত্রদিগের শিক্ষা এবং আমার পরিবারের ভাত কাপড় দিবেন। এই ভাবটী কোথাও পরিস্ফুট, কোথাও অপরিস্ফুটরূপে আমাদিগের অনেকেরই মনে থাকে। এই জন্য কন্যা পুত্র কলত্রাদির প্রতি সমূহ স্নেহবান্ হইয়াও এতদ্দেশীয় জনগণের পক্ষে সঞ্চয়শীলতা অপেক্ষা ব্যয়শীলতাই সমধিক প্রশংসার বস্তু হইয়াছে। সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থাতে স্ত্রী পুত্রাদির মোটা ভাত কাপড়ের ঠিকানা রহিল—শাস্ত্রের শাসন স্থূল দৃষ্টিতে, ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রতি অধিকতর আস্থা জন্মাইয়া দিল, এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ব্রাহ্মণদিগের দানধর্ম্মের প্রতি উত্তেজনা করিতে লাগিল, এই সমুদয়

কারণে আর্য্যসন্তান অপরাপর জাতি সমূহ অপেক্ষা অধিক ইন্দ্রিয় সংযম-শীল, আসব ব্যবহার বিবর্জ্জিত, শান্তস্বভাব এবং পরিণামদর্শী হইয়াও ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়শীলতা গুণ পরিহার করিতেছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ বহু বৎসর ধরিয়া ৪।৫ শত টাকা মাহিনা পাইয়াও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণের জন্য চাঁদার বহি বাহির হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, কোন আয়বান ব্যক্তি একখানি প্রকাণ্ড বসতবাটীর কতকদূর প্রস্তুত করিয়া মৃত হইলে তাঁহার ছেলেদিগকে ঐ বাটীর ইট কাঠ বেচিয়া খাইতে হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, খুব সচ্ছল পুরুষ মারা গেলেন, অমনি দেনার দায়ে তাঁহার ঘটী, বাটী, স্ত্রীর খোঁপা বাঁধিবার দড়ি গাছিটী পর্য্যন্ত, নিলামে উঠে। এই জন্যই প্রশংসা-বাদ শুনিতে পাই—"অমুকের অত আয়, কিন্তু সঞ্চয় এক কড়াও নাই"—"অমুক স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াও দান করিয়া থাকেন"—"অমুক যাহা পান, তাহাই খরচ করিয়া ফেলেন—বলেন ছেলেদের জন্য কিছু না রাখাই ভাল; ধনবানের পুত্রেরা প্রায়ই মন্দলোক এবং অকর্ম্মণ্য লোক হয়।"

আমার বিবেচনায় অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের মঙ্গলকর নহে, যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থ ধর্ম্মের অনু-কূলাচরণ নহে, এবং সম্মিলিত পারিবারিক প্রণালীর প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধের সূচক নহে।

দানধর্ম্মের প্রশংসায় যদি অমিতব্যয়িতা বাড়িয়া যায়, তবে দান করিতে সক্ষম এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই ন্যূন হইয়া যায়; আত্মসংযম, ভবিষ্য-দর্শন, উপায়োদ্ভাবন প্রভৃতি অনেকানেক উন্নত শক্তির খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। কৃপণদিগের অনেক দুঃখ এবং অনেক দোষ ঘটে। কিন্তু তাহারা প্রায়ই সংযতাচারী, অবিলাসী এবং বাক্‌নিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে খরচে লোকেরা প্রায়ই বিলাসী এবং অনেক স্থলে অনৃতবাদী হইয়া পড়ে। যে সমাজে শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন, তাহাতে কৃপণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, খরচে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল নয়। এতদ্দেশীয় যতগুলি [illegible] জাতি জানি তাহার মধ্যে মাড়ওয়ারী বৈশ্যদিগের প্রায়শই ধনি

প্রতীয়মান হয়। উহারা সচরাচর অতি দীন দরিদ্রের ... —উহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও স্বহস্তে সকল গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে। উহাদিগের মধ্যে মোটা কাপড় পরিতে, জলে ভিজিতে, পায়ে চলিতে, ক্রোড়পতিরও অপমান নাই। উহারা যে ব্যবসায়ে হাত দেয়, তাহাতেই সফলতা লাভ করে। উহারা সহজে কেহ কিছু চাহিলে দেয় না। কিন্তু এমন মাড়বারী বণিক্ নাই বলিলেই হয়, যাঁহার সহায়তাবলে আর দুই তিনটী মাড়বারী নিরন্ন দশা হইতে উত্থিত হইয়া সচ্ছল অবস্থাপন্ন না হইয়াছে। ইহাঁরা দানধর্ম্ম এবং সঞ্চয়শীলতা দুইটীই শিখাইতে জানেন, ইহাঁদের ঘরে লক্ষ্মী পুরুষানুক্রমে থাকেন তবে আজি কালি দেখিতে পাই যে, উহাঁদিগের মধ্যেও সংসর্গ দোষ সংক্রামিত হইয়া কোন কোন মাড়বারী বণিকের পুত্র বিলাসী, অমিতাচারী এবং লক্ষ্মীছাড়া হইতেছে।

গৃহস্থকে যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়, এ কথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ দার্শনিক বেকন্ বলিয়াছেন, যত আয় হইবে, তাহার অর্দ্ধেক সঞ্চয় করিবে। ইংরাজ জাতীয়েরা খুব উন্নতিশীল। উহাদের প্রাচীন দার্শনিক যে বিধি দিয়া গিয়াছেন নব্য ইংরাজেরা তাহা অপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। এ দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর প্রভৃতি কোন কোন ইংরাজ এমনি সঞ্চয়শীল যে, তাঁহাদের মাসিক বেতন ২।৩ হাজার টাকা হইতে ১ শত, ১।০ শত, —বড় জোর ২ শত মাত্র—খরচ করেন। আমি স্বদেশীয়দিগকে অনুকরণ করিতে বলি না। আমি স্বদেশীয়দিগকে বলি, তোমাদের শাস্ত্রে যাহা বলিয়াছে, তোমরা সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন * ভবিষ্যৎ কালের জন্য আয়ের সিকি রাখিবে, অর্দ্ধেকে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ করিবে, আর এক আনা ধার দিয়া সুদে

* পাদেন তস্য পারত্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা॥
পাদঞ্চার্দ্ধার্দ্ধমর্থস্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুংসঃ স্বার্থঃ সাফল্যমৃচ্ছতি॥

রাখিবে। ভগবান মনু বলিয়াছেন,† তিন বৎসর খরচের যোগ্য অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিনদিনের যোগ্য, অন্ততঃ এক দিনের যোগ্য খাদ্য সঞ্চয় করিবে। বাস্তবিক সকল লোকের পক্ষে সম পরিমাণ সঞ্চয় সম্ভবে না। যে ব্যক্তির আয় প্রতি পলে ১০ টাকা (যথা [illegible]) তাহার প্রতিদিন খরচ ৫ টাকা হয় না—তাহার সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক হয়। যে কমিশনর সাহেবের বেতন ত্রিশ দিনে তিন হাজার টাকা তাঁহার দৈনিক আয় ১০০ টাকা, খরচ বড় জোর ৬।৭ টাকা মাত্র; সুতরাং সঞ্চয় অর্দ্ধেকের অনেক বেশী হয়। কিন্তু এক জন মুন্সেফ, কি ডেপুটী, কি মাষ্টার যাঁহার বেতন তিন শত টাকা, তাঁহার কাচ্চা বাচ্চা এত তাঁহার উপর জ্ঞাতি কুটুম্বের ভার এত এবং তাঁহার বাসা খরচ এবং ঘর খরচ দুয়ে মিলিয়ে এত যে, তিনি কোনমতেই তিন শতের ভিতর হইতে দুই শত খরচ না করিয়া চালাইতে পারেন না—১০।২৫ টাকার সামান্য মুহুরি [illegible] আপনার পরিজনের মোটা ভাত কাপড়ের [illegible] তিনি ত্রিশ টাকা আয় হইতে অর্দ্ধেক বা সিকি কোথা হইতে বাঁচাইবে? তাহার পর ধর দোকানদার এবং কারিগর, উহাদের আয় ১০।১৫ টাকা, তাহা হইতে খরচ পত্র করিয়া কত বাঁচাইবে?—আর যাহারা মজুরদার তাহাদিগের ত দিনের আয় হইতে দিনেই সঙ্কুলান হয় না। অতএব যত আয় হইবে তাহার অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ বা সিকি বাঁচাইবে বলিয়া যে উপদেশ, তাহা জন সাধারণের প্রতি খাটে না। এই জন্যই বোধ হয়, মনুসংহিতায় এরূপ কোন নিয়ম বলিয়া দেওয়া হয় নাই—কেহ বা তিন বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিবে; কেহ বা এক দিনের [illegible] উপযুক্ত সঞ্চয় করিবে। আমিও তাহাই বলি—সকলকেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে; যে দিন আনে, সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে; যে মাসে আনে সে প্রতি মাসে সঞ্চয় করিবে; যে বর্ষে আনে, সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর একটী নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে,

---

† কুশূল ধান্যকো বাস্যাৎ, কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা॥

খরচের শেষ ভাগে নয়। মনে কর, তুমি আজ দুই সের চাউল মজুরি পাইয়াছ; উহা হইতে কিছুই রাখিতে পার না, রান্না হইলে সকল তণ্ডুলগুলি ফুরাইয়া যাইতে পারে। তবু এক মুঠা চাউল ঐ কর্লসিটাতে রাখিয়া দাও—বাকী চাউল রন্ধন হউক। আর তুমি মাসে দশটী টাকা পাও, খরচে কুলায় না; তবু দুই আনা পয়সা কোন মহাজনের কাছে গচ্ছিতরূপে কিম্বা সেবিংবেংকে রাখিয়া বাকী হইতে খরচ চালাও। এইরূপে যে যাহা রাখিতে পারিবে, তাহা আগেই রাখিয়া দিবে। আর একটী নিয়ম আছে। যাহা সঞ্চিত হইল পার্য্যমাণে তাহা ভাঙ্গিয়া খরচ করিও না। সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উটী কাহার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ, তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে—তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতেও উহাদের অংশ আছে। তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে। এই জন্য ধর্ম্মশীল ব্যক্তির চক্ষে সম্মিলিত পরিবারের অবস্থা অমিতব্যয়িতার প্রতিকূলরূপেই প্রতীত হয়।

সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গৃহস্থলোকের পক্ষে নিম্নবর্ত্তী নিয়ম কয়েকটী যত্নপূর্ব্বক পালনীয়—

(১) সকলকেই কিছু সঞ্চয় করিতে হয়।

(২) সঞ্চয় করা খরচের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য, খরচের পরে নয়।

(৩) সঞ্চিত ধন হইতে সহজে খরচ করিতে নাই।

(৪) যে দ্রব্যে প্রয়োজন নাই এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

(৫) যাহা ক্রয় করিবে তাহা নগদ মূল্য দিয়া কিনিবে, ধারে কিনিবে না।

(৬) আয় ব্যয়ের একটী হিসাব নিজ হাতেই রাখিবে।

একচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

———•(•)•———

চিনিতে পারিলেন না।

আমার সমাধ্যায়িদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয় অধিক পরিমাণে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিতেন। রাজারাম যে ইতিহাস গ্রন্থখানি একবার পড়িত, তাহার বর্ণিত ঘটনাবলীর তারিখগুলি প্রায় সকলই তাহার মনে থাকিত—মধুসূদন যে বহি পড়িত, তাহার ভাল ভাল পদবিন্যাস কখনই ভুলিত না—বঙ্কবিহারী যাহা পড়িত, তাহার যেন একখানি ছবি আপনার মনে উঠাইয়া লইত—পুস্তকের কেমন স্থানে কোন কথা আছে তাহা বেশ বলিতে পারিত, এবং কোথায় কিরূপে কোন ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল তাহাও অবিকল বর্ণন করিতে পারিত। এরূপ দেখিয়া তখন মনে করিতাম যে, যাহার যে দিকে অভিরুচি, তাহার স্মৃতিশক্তি সেই দিকে বিশেষ কার্য্যকারিণী হয়। এখনও তাই মনে করি—কিন্তু একটু ভিন্নরূপে। এখন বিভিন্ন ব্যক্তির কি জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিরুচি জন্মে, তাহারও যেন একটা কারণ দেখিতে পাই বলিয়া বোধ হয়। এখন জানিয়াছি যে, চিন্তন মননাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা যেই হউক, তাহার কারণ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কমূল হইতে স্নায়ুরূপ শাখা সমস্ত নির্গত হইয়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয়স্বরূপ পত্র পুষ্প পরিণত হইয়া আছে। ঐ স্নায়ুরূপ শাখাগুলি যেটী যেমন পুষ্ট এবং সবল তাহার সীমান্ত দেশে স্থিত পত্র পুষ্পরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও তেমনি পুষ্ট বা সবল হয়। পক্ষান্তরে সবল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যেমন সুখের অনুভব হয়, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের পরিচালনায় তেমন সুখ বোধ হয় না। এই জন্য যাহার যে ইন্দ্রিয় অথবা ইন্দ্রিয়ের অবলম্বনরূপ স্নায়ু প্রবল, তাহার সেই স্নায়ুর কার্য্যে সুখানুভূতি অধিক—এবং তাহাতে অভিরুচি হয়। যাহার শ্রাবণস্নায়ু ভাল, শব্দ [illegible] তাহার কর্ণকে নীত হইয়া বিশেষ সুখকর ব্যাপার জন্মায়—যাহার [illegible] উত্তম, তাহার চক্ষুঃর দৃষ্ট বস্তুর যে প্রতিবিম্ব পড়ে,

মস্তিষ্কে তাহাঁর প্রতিবিম্বজাত কার্য্য বিশেষ সুখের হেতু হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই এইরূপ হয়। স্নায়ুগণের পুষ্টতার ইতরবিশেষ হইবার কারণ—অধিক পরিমাণেই পৈতৃক, এবং কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষাই ইতরবিশেষ। যাঁহার পিতার শ্রবণ স্নায়ু ভাল নয়, তাঁহার নিজেরও ঐ স্নায়ু ভাল না হইবার সম্ভাবনা—কিন্তু তিনি যদি ঐ স্নায়ুর বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যাদি শিক্ষা করেন, তবে পৈতৃক দোষ কতক শুধরাইয়া যায়, এবং হয় ত তাঁহার পুত্র অপেক্ষাকৃত সবল শ্রবণ স্নায়ু পাইয়া জন্মগ্রহণ করে। ফলতঃ এ বিষয়ে "পারব্ধ" এবং পুরুষকারের" এই মর্য্যাদা নিরূপিত হইয়া আছে, এবং শিক্ষার ফল চিরস্থায়ী হইতে পারে, ইহা প্রতিপন্ন হওয়াতে উৎকর্ষ লাভের পথও উন্মুক্ত রহিয়াছে।

এ কথা এই পর্য্যন্ত থাকুক। সকল লোকের সকল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় স্নায়ু সমান সবল হয় না, এবং এক ব্যক্তিরও সকল ইন্দ্রিয় এবং তন্মূলক স্নায়ু সমান হয় না। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বিষয়ে অভিরুচি, এবং এক ব্যক্তিরও কোন এক বিষয়ে যেমন অভিরুচি অন্য বিষয়ে তেমন নয়। কিন্তু এই কারণে যে শুদ্ধ অভিরুচিরই ভেদ হয়, তাহা নহে। মস্তিষ্কশক্তিরও যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্কশক্তির নামই স্মৃতি। এই জন্যই দেখা যায় যে, কেহ কোন বিষয় অধিক বা অল্প স্মরণ রাখিতে পারে।

চক্ষু, এবং ত্বক্ উভয় ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত কার্য্য দ্বারা দ্রব্যের আকৃতি জ্ঞান হয়। পরে শুদ্ধ চক্ষুদ্বারাও উহা হইয়া থাকে। চক্ষুস্নায়ুর মূলে যে মস্তক ভাগ আছে, তাহার দ্বারাই আকৃতির সংস্মৃতি হইয়া থাকে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। চক্ষু চক্ষুস্নায়ু, অথবা সেই স্নায়ুর মূলস্থিত মস্তিষ্কভাগ ইহাদিগের কোন একটীতে বা দুইটীতে কিম্বা সকলগুলিতে দৌর্ব্বল্যের কোন হেতু থাকিলে দ্রব্যের আকৃতি গ্রহণ সহজে হয় না, এবং আকৃতি গ্রহণ হইয়াও তাহার ধারণা তেমন দৃঢ় হইতে পারে না।

আমার শরীরে কোথাও ঐরূপ কোন দোষ আছে বোধ হয়। দ্রব্যের আকৃতির ধারণায় আমার বিলম্ব হয় কি না, বলিতে পারি না কিন্তু

আকৃতির স্মরণশক্তি আমার বড়ই অল্প। ছেলে বেলায় যদি কোন নূতন পথ দিয়া আমাকে কেহ লইয়া যাইত, আমি পথ চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না। বহুবার একটী দ্রব্য দেখিয়াও তাহার আকার প্রকার ভুলিয়া যাইতাম, কিন্তু তাহার নাম এবং তৎসম্বন্ধী কোন কথা শুনিলে সেই সকল কথা বেশ মনে থাকিত। বেশ মনে পড়িতেছে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় বাবা আমাকে লইয়া সময়ে সময়ে একটী বাগানে যাইতেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন গাছ ও তাহাদের পাতা, ফুল, ফল দেখাইয়া গাছের নাম বলিয়া দিতেন। যে নামটী একবার শুনিতাম, তাহা মনে থাকিত; কিন্তু যদি দুই প্রকার বৃক্ষের বা পত্রের বা পুষ্পের কতকটা সাদৃশ্য থাকিত, তাহা হইলেই আর ঠিকঠাক নাম বলিতে পারিতাম না, প্রায়ই গোলমাল করিয়া ফেলিতাম।

বয়স বৃদ্ধির সহিত ঐ দোষ কতকটা কমিয়া গিয়াছে, এখন আর তেমন স্থূল বিষয়ে ভুল হয় না। কিন্তু তবুও অনেক সময়ে ভুল হয় এবং তজ্জন্য বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইতে হয়। * * "তুমি মকরের সঙ্গে একটী কথাও কহিলে না কেন? তুমি কথা কহিলে না বলিয়া ও রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।" * * "ঐ যে বসিয়াছিল, ঐ কি মকর?" * * "তা নয় ত আর কে? এই সে দিন ওর সঙ্গে অত কথা কহিলে, আজ একবারে চিনিতে পারিলে না—ওর কিন্তু বড়ই দুঃখ হবে।" * * * "ছেলেকে ছবি আঁকিতে শিখাইবার ইচ্ছা হইল কেন?"—কোন আত্মীয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলাম—"নিজের আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণাশক্তি কম; ছেলের সেই দোষটা না হয়, এই জন্য উহাকে দুই তিন বৎসর ছবি আঁকিতে শিখাইব।" "তোমার আকৃতি গ্রহণ এবং ধারণাশক্তি কম। এ ত কখনই মনে করি নাই—তুমি নানা স্থানে বেড়াও, অনেক লোকের সহিত আলাপ পরিচয় কর—কেহ কি কখন বলিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পার নাই?—আকৃতি গ্রহণ এবং স্মরণ ক্ষমতা অল্প হইলে অবশ্যই ঐরূপ কথা উঠিত।" "আমি প্রায়ই মানুষ চিনিতে পারি না—কিন্তু তাহা [illegible] আমাকে বড়ই বিষম হয় জানিয়া ঐ দোষের একটী প্রতিবিধানের উপায় [illegible] রাখিয়াছি। যেখানে কাহারও সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয়, একখানি ছবিতে

তাহার নামাদি টুকিয়া রাখি এবং সেই স্থানে পুনর্ব্বার যাইতে হইলে ঐ বহিখানি দেখিয়া নামাদির পুনরালোচনা করিয়া লই। এই তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে এখানে যাহার যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সমুদায় আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি—তাই ঐ যে ভবানী বাবু এবং শ্রীনাথ বাবু আসিলেন, অনায়াসে তাঁহাদের নাম লইয়া কথোপকথন করিতে পারিলাম।” “তবে ত দেখিতেছি লোকে যে অমুক আমাকে চিনিতে পারিলেন না বলিয়া অভিমান করে সেটা বড় অন্যায্য অভিমান!” “কিছু অন্যায্য বৈ কি —আমার সম্বন্ধে ত খুবই অন্যায্য, তাহার সন্দেহ নাই—এবং আমার মত যে চোক থাকিতেও কাণা লোক অনেক আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। এই সে দিন অমুক সাহেব আমার পুত্রের নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে অমুক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তোমার বাপ আমাকে চিনিতে পারিলেন নাই।” “তাই ত, তুমি এত সাবধান হইয়াও ঐ চিনিতে পারিলেন না অভিমানটির হাত এড়াইতে পার নাই?” * * * “অনেকটাই পারিয়াছি।”

দ্বিচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

গৃহে মৃত্যু ঘটনা।

সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যুঘটনা দর্শন করিতে হয়—সুহৃদ্বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। এরূপ দুর্ঘটনা অনিবার্য্য—ঐ দুঃখ হ্রাসের একমাত্র উপায় কালাত্যয়।

আমার অদৃষ্টে এ দুর্ঘটনা ভোগ অনেকবারই ঘটিয়াছে। আমি অপঘাতে স্বজনের মৃত্যুঘটনা দেখিয়াছি—আমি চিকিৎসার দোষেও প্রীতিভাজনদিগকে হারাইয়াছি—আমি অচিকিৎস্য ব্যাধি পীড়িত প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখ ভোগ করিয়াছি—আমার কোন কোন সুহৃজ্জন ক্রমে ক্রমে ক্ষীণশক্তি হইয়া পঞ্চত্বে মিলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া নিরন্তর মনস্তাপে দগ্ধ হইয়াছি—আমার প্রিয়তমকে হঠাৎ কালে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছি, এবং বজ্রাহতবৎ চেতনাশূন্য হইয়াছি। আমার নিদারুণ সাধব পরিবারবর্গের অমনোযোগিতায় শিশুদিগকে পীড়িত এবং বিনষ্ট হইতে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলাতন হইয়াছি। আমি অনেক দিন ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—মৃত্যু অনেকরূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

কিন্তু আমার ঐ সকল দুর্ঘটনাখ বর্ণন করিয়া কাহাকেও কষ্ট দিবার ইচ্ছা নাই। সংসার প্রমে থাকিয়া যে কোন স্ত্রী পুরুষ যখন কোন যমযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইবেন, তাহাদিগকে আমি কয়েকটী উপদেশমাত্র প্রদান করিব। (১) তাঁহারা যেন আপনাদের দুঃখের অবস্থায় নিজ পরিচিত অপরাপর স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহারা ঐ প্রকার যাতনা পাইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ করেন। (২) যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে যদি তাঁহার অপেক্ষা অধিক অথবা সমান পরিমাণে অপর কেহ পরিতপ্ত হইয়া থাকে, তবে যেন সেই ব্যক্তির সান্ত্বনা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন তাহাতে নিজের দুঃখ ন্যূন হইবে এবং শাস্ত্রের আদেশও প্রতিপালিত হইবে। (৩) পুত্রশোকে তাহার গর্ভধারিণীর বা জনকের দুঃখ, পত্নীবিয়োগে

পুত্র কন্যাদিগের দুঃখ এবং নিরাশ্রয়তা, মাতৃবিয়োগে পিতার কষ্ট, বন্ধু-বিয়োগে বন্ধুর পরিবারবর্গের কাতরতা—এই সকল দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাসাধ্য সেই সকল দুঃখে সহানুভূতি করাই বিধেয়। তাহা করিতে গেলেই যাহার বিয়োগ যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছ, তাহারই প্রতি-নিধিত্ব পাইবে। (৪) নিজের দুঃখের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করিলে কর্ত্তব্যসাধন হইবে না। দুঃখের ভারই বাড়িবে, অস্থির এবং অধীর হইয়া, অলৌকিক, অধর্ম্ম্য এবং অশাস্ত্রীয় অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিবে।

———(*)———

ত্রিচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

— :০::০: —

ডাক্তার দেখান।

আমার বাটিতে যখন যে ডাক্তার দেখিতেন, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত পরামর্শপূর্ব্বক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ হইবার মূল কারণ এই যে, বাটীর সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করা আমি আপনার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতাম এবং ডাক্তারকে আপনারই প্রতিনিধি বলিয়া জানিতাম। এরূপ মনে করিয়া চলাতে, বাটীর কাহার পীড়া হইলে আপনাকে স্বচক্ষে তাহার শরীরের অবস্থা দর্শন করিতে হইত, স্বহস্তে তাহার কতকটা সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত, সুতরাং পীড়ার ভাবগতিক নিবিষ্ট মনে বুঝিবার প্রয়োজন এবং সুযোগ হইত। ডাক্তারেরাও ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছিলেন যে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পীড়ার প্রকৃত লক্ষণাদি, তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারেন। এই জন্য আমার বাটীর চিকিৎসক ডাক্তারেরা আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত বলিয়াই মনে করিতেন।

কোন সময়ে আমার বাটীর চিকিৎসক কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, এবং একটী বালকের অতি কঠিন জ্বর বিকার রোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অগত্যা একজন ইংরাজ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে হইল। তিনি আসিয়া ছেলেটীকে দেখিলেন, এবং ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিলেন। আমার অভ্যাস, ডাক্তারকে পীড়ার অবস্থা এবং ঔষধ প্রয়োগের ফল জিজ্ঞাসা করা। সেই পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ ইহাঁকেও জিজ্ঞাসা করিলাম —রোগটীর প্রকৃতি কি—এবং যে ঔষধের ব্যবস্থা হইল, তাহার সেবনে কি ফল হইবে। ইংরাজটী প্রথমতঃ একটু অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিলেন, পরে আমার মুখাবয়বে বিশিষ্ট কষ্টের লক্ষণ দেখিয়াই হউক, আর যে কারণেই হউক, একটু কোমল স্বরে বলিলেন, "পরে বলিব"।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রটী ডাক্তারখানায় পাঠাইয়া ঔষধ আনাইলাম। আনাইয়া ঔষধের এক মাত্রা খাওয়াইলাম, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ঔষধের অর্দ্ধমাত্রা ছেলেটীকে পুনঃ

খাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। রোগীর নাড়ি দেখিলেন, ঘড়ী বাহির করিলেন, আবার নাড়ি দেখিলেন—মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—উহার কয়বার শৌচ হইয়াছে। আমি বলিলাম পাঁচ বার। "পাঁচ বার!!—প্রতিবারে ভেদ অধিক হইয়াছিল কি?"। "সর্ব্বশুদ্ধ দুই সের এক ছটাক"। "দুই সের এক ছটাক!—ভেদের ওজন কেমন করিয়া এত ঠিক জানিলে?" "আমি মাপিয়াছিলাম—ঐ যে শরাব রহিয়াছে দেখিতেছেন, ঐরূপ শরাবে, মল গ্রহণ করাইয়া ঐ তৌল দাঁড়িতে ওজন করিয়া দেখিয়াছি।" ডাক্তার সাহেব একটু গম্ভীরমুখ হইলেন—এবং রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ভেদ হওয়াতে মন্দ হয় নাই, অনেকটা দোষ বাহির হইয়া গিয়াছে—এক্ষণে অল্প ঔষধের ব্যবস্থা করিব"। * * * "ভেদ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক হইলে কি ভাল হইত?" * * * "না ইহাতেই একটু দুর্ব্বল হইয়াছে—আর অধিক হওয়ার প্রয়োজন নাই"। * * * "তবে যে পূর্ণমাত্রায় ঔষধ না খাওয়াইয়া অর্দ্ধ মাত্রায় খাওয়াইয়াছি, তাহা ভালই হইয়াছে"? * * * "কি বলিলে?" * * * "এই ঔষধের শিশি দেখুন—আমি চারি বার ঔষধ খাওয়াইয়াছি—কিন্তু তিন মাত্রার অধিক ফুরায় নাই। ঐ তিন মাত্রার এক মাত্রা আমি স্বয়ং খাইয়াছি, অপর দুই মাত্রা অর্দ্ধেক করিয়া দিয়া চারি বারে ছেলেকে খাওয়াইয়াছি।" * * * "তুমি আপনি খাইলে কেন?" * * * "ঔষধের বীর্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য।" "বীর্য্য কি বুঝিলে?" * * * "আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার জোলাপ হইল, প্রস্রাব বেগে নির্গত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল—আমার শরীরে এত গুণ করিল দেখিয়া বালককে অল্প মাত্রায় ঔষধ দিলাম।" ডাক্তার সাহেব নতশির হইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিলেন, আমি সেই সময়ে বলিলাম, "আমার পত্নী বালকটীর নিকটেই সমস্ত দিন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বালকটী ছয় ঘণ্টার মধ্যে আট বার কাসিয়াছে। উহার কি ফুস্ফুসে বা শ্বাস-নালীতে দোষ হইয়াছে?"।—ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "এ প্রকার জ্বর একেবারে না হউক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কিছু না কিছু আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু উদ্বেগের কোন কারণ

উপস্থিত হয় নাই—আর আজি অবধি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিব অগ্রেই তাহার ফল আপনাকে বলিয়া যাইব"। ডাক্তার সাহেব যে সময়ে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার বাটির চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—'আমি তাহাই করিয়া থাকি—উনি স্বচক্ষে সকল দেখেন—স্বহস্তে রোগীকে ঔষধ খাওয়ান, এবং তাহারি সেবা করেন; উহাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া উহাঁর বাটীতে চিকিৎসা করায় চিকিৎসার বিশেষ সুবিধাই হয়। বিশেষতঃ উনি ত আপনার একটা মত বাহির করিয়া বাহাদুরী করিতে যান না? উহাঁর মনের কথা এই—চিকিৎসক স্বয়ং সমুদায় দেখুন, আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা শুনুন, তাহার পর ব্যবস্থা করুন—এবং সেই ব্যবস্থার ফল কি হইবে মনে করেন আমাকে বলিয়া যাউন।—এমন লোকের সহিত পরামর্শ করাই বিধেয়।" ডাক্তার সাহেব বলিলেন "আমি এ পর্য্যন্ত কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী কাহারও ঘরে কোথাও রোগীর সেবার এত যত্ন ও মনোযোগ দেখি নাই—তুমি যেরূপ বলিলে এখানে সেই রূপেই কাজ করা উচিত। ডাক্তার সাহেব খুব সজোরে সেকহ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেলেন এবং যত দিন বাঁচিয়াছিলেন আমার প্রতি বিশিষ্ট অনুকূল দৃষ্টিই করিতেন।

— :*::*: —

চতুশ্চত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

রোগীর সেবা।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহ মমতা কম—স্বার্থপরতা বেশী—আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল হয়, সে বাটীর অনেকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি।

(১) সে বাটীতে গৃহোপকরণের মধ্যে এমন কতক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী এবং প্রয়োজনীয়।—যথা জল গরমের কেটল, ফ্লানেল এবং মসমস কাপড়ের টুকরা খল নুড়ি, হামানদিস্তা, মেজর গ্লাস, উষ্ণ জলে না ফাটিয়া যায় এমন বোতল, ভাল নিক্তি, সোর্ণা, বেডপ্যান, ক্লিনিকাল থার্ম্মোমেটর এবং ঔষধের একটী বাক্স বা আলমারি।

(২) সে বাটীতে কি পুরুষ কি স্ত্রী কাহার কোন পীড়া হইলে তাহা যতই সামান্ত হউক, বাটীর কর্ত্তা তাহার তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

(৩) সে বাটীতে যদি কোন কঠিন পীড়া উপস্থিত হয়, তবে বাটীর ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার জন্ত বিশিষ্টরূপে আদিষ্ট হয়।

(৪) অধিক পীড়ায়, সমস্ত বাটী উপশান্তভাব ধারণ করে—কেহই কাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয় না—কেহই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহে না—বাটীর কৃতবিদ্যেরাও সাহেবী চাইলে মস্ মস্ করিয়া চলেন না—ছেলেরাও আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া চলে।

(৫) রোগীর নিকটে থাকিবার জন্ত পাহারা বদলের ন্তায়, দিবারাত্রির মধ্যে পারিপারিক স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নিয়োগ হইয়া যায়। যাহারা সেবায় নিযুক্ত হয়, অপরে তাহাদিগের তাৎকালিক করণীয় গৃহকার্য্য সমস্ত আপনাদের মধ্যে বিভাজিত করিয়া লয় এবং সমস্ত গৃহকার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে—বাসনের ঠন ঠনানি, গৃহোপকরণের হুড়হুড়ানি, কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না।

(৬) রোগীর পথ্য এবং ঔষধ যথাসময়ে প্রদত্ত হইতে থাকে তাড়াতাড়িও নাই বিলম্বও নাই—বিন্দুমাত্র কোন বিপর্য্যয় নাই। বাটীর অনেকেই রোগীকে পথ্যাদি প্রদান কার্য্যে সক্ষম হয়।

(৭) রোগের লক্ষণ দেখা এবং চিকিৎসককে তাহা অবগত করান পরিবারের মধ্যে অনেকের সাধ্য হইয়া থাকে।

(৮) রোগের চিকিৎসায় ব্যয়কুণ্ঠতার নামগন্ধও থাকে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুরুবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা এক এবং মন এক হইয়া যায়। আমি স্বচক্ষে পীড়িতাবস্থ ইংরাজের সেবা এবং চিকিৎসা দেখিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির পত্নী যদি একটু রাত্রি জাগরণ করিলেন, যদি ঠিক সময়ে স্বয়ং হাজির না থাকিলেন, তবেই তাঁহার চিত্ত প্রশংসা হইল। পীড়িতের ভ্রাতা যদি তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং ভ্রাতা কেমন আছেন, পরিচারককে দিনের মধ্যে দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে পীড়াসম্বন্ধীয় দুই একটা কথা কহিলেন, তাহা হইলেই তিনি ভ্রাতৃকর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলেন। প্রাতিবেশী ইংরাজ যদি বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া নিজ নামাঙ্কিত কার্ড রাখিয়া গেলেন, তাহা হইলেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার দায় হইতে খোলসা হইলেন। এই বিদেশে ত ইংরাজদিগের পীড়ার সময় বেতনভোগী খানসামা প্রভৃতি দ্বারা যৎদূর সেবা হইবার তাহাই হইয়া থাকে। উহাঁদিগের স্বদেশেও পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বড় একটা কিছু করিতে হয় না। বেতনগ্রাহিণী ধাত্রী অথবা দয়াবতী উদাসিনীগণ মুখ্যতঃ উহাঁদিগের রোগের সেবা করিয়া থাকে।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। আস্তবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে তবে, আস্তবলের সকল ঘোড়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গোরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে আর যে গোরু তাহাকে দেখিতে পায় সেই উহা লেজ করিয়া দৌড়াইতে চায়—কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়, চটক প্রভৃতি সকল পশু পক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার শু

ঝাড়িয়া বা চটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের শুশ্রূষা পাশবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্য জাতির মধ্যে পাশব ভাব অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীড়িতের সেবার তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে। অতএব রোগ সেবা সম্বন্ধে ইংরাজের রীতি আমাদিগের অনুকরণীয় নহে।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগমুক্ত করা। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে রোগমুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এই জন্য এমন ভাবে সেবা করা আবশ্যক, যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে তাহার জন্য পরিবার অতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র কি ভ্রাতা, রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে, সে রোগীর ঘরে আসিল—তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শয়িত—তুমি রাত্রি দিন তাহার মলিন মুখ মণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোকবিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য, তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে, তুমি অধীরা হইয়া শিশুর ত কোন উপকারই করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপ বিষপান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর, উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের, হা হুতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার, প্রকৃত হেতু বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটী নষ্ট করিও না। এই জন্যই প্রাচীনা গৃহিণীরা

বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্য কৌতুক বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই? বরং এ পক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেরও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্দ্দয় এবং হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্য পরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন—তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন এবং সেই কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর, শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবকে আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুলবুলে লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদাই এ পাশ ও পাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদৃষ্টি হইতে হয়। তাঁহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয়, তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবককেও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না— রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয়, এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয়, বড়ই বিরক্ত এবং দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে [illegible] এই সকল গুণ বর্ত্তমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই

রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই—কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই—পায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিসটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটী কপালে দিতে হইবে—ঠিক একটুকু চাপিয়া বা আলগা করিয়া দিতে হইবে.—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদু হাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হয়েন।

পরিজনগণ উল্লিখিত ভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহারও বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা যতদূর পারেন, যে কাপড়ে রোগী ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালক বালিকাদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন সেই আদেশ পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে, সে কথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ তাঁহারা ছেলের গু, মূতে ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মল মূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণ বটে, এবং তাহা করিতেও নাই, কিন্তু এ স্থলে ঘৃণা প্রদর্শন হইতেছে না, কেবল মাত্র সংস্রব দোষ নিবারণের উপায় বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে যত ধরে, ছোটর পীড়া ডাগরকে তত ধরে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামকধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক।

পঞ্চচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

ভোজনাদি।

পারিবারিক যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে ভোজন একটী প্রধান কার্য্য। ভোজনের ব্যবস্থা অনেকটা বিচার করিয়া করিতে হয়। এই কার্য্যেও দিব্য ভাব আনিতে হয়; বস্তুতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ইহাই নিত্য যজ্ঞ, এবং গৃহাশ্রমী যাবতীয় ব্যক্তি এই যজ্ঞের পূর্ণাধিকারী।

এই নিত্যযজ্ঞের দেবতাগণ শরীরী, সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান, সন্তোষা সন্তোষ প্রকাশে সক্ষম এবং বাধ্য। অশরীরী দেবতারা, নিবেদিত হোম নৈবেদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহা গ্রহণযোগ্য মনে করিলেন কি না, বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু ভোজনরূপ নিত্যযজ্ঞ যাহাদের প্রীত্যর্থ উৎসৃষ্ট হয়, তাঁহারা উহার দোষ গুণ বলিয়া দিতে পারেন।

গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য তিনি গৃহপ্রস্তুত যে খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিবেন, যেন অবশ্য অবশ্য তাহার দোষ গুণ বলিয়া দেন। তিনি যদি না বলেন তবে কখনই তাঁহার বাটীর রান্না ভাল হইবে না। এ বিষয়ে আমার অতি আত্মীয় কোন এক ব্যক্তির সহিত এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, আপনার বাটীর রান্না উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাই—যদি কখন একটী ব্যঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্র স্বাদহীন হয়, আপনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যঞ্জনটীর সে দোষ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন। আমি ওরূপ করিতে পারি না। বৌ, ঝি, গৃহিণী প্রভৃতি যাহারা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হয় তাহারা কতটা পরিশ্রম করে স্মরণ করুন; উহারা যতদূর সাধ্য তাহাত করে—উহাদের কার্য্যে প্রশংসা না করা কি একটু নৈষ্ঠুর্য্য নয়? আমাকে যা দেয়, আমি তাহাই ভাল বলিয়া খাই। আমি বলিলাম—আমার প্রণালীতে একটু নৈষ্ঠুর্য্য আছে বটে কি?—কিন্তু শিক্ষা প্রদান কাৰ্য্যটা যে বিষয়েই প্রযুক্ত হউক, তাহাতে একটু কঠোরতা থাকেই থাকে। যদি বাটির রান্না ভাল করিতে চাও, তুমি ঐ কঠোরতা প্রয়োগে অত ভীত হইও না। যে কাজ

করিব, তাহা ভাল করিয়া করিব, এ সংস্কারটি নিজের থাকা ভাল, আর পরিবারের মধ্যেও উহা বদ্ধমূল করা আবশ্যক। উহা একটী ধর্ম্মবীজ।

আমার দৃঢ় সংস্কার এই যে, যে বাটীর রান্না ভাল নয়, সে বাটীও ভাল নয়; অর্থাৎ সে বাটীর স্ত্রী পুরুষদিগের যজ্ঞ করা অভ্যস্ত হয় নাই—তাহারা কিছু অলস প্রকৃতিক, কিছু অযত্নপর, কিছু সুখ্যাতিবিমুখ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুখ দুঃখ বোধে কিছু অনুভূতি শূন্য হইয়া থাকে। যে বাটীর রান্না ভাল অর্থাৎ যে বাটীতে নিত্যযজ্ঞের ব্যাপার পরিপাটীরূপে অভ্যস্ত, সে বাটীর নৈমিত্তিক যজ্ঞও, অর্থাৎ অতিথিসৎকার, ব্রাহ্মণসজ্জনের ভোজনাদি, অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়।

রান্না ভাল করিবার উপায় গৃহস্বামীর শিক্ষাদানে প্রবণতা। তাহাতেই অনেকটা হয়, কিন্তু যদি রন্ধন বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার কিছু ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। পুরুষের নিকট রন্ধন বিষয়ে শিক্ষা পাইতে হইলে স্ত্রীলোকেরা বড়ই লজ্জিতা হয়, তাহারা সত্বরেই সযত্ন হইয়া আপনারা উত্তমরূপে রন্ধন করিতে শিখে। যে বাটীর কর্ত্তা বাটীর রন্ধনকার্য্যের প্রতি মনোযোগী, কিরূপে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে হয়, বলিয়া দিতে পারেন, সে বাটীর স্ত্রীলোকেরা রন্ধনকার্য্যটিকে গৌরবসূচক মনে করে, এবং তাহার উৎকর্ষ এবং পারিপাট্য সাধন করিতে পারেন।

বাটীর রন্ধন ভাল হইবার আর একটী অন্তরায় আছে। সেটীও বাটীর কর্ত্তাকে যত্ন করিয়া নিবারণ করিতে হয়। রন্ধনের দ্রব্য সামগ্রী ভাল হওয়া চাই। যজ্ঞীয় দ্রব্য অতি যত্নপূর্ব্বক আহরণ করা বিধেয়। আজি কালি কিন্তু এতই ভেজাল দেওয়া অভ্যাস হইয়া পড়িতেছে যে বিনা ক্লেশে ভাল জিনিষ আয়ত্ত হইয়া উঠে না। তৈল, ঘৃত, দুগ্ধাদি প্রায়ই ভাল পাওয়া যায় না। আনাজ তরকারীও যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া না কিনিলে ভাল মিলে না। অতএব দ্রব্যাহরণ সম্বন্ধে কর্ত্তার দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

দেশাচার এই যে, রন্ধন কার্য্য শুচি হইয়া করিতে হয়। যজ্ঞীয় দ্রব্য শুচি হইয়া প্রস্তুত করা শাস্ত্রের আদেশ। স্নান করিয়া অথবা হাত পা মুখ ধুইয়া এবং কাপড় ছাড়িয়া রন্ধনশালায় যাইতে হয়। ইহাতে রন্ধন কার্য্যের প্রতি বিশেষ একটী শ্রদ্ধা জন্মে, এবং রন্ধনও ভাল হয়। আর্য্যেতর জাতি-

দিগের রন্ধনকার্য্যে আর যত গুণ থাকুক, উহার শুচিতা রক্ষার নিমিত্ত কোন যত্নই থাকে না। অতি বড় ইংরাজেরও বাবুর্চ্চিখানায় প্রবেশ করিবামাত্র ঘৃণা জন্মে। পাচকদিগের হস্ত, পদ, মুখ, বস্ত্রাদি সাতিশয় ক্লিন্ন, ঘরের দুর্গন্ধ অসহ্য, ভোজন পাত্রাদি পরিষ্কার করিবার প্রণালী অতি জঘন্য। খাদ্য সামগ্রী সকল রন্ধনশালায় প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিলে পর, তবে পরিবেষ্টৃগণ ফিটফাট হয় এবং দ্রব্যাদি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদিগের শাস্ত্রে অন্নকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্ম বলিয়াছেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহার সম্যক্ পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

ইংরাজদিগের ভোজন প্রণালী হইতে আমাদিগের শিক্ষণীয় অধিক কিছুই নাই। উঁহারা নিত্য মাংস্যভোজী। ইংরাজেরা যত মাংস খান, অপর কোন ইউরোপীয় জাতীয়েরা অত মাংস খায় না। এদেশে অত মাংস খাওয়া সহ্য হয় না। ইংরাজেরা তীব্র সুরা পানে অনুরক্ত। কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বে উহাঁরা যত তীব্র সুরা সেবন করিতেন, এখন আর তত করেন না। আমাদিগের দেশে সুরা সেবনে আয়ুঃশেষ হয়। ইংরাজেরা পচা মাংস এবং পচা মাছ খাইয়া থাকেন—মাংস এবং মৎস্য কিছু না পচাইয়া উহাঁরা প্রায়ই খান না, আমাদের শাস্ত্রে টাটকা বই পচা খাইতে একেবারে নিষিদ্ধ। ইংরাজেরা চিনের বাসন এবং কাচের গ্লাস বাটী ব্যবহার করেন। ঐগুলি বেশ ঝক্‌ঝকে জিনিস। ভাবিয়া দেখিলে ও গুলি কৃত্রিম প্রস্তরমূ, আমার বোধ হয় যে দেশাচার ঐ সকল পাত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ প্রচলিত হইতে দিবে। তবে ওগুলি দেশীয় কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলেই ভাল হয়। ইংরাজেরা টেবিল পাড়িয়া চেয়ারে বসিয়া খান। উহাঁদের খাদ্য সামগ্রী অধিকাংশই শুষ্ক। কিন্তু যখন কোন ঝোল কিম্বা তরকারি খান, তখন পাছে কাপড় নেওয়া হয় এই ভয়ে শরীরের সম্মুখভাগটা একটী তোয়ালে রুমাল দিয়া ঢাকেন—তখন চেয়ারে বসার শোভাটা আর তত চিত্ত আকর্ষণ করে না আমাদের [illegible] জিনিস অধিকাংশই সরস এবং সজল, এবং এদেশে তাহাই [illegible]। সুতরাং আমাদের পক্ষে টেবিলে বসার বিশেষ সুবিধা নাই। [illegible] শাবচ ব্যবহার করেন—হাতে করিয়া খান না। ঐ

ব্যবহারটিও মন্দ বলিয়া আমার বোধ হয় না। প্রত্যুত, ঐ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়াই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তবে আমাদিগের ভোজনে কাঁটা ছুরি নিষ্প্রয়োজন। ইংরাজেরা স্ত্রী পুরুষে একত্র ভোজন করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রথা ভাল নয়। উহাতে স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হয়। তবে যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্তি এবং প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন করা শাস্ত্রীয়। অতএব ভোজনকালে বাটীর স্ত্রীলোকেরা নিকটে বসিয়া খাওয়াইবেন, এবং বাটীর স্ত্রীলোকেরাই পরিবেশন করিবেন। পরিবেশন হাতে করিয়া করিতে নাই। যজ্ঞীয় হোমাদি যেমন স্রুবের দ্বারা প্রদান করিবার বিধি, পরিবেশনও সেইরূপ চামচ, হাতা, বাটী প্রভৃতির দ্বারা করিতে হয়। শিশুগণ নিকটে বসিয়া খাইবে। নিত্য ভোজনের এইরূপ ব্যবস্থা হইলে খাওয়া তাড়াতাড়ি হয় না, খাওয়ার মধ্যে অনেক কথা বার্ত্তা গল্প শুনন হয়, হাসি তামাসাও আইসে, রাক্ষস ভাব থাকে না, মুখের বিকৃতি এবং শব্দ হয় না, ভোজনপাত্র নোঙরা হয় না, অঙ্গুলির দুই পর্ব্বের অধিক খাদ্যসামগ্রীতে সংলগ্ন হয় না, এবং কতকটা পথ্যাপথ্যের বিচার করিয়াও চলিতে হয়।

পথ্যাপথ্য বিচার ইংরাজী গ্রন্থ সকল হইতে কতকটা হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত হয় না। উহঁাদের বিচারপ্রণালী রাসায়নিক শাস্ত্রসম্মত, প্রকৃত প্রস্তাবে শারীর শাস্ত্র জ্ঞান সমুদ্ভূত নয়। উহঁাদিগের মধ্যে একজন পণ্ডিত দেখিলেন, গোধূমে এত অমুক পদার্থ, এত তুমুক পদার্থ, এত কদনা পদার্থ আছে, আর একজন দেখিলেন, তণ্ডুলে ঐ ঐ পদার্থের এত এত অংশ আছে, আর একজন দুগ্ধের, আর একজন মাংসের, ঐরূপ মূল সকল বাহির করিলেন। কিন্তু ঐ প্রণালীতে বাস্তবিক পথ্যাপথ্য নিরূপণ হয় না। প্রথমতঃ ঐ প্রণালীর পরীক্ষা বিধান বড়ই দুরূহ। অতি বিখ্যাত পণ্ডিত দিগেরও দুই জনের মত ঠিক এক হয় না। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যের পাক যন্ত্রস্থ হইয়া খাদ্য সামগ্রীর যেরূপ বিশ্লেষণ হয়, এবং তাহা হইতে শরীর পোষণোপযোগী যে সকল গুণ জন্মে, সামান্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদিগের সে সকল গুণ জানিতে পারা যায় না। তৃতীয়তঃ এতদ্দেশজাত এবং প্রচলিত খাদ্য সামগ্রী সকল ইউরোপজাত খাদ্য সামগ্রী হইতে কতকটা ভিন্ন। এই জন্যও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের পরীক্ষা বিধান হইতে আমাদিগের সকল খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণ জানিবার যো নাই। ফল কথা,

যেমন ঔষধের গুণাগুণ ঔষধ খাইয়াই প্রকৃতরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ খাদ্য সামগ্রীর গুণাগুণও যাঁহারা তাহা খাইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থতঃ জানিতে পারেন। আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র মতেতেই পথ্যাপথ্য বিচারপূর্ব্বক যে সময়ে যাহা খাইতে বিধি আছে তাহা খাইবে, যাহার বিধিও নাই নিষেধও নাই, তাহাও খাইবে, আর যাহা খাইতে নিষিদ্ধ তাহা খাইবে না *।

পথ্যসেবী হওয়া একটী ব্রত। যাঁহাদিগের এই ব্রত বাল্যাবধি অভ্যস্ত হইয়াছে, তাঁহারা রোগযন্ত্রণা হইতে অনেকটা মুক্ত থাকেন, দীর্ঘায়ুঃ হয়েন,

* ১। গ্রীষ্ম পথ্যাপথ্য।—পুরাতন চাউল, পুরাতন গোধুম, পুরাতন যব কৃষ্ণমুগের দাইল। জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংস। যবের শক্তু (ছাতু) শীতল জলে খুব তরল করিয়া গোলা। দুগ্ধ, গব্য বা মাহিষ (চিনি মিশ্রিত) দ্রাক্ষা, কিসমিস, কাঁটাল, আম্র। লঘুপাক, স্বাদু, স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) প্রস্তুত দ্রব্য। নির্ম্মল লঘু শীতল জল। দিবানিদ্রা। পাখার বাতাস।

২। বর্ষা পথ্যাপথ্য।—পুরাতন চাউল, গোধুম, যব, সোণামুগের দাইল। শুষ্ক দেশবাসী পশু পক্ষ্যাদির মাংস। মাংসরস। লঘু আহার। দিব্যাম্ভঃ (আকাশের জল)। সিদ্ধ জল। উচ্চস্থানে শয়ন। ঠাণ্ডা বাতাস, দিবা নিদ্রা, নদীজল এবং অধিক জলীয় দ্রব্য নিষিদ্ধ।

৩। শরৎ পথ্যাপথ্য। চাউল, গোধুম, সোণামুগ, ছোলার দাইল। মরুদেশীয় পশু পক্ষীর মাংস। মাংস রস। ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, ইক্ষু, আমলকী, পটোল। অংশূদক, অর্থাৎ যে জলে সূর্য্য এবং চন্দ্রকিরণ বিশেষরূপেই লাগিয়াছে। পিত্ত প্রকোপ জনক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৪। ৫। হেমন্ত শিশির পথ্যাপথ্য।—গোধুম—তজ্জাত পিষ্টকাদি, ক্ষীর এবং ইক্ষুরসজাত দ্রব্যাদি, বসাবহুল দ্রব্যাদি, আনুপ পশু পক্ষীর মাংস, বিলেশয় জন্তুর মাংস, স্নেহপূর্ণ, উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য। উষ্ণগৃহে বাস। অতি শীতল জল নিষিদ্ধ। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

৬। বসন্ত পথ্যাপথ্য।—বিশিষ্টরূপ ব্যায়াম, বিশিষ্টরূপ উদ্বর্ত্তন এবং স্নান। পুরাতন গোধুম, যব, চাউল। জাঙ্গল মাংস। ঘৃত, মধু পানীয় [illegible] মিশ্রিত জল। তিক্ত, কটু, কষায়াদি দ্রব্যের বিশিষ্ট সেবন। [illegible] নিষিদ্ধ।

এবং চিরকাল কর্ম্মক্ষম শরীর ধারণের সুখভোগ করিতে পারেন। যাঁহারা মনে করেন যে, পথ্যসেবীদিগের ভোজনসুখ অল্প, তাঁহারা ভ্রান্ত। পথ্যসেবীদিগকে যে নিতান্ত পুতু পুতু করিয়া খাইতে হয়, অথবা বিস্বাদ সামগ্রী খাইতে হয়, তাহা নহে। প্রকৃত পথ্যের একটী বিশেষ গুণ আছে। উহা স্বল্প মাত্র অভ্যাসে অতিশয় সুস্বাদু হইয়া উঠে। উহার গ্রহণে ভোজনসুখ এবং আনন্দ অধিক হয়। উহা পুষ্টিও করে এবং হৃষ্টও করে। আর একটী কথা আছে। সকল লোকের পক্ষে সকল সময়ে পথ্যাহার এক প্রকার হয় না। ধাতুভেদে এবং কার্য্যভেদে পথ্যের ভেদ হয়। এক ব্যক্তির পক্ষেও সকল সময়ে একই পথ্য হয় না। যাঁহারা বহুকাল পথ্যসেবী, তাঁহারা কোন সময়ে কি খাইলে ভাল থাকিবেন, তাহা সংস্কারগুণেই বুঝিয়া লইতে পারেন।

আহার গ্রহণ উদরপূর্ণ করিয়া করিতে নাই। পরন্তু পথ্যসেবীদিগের প্রায়ই অতিভোজন দোষ ঘটে না। তাঁহারা ভোজনের গূঢ়তম, সর্ব্বাঙ্গীন সুখের এতই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন যে, শুদ্ধ রসনার তৃপ্তিতে তাঁহাদের সম্যক্ সুখানুভব হয় না।

দৈহিক কার্য্যমাত্রেরই সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। আহার গ্রহণের পক্ষেও সেই নিয়ম। ব্রতচারীদিগের কথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণতঃ গৃহস্থ লোকের ভোজনকাল চারিটী। এক, প্রাতে; দ্বিতীয়, মধ্যাহ্নে; তৃতীয় সায়ংকালে; চতুর্থ রাত্রি এক প্রহরের পর। কিন্তু চাকুরির দায়ে, আর স্কুলের দায়ে আজি কালি ঐ সকল সময়ের খুব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। প্রাতরাশ আর মাধ্যাহ্নিক ভোজন মিলিয়া গিয়া সহর অঞ্চলে বেলা নয়টায় ভাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিক রাত্রি করিয়া আহার করা ভাল নয়। কারণ আহার গ্রহণের পর আড়াই ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টা জাগিয়া থাকা উচিত; অধিক রাত্রিতে আহার করিলে ঐ নিয়ম পালন হয় না—সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা হয়।

ইংরাজেরা ভোজনের পর তাম্বূল চর্ব্বণ করেন না। প্রত্যুত তাম্বূল চর্ব্বণটা রোমন্থকদিগের যাবর কাটার সহিত তুলনা করেন, এবং তাহা দেখিয়া নব্যেরা আর তাম্বূল চর্ব্বণে সাহস করিতে পারেন না। কিন্তু তাম্বূল, ঝাটি প্রভৃতি শস্যভুকদিগের পক্ষে পান খাওয়া সুব্যবস্থা। অতএব ভোজন

ন্তে উত্তমরূপে আচমন করিয়া দুই চারিটা পান খাইবে, এবং তাহার পর আবার ভাল করিয়া পুনরাচমন করিবে। শাস্ত্রেরও বিধি এই।

ভোজন সম্বন্ধে আর একটা বড় মোটা রকম ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। লোকেরা যে কারণেই হউক যেন মনে করেন, নিদ্রাবস্থায় আহারের পরিপাক জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা ভাল হয়, এবং সেই জন্য তাঁহারা রাত্রির আহারটাই গুরুতর করিয়া থাকেন। বাস্তবিক নিদ্রাবস্থায় সকল স্নায়ুশক্তিই দুর্ব্বল থাকে—তখন কোন শারীরিক কার্য্যই সতেজে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, আহার পরিপাকও সত্বরে হয় না। এই জন্য দিবার আহার অপেক্ষা রাত্রির আহার গুরুতর করিতে নাই। কিন্তু আজি কালি মাংস এবং পোলাও খাবার ব্যবস্থাটা রাত্রিকালেই করা হইয়া থাকে।

সুস্থ এবং সবল শরীর ব্যক্তির পক্ষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান একটু প্রত্যুষে হওয়াই ভাল। শয্যা হইতে উঠিয়াই মলত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি শরীরের নির্ম্মলতাসাধক কার্য্যগুলির অভ্যাস করা উচিত। তাহার পরেই ব্যায়াম করিবে—যথা ডন্, মুদ্গর, ওঠবোস্ প্রভৃতি। একেবারে অধিক ব্যায়াম করিবে—যথা ডন্, মুদ্গর, ওঠবোস্ প্রভৃতি। একেবারে অধিক ব্যায়াম করা ভাল নয়—কিন্তু অল্পে অল্পে উহা কতকদূর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া যাইতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে। আমাদিগের দেশে ব্যায়ামচর্য্যার প্রকৃত কাল প্রাতঃকাল। কিন্তু ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছেলেরা অনেকেই সায়াহ্নে ব্যায়ামচর্য্যায় আদিষ্ট হইয়া থাকেন।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও ব্যায়ামচর্য্যা আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যায়াম কার্য্যে শরীরের কোমলতা নষ্ট হয়, সে সকল কার্য্য তাঁহাদের পক্ষে বিধেয় নহে। নিয়মিতরূপে গৃহকার্য্য করিলেও অনেকটা ব্যায়ামের কাজ হইয়া যায়। উদূখলে বা ঢেঁকিতে চাউল কাঁড়ায়, যাঁতায় কলাই ভাঙ্গায়, ঘরদ্বার ঝাঁইট দেওয়ায়, বাটনা বাটায় বিলক্ষণ শারীরিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। সময় বিশেষে এবং শরীরের অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কি ব্যায়াম, কি অপর কোন অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম সকলই নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

শয়ন এবং নিদ্রাদি।

কতকটা সময় বিশ্রামের জন্য না পাইলে শরীর টিকে না। কিন্তু বিশ্রামেরও অনেকটা ইতর বিশেষ আছে। যে দৌড়িতেছে বা অনেকক্ষণ ধরিয়া পাদচারণ করিতেছে, সে স্থির হইয়া বসিলে বা শুইলেই বিশ্রাম লাভ করে। যে হস্তচালন দ্বারা কাঠের রেঁদা করিতেছে বা কাপড় বুনিতেছে, ঐ ঐ কার্য্য হইতে ক্ষণকালের জন্য হাত গুড়াইয়া রাখিলেই তাহার শ্রমজনিতক্লান্তি দূর হয়—অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন জন্য যে পরিশ্রম, তাহা সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অভ্যন্তরবর্ত্তী যে স্নায়ুমণ্ডল তাহার সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিদ্রা ব্যতীত আর কিছুতেই হয় না। যে ব্যক্তি যত অধিক কাজ করে অর্থাৎ নড়ে চড়ে, এবং চিন্তা করে, তাহার তত অধিক নিদ্রার প্রয়োজন হয়। শিশুরা অধিক চঞ্চল, এবং উহাদের স্নায়ুমণ্ডলে কার্য্য অধিক হয়, এই জন্য উহারা অধিক নিদ্রা যায়। বৃদ্ধের নড়াচড়া কম, মস্তিষ্ককার্য্যও অনধিক অথবা পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অনধিকরূপেই প্রতীয়মান, এই জন্যই বৃদ্ধের নিদ্রা অল্প। কিন্তু এই কথার ভিতরে আর একটী কথা আছে। নড়া চড়া যত বাড়াইবে, ততই যে নিদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, সে কথা ঠিক নয়। যেমন ব্যায়াম অধিক করিলে ক্ষুধা অধিক হয় এবং পরিপাক শক্তি বাড়িয়া উঠে, এ কথার একটী সীমা আছে, তেমনি অধিক নড়িলে চড়িলে নিদ্রা অধিক হয়, এ কথারও একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। আমি দেখিয়াছি, অতিরিক্ত ব্যায়ামের পর ক্ষুধাবৃদ্ধির কথা দূরে থাকুক, একবারে আহার মাত্র গ্রহণে অরুচি জন্মিয়া যায় এবং পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি না হইয়া উহার হ্রাস হইয়া পড়ে, সেইরূপ অতিরিক্ত চলা ফেরা করায় এবং অতিরিক্ত চিন্তনে বা মস্তিষ্ক চালনে একেবারেই নিদ্রা আইসে না—অনিদ্রাই একটী রোগ হইয়া দাঁড়ায়। শরীর পোষণ এবং পালনের

পক্ষে ব্যায়ামাদি পরিমিতরূপ হওয়াই আবশ্যক, এবং ঐ পরিমাণ ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন।

সুনিদ্রার নিমিত্ত যেমন পরিমিতরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন, তেমনি কতকগুলি বাহ্য বন্দোবস্তের আবশ্যকতা আছে। প্রথমতঃ শয়নের ঘর। এটী শীতল হইবে এবং ইহাতে বায়ু ও আলোকের উত্তম প্রবেশ থাকিবে। কিন্তু শয়নের এবং নিদ্রার সময় অধিক আলোক বা বায়ুর সমাগম অবৈধ। শয্যা হইতে কিছু দূরে বায়ু সঞ্চালনের পথ অনবরুদ্ধ থাকিবে, এবং কেরোসিনের কিম্বা গ্যাসের কটকটে আলো ঘরের ভিতর জ্বলিবে না। পত্র পুষ্পাদিও ঘরে থাকিবে না। ঘরটী যত খোলসা থাকে ততই ভাল; কিন্তু উহাতে আর যাহা কিছু থাকুক বা না থাকুক, কোন খাদ্য সামগ্রী উহাতে রাখিতে নাই। খাদ্য সামগ্রী রাখিলেই তাহার গন্ধে বায়ু দূষিত এবং পিপীলিকা মাছি এবং মশার উপদ্রব অধিক হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শয্যা। শয্যা পরিষ্কার এবং কোমল হইবে। কিন্তু অতি কোমল শয্যা ভাল নয়। এক ঘরে একটি শয্যা থাকাই উচিত। যদি পতি পত্নীর দুইটী শয্যাই এক ঘরে রাখিতে হয়, তথাপি ঐ শয্যা দুইটী ঘরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে থাকিবে। এক শয্যায় শয়ান হইয়া দুই জনের নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। ছেলেদের বিছানাগুলি পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী ঘরে হওয়াই আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, স্ত্রী-সংসর্গ। য়িহুদীদিগের শাস্ত্রে ঋতু বিরত হইবার কাল পাঁচ দিন ধরিয়াছে। সেই পাঁচ দিনের পর আর সাত দিন বাদ দিয়া স্নান এবং স্বামী শয্যা গমন তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধি। এই নিয়ম যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা একণে সকলেরই অবধারিত হইয়াছে। য়িহুদী জাতির সন্তানের অকাল মৃত্যু অপর সকল জাতির অপেক্ষা অল্প হয়। আমাদিগের মধ্যে তিন রাত্রি অতীত করিবার ব্যবস্থা *। বিজ্ঞান দ্বারা এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে অনুমান মাত্র এই যে, সামান্যতঃ রজঃসংযমের পূর্ব্বে যদি সংসর্গ হয়, তবে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি পীড়া সংঘটন হইতে পারে।

---

* স্নানের ব্যবস্থা চতুর্থ দিনেই আছে। কিন্তু ব্যক্তিভেদে ঐ ব্যবস্থা ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। রজঃসংযত হইয়া গেলেই স্নান করা উচিত, তাহার পূর্ব্বে স্নান করা অবৈধ।

গর্ভগ্রহণ এবং গর্ভদানের প্রশস্ত কাল রাত্রি ভোজনের ৩ ঘণ্টা আ° ঘণ্টার পর। উদরে আহার্য্য দ্রব্য অপক থাকিতে স্ত্রী সংসর্গ নিষিদ্ধ। স্ত্রী পুরুষ কাহারও শরীরে কোন গ্লানি থাকিলেও স্ত্রী সংসর্গ নিষেধ। আর দিবাভাগে স্ত্রী সংসর্গ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দিবা সংসর্গে সমূহ দোষ হয় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ আছে। *

পর্ব্বাহে—অর্থাৎ পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমীতেও স্ত্রী সংসর্গ নিষেধ। এই শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপোষক কয়েকটী যুক্তি আছে বলিয়াই আমার বোধ হয়। কিন্তু সকল যুক্তির উল্লেখ না করিয়া এ স্থলে কেবল একটী মাত্রের উল্লেখ করিব। স্ত্রী পুরুষ অন্যোন্যের অভিলাষ পুরঃসরেচ্ছায় অনেক সময়ে পরস্পর সংসর্গী হইয়া থাকেন। উভয়ের মনে, এই যে পরার্থবোধটী জন্মিয়া প্রবৃত্তির উত্তেজক হয়, তাহা অনেক সময়েই ভ্রমমূলক। কিন্তু ঐ ভ্রম সহজে ভাঙ্গে না। সুতরাং বিধি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নিবৃত্তি অভ্যাস করাই ভাল। শাস্ত্রে সেই বিধির সৃষ্টি করিয়া দিয়া স্ত্রীপুরুষকে অতি ধর্ম্ম্য এবং হিতজনক পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। ফলকথা, রেতঃক্ষয়ে আয়ুক্ষয় হয় বলিয়া ভগবান ব্যাসদেব হইতে নব্য দার্শনিক প্রবর ডারউইন সাহেব পর্য্যন্ত সকলেরই দৃঢ় প্রতীতি—সুতরাং মাসের মধ্যে যত রাত্রি বিনা সংসর্গে যায় ততই ভাল। রুগ্ন, দুর্ব্বল ক্ষীণজীবী মনুষ্যদিগের মধ্যেই আসঙ্গলিপ্সা অধিক বলবতী হইয়া থাকে—বিশিষ্ট সবলকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কামাতুর্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প হয়।

অজাতরজাকুমারীগমন অতি মহাপাতক। গর্ভিণী স্ত্রীগমনেরও সমূহ দোষ। আমি শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রী সংসর্গ হইতে একান্ত নিবৃত্ত থাকিলে, বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মে। এটী সম্পূর্ণ মিছা কথা। যদি মনে কাম ভাবের উদ্রেক হইলে তাহার দমন না করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তাতেই অনুরক্ত হও, এবং ক্রমে ক্রমে উহাকে অতি বর্দ্ধিত করিয়া তুল, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ দুই এক স্থলে পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, নচেৎ কেবল মাত্র সংসর্গনিবৃত্তিতে কোন পীড়াই হয় না; প্রত্যুত শরীর [illegible] শীতাতপের দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা জন্মে, পরিশ্রমশক্তি বাড়ে, [illegible]

* প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবারত্যা সংযুজ্যন্তে। প্রশ্নোপনিষৎ।

ক্ষয় হয়, এবং আয়ুকাল দীর্ঘ হইয়া উঠে। দারত্যাগী দেবব্রত ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন, কপদেহ হয়েন নাই।

আমি কয়েকটী সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আদিষ্ট এবং অনুরুদ্ধ হইয়া এই সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। যাঁহারা আমাকে ইহা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, কোন পিতা মাতা আপনাপন পুত্র কন্যাদিগকে এই সকল তথ্য শিখাইয়া দেন না। প্রতি স্ত্রী পুরুষকই এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আপনাপন অভিজ্ঞতা বলে সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাদিগের সংগ্রহ করিতে করিতে জীবিত কাল অতিবাহিত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী স্ত্রী পুরুষকে আবার নূতন করিয়া শিখিতে হয়। তাঁহারা বলেন, দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রে এ সকল বিষয়ে যে বিশেষ উপদেশ আছে, তাহা ঐ সকল শাস্ত্রের আলোচনা অনেক পরিমাণে লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, আর কেহই জানিতে পারে না। এবং কর্ত্তা গৃহিণীরাও এই সকল তথ্যকে অবশ্য প্রতিপাল্য বিধিস্বরূপে না জানাতে, যুবক, যুবতীরা কিছুই শিখিতে পারে না। এই যে, দেশের মধ্যে এত রোগের বৃদ্ধি, তাহার কতকটা কারণ যেমন দৈন্য দশা, আচারের বিপর্য্যয়, উদরান্নের জন্য কঠোর চিন্তা, আপনাপন ভাবি বিষয়ে অতি ভীষণ শঙ্কা, তেমনি কতকটা দাম্পত্য নিয়ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞতা।

আমার পত্নী আমাকে কোন সময়ে বলিয়াছিলেন—"এই সকল কথা ছেলেদিগকে শিখাইতে পারিলে ভাল হয়।" আমি বলিলাম—"ক্রমে ক্রমে সকল কথাই তাহাদিগকে বলিব, না বলায় অনেক দোষ হয়" * * "দোষ হয় বই কি—না জেনেও আগুনে হাত দিলে ত হাত পুড়ে"। * * "ঠিক কথা! আমি অবশ্যই বলিব—তুমি দেখিবে আমাদের ছেলের ছেলে হইলে সে আমাদের সাক্ষাতে সচ্ছন্দে তাহাকে কোলে পিঠে করিতে এবং তাহার আদর করিতে পারিবে—লজ্জিত হইবে না।" * * * "ছেলেরা বাপ মায়ের সমক্ষে আপনাদের ছেলের আদর করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করে" * * * "বাপ মায়েরা বরাবর এমন ভাবেই চলিয়া থাকেন যে, ছেলেকে আদর করিতে হয়, তাহার ছেলে হওয়া একটা ভারী দোষের কথা।"

সপ্তচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

—•(•)•—

দলাদলি।

প্রত্যেক পরিবার এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একটি বৃহত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেই বৃহত্তর রাজ্যের নাম সমাজ। অতএব সমাজের শাসন মানিয়া তাহার অঙ্গীভূত পরিবারগুলিকে চলিতে হয়। যে সকল দেশে রাজার এবং সমাজে ভিন্ন ভাব নাই, প্রত্যুত রাজা এবং তাঁহার প্রতিনিধি-রাজপুরুষেরাই সমাজের নেতা এবং রক্ষিতা, সে সকল দেশেও রাজশাসন ভিন্ন একটি সমাজশাসন থাকে। কিন্তু সেখানে রাজশাসনে এবং সমাজশাসনে ব্যাপ্য ব্যাপক ভেদ মাত্র দেখা যায়। সেখানে রাজশাসন যে যে বিষয় গ্রহণ করে, সমাজশাসন সেগুলিকে ত গ্রহণ করেই, তদ্ভিন্ন অপর অনেকানেক ব্যাপারেও সমাজ শাসনের হস্ত বিস্তৃত হয়। চুরির নিষেধ রাজশাসন হইতেও হয়, আর সমাজ শাসন হইতেও হয়। কিন্তু 'এই এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিবে' ইত্যাদি কথা সমাজ শাসনের মুখে শুনা যায়, রাজশাসন এমন সকল বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলেন না। বস্তুতঃ রাজশাসন অপেক্ষা সমাজের শাসন অধিকতর ব্যাপক। কিন্তু তাহা হইলেও এই বঙ্গদেশে সমাজ শাসনের গৌরব বড় অল্প নহে। যে দেশে রাজায় এবং সমাজে ভিন্ন ভাব সে দেশে রাজা এবং রাজপুরুষেরা সমাজের রক্ষিতা এবং নেতা না হইয়া তাহার প্রতি উদাসীন বা তাচ্ছিল্য অথবা ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ সম্পন্ন, সেখানে সমাজ শাসনের বল কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। সমাজ শাসন কুণ্ঠিত হইলে ক্রমশঃ জাতীয় ভাবও বিলুপ্ত হইয়া যায়, জনগণের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির ন্যূনতা জন্মে এবং ধর্ম্মবুদ্ধির মূল অশক্ত হইয়া পড়ে।

আমাদের এই পরাধীন দেশে এখন ঐরূপ হইতেছে। আমাদের রাজা ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী; এবং অনেকস্থলেই আমাদের সামাজিক নিয়মের এবং শাসনের বিদ্বেষ্টা। কোন অপরাধের জন্য কাহার ধোপা নাপিত হুঁকা বন্ধ করা, তাহাকে একঘরিয়া করা প্রভৃতি সামাজিক শাস-

দের সহিত রাজপুরুষেরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না। বরং যাহার প্রতি ঐরূপ সমাজ শাসন বিহিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি যদি রাজ-দ্বারে যাইয়া নালিশ করে তবে কোনরূপে দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে ফেলিয়া উক্তরূপ সামাজিক শাসন বিধানকারী সমাজের নেতৃবর্গকে দণ্ডিত করিতে পারা যায় কি না, সেই দিকেই যেন প্রথমে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি যায় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস। "আক্রমণ" "ভয় প্রদর্শন" "মিথ্যাপবাদ রটন" প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে ইংরাজী দণ্ডবিধি আইনের ধারাগুলি এমনি দূরব্যাপী যে কাহাকেও সমাজ শাসনে শাসিত করিবে অথচ দণ্ডবিধি আইনের এইরূপ কোন একটি ধারার মধ্যে পড়িয়া দণ্ডনীয় হইবে না, এরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব বলিলেও চলে। তবে যদি সমগ্র সমাজের লোক একজোট হয়, যদি প্রকৃতপক্ষেভাবে অপরাধীর প্রতি সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে, অপরাধীর সহিত সমাজস্থ সকলের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সকল বিঘ্ন বিপত্তি অতি-ক্রম করত সমাজ শাসন অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে। মনে কর কোন ব্যক্তি কোন গৃহস্থের বয়স্থা বিধবা কন্যাকে কুপথগামিনী করিল। ইংরাজী আইন ত উহাকে দোষ বলিয়াই ধরিবে না। হিন্দু সমাজের চক্ষে অপরাধ কিন্তু বড় গুরুতর! অপরাধীকে এক ঘরিয়া করিয়া দণ্ড দিবার চেষ্টা হইল। যদি গ্রামশুদ্ধ—দেশশুদ্ধ হিন্দুর মনে এই অপরাধের উপর প্রকৃত হিন্দু সন্তানোচিত বিদ্বেষ বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে অপরাধী নিজ গ্রামে, এমন কি দেশের মধ্যে কুত্রাপি দাস দাসী আত্মীয় স্বজন বন্ধু পাইবে না। তখন অগত্যা তাহাকে সমাজের পায়ে পড়িয়া সমাজ কর্ত্তৃক বিহিত হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তাদিরূপ শারী-রিক ও আর্থিক দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে এবং সেই দণ্ডের দৃষ্টান্তে অপরেও অনেকটা আত্মসংযম শিক্ষা করিবে—ওরূপ অপরাধ করিতে আর সাহসী হইবে না। কিন্তু কলে আর এখন সেরূপ হয় না। দেশমধ্যে ধর্ম্মভাবের ন্যূনতা ঘটায় অপরাধী ব্যক্তিকে আর আজ কাল [illegible] হইয়া পড়িতে হয় না। অর্থবল থাকিলে অথবা সমাজের নেতা[illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষভাব আছে, কৌশলপূর্ব্বক

বিশিষ্টরূপে তাহার উদ্রেক করিয়া ফেলিতে পারিলে, সকল অপরাধী ব্যক্তিই একটা দলাদলি বাধাইয়া ফেলিতে পারে।

(১) "উনি এক ঘরে কর্ব্বেন বলেছেন, কেন উনি সমাজের মোড়ল আনা নাকি! আমিও ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দু দশ টাকা দিয়া থাকি; আমারও লোক বল আছে। দেখি ওঁর দলেই বা কজন হয়, আমার দলেই বা কজন থাকে।" (২) "তুমি যখন আমার কাছে আসিয়া পড়িয়াছ তখন তোমার কোন চিন্তা নাই। দেখি কাহার সাধ্য তোমাকে একঘরে করে। আপনার বেলা এক রকম, পরের বেলা অন্য নিয়ম! আহা! কি সাধু পুরুষ রে! নিজের দোষগুলি একবার স্মরণ করিয়া দেখুন না। নিজের ভাগিনেয়ের চরিত্র স্মরণ করুন না" (৩)—তোমাকে এক ঘরে করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে? কাল যার বাপ গামছা কাঁধে ক'রে বাজার ক'রে মাসে আড়াই টাকা রোজগার করিত, আজ ঠিকেদারীর চুরীতে' তার কিছু টাকা হয়েছে ব'লে সে যা ইচ্ছা তাই কর্‌বে নাকি? শর্ম্মা বেঁচে থাকতে ত তা হচ্চে না। এখনও মগের মুল্লুক হয় নাই!"—এরূপ কথার প্রয়োগ এবং তদনুরূপ ব্যবহার অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়।

সমাজ মধ্যে ধনলোভ এবং ঈর্ষা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া অধর্ম্মের প্রতি লোকের ঘৃণা কম হইয়া পড়াতেই এদেশে সমাজের শাসন ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দলাদলিরও প্রাদুর্ভাব বাড়িতেছে। অপরাধীর পক্ষ গ্রহণ করিতে কাহারও আর লজ্জাবোধ বা সঙ্কোচ হইতেছে না। সমাজের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা আর তত পরকালের ভয় করেন না; দূরদর্শন অভাবে সমাজে নৈতিক শাসনের জন্যও তাঁহারা আর তত একাগ্র নহেন। সুতরাং সমাজের এক অংশ দুষ্টের দমন ইচ্ছা করিলে অপর এক অংশ আগ্রহসহকারে অপরাধীর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়। দলাদলি একবার প্রকৃত প্রস্তাবে বাধিয়া গেলে স্বপক্ষীয় দুষ্টের পালনই যেন পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। দলাদলির আক্রোশে এতটা ধর্ম্ম লোপ হয় যে তজ্জন্য কোথাও কোথাও জ্ঞাতিদিগের মধ্যে অশৌচগ্রহণ এবং একত্রে শ্রাদ্ধ কামান প্রভৃতি সনাতন ধর্ম্মানুমোদিত দেশব্যাপী প্রথা একেবারেই ব্যতিক্রম হইয়া নৈতিক সমবন্ধির অতি শোচনীয় অবস্থা

সূচিত করে। অথচ ঐ দলাদলির মধ্যে কোন দুষ্টের দমনের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এখন অধিকাংশ দলাদলিই বিষয় সম্পত্তি লইয়া অথবা শুধু ধনগর্ব্বিত জ্ঞাতিদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যাসম্ভূত মনান্তর হেতু গ্রামের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক দলবন্ধন মাত্র। এই প্রকার দলাদলি একান্তই ধর্ম্মহানি কর। সাধারণ মানুষ্যকে খাটি রাখিবার জন্য সামাজিক শাসন একান্তই প্রয়োজনীয়। এবং পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে দলাদলি ঘটিলে সামাজিক শাসনের কার্য্যকারিতা অনেক পরিমাণেই নষ্ট হয়। মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দমন জন্য সামাজিক শাসন ইংরাজদিগের মধ্যেও কমিতেছে বটে, কিন্তু এখনও বেশ প্রবল আছে। এক সময়ে উহাঁরা ধর্ম্মমতবাদ সম্বন্ধেও সমাজের শাসন প্রয়োগ করিতেন। রোমান কাথলিকেরা এবং প্রোটেষ্টাণ্টেরা উভয়েই সমাজ মধ্যে প্রতিপক্ষীয় মতাবলম্বীদিগের স্থান দিতে চাহিতেন না —সকলেই কাথলিক হয় বা সকলেই প্রোটেষ্টাণ্ট হয়, বলপ্রয়োগপূর্ব্বক সেরূপ চেষ্টা করিতেন। কাথলিকে এবং প্রোটেষ্টাণ্টে বিবাহাদি এমন কি আহারাদি পর্য্যন্ত সমাজশাসনে বন্ধ ছিল। কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনীর গর্ভজাত সন্তান ইংলণ্ডের রাজাসন পাইবে না আজও সেই প্রাচীনকালের দলাদলি প্রসূত ব্যবস্থা প্রবল রহিয়াছে। এখন মতবাদাদি সম্বন্ধে উহাঁদের মধ্যে সামাজিক শাসন ওরূপ প্রকট নাই বটে কিন্তু আচার ব্যবহার বেশ ভূষা সম্বন্ধে শাসন খুবই আছে। অনেক গুরুতর নৈতিক দোষকে ইংরাজেরা সামাজিক দোষ বলিয়াই ধরেন না বটে, এবং অনেক সময়ে স্বজাতীয়ের পক্ষপাতিতা জন্য সমস্ত নীতির উপর পদাঘাত করাই উহাঁরা উচিত মনে করেন বটে, কিন্তু যাহা উহাঁদের সমাজ মধ্যে দোষ বলিয়া স্থির আছে, তজ্জন্য সামাজিক শাসন বেশ দৃঢ়রূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্যর চার্ল্‌স ডিলকি, পার্ণেল প্রভৃতি বিশিষ্টরূপ উচ্চপদস্থদিগের চরিত্র সম্বন্ধীয় অপরাধ ইংরাজ সমাজে মার্জ্জনীয় বোধ হয় নাই; এবং সমাজের শাসনে উভয়ে অনেকটা উপযুক্তরূপেই কষ্ট পাইয়াছেন। তাহাতার নির্ব্বিশেষে সকল অবস্থায় ইংরাজের পক্ষসমর্থন না করিলে উহাঁরা আপনাদের মধ্যে সামাজিক দণ্ড প্রয়োগ করেন, এবং সেই দণ্ড প্রয়োগ হইলে উহাঁদের সমাজে কি ধরণে কার্য্য চাল তাহা

লর্ড রিপনের ইলবার্ট বিল, জষ্টিস হোয়াইট কৃত ইংরাজহত্যাকারীর প্রাণদণ্ড এবং লর্ড লিটনের ফুলার মিনিট সম্বন্ধে দেশীয় ইংরাজদিগের ব্যবহার এবং ঐ দণ্ডের ভয়ে কি হয় তাহা ডিফেন্স আসোসিয়েশন, নানাস্থানে ইউরোপীয় অপরাধী সম্বন্ধে ইউরোপীয় জুরীদিগের বিচার ও ইংরাজ সদস্য নির্ব্বাচন সমিতি সমূহের ব্যবহারাদি স্মরণ করিলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। উহাঁরাও এক ঘরে করেন—সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অভিনন্দনাদি করেন না, "ক্লাবে" লয়েন না। এদেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা অনেকটা প্রকাশ্য ভাবেই আপনাদের মধ্যে সামাজিক দণ্ড প্রয়োগে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং উহাঁদের সমাজের একেবারে অপ্রতিহত ক্ষমতা! তবে দুষ্টাচারের বিরুদ্ধে ঐ ক্ষমতার প্রয়োগ কম হয়, "দল ছাড়াই" উহাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অপরাধ বলিয়া গণ্য।

একটি কথা এই যে, সহর অঞ্চলে পরস্পরের কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ একেবারে ওদাসীন্য জন্মিতেছে তাহা কোন অংশেই হিতকর নহে। ইহা অপেক্ষা পল্লীগ্রামের দলাদলিও ভাল। উহা সমাজের রুগ্নাবস্থার দ্যোতক। সহরের ব্যাপার সমাজের একেবারে অস্তিত্ব লোপের সূচনা করে! দলাদলিতে তবুও কতকটা শাসন থাকে; সুতরাং লোকের কতকটা চক্ষুলজ্জাও থাকিয়া যায়। প্রকাশ্য আন্দোলন উপেক্ষা করিবার উপযোগী নির্লজ্জতা ত আর সকলের নাই; এবং সকল অপরাধীর জন্যই ত বহু অর্থ ব্যয়ে দলাদলির সৃষ্টি হয় না। সেই জন্য দলাদলি সত্ত্বে এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে অপরাধীর প্রকৃত শাসন হয়।

যোল আনা সমাজ লইয়া একমাত্র দল এবং দুষ্টাচারের শাসনে সমস্ত সামাজিক বল প্রযুক্ত—এই অবস্থাই একান্ত প্রার্থনীয়। দলাদলির প্রাবল্যে ক্ষমতাপন্ন অপরাধীর সুবিধা এবং নিরীহ ভদ্রলোকদিগের কষ্ট হয়, এজন্য উহা বড়ই মন্দ জিনিস! সমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে সামান্য ঈর্ষ্যাদ্বেষ জনিত দলাদলির পোষণ দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য অশান্তির অব্যর্থ বীজ বপন করেন। দলাদলিপ্রধান গ্রামে পারিবারিক শাসন ও ভ্রাতৃবাৎসল্যাদি

জ্ঞান করিয়া যায়। "ঘরে আগুন দিব, বহিঃশত্রুকে বা ভিন্নজাতীয় লোককে —বাড়ীর অংশ বেচিব"—এ সকল দুষ্প্রবৃত্তির মূল " দলাদলি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে ইহাই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের কারণ। অভিমান ছাড়িয়া বিনীত হইয়া এমন কি সাধারণে যাহাকে প্রথম প্রথম হীনতা বলিবে— তাহাও স্বীকার করিয়া দলাদলি মিটাইয়া ফেলা উচিত। যিনি তাহা করিতে পারেন তিনিই মহৎ। সাধারণে তাঁহাকে অবশেষে মহৎ বলিয়া জানিবে। আমরা জানি কোন গ্রামে দুই দল ছিল। একদলের যিনি প্রধান তিনি অপর দলের প্রত্যেক লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া বলিলেন যে, কর্ত্তাদের আমল হইতে আমাদের মধ্যে দুই দল চলিয়া আসিতেছে। আপনারা ভিন্ন গ্রাম ভুক্তদিগের দলে। কিন্তু কি জন্য তখন দলাদলি হইয়াছিল এখন তাহা অনেকের জানাও নাই। আমরা এখন এক গ্রামে দুই দল হইয়া থাকি কেন?"—বলা বাহুল্য যে সে গ্রামে আর দলাদলি নাই।

আর এক ব্যক্তি গ্রামের মধ্যে কোন দলাদলিতেই যোগ দিতেন না। তাঁহার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি বাধিলেও তিনি সকলের সহিতই পূর্ব্বের মত সম্বন্ধ রাখিতেন। তিনি সকল দলেই যাইতেন। সকল দলের লোকই তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন। তিনি দলাদলির বাহিরেই রহিলেন। দলাদলিতে ঢুকিতে না চাহিলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে দলাদলিতে সহজে পড়িতে হয় না। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি কখন মিউনিসিপাল ইলেক্‌শনে কাহার জন্য "ভোট" দেন নাই। তিনি বলিতেন—"আমাদের নিজেদের দলাদলিতেই যথেষ্ট সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আর বিলাতী দলাদলির আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই।"

অন্য বর্ণের দলাদলি নিজেদের মধ্যেও অনেকে জানেন। বিলাত ফেরতদিগকে লইয়া এখন একটা দলাদলির প্রধান কারণ হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে বিলাত ফেরত বৈদ্য, কায়স্থ, তিলিকে উপলক্ষ করিয়া অন্য বর্ণের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয়। সেটা যে কতটা মূর্খতা তাহার বর্ণনা করা যায় না। কোন বৈদ্য বা কায়স্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিলে তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দলাদলি কেন হয়? যদি বৈদ্য এবং

কায়স্থ সমাজের কতক অংশও তাহাকে জাতিতে লয় এবং সে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করে, তবে আর সে পতিত থাকিবে কেন? উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে—এবং প্রকৃতরূপে দীনতা স্বীকার করিলে সমাজের কর্ত্তব্য অপরাধের মার্জ্জনা করা। "মার্জ্জনা নাই" এরূপ অহিন্দু ভাব পোষণ করিতে নাই।

এইরূপ বুঝিয়া চলিলে সমাজের নেতৃবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অনেক দলাদলি মিটাইয়া এবং সকল দলাদলির তীব্রতা অনেকটা কমাইয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন ঘটিয়া উঠে যে একটা না একটা দলে না পড়িয়া সাধারণের বাঁচিবার উপায় নাই। কোন দলে যাইব না মনে করিলেও আত্মীয় কুটুম্বদিগের দলাদলি ক্রমে নিজের উপর আসিয়া পড়ে। আজকাল লোকের নীচতাও এত অধিক হইয়াছে যে যজমানেরা অন্যায় কার্য্যে নিজ নিজ পুরোহিতদিগের মত পাইবার প্রার্থনা করিতে সাহস করে এবং তাহা ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিশেষে অনেকস্থলে পাইয়াও থাকে! পুরোহিতদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চার ত্রুটি এবং সামান্য ধনলোভই এই শোচনীয় অবস্থার মূল। অনেকে অধীন, অনুগত, প্রজা এবং খাতক দিগকে বলপূর্ব্বক দলাদলির মধ্যে ফেলে। এমন কি দলাদলির পাণ্ডারা একস্থানে পুরুষানুক্রমিক কোন দেব মন্দিরের পূজারীকেও শুধু দলাদলির খাতিরে হৃতসত্ব করিতে ভীত হয় নাই। এ সকল অধর্ম্ম ও অত্যাচারের ভিতরে প্রত্যেক পরিবারের কি কর্ত্তব্য? ধীরভাবে উৎপীড়ন সহ্য ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। সকল অবস্থাতেই ন্যায়পক্ষে দৃঢ় থাকা ভিন্ন অন্য কোন উপদেশই গ্রহণ করিতে নাই। উহাতে ঐহিক কিছু কষ্ট হইলেও পরকালের উপকার হয় এবং পরিবার মধ্যে বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ দ্বারা ইহকালেও পুত্রাদির চরিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে যে মহৎ উপকার আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

———::•::———

অষ্টচত্বারিংশ প্রবন্ধ।

-:*:

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ

পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে পর লোকের গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া উচিত। এই শাস্ত্রীয় উপদেশের তাৎপর্য্য একটু ভাবিয়া বুঝিতে হয়। প্রথম কথা এই যে, পঞ্চাশৎ বৎসর শব্দটী এস্থলে গৌণার্থেই গৃহীত। উহা শরীরের একটি অবস্থা বিশেষকে জানায়, বয়সের বৎসর-সংখ্যামাত্রকে বুঝায় না। যে অবস্থায় শরীরের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির পর যে সাম্যাবস্থা হয়, তাহারও শেষ হইয়া জরা বা বার্দ্ধক্যের স্থিরতর প্রবৃত্তি হয়—পঞ্চাশৎ বৎসর শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য সেই অবস্থা। সচরাচর পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়া গেলেই এদেশে শরীরের সেই অবস্থা দাঁড়ায়। শাস্ত্রীয় বচনের তাৎপর্য্য এরূপে না বুঝিলে অনেক স্থানেই দোষ পড়ে। সকলের শরীর সমান নয়—কাহারও ৬০।৬৫ বৎসরেও শরীর বিলক্ষণ শক্ত থাকে—কাহারও আবার ৪০।৪৫ বর্ষেই বার্দ্ধক্য দশা প্রবর্ত্তিত হইয়া যায়—পরিবারের বা স্বজনের বা সমাজের উপকার করিবার কোন ক্ষমতাই থাকে না, বস্তুতঃ সমাজ এবং স্বজনদিগের উপর একটী বোঝার মত ভার হইয়া থাকিতে হয়। উপকার করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইলেই সমাজ পরিত্যাগ করা উচিত। দ্বিতীয় কথা, বনে যাইতে হয়, এই কথা-টীরও মুখ্যার্থ গৃহীত হইতে পারে না। সকল বুড়া মানুষেই বনে যাইবে, শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ হইতেই পারে না। এখন দেশে যত বন আছে, তাহাতে দেশের সকল বুড়া মানুষ ধরিতে পারে না। সকলে বনে গেলে বন আবাদ হইয়া উঠে—আর বনই থাকে না। তবে শাস্ত্রার্থ এই বুঝা গেল যে, নিজ শরীর পরোপকার সাধনে অসমর্থ হইয়া আসিলে সংসার ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে থাকিবে, ইহাই বিধি।

এরূপ করায় সমাজকে অক্ষম অকর্ম্মণ্য লোকের ভার বহন হইতে মুক্তি দেওয়া হয়—অথচ ভিক্ষা প্রদানের কতকগুলি প্রকৃত পাত্রের সৃষ্টি

হওয়াতে, যাহাকে,তাহাকে ভিক্ষা দেওয়ার যে দোষ, তাহাও সহজমধ্যে সংঘটিত হইতে পারে না। আর পরিবারের পক্ষে বিশেষ উপকার এই হয় যে, গুরুলোকের কথা অমান্য করিয়া কাজ করায় পরিবারস্থ লোকের যে ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে তাহাও হইতে পায় না। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ অক্ষম এবং অবুঝ হইলেই যদি বাটী হইতে চলিয়া যান, তবে প্রৌঢ়েরা আপনারা বুঝিয়া সুঝিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন সময় কিরূপ পড়িয়াছে তাহা ঠিক বুঝিতে পার না—আপনার পূর্ব্বকালের সংস্কার যেমন, তাহারই অনুরূপে কোন কাজটী করিতে বা না করিতে চাও—কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরা বেশ দেখিতেছে যে, তুমি ঐ বিষয়ে ভুল বুঝিতেছ—তুমি যে কার্য্যের আদেশ বা নিষেধ করিতেছ, তাহাতে বিলক্ষণ ধনক্ষতি অথবা মানহানি কিম্বা কার্য্যধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। তাহারা করে কি?—তুমি বাপ কিম্বা মা কিম্বা অপর কোন গুরুলোক, তোমার কথা না শুনিলে তোমার প্রকাণ্ড অভিমান হয়, তোমার কথা শুনিলে তাহাদের বড়ই ক্ষতি হয়। তোমাকে বঞ্চনা করা ব্যতিরেকে তাহাদের ত উপায়ান্তর নাই? কিন্তু তাহা করিলে কি তাহাদের কপটাচার হয় না? এবং তজ্জন্য তাহাদের স্বভাব দুষ্ট এবং তোমার প্রতি তাহাদের চিত্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া যায় না? অতএব যাহাদের ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত চিরজীবন এত যত্ন করিয়াছ, এখন আর তাহাদের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের মায়া ছাড়িতে না পারিয়া তাহাদেরই ধর্ম্মে ব্যাঘাত করিও না, তাহাদের জীবনপথের কণ্টক স্বরূপ হইও না। যাঁহাদের চিরভক্তির পাত্র ছিলে, তাহাদের বঞ্চনার সামগ্রী হইও না—তাহাদের গালি খাইও না। তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও। যদি নিজের জীবিকার উপায় কিছু থাকে—তাহা হইলে ত কথাই নাই; স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পার; শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মচর্চ্চা, শিষ্টালাপাদিতে অবশিষ্ট জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে পার। যদি নিজের কিছু না থাকে, এবং পুত্রাদির প্রতিই নির্ভর করিতে হয়, তাহাদিগের উপর যত অল্প ভার দিয়া চলে তাহাই ভাল—কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার চেষ্টা কর। আপনার অবশ্য করণীয় কার্য্যগুলি নিজ হস্তে সম্পন্ন করিলে শরীর বহুকাল পটু থাকে।

অতএব স্বপাকে খাও, নিজ ব্যবহারের জলাদি স্বয়ং আহরণ কর, আপনার বাগনগুলি আপনি মাজ—বেশ থাকিবে, খরচও কম লাগিবে, ছেলেদের উপর ভার লঘু হইবে। যদি পুত্রাদি হইতে সহজে সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে বরং ভিক্ষা করিয়া খাইও, তথাপি তাহাদের গলগ্রহ হইও না। কারণ গুরুলোকেরা গলগ্রহ হইয়া পড়িলে পুত্রাদির ধর্ম্মহানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আমার এই সকল কথাতেই বুঝা যাইবে যে, আমি বৃদ্ধদিগকে নির্ম্মায় হইতে অর্থাৎ পরিজনদিগের প্রতি প্রীতিমমতাপরিশূন্য হইতে বলিতেছি না। বরং প্রীতি মমতা বাড়াইতেই বলিতেছি, এবং পরিজনদিগের ধর্ম্ম-রক্ষার অনুকূল যে ব্যবহার, তাহারই উপদেশ দিতেছি। তুমি বৃদ্ধ এবং অক্ষম হইয়াছ, নিজ বাটী হইতে পৃথক্ হইয়া থাক—পরিজনদিগকে তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন অথবা তোমার অভিমানের ভয়ে তোমাকে বঞ্চনা করিতে বাধ্য করিও না। একান্ত মনে তোমার সেবা শুশ্রূষা করাতেও তাহাদিগের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা তুমি স্বতন্ত্র হইয়া থাকিলে যেমন অবিমিশ্রভাবে হইবে, তাহাদিগের মধ্যে জড়াইয়া থাকিলে তেমন বিশুদ্ধ-ভাবে হইবে না। তুমি তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিলে তাহারা আপনাদের সুবিধ হইলেই ধীরে সুস্থে তোমার তত্ত্ব লইবে, তোমার নিকটে যাইবে, তোমার সেবা করিয়া সুখী এবং ধর্ম্মভাগী হইবে। যখন তাহারা ঘর কুরনার নানা জ্বালায় বিব্রত, রাজদ্বারে নালিস রুজু হওয়াতে উকীল মোক্তারদের সম্‌জাইবার জন্য উদ্বিগ্ন, সন্তান সন্ততির পীড়ার উপশমের নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল, এমন সকল সময় তোমার সেবাও তাহাদের পক্ষে ক্লেশদায়ক। সেই ক্লেশ হইতে এবং তজ্জনিত পাপভার হইতে পরিজনকে বিমুক্ত রাখা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। ফরাশিদিগের আইন অনুসারে ত্রিষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তি উপার্জ্জনক্ষম হইলে পুত্রের নিকট হইতে ✓০ হইতে ।✓০ আনা পর্য্যন্ত এবং পৌত্রের নিকট হইতে তদর্দ্ধ পরিমিত খোরাকীর দাবী করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে কথা অথবা এক্ষণে এতদ্দেশ প্রচলিত ইংরাজী আইনের কথা বলিব না। সে আইনের মতে প্রসবিনী মাতারও খোরপোষের জন্য কৃতী পুত্রের বিরুদ্ধে নালিস চলিতে পারে না।

(সংক্ষিপ্ত)

ভূদেব জীবনী।

রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ।
সাধবো যং প্রশংসন্তি স পার্থ পুরুষোত্তমঃ॥

নির্ম্মল চরিত্র, গভীর বিদ্যাবত্তা, অকপট স্বধর্ম্মভক্তি, প্রগাঢ় স্বদেশবাৎসল্য এবং শিক্ষাবিভাগে পদগৌরব, এই সকলের বৈশিষ্ট্যে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি আই মহাশয় তাঁহার সমকালিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আদর্শ জীবনে এবং গ্রন্থাবলীর উপদেশে পাশ্চাত্য স্বদেশভক্তির ও উদ্যমের এবং প্রাচ্য ধর্ম্মপরায়ণতার শুভ সম্মিলন দেখা যায়। সেই জন্যই উহা ভারতের নূতন জীবন গঠনে গূঢ়ভাবে সাহায্য করিতেছে এবং ক্রমশঃই অধিকতর পরিমাণে করিবে। উহাঁর প্রদর্শিত পথই যে আমাদের প্রকৃত পথ—নীরবে অনাড়ম্বরে জন্মভূমির সেবা!

হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর গ্রামে ইহাঁদের পূর্ব্বনিবাস। ভূদেব বাবুর পিতামহ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। সরিকি বিবাদ হইলে তিনি পৈতৃক জমিজমার এবং সম্পত্তির কিছু মাত্র অংশ না লইয়া রিক্তহস্তে বাটী ত্যাগ করেন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার এই ত্যাগ হইতেই তাঁহার বংশের উন্নতি দেখা যায়—অসামান্য পুত্র ও পৌত্র লাভ হয়। কলিকাতা

হরীতকী বাগান লেনে ১৮২৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (৩রা ফাল্গুন রবিবার) ভূদেব বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতৃ পিতামহাদি মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল এবং সকলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ জীবনের শাস্ত্রাদিষ্ট অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ প্রতিপালন করিয়া চলিতেন।

ভূদেববাবুর পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল এবং সচরাচর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় তাঁহার বিষয় জ্ঞানেরও অভাব ছিল না। ভারতের নানা তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে অনেক দেশ ভ্রমণের গুণে সে দোষ হইতে তিনি সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অনৈক ছাত্র ৺ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহার সম্পূর্ণ সাহায্য লইয়া মনুসংহিতার এক উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। গোল্‌ডষ্টকার সাহেব এই অনুবাদের প্রশংসা করতঃ উহা স্যর উইলিয়ম জোন্স কৃত অনুবাদ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলিয়াছিলেন। তাঁহার দুই জন ছাত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্বংমোদ নামক মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষতা লইয়া তর্কভূষণ মহাশয় অনেকানেক পুস্তকাদি ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি বার্ষিক পঞ্জিকা প্রকাশিত করেন। উহা তৎ-কালে কলেজের পাঁজি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মহারাজা রণ-জিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় স্বাধীন এবং অপরাপর করদ এবং মিত্র হিন্দু রাজগণ যত্নপূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে ঐ পঞ্জিকা গ্রহণ করি-তেন। ১২৪০ সালে তর্কভূষণ মহাশয় ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকুড়ায় জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত বিদ্বন্মোদ যন্ত্র হইতে তৎকর্ত্তৃক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার (কিয়দংশের) টীকায় তাঁহার বেদান্তদর্শনে শ্রদ্ধা, শান্তিশতকের টীকায় তাঁহার আন্তরিক

বৈরাগ্য, স্বাধবোধিনী নামক বালক শিক্ষার প্রক্রিয়ায় তাঁহার শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান, এবং অনেকানেক বাঙ্গালা গদ্য পদ্য প্রাচীন গ্রন্থের মুদ্রণে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের এবং বেদের শিরো-ভাগ উপনিষদে পরস্পর অভিন্ন মতবাদেই প্রকটিত হইয়া আছে এবং সদ্গুরুর সাহায্যে উচ্চাধিকারী তান্ত্রিক সাধক শরীর ও মনের এত উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন যে, সর্ব্বরিপুজয়ী হইয়া "সুরনর-সমান ক্ষিতিতলে" বিচরণ করিতে পারেন; ভ্রষ্ট মদ্যপ শাক্ত দেখিয়া তন্ত্রে অভক্তি বা নেড়ানেড়ি মাত্র দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে অভক্তি করা অনুচিত; কোন সম্প্রদায়েরই একান্ত নিকৃষ্ট অধিকারিগণ মনোহর নহেন; তন্ত্রই কলির বেদ; তন্ত্রে শক্তি সঞ্জীবনের উপায় আছে। তর্কভূষণ মহাশয় নিজে শব সাধনাদি করিয়াছিলেন কিন্তু কোনরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। বিজয়া দশমীর দিন কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা কপালে একটি সিদ্ধির ফোঁটা লাগাইতেন মাত্র। তিনি এ বিষয়ের উল্লেখে বলিতেন কোন কোন ফৌজ ব্র্যাণ্ডি মদ খাইয়া, কোন কোন ফৌজ বা ভাঙ খাইয়া যুদ্ধে তোপের মুখে ধাওয়া করিবার সাহস অর্জ্জন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সিপাহী শুদ্ধাচারে থাকিয়া সহজ ভাবেই মনের জোরে যুদ্ধে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে চলিয়া যায়; উচ্চ তান্ত্রিক সাধক জগজ্জননীকে মা মা বলিয়া ডাকিয়াই শ্মশানে অমানিশায় শবসাধন কার্য্যে মনে তেজ এবং শরীরে বল পাইয়া থাকেন—অন্য কোন প্রকার অসৎ বা দুষ্ট অবলম্বনের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি আরও বলিতেন যে, পুরাণশাস্ত্র সমুদয় লৌকিক ব্যাপারগুলিকে অবলম্বন মাত্র করিয়া বেদের শাস্ত্র সকলকে ব্যাখ্যাত করে। তাঁহার মতে মহাভারত গ্রন্থ কর্ম্মকাণ্ড বেদকে এবং রামায়ণ উপাসনাকাণ্ড বেদকে

সুবিস্তৃত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছিল। তিনি পৌরাণিক সকল আখ্যায়িকারই এক একটি গূঢ়ার্থ প্রকটিত করিতেন এবং শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্যার্থ যে সেই উপনিষদুক্ত পুরুষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলে অতি সহজে এবং সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি মহামুনি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ভাব ব্যাখ্যাত করেন। উহারই আদিকাণ্ড মাত্র "বিশ্বনাথ রামায়ণ" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি একজন ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। সংসারাশ্রমের সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাহিত করিয়াও লোভ মোহ মাৎসর্য্য অভিমানাদির সর্ব্বতোভাবে অনধীন এবং শোক হর্ষ বিষাদ বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সজ্ঞানে ৺ ভাগীরথীতীরে তর্কভূষণ মহাশয়ের পরম গতি লাভ হওয়ার পরে সোমপ্রকাশপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রকাশিত হয়—

"স্বর্গীয় তর্কভূষণ মহাশয় একজন অতি প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্র এবং মিশ্রের প্রণীত ঘটকদিগের গ্রন্থেও তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন ছিল। × × তিনি একান্ত সত্যবাদী ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মানুষ্ঠান তাঁহাকে ভয় লোভ কামাদি রিপুবর্গের একান্ত অতীত করিয়াছিল। তিনি এই নব্যকালে প্রাচীন ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি সংস্কৃত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি ইংরাজী ব্যবসায়ী নব্য সম্প্রদায়ের লোক, সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার তেজোগর্ভ সসার বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এবং স্বয়ং ধর্ম্মকার্য্যে উত্তেজিত

হইয়া যাইতেন। তাঁহাতে ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রগুণ সর্ব্বতো-ভাবেই বিদ্যমান ছিল।”

ভূদেব বাবু তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি নামক গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে পিতৃদেব তর্কভূষণ মহাশয়কে যেভাবে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাঁহা পাঠ করিলে তর্কভূষণ মহাশয়ের জ্ঞানগভীরতা এবং ভূদেব বাবুর পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।—

“হে স্বর্গীয় পিতৃদেব! তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু, আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহার স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অত্যুদার সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থ সকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইত—যাবতীয় কূটার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপকমালার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল প্রকাশ করিত—আপাত-বিরুদ্ধ মত-বাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহার প্রণালী জন্মিত—এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইত। ইহ-লোকে আর আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না। এখন জগৎকার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হইলে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া যায়। এখন কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং যাহা জানিব তাহা ঠিকই জানিব এ প্রতীতিটী এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। এই যে পুস্তক খানি লিখিয়াছি ইহার কোন্ স্থানে কি ভ্রম আছে তাহা আর কে বলিয়া দিবে? এবং আর কে বলিয়া দিলেই বা ভ্রম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিবে?

কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে। একবার তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনাইয়া লইতে পারিতাম, তবে ইহা জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্তর্ব্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি পরম্পরা-সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার—তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।"

ভূদেববাবুর মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে কেহ তাঁহার জীবন চরিত লিখিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আমাতে যাহা কিছু ভাল বলিয়া মনে হইবে তাহা সমস্তই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত প্রতিরূপ স্বরূপ আমার পিতৃদেবের গুণেই হইয়াছে ইহা যদি দেখাইতে পার তাহা হইলেই জানিবে যে আমার জীবন চরিত লেখা ঠিক হইয়াছে।"

সুকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

"ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে।
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে॥"

কবিবরের সহিত দেখা হইলে ভূদেব বাবু বলেন "তুমি আমার বাবাকে দেখ নাই, দেখিয়া থাকিলে ইংরাজী শিক্ষার উল্লেখও করিতে না।" কবিবর বলেন, "আপনার উদ্যম ও কার্য্যশৃঙ্খলা?" —ভূদেব বাবু উত্তর করেন "আমি পাল্কী চড়িয়া স্কুল পরিদর্শন করি, পিতৃদেব পদব্রজে গিয়া দেবমন্দির এবং তীর্থদর্শন করি-

তেন! আর তোমরা মনে কর প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় কার্য্যশৃঙ্খলা ছিল না? যাঁহারা জাব পদার্থের কয়েক ভজন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদের কুরুক্ষেত্রের মাঠে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর ব্যূহ রচনা হইয়া ছিল এবং যাঁহারা আশ্রমে যোগাভ্যাস রত থাকিয়া বেদ বেদান্ত পাঠনা করিতে করিতে দশ সহস্র শিষ্য খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন তাঁহাদের মাথায় এবং কাজে শৃঙ্খলা বেশ ছিল। আমরাই হীন হইয়া পড়াতে ও সকল যেন নূতন করিয়া শিখিতে যাইতেছি! আমার পিতৃদেবে ঋষিযুগের কোন গুণেরই অভাব ছিল না। অথণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় যোগশাস্ত্র হইতে শিল্প, কৃষি (বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ) চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন, বিজ্ঞান, স্থপতি বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা, জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ বা যুদ্ধশাস্ত্র এবং রাজনীতি সমস্ত শাস্ত্রই ঋষি প্রণীত। আমার পিতৃদেবও স্মৃতি এবং দর্শনের অধ্যাপনা করিতে করিতে সুঁদরী কাঠের গুঁড়া হইতে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এ দেশের কয়জন ইংরাজী শিক্ষিত ডাক্তার সেরূপ পরীক্ষা বিধানে মন দিলেন?”

ভূদেববাবুর মাতাও আদর্শ ঋষি পত্নীর ন্যায় ছিলেন। কথিত আছে তিনি ইষ্ট মন্ত্রজপের সময় কখন কখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন এবং সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার ক্লেশের সময় একবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেই যেন অমানুষিক প্রশান্ততা লাভ করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া কখনও জল গ্রহণ করিতেন না।

যখন ভূদেব বাবুর বয়ঃক্রম তিন কি চারি বৎসর মাত্র, তখন একদিন ক্রীড়াচ্ছলে তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের চর্ম্মপাদুকা পায়ে দিয়াছিলেন। পাছে পিতার জুতা পায়ে দেওয়া অধর্ম্ম হেতু সন্তানের ও পরিবারবর্গের অকল্যাণ হয়, তজ্জন্য তর্কভূষণ মহা-

শয়ের স্ত্রী নিজে উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া ছেলের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করত: তৎক্ষণাৎ সেই জুতা পুত্রকে মস্তকে বহন করাইয়া উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

এইরূপ মাতার গুণেই শিশুর মনে পিতৃমাতৃভক্তি ও ধর্ম্মে আস্থার প্রকৃত ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। গুরুজন এতই সম্মান ও ভক্তির পাত্র যে, তাঁহাদের দিকে পা করিয়া বসিলে বা শয়ন করিলে কচি ছেলেরও পাপ হয়, এইভাবে পরিবারস্থ সকলে আচরণ করিলে তবে না আশৈশব সংস্কার ও শিক্ষার প্রভাবে ছেলেরা বড় হইয়া গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিবে?

আট বৎসর বয়সে ভূদেব বাবু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নার্থ প্রবেশ করেন এবং তিন বৎসর কাল তথায় অধ্যয়নের পরই ইণ্ডিয়ান একাডেমী নামক ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক উলাষ্টন নামক একজন ইংরাজ উহাঁকে অযাচিতভাবে ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার জীবনে এই পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন। ইণ্ডিয়ান একাডেমিতে কিছু কাল পাঠ করার পর তিনি নবীন মাধবের স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। এই স্কুলে তিনি প্রথম প্রাইজ পাইলে তাঁহাদেরই বাটীতে প্রতিপালিত তাঁহার খুড়ার শ্যালক ছিরু তাঁহাকে বলে "তুমি বাড়ীর একমাত্র ছেলে। তুমি প্রাইজ না পেলেও তোমাকে কেহ কিছু বলিত না। আমি প্রাইজ না পাওয়ায় তিরস্কৃত হইব। তুমি আমাকে বইগুলি দাও, আমি নাম বদলাইয়া লইয়া যাই।" সরলমনা উদারহৃদয় বালক, প্রার্থীকে নিজের যশ এইরূপে দিয়া ফেলিলে ছিরুর খুব প্রশংসা হইল। কোনরূপ তিরস্কার বা গঞ্জনায় একথা ভূদেববাবুর দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। অনেক দিন পরে মাষ্টারের নিকট তাঁহার খুড়া ভূদেববাবুর প্রশংসা শুনিয়া জিজ্ঞাসায় ঐ প্রাইজের কথা জানিতে পারেন;—তর্কভূষণ মহাশয়কে সেকথা বলিলে তিনি বলেন "বেশ করেছিল।"

নবীনমাধবের স্কুলে পাঠের পর ভূদেববাবু মধু চক্রবর্ত্তীর স্কুলে ও তাহার পর হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় অনাস্থা এবং স্বধর্ম্মে অভক্তি খুবই বাড়িতেছিল। সময়ে অসময়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি বিদ্রূপ করাই যেন সুশিক্ষিতের লক্ষণ মনে করিতেন। প্রথম দিনই ভূগোল পড়াইতে পড়াইতে মাষ্টার রামচন্দ্র মিত্র বলেন "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল; কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করিবেন না।" পিতৃভক্ত ভূদেব বাবু গৃহে উপস্থিত হইয়াই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম?" তাঁহার পিতা সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরম সাধক তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন, "কেন? পৃথিবীর আকার গোল।" এই বলিয়া তিনি গোলাধ্যায় পুস্তক হইতে দেখাইয়া দিলেন,—"করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" পরদিন রামচন্দ্র বাবুকে গোলাধ্যায়ের ঐ অংশটি দেখাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কথাটি বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল। তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহারা পৃথিবীকে সমতল এবং ত্রিকোণ বলেন।" স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির প্রতি ভক্তি, ভূদেব বাবুর পিতৃভক্তির সহিত জড়িত ছিল।

এই সময়ে তর্কভূষণ মহাশয়ের আর্থিক কষ্ট অত্যধিক হইয়াছিল। কোন রাজবাড়ীতে তিনি বার্ষিক ৫০ টাকা বৃত্তি পাইতেন। নূতন নূতন বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইতে থাকিলে সুম্বাদ ভাস্করে ঐ রাজবাটী হইতে বিশেষ অগ্র পশ্চাৎ অনুধাবন না করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, অধ্যাপক মহাশয়েরা যেন বার্ষিক বৃত্তি লইতে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজবাড়ীতে

আসেন। ঐ বিজ্ঞাপন কাঙ্গালী জড় করার ঢেঁটরা দেওয়ার মত অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক বোধে তেজস্বী তর্কভূষণ মহাশয় ঐ রাজবাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন! কিন্তু ঐ বৃত্তি ছাড়ায় অর্থ কষ্ট বড়ই দারুণ হইয়াছিল। এই ঘটনাটী ভূদেববাবুর মনে চিরকালই জাগরূক ছিল।

হিন্দু কলেজে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের ক্লাসে ভূদেববাবু একজন সর্দ্দার পোড়ো ছিলেন। বাড়ীতে নিজের পড়া শেষ করিয়া লইয়া তাঁহার এলাকার দশজন ছাত্রকে পড়াইয়া দিতে হইত। ঐ দশ জনের কেহ পড়া বলিতে না পারিলে সর্দ্দার পোড়োরই দোষ হইত। এখনকার স্বার্থপর ছেলেরা অনেকেই এ নিয়মে আপত্তি করিবেন—তাঁহারা হিন্দুর শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছেন। পরার্থেই যে সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ জড়িত! পড়াইয়া দিতে পারিলে পড়া সর্ব্বাপেক্ষা পাকা হয়। ভোর সাড়ে তিনটা বা চারিটার সময় উঠিয়া নিজের লেখাপড়ার সব কাজ সারিয়া লওয়া তাঁহার চিরকালই অভ্যস্ত ছিল। ইহাতে অপরের কাজের জন্য সময় দিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত না। ঐ নিস্তব্ধ সময়ে শ্রান্তিশূন্য মস্তিষ্কে পড়াশুনা এবং জপ সাধনা দুয়েরই সুবিধা! এজন্য বাল্যকাল হইতেই ঐ সদভ্যাস অর্জ্জন সকলেরই করা ভাল।

হিন্দু কলেজে তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তথাকার পারিতোষিক এবং বৃত্তিসমূহ লাভ করায় তথায় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি খুবই হইয়াছিল। তাঁহার পিতা তৎসন্নিধানে থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য সকলের সম্বন্ধে যেরূপভাবে ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ সকল অপেক্ষাও উচ্চতর ভাব সকল সংস্কৃত শাস্ত্র রত্নাকর হইতে বাহির করিয়া

দেখাইতেন তাহাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব তাঁহার স্বধর্ম্ম বিশ্বাসকে এবং জাতীয় মর্য্যাদার বোধকে কখনই অধিকক্ষণের জন্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। অসাধারণ প্রতিভাশালী পাদরী ডাক্তার ডফের সংসর্গে পড়িয়া এবং মূর্ত্তিতে একাগ্রভাবে পূজার সহিত মূর্ত্তি-পূজার প্রভেদ না বুঝিয়া কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে সপ্তদশ বর্ষ মাত্র বয়সে অল্পকালের জন্য ভূদেব বাবুর হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা বলিয়া সংশয় হয়, কিন্তু তিনি সে কথা তাঁহার পিতাকে সরলভাবে বলায় জ্ঞানী সাধক এবং দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন তর্কভূষণ মহাশয় ওরূপ কথাতেও অণুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া বলেন, "ভক্তিই পূজার একমাত্র উপকরণ; তাহা না লইয়া পূজা করিতে যাওয়া কপটতা; ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। তা ছাড়া "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—ছাত্রদিগের নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নেই তপ করা হয়। এখন তোমার ঠাকুর পূজা করিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি যে, সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিলেই তোমার স্বধর্ম্মে অচলা ভক্তি হইবে। তুমি জাতীয় ধর্ম্মের অবমাননা কখনই করিতে পারিবে না।" গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থবোধ সহ ভূদেববাবুর সমস্ত ভ্রম কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি পরে বহু পুরশ্চরণ করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সন্তানকে তাহার স্বধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার যে একান্তই প্রয়োজন, তাঁহার আচার প্রবন্ধে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ভূদেববাবু তাহা লিখিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু কলেজে পাঠকালে মৌঃ আবদুল লতিফ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। একদিন তিন জনে গল্প করিতে করিতে কে কি চাহেন তাহার কথা উঠিলে যিনি পরে নবাব বাহাদুর পদবী এবং ভোপালের রাজমন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, তিনি বলেন, "রাজদত্ত উচ্চপদ প্রার্থনা করি"; যিনি পরে মেঘনাদ

বধকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি বলেন "ইচ্ছা হয় বড় কবি হইতে পারি"; যিনি পরে সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা এবং বিশ্বনাথ বংশের স্থাপয়িতা হইয়াছিলেন তিনি (বর্ত্তমান ভারতের সুপুত্র মাত্রেরই যাহা ইচ্ছা করা উচিত সেই ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া) বলিয়াছিলেন "জন্মভূমির কোন কাজে যেন অণুমাত্রও লাগিতে পারি!'

ভূদেব বাবু ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু কলেজ হইতে বাহির হইয়া বাবু চণ্ডীচরণ মজুমদার, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাহচর্যে টোলের পণ্ডিতের ন্যায় অর্থাগমের কোনরূপ ভাবনা না ভাবিয়া ইংরাজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত বিদ্যার বহুল প্রচার দ্বারা স্বদেশীয় জনগণের অজ্ঞানমোচন চেষ্টায় প্রায় তিন বৎসরকাল ইতস্ততঃ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় অধ্যাপনে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে পিতাকে অর্থ চিন্তা করিতে হইতেছে জানিতে পারিবামাত্র তিনি বাবু স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আড়াইশত টাকা ধার করিয়া পিতাকে দেন এবং ঐ ঋণ শোধ করিবার জন্য ডাঃ মৌয়াটের নিকট পরদিনেই চাকরী প্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দুইটী চাকরী খালি ছিল। হিন্দু স্কুলে ৭ম শিক্ষকের পদ ৭৫ টাকা বেতনে এবং মাদ্রাসা কলেজে ৫০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পড়াইতে পাইবার জন্য বাটী হইতে দূরস্থিত স্কুলে কম মাহিনার পদটীই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি প্রাপ্ত বেতনের অর্দ্ধেকে ঋণ শোধ করিতেন। এবং অর্দ্ধেক বাটীতে খরচের জন্য দিতেন। ঋণ শোধ হইয়া গেলে সেইরূপ অর্দ্ধেক মাত্র খরচ জন্য দিয়া অপরার্দ্ধ ব্যাঙ্কে সঞ্চয়ার্থ রাখিতেন। এই ব্যবস্থার গুণে এবং তাঁহার নিজের উপর ব্যয় খুবই কম ছিল বলিয়া তিনি ধন

সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।

ভূদেব বাবু ১৮৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষকস্বরূপে সর্ব্বপ্রথম সরকারী চাকরী করিতে প্রবেশ করেন এবং সেই বৎসরেই দেড়শত টাকা বেতনে হাওড়া জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হন।

ভূদেব বাবু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মুসলমান ছাত্রগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একজন অতীব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইলেও, কি মুসলমান, কি ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত অপর জাতীয় কাহারও প্রতি কখন তাঁহার কোনরূপ বিরাগ ছিল না।

সনাতন ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট পবিত্র পথে অবিরত নিবদ্ধদৃষ্টি তাঁহার পিতা তর্কভূষণ মহাশয়ের উদার হৃদয়ে পরধর্ম্ম বিদ্বেষের লেশ মাত্র ছিল না। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিল নানা পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" (যেমন সকল নদীই আঁকিয়া বাঁকিয়া ভিন্নপথে সমুদ্রেই গিয়া পড়ে সেইরূপে হে ভগবন্! জনগণ রুচিভিন্নতা হেতু সরল বা কুটিল পথে তোমার নিকটই যাইতেছে) তর্কভূষণ মহাশয়ের হৃদয় সনাতন ধর্ম্মের এই উদার শিক্ষায় পবিত্রীকৃত ও "সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ" (অতিথি সকল দেবতার আধার), "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।" (অভ্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বত্রই গুরুর ন্যায় পূজ্য) গৃহাগত ব্যক্তির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রের এইরূপ উচ্চাদর্শ গঠিত হইয়াছিল, সুতরাং পুত্রের মুসলমান ছাত্রগণ কেহ বাড়ী আসিলে তিনি তাহাদিগকে সযত্নে বসাইতে এবং জল খাওয়াইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ছাত্রেরা যে কোন মুসলমান মৌলবীর বাটীতে আসে নাই, একজন একান্ত আচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়াছে তাহা বাক্যে ইঙ্গিতে বা ব্যবহারে

কখন বুঝিতে পারিত না। উহাদের জন্য কাষ্ঠাসন এবং পিত্তলের ক্ষুদ্র নক্সাকাটা ঘটি ও রেকাবি ক্রয় করিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কৃত রাখা হইয়াছিল। উহারা চলিয়া গেলে ঐগুলি আবার মাজিয়া ঘসিয়া অগ্নিস্পর্শ করিয়া রাখা হইত। ফলতঃ ৺ তর্কভূষণ মহাশয়ের বাটীতে দেশাচারেরও অবজ্ঞা ছিল না এবং প্রকৃত প্রস্তাবেই অতিথি পূজা হইত।

যাহারা মনে করেন স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যত্ন হয় না এবং অপরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাস্থাপন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর নূতন বিধান, তাঁহাদের প্রবোধের জন্যই এই ব্যবহার প্রণালী এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় বচন কয়েকটী বিশেষ করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি। মূর্খ বা গোঁড়া হিন্দুর কথা বলিতেছি না, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের উচ্চাধিকারী বিশুদ্ধ হিন্দুর জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা অপেক্ষা উদারতর শিক্ষা ভূমণ্ডলে আর কখন প্রচারিত হয় নাই এবং "আজে বাজে" কাহার দ্বারা যে আবিষ্কৃত হইবে তাহাও সম্ভব নয়। এইটী একটু মনে রাখিয়া চলিতে পারিলে শাস্ত্রচর্চ্চাও বাড়ে এবং কোন আর্য্য সন্তানের নিত্য নিত্য ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন করিতেও ইচ্ছা হয় না।

উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান মৌলবীগণ যে ধর্ম্মজীবন ও ইন্দ্রিয় সংযমের পক্ষপাতী এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মও যে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ সম্ভোগের বিরোধী, ইহা ভূদেববাবু এই মাদ্রাসা কলেজের চাকরীর সময় ভাল ভাল মুসলমানদিগের সংস্রবে আসিয়া সুস্পষ্ট রূপেই জানিতে পারিয়াছিলেন। মুসলমানের প্রতি তিনি বরাবরই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলিতেন "হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। উভয়েই এখন একদেশবাসী সুতরাং একই মাতৃস্তন্যে উভয়ে পুষ্ট। ফলতঃ উহারা দুধ ভাই এমন বলা যাইতে পারে"।

ভূদেব বাবু তাঁহার পরিণত বয়সের লিখিত গ্রন্থ সামাজিক প্রবন্ধের স্থানে স্থানে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মুসলমানদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বেশ বুঝা যায়। সামাজিক প্রবন্ধ ১৪ পৃঃ হইতে কয়েকটী স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ছাপরা নগরবাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটি সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্র-মনা ব্যক্তি যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উহাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন করি তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক, মুসলমান দিগের মধ্যে এমনি উদার-চেতা, পবিত্র-কর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যমতবাদও গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম "উও হয়ে: হ্যায়" আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।"

"যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারী দিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসল মানদিগের ভারতরাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারত বর্ষ একটী সর্ব্বপ্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দিভাষাপ্রাপ্ত হইয়াছে— হর্ম্ম্য শিল্পের একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী সুসংযুক্ত হইয়াছে—সৌজন্য-রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ

যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপ্রপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অনেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটী ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।"

মাদ্রাসায় তিনি নিজের ক্লাশ পড়ান ছাড়া হেড মাষ্টার ক্লিঙ্গার সাহেবের সমস্ত পড়ানর কাজই করিয়া দিতেন এবং সুবিধা পাওয়ায় হেড মাষ্টার অনেক সময় স্কুল ছাড়িয়াই অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কিন্তু সে কথা পরিদর্শক কর্ণেল রাইলি কলেজের মৌলভির নিকট জানিতে পারিয়া তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক ভূদেববাবুকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতেও তিনি বিনীতভাবে একই উত্তর দিয়াছিলেন—"অনুগ্রহপূর্ব্বক হেড মাষ্টারকেই জিজ্ঞাসা করুন।" কর্ণেল রাইলি ইহাতে তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সমন্বিত হন এবং বলেন (young man always behave thus and you will succed in life) যুবক এইরূপ ব্যবহারই বরাবর করিও, জীবনে তোমার উন্নতি হইবে। কর্ণেল এরূপ কোপন স্বভাব ছিলেন যে, তাঁহাকে ভূদেব বাবুর অবিলম্বেই পদোন্নতি জন্য বিশেষ ভাবে সুপারিশ করিতে দেখিয়া কৌন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটরী ডাঃ মৌয়াট সাহেব ভূদেব বাবুকে বলেন, (How could you tame that tiger) "তুমি ঐ বাঘকে বশ করিলে কিরূপে?"

হাবড়া স্কুলে তিনি সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠনার পরিদর্শন করিতেন। কোন ছেলে একান্ত অনাবিষ্ট বলিয়া উক্ত হইলে উহার অভিভাবককে বলিয়া ছেলেটীকে কয়েক দিনের জন্য নিজের বাসায় লইয়া যাইতেন এবং উহার শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে তাহার অসুবিধার এবং অক্ষমতার

নিবারণ হইতে পারে তাহা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ও বালকদিগের অভিভাবকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং বালকের মনে আশা উদ্যমের সঞ্চার করিয়া দিতেন। তাঁহার সময়ে হাবড়া স্কুলের সবিশেষ প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা তথায় শিক্ষিত ও গঠিত-চরিত্র অনেকে সংসারে উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

মিঃ হজসন প্রাট ঐ সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। উহাঁর সহিত ভূদেববাবুর বিশেষ হৃদ্যতা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে হজসন প্রাট সাহেবের উল্লেখ আছে। ভূদেব বাবু তাঁহার সহিত কখন দেখা করেন না কেন, হাবড়া স্কুলে আসিয়া হজসন প্রাট সাহেব জিজ্ঞাসা করায় ভূদেব বাবু সরল ভাবে বলিয়াছিলেন "সাহেবেরা সাধারণতঃ মন খুলিয়া কথা কন না এবং চাপরাশীরা তাঁহাদিগকে খবর দিতে দেরী করে এবং গা-ঘেঁসিয়া চলে। নচেৎ ভিন্ন সমাজের সুশিক্ষিত কর্ম্মঠ ব্যক্তিদিগের সংস্রবে শিক্ষা লাভ ও স্বচিন্তার উদ্রেক করিয়া লইতে ইচ্ছা কেনই হইবে না?" ইহাতে সাহেব ব্যবস্থা করিয়া দেন যে, ভূদেব বাবু সাহেবের পড়িবার ঘরে অবাধে গিয়া বসিতে পারিবেন। ভূদেববাবুর একবার জ্বর হইলে সাহেব মেম তাঁহার বাসায় আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবুর দেহান্তের পর মিঃ প্রাট বিলাতে ঐ সংবাদ শুনিয়া তথা হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটি কথা সম্বাদ পত্রে লিখিয়া পাঠান—

"I see clearly as if it were yesterday that tall dignified figure in his pure white robe and those handsome features of fair complexion. He spoke with that thoughtfulness and gravity which mark the Hindu of high caste."

অর্থাৎ সেই সুপরিষ্কৃত শ্বেতপরিচ্ছদশোভিত, সুন্দর গৌর শরীর কান্তি, সমুন্নত, উচ্চাশয়তাসূচক আকৃতি স্পষ্টতঃ যেন চক্ষের উপরি দেখিতে পাইতেছি। সেই কতদিনের দেখা শুনা আলাপ পরিচয় যেন গত পূর্ব্বদিনের ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি কথাবার্ত্তা কহিতেন।

এই হজসন প্রাট সাহেবই বিলাতে অবস্থান কালে মধ্যে মধ্যে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "who is my best friend in India" অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু কে? ছেলেরা তাঁহার শিক্ষা মতে উত্তর দিত "ভূদেব মুখার্জ্জি"।

ভূদেব বাবুও বলিতেন "কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক ভাল ইংরাজের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, এবং তাঁহারা সকলেই যে আমার বন্ধু হইয়া পড়িয়া ছিলেন, একথা আমি বলিতে পারি।" তিনি বলিতেন "ভাল ইংরাজের কাছে গেলেই কিছু না কিছু শিখিতে পারা যায়, এবং নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল জানিয়া লইয়া আপনাদিগকে পুনরায় পূর্ব্বকালের মত ভাল করিয়া লইতে ইচ্ছার উদ্রেক হয়।" তিনি ইংরাজকে বর্ত্তমান ভারতে "সম্মিলন সাধক রাজা এবং বিধিপ্রেরিত শিক্ষক" ভাবেই দেখিতেন এবং উহাঁদের ব্যবহারিক কার্য্যশৃঙ্খলা, দলবন্ধনের ক্ষমতা, এবং প্রগাঢ় স্বদেশীপ্রেম সম্বন্ধে উহাঁদের প্রতি যথেষ্ট ভক্তিপোষণ করিতেন।

১৮৫৬ সালে ভূদেব বাবু হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার হন। এই কার্য্যে তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। তখন হুগলী নর্ম্যালের ছাত্রকে শিক্ষকরূপে পাইবার

অন্য সকল স্কুল সেক্রেটরীই চেষ্টা করিতেন। বাবু ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি এরূপ ভক্তিমান ছিলেন যে তাঁহারা যে মন্ত্র শিষ্য বা পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে কেহ বুঝিতে পারিত না। ভূদেব বাবুর দেহান্তের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে ইন্দ্রকুমার বাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। "অন্য গুরুকে আমার ভক্তি হইবে না বলিয়া আমি দীক্ষা লই নাই" এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু দীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েন। যাহাতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মনে শিক্ষক সম্বন্ধে ভারতীয় মহোচ্চাদর্শের মলিনতা না ঘটে এরূপ শিক্ষাদাননীতিই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নর্ম্যাল স্কুলে থাকিতে থাকিতেই ভূদেব বাবুর প্রথম পুত্র মহেন্দ্রদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে মৃত্যু হয়। ঐ অল্প বয়সেই বালক এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়াছিল। মহেন্দ্রদেবের তুল্য বুদ্ধিমান ও স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন বালক অতি বিরল। একদিন ভূদেববাবু অন্ধকারে বসিয়া অঙ্গুলি দিয়া পুত্রের হাতে চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইউক্লিডের পঞ্চম প্রতিজ্ঞার প্রমাণটী বলিয়া দিয়াছিলেন। বালক তাহাতেই ঐ প্রতিজ্ঞাটি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। জ্বর হইয়া কয়েক ঘণ্টামাত্র মধ্যে বালকের মৃত্যু হয়।

পারিবারিক প্রবন্ধের "গৃহে মৃত্যু ঘটনা" প্রবন্ধটিতে এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে *। তর্কভূষণ মহাশয় সর্ব্বক্ষণই শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া স্বহস্তে পীড়িত বালকের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন কিন্তু

* সংসারে থাকিতে গেলেই কখন না কখন মৃত্যু ঘটনা দর্শন করিতে হয়। × × × আমার প্রিয়তমকে হঠাৎকারে রোগাক্রান্ত হইয়া একেবারে ঊবিয়া যাইতে দেখিয়াছি এবং বজ্রাহতবৎ চৈতনাশূন্য হইয়াছি। × × × আমি অনেকদিন বাঁচিয়া আছি। মৃত্যু অনেক রূপেই আমাকে দেখা দিয়াছে।

শেষ হইয়া গেলে নির্ব্বিকৃত মুখেই উঠিয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় যাবজ্জীবন আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন যে, এরূপ শোকাবহ ব্যাপারেও একদিনের জন্যও তাঁহার দুঃখ প্রকাশ হইতে পায় নাই। ভূদেব বাবু শোক দুঃখাদি বিষয়ে অনেকটা আপন মাতৃভাবেরই অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অভ্যাস দ্বারা এবিষয়ে আপনাকে অনেকটাই সংযত করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ে শোকের বিশেষরূপ বশীভূতই ছিলেন। পুত্রের এই মৃত্যুব্যাপারে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে নিদ্রিতাবস্থায় প্রায়ই স্বপ্ন দেখিয়া চমকিত হইতেন। এমন কি জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁহার সময়ে সময়ে বোধ হইত যেন পুত্র নিকট দিয়া দৌড়িয়া গেল।

মহেন্দ্রদেব ইংলণ্ডের সাক্সন ভূপতি মহাত্মা আলফ্রেডের একটী জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু সেই কাগজ গুলি মধ্যে মধ্যে দেখিতেন। আত্মীয়েরা মনে করিলেন যে এগুলি সর্ব্বদা দেখায় তাঁহার শোক কমিতে পাইতেছে না। কেহ অজ্ঞাতসারে লইয়া কাগজগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ভূদেব বাবু সে জন্য বরাবরই দুঃখ প্রকাশ করিতেন; বলিতেন "সে ত গিয়াছে, কিন্তু একেবারে যে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ।"

প্রথমজাত বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন এই পুত্রটি ভূদেব বাবুর নিজের মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল তিনি তাঁহার রচনাবলীর অনেক স্থলেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ পারিবারিক প্রবন্ধের উৎসর্গে আছে—"কৈ?—একি হইল?—সেইটী?—সেই সর্ব্ব প্রথমেরটী?—সেই সাক্ষাৎ দেব-তুল্য শক্তিসম্পন্নটী?—সেটী কোথায় গেল?—আর এখানে

থাকিব না! বৃক্ষবাটীকা হইতে বাহির হইয়া সে যথা গিয়াছে সেই স্থানেই যাইব।—বাহির হই—হাত ধরিলেন—নিকটে একটী গাছ ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। দেখিলাম গাছটীর তলায় অনেকগুলি অশোক কুঁড়ি পড়িয়া রহিয়াছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাষ্পাদিগ্ধ গদ্‌গদ্ স্বরে বলিলেন, "মুকুল যত হয় ফল তত হয় না।" তথ্য বুঝিলাম। থামিলাম। ইতি প্রবোধ দায়িনী—"

তাঁহার নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের যাহাতে মফঃস্বলে চাকরী পাইবার সুবিধা হয় এবং তাঁহার সহিত চিঠি পত্র লেখালেখি রাখিয়া তাহাদের শিক্ষাদান কার্য্যে বরাবর উৎসাহসম্পন্ন থাকে সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

ক্রোড়পতি কার্ণেগি বলিয়াছেন যে, উন্নতিশালী ব্যক্তিগণ যেন নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আরও কিছু বেশী করেন। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ভাল না করিলে মান থাকে না এবং সে কাজও যায়; উহা ভাল করিয়া করিলে সে কাজ থাকে ও সম্মান থাকে, তাহা ছাড়া অন্য কার্য্য করিলে তবে উন্নতি হয়। ভূদেববাবুর জীবনে এই সূত্রের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মফস্বলের সহিত সংশ্রব রাখায় তিনি ইন্‌স্পেক্টার উড্রো সাহেব যখন ছুটী লয়েন তখন তাঁহার পদে আগত মেডলিকট সাহেবের শিক্ষা বিভাগের বিষয় কিছু জানা না থাকা উপলক্ষে ছয় মাসের জন্য সহকারী ইন্‌স্পেক্টার পদ প্রাপ্ত হন। মেডলিকট সাহেবের সহিত ভূদেববাবুর এরূপ প্রকৃত হৃদ্যতা হইয়াছিল যে, পরে মেডলিকট সাহেব উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে ভূদেববাবু তাঁহার কুঠীতে তাঁবু ফেলিয়া ৪০ দিন বাস করিয়াছিলেন এবং শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি "মেডলিকট" বলিয়া ডাকিলে সাহেব ঠাণ্ডা হইয়া খাইতেন ও শুইতেন; মেম সাহেব

বা অপর কেহ তাঁহাকে কথা শুনাইতে পারিতেন না। সামাজিক প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায় "শ্রদ্ধাভাজন ইয়ুরোপীয়" বলিয়া এই মেডলিকেট সাহেবেরই উল্লেখ আছে। ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে স্কুল সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর হইয়া কয়েকটি প্রধান জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বৃদ্ধি সম্বন্ধে সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের অভিপ্রেত বিষয় কার্য্যে পরিণত করণে প্রধান সহায় হন। ১৮৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন এবং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করা হয়। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত বিষয় তিনি সুশৃঙ্খলায় কার্য্যে পরিণত করণে সফলকাম হয়েন এবং এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপে তিনি শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে উন্নীত হন। ১৮৬৯ সালে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষাসম্বন্ধে হলকাবন্দী প্রথার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার প্রদত্ত এতৎসংক্রান্ত রিপোর্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং ষ্টেট সেক্রেটরীর অনুমোদিত হয়। স্যর এস্লে ইডেন বলিয়াছিলেন, (It is a gem of a report) ইহা রিপোর্টের মধ্যে রত্নবিশেষ। এই রিপোর্টে ভূদেব বাবু তাঁহার বক্তব্য সকল কথা তাঁহার বিরুদ্ধমতবাদীদিগের ছাপান রিপোর্টের কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রমাণ করিয়া দিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষাকর স্থাপন প্রস্তাব রোধ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বেতন বৃদ্ধি না দিয়া যেন উপযুক্ত বুঝিলে পদোন্নতি নামে উৎসাহিত করা হয়, তিনি এ দেশের লোক, ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা কম বেতনে চালাইতে পারেন; কিন্তু পদোন্নতি না দিলে যে অক্ষমতার আরোপ করা হয় তাহা বড়ই কষ্টকর। অতঃপর সার্কেল

ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে তিনি শিক্ষা বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৭২ অব্দে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। ঐ সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া ছিল। সার জর্জ ক্যাম্বেল তাঁহাকে স্পষ্টবাদিতা জন্য অপছন্দ করায় সেই সময়ে তিনি ছুটী লইয়া আসাম ও ব্রহ্মদেশে পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে ব্রহ্মদেশের কমিশনর (পরে ছোট-লাট) ঈডেন সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে স্যার জর্জ ক্যাম্বেলকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বলেন—Let me say a word to you about my old friend Babu Bhoodeb Mookerjea. Bhoodeb has many of the higher qualifications of the Europeans and very few of the failings of his countrymen. × × I should like to think that even five out of ten of our civilians are as conscientious workers অর্থাৎ আমার বহুদিনের বন্ধু বাবু ভূদেব মুখার্জ্জি সম্বন্ধে একটি কথা বলি। ইউরোপীয়ের অনেক উচ্চগুণ ভূদেবে আছে এবং তাঁহার দেশীয় লোকেদের মধ্যে যে সকল ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় সে সকল তাঁহাতে নাই বলিলেই হয়। আমাদের সিভিলিয়ানদলের দশজনের মধ্যে পাঁচজনও তাঁহার ন্যায় বিবেকী কর্ম্মচারী, ইহা মনে করিতে পারিলেও আমার সুখ হয়।

১৮৭৭ সালে তাঁহার উপর পাটনা (৭) (তখন ত্রিহুত কমিশনরী পৃথক হয় নাই) ভগলপুর (৫) বর্দ্ধমান (৬) ও উড়িষ্যা (৩) বিভাগের মোট ২১টি জিলার শিক্ষাসংক্রান্ত ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহার নিম্নে কয়েকজন আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন ইহার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি আই ই উপাধি দেন। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত ক্রফ্‌ট সাহেব ঐ সময়ে অসুস্থ হইয়া

তিন মাসের ছুটী লইতে চাহিলে তাঁহারই ঐ উচ্চ পদে একটিনি করার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তাহাতে ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কেহ কেহ ক্রফ্ট সাহেবকে ছুটী লইতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে, স্বজাতীয়দিগকে এদেশীয়ের অধীনস্থ করিয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জন অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। ইহাতে ক্রফ্ট সাহেব ছুটী লয়েন নাই এবং হয়ত তাঁহার আরোগ্য হওয়া সম্বন্ধে তাঁহার স্বসমাজের কৃতজ্ঞ লোকদিগের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগেই তাঁহার অসুখও সারিয়া যায়! স্বসমাজের মুখাপেক্ষিতায় ইংরাজ সকল জাতির শ্রেষ্ঠ।

বেহারের আদালত সমূহে পারসী অক্ষরের (ইহার যাবনিক বা যাবনী বা যামনী নাম দেওয়া হইয়া থাকে) পরিবর্ত্তে নাগরী অক্ষর চাল হইবার ব্যবস্থা তাঁহারই পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুও অনেকে (কায়স্থেরা) উর্দ্দুর পক্ষপাতী একথা ঐ সময়ে উঠিলে তিনি ছোটলাট ঈডেন সাহেবকে সরল ও সত্য পূর্ণ মন সহজ ভাবেই বলেন, "বিহারী হিন্দু বালকেরা তাহাদের চলিত মাতৃভাষা হিন্দী, ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত এবং রাজভাষা ইংরাজী শিখিবে, বিহারী মুসলমান বালকেরা চলিত ভাষা হিন্দী, ধর্ম্মের ভাষা আরবী, এবং রাজ ভাষা ইংরাজী শিখিবে ইহা সঙ্গত। বিহারী কোন বালককেই উর্দ্দু বা পারশী শিখিতে বাধ্য করা হয় কেন? পূর্ব্বের রাজা মুসলমানগণ হিন্দীকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছিলেন এবং বিদেশ পারস্য হইতে একটী ভাষা আমদানী করিয়াছিলেন বলিয়া? সে হিসাবে যে ইংলণ্ডে সাক্শন বিজেতাদিগের জর্ম্মণ ভাষা এবং নর্ম্ম্যান বিজেতাদিগের ফরাসী ভাষা আজও অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচলিত রাখা উচিত হইবে। এবং এদেশে কোন সুদূরবর্ত্তীকালে (সংসারে কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়) ইংরাজ রাজত্ব লোপ হইয়া গেলেও যে বিহারী বালককে হিন্দী উর্দ্দু সংস্কৃত

এবং পৃথক্ অপর কোন রাজ ভাষা ভিন্ন ইংরাজীও পড়িতে হইবে!" ঈডেন সাহেব এই বিচারের সোজা সাফ কথায় খুবই তুষ্ট হইয়া হাসিয়া স্বীকার করেন যে, যে কোন বালকের প্রতি তিনটী ভাষার চাপই যথেষ্ট।

হিন্দী প্রচলনে ভূদেব বাবুর উপর বেহারবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া বেহারে অনেক গীত রচিত হয় এবং ঐ গীতগুলি শীঘ্রই লোক সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম উপদেশক পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাসজী রচিত যে দুইটী গীত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে তাহা ডাঃ গ্রিয়রসন সাহেবের প্রণীত বিহারী ব্যাকরণমালার ভোজপুরী খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নাগরী অক্ষর কচহরিয়োঁ মে চলিত হোনে কে বিষয় মেঁ সরকার কী প্রশংসা—

পূরবী গীত

ধন্য ধন্য গবর্ণমেণ্ট। পরজা সুখদায়ী।
যামনীকে দূর করী। নাগরী চলাই ॥১
"ভুবন দেব" করি পুকার। লাট নিকট যাই।
পরজা দুঃখ দূর করহ। যামনী হুরাই ॥২
নানাবিধি জাল হোত। যামনী মেঁ রাই।
পরজা মন হরষ হোত। বিদ্যা নিজ পাই ॥৩
ধন্য বুদ্ধি ধন্য বিচার। ধন্য অন্তর ভাই।
করি নেয়ায় হিন্দ বীচ। হিন্দুই চলাই ॥
পরজা নিত সুযশ গাব। অম্বিকা মনাই।
যবলো চন্দ সূর্য্য রহে। রাজ রহে যাই ॥৫

(২)

হকুম ভইল সরকারী।

রে মত্রী লিখো নাগরিয়া ॥ ধুয়া ॥
যামন জী সে দেহু ছুরাই
পঢ়ি গুণ কাজ কর নরকরিয়া ॥১
সে পোথী নিত পাঠ করহু অব।
যামনী গ্রন্থ দেহু পৈসরিয়া ॥২
অবলে নাগরী আবত নাহী।
টৈকথী অচ্ছর লিখ কচ্‌হরিয়া ॥৩
ধন্ত মন্ত্রী প্রজা হিতকারী।
অম্বিকা মনাবত রাজ ভিক্টোরিয়া ॥ ৪

হিন্দীভাষা সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর উচ্চধারণা তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের "ভবিষ্যবিচার—ভাষাবিষয়ক" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য :—

(১) "বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষাসমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" (সামাজিক প্রবন্ধ ২২৫ পৃঃ)

(২) বিরাট ভারত সমাজের সকল অংশের সহিত সহানুভূতি বৃদ্ধি উপলক্ষে হিন্দীভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:— "স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন এই ভাবটী মনে জাগরূক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন

করিতে সমর্থ। অতএব ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে কথোপকথন করাই ভাল। পত্রাদি লিখিতেও সাধারণতঃ ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ, , অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে ত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান, খৃষ্টান, ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারতসমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি অনায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।” (সামাজিক প্রবন্ধ ২৮৫ পৃঃ)

(৩) বিবাহ সম্বন্ধীয় সংস্কার উপলক্ষেও তিনি হিন্দী ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন;—

“একই বর্ণের লোকের মধ্যে যে অবস্থান ভেদ জনিত বিবাহ প্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহা জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই ঐ আগন্তুক সঙ্কীর্ণতা আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ়সম্বদ্ধ এবং হিন্দীভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৩৬ পৃঃ)

বাঙ্গালা হইতে তিনি বহুসংখ্যক পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং নূতন হিন্দী পুস্তক রচনা সম্বন্ধে স্কুলের প্রাইজ ফণ্ড হইতে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিব নারায়ণ ত্রিবেদী, পণ্ডিত ছোটুরাম ত্রিবেদী এবং

বাবু রামদেনী সিংহ তাঁহার এই কার্য্যে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার পরম প্রীতিভাজন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বাঁকীপুর হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একটু উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"এ প্রদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যাইবার আদেশ হওয়ায় মুসলমানেরা এবং মুসলমান সদৃশ হিন্দুরাও অনেকে গোলমাল করিতেছে। আমার প্রতিই অনেকে দোষারোপ করিতেছে এবং যাহারা ফারসীর পক্ষ নহে, তাহারা আমার প্রতি বংপরোনাস্তি অনুরাগ দেখাইতেছে। বাস্তবিক এ কার্য্যটিতে আমার হাত কতদূর আছে তাহা আমি নিজেই বলিতে অক্ষম। কিন্তু যদি কিছু থাকে তবে যে তাহা আত্মপ্রসাদের একটি কারণ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ফারসী উঠিয়া যায় এরূপ চেষ্টা আমি বিহারে আসিয়া অবধিই করিয়াছি। জাতীয় ভাষার (হিন্দীর) বিদ্যালয়গুলি আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে অনাদৃত ছিল। আমি সেগুলির আদর করিয়াছি এবং সেই জন্যই আমার এখানে আসায় বিদ্যালয় সংখ্যা ১০।১৫ গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমার পূর্ব্বে ফারসীর পরিবর্ত্তে নাগরাক্ষর চালাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোমত হয় নাই। নাগরী কায়েতী অক্ষরের প্রচলন হয় একথা আমিই বলিয়াছিলাম ও সে জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। ১৮৩৯ ইংরাজী অব্দে বঙ্গদেশ হইতে ফারসী দপ্তর উঠিয়া যায়। সেই অবধি বাঙ্গালার উৎকর্ষ আরম্ভ হয়। সেই অবধি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। হিন্দী হওয়াতে বিহারে কি সেইরূপ হইবে না? কেন হইবে না? আমার আশা এইরূপ যে, বাঙ্গালায় যাহা ৪০ বৎসরে হইয়াছে, বেহারে ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে সেইরূপ উন্নতি দেখা দিবে। আমার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রকর্ম্মগুলির মধ্যে এই কার্যটির

সংগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু এইরূপ ভাব নিতান্ত স্থূল দর্শনের ফল। প্রকৃত দৃষ্টিতে "আমি" কিছুই করি নাই। যে সকল শক্তিতে মনুষ্য সমাজে প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইগুলি কাল সহকারে এইদিকে ঝুঁকিয়াছিল। সেই ঝোঁকটি সুপরিস্ফুটরূপে আমার অন্তরে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবিধা থাকায় সেইদিকে চেষ্টা করিতে থাকি। অতএব ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই।"

অধ্যাত্ম দর্শনোন্মুখ ব্যক্তির মনে কিরূপভাবে ঐশী শক্তির দিকেই দৃষ্টি থাকে এবং অহং জ্ঞান দূরীকৃত হইয়া যায় তাহা এই পত্রখানি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ভূদেব বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বৈদেশিক জীবন চরিত হইতে বালকদিগের শিক্ষার এক অংশের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাহাদের মনে হয় যে, এদেশে বুঝি উদাহরণ দিবার উপযুক্ত ভাল লোক জন্মেন না। তিনি এই জন্য উৎসাহ দিয়া চরিতাষ্টক নীতিপথ এবং রামচরিত লিখাইয়া ছিলেন। প্রত্যেক জেলার ভূগোল পড়ান ভাল এজন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দী "গয়া কি ভূগোল" অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

১৮৮২ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে শিক্ষা কমিশনেরও সদস্য নিযুক্ত থাকায় বাঙ্গালার প্রাদেশিক রিপোর্ট প্রস্তুত করণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ঐ রিপোর্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। তবে সভ্যদিগের অধিকাংশের মতের (ভোটের) জোরে উহা সমিতিতে পাঠকালে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ছাপান রিপোর্টে তাঁহার প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির সহিত অনেক স্থলেই মিল নাই।

১৮৮৩ সালের জুলাই মাসে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ৺ বারাণসীধামে যাইয়া

কয়েক বৎসর তথায় বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীমদ্ভাস্করানন্দ স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিয়া 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ৺ বারাণসী ধামে আনন্দবাগে স্বামিজীর যে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির পূজা হয় তাহার নিম্নে খোদিত সংস্কৃত শ্লোকটী ভূদেব বাবুর রচিত। শ্রীমৎ বালরাম স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিয়া চুঁচুড়ার বাড়ীতে অনেকদিন ছিলেন। বারাণসী হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া (১৮৬৩ সাল হইতে চুঁচুড়াতেই তাঁহার বাস হইয়াছিল) সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধন কল্পে এবং এ প্রদেশে বেদান্ত দর্শনের যাহাতে চর্চা হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৮৯ সালের ১৭ই এপ্রেল তারিখে চুঁচুড়ার বাটীতে পিতার নামে একটী চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করেন। ১৮৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বীয় পিতার নামে "বিশ্বনাথ ফণ্ড" নাম দিয়া একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপনে এক লক্ষ যাট হাজার টাকা দান করিয়া দলিল রেজেষ্টারী করেন। তাঁহার পিতৃবংশীয়দিগের মধ্য হইতেই বিশ্বনাথ ফণ্ড সমিতির সভ্য নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দলিলে সর্ত্ত আছে যে, ট্রষ্টিরা কোনকালে কার্য্য ঠিক না চালাইলে গবর্ণমেণ্ট উহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে আয় কমিয়া না যায় এজন্য বার্ষিক আয়ের পঞ্চমাংশ মূলধনে যোগ হইবে এরূপ ব্যবস্থা আছে। সুদি কাগজ পত্র বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জমা আছে। প্রতি বৎসর এডুকেশন গেজেটে ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব ও বৃত্তি তালিকা প্রকাশিত হয়। উচ্চ সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে এই ফণ্ডের সংস্থাপন হয়। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার শ্রুতি স্মৃতি ও দর্শনের অধ্যাপকদিগকে বার্ষিক অন্যূন ৫০ টাকা বৃত্তি এবং ৺ কাশীধামে ছাত্রদিগকে অন্যূন ৩০টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা আছে। দুইটী দাতব্যঔষধালয়—একটী কবিরাজী ও একটি হোমিওপ্যাথি ইহার অন্তর্গত। ঔষধা-

লয়টি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণামূর্ত্তি তাঁহার মাতৃদেবী "ব্রহ্মময়ী দেবী"র নামানুসারে "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে অভিহিত করেন।

ভূদেব বাবু বলিতেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ে উন্নতি জন্য যে সকল চেষ্টা করিতেছেন কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার সম্পূর্ণ উপকার গ্রহণ করা এদেশীয়দিগের উচিত। কিন্তু সকলেরই নিজের ধর্ম্মে থাকা ও ঠিক থাকা চাই এবং নিজেদের শিল্প রক্ষার চেষ্টা করা চাই। অন্য সকল কার্য্যেই—এমন কি এদেশের লোকের আগ্রহ ও স্বচেষ্টা বিশিষ্ট-রূপে দেখিলে ম্যাঞ্চেষ্টার এবং বার্মিংহামের চাপও কাটাইয়া "কোন সময়ে" শিল্পোন্নতি সম্বন্ধেও—গবর্ণমেণ্ট আমাদের নেতা ও সহায় হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের স্বধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা জন্য যদি আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। এদেশে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সকল ধর্ম্মেরই শিক্ষার সাহায্য করিতে পারার উপযুক্ত উদারতা হিন্দুর সংশ্রবে এবং শিক্ষায় ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে খিয়সফিষ্টেরা মাত্র এতকালে পাইতেছেন। পৃথিবীর কোন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টই তাহা এখনও প্রাপ্ত হন নাই।

ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রথম স্থাপনাকালে তিনি এই ধর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী নেতার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তিনি ঐ সময়ে মহাত্মা বালরাম স্বামিজীর নাম উল্লেখও করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ ফণ্ড মুখ্যতঃ সেই ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত। ভদ্রগ্রাম মাত্রেই এক একটি সংস্কৃত পাঠ-শালা স্থাপিত হইয়া সদাচারী, নির্লোভ, তেজস্বী এবং সুপণ্ডিত অধ্যাপক ও পুরোহিত শ্রেণী প্রস্তুত হওয়া উচিত। ধর্ম্মোন্নতি ভিন্ন ভারতে কোনরূপ প্রকৃত উন্নতি ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মো-

মুক্তি হইলেই অপর সমস্ত হইবে। ধর্ম্মহীন বাণিজ্য ও শিল্প ভেজাল চর্চ্চা—"তাহাতে" শিল্প বা বাণিজ্য রক্ষা হইবে না। এই রূপ সকল বিষয়েই।

তিনি বলিতেন,যে, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীই সমাজের সংরক্ষক। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত প্রকৃত পণ্ডিত করিতে পারিলেই সমাজের উন্নতি হইবে। বিষয়ী লোকদিগের দ্বারা ইহাঁদের মোটাভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান হইয়া ইহাঁরা যদি আবার নির্ভাবনায় বিবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিতে পান তাহা হইলেই সমাজের মঙ্গল হয় এবং মানবধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা সংহিতাকার মনু যে সদাচারী ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে আদর্শ করিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন ভারতে সেই আদর্শ সংরক্ষিত হয়। বিশ্বনাথ ফণ্ডের সৃষ্টি দেশের ধনিসন্তানগণকে সমাজের উন্নতি সাধনের এই প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিতেছে। এই দান প্রকৃত সাত্ত্বিক। ফণ্ড প্রতিষ্ঠার পর বৃত্তিতালিকা এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত করার জন্য লিখিয়া আনিতে কর্ম্মচারীকে উপদেশ দিলে কর্ম্মচারী যখন অন্যান্য কথা মধ্যে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন—"এ বৎসরে যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রকে এই বিশ্বনাথ বৃত্তি দেওয়া হইল ইত্যাদি" তখন তিনি বলিলেন, "দেওয়া হইল" এমন কথাটাও তুমি লিখিতে পারিলে। তুমি জান না, সমস্তই ব্রাহ্মণের, মনু বলিয়াছেন—'সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিৎ জগতি গতং।' আমি দিব কি? তাঁহাদের জিনিস তাঁহারা লইলেন। লেখ, 'যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিশ্বনাথ বৃত্তি গ্রহণ করিলেন ইত্যাদি"। বিশ্বনাথ ফণ্ডের বৃত্তি মণিঅর্ডারে দ্বারা অধ্যাপক এবং ছাত্রদিগকে সসম্মানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাহাকেও আসিয়া লইয়া যাইতে হয় না। তাঁহার পিতা যে বিদ্যাগৌরব

আহ্বানে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ৫০১ টাকা পরিমিত রাজবাটীর বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়াছিলেন এবং পিতৃব্যবসায়ী ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সমাদর ও সম্মাননা দানে সর্ব্বদাই আনন্দ বোধ করিতেন। ৮৺কাশীতে বেদান্ত শিক্ষা জন্য কয়েকটি ছাত্রবৃত্তিও দেওয়া হইতেছে।

ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা প্রদেশে মুনসেফ এবং পরে মধ্যপ্রদেশে সিভিল জজ ছিলেন। তিনি একান্ত দৃঢ় চরিত্র এবং পিতৃভক্ত ছিলেন। কোন সময়ে ভূদেববাবুর দুই পুত্রেরই নওয়াখালিতে বদলী হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চাকরীতে ইস্তফা দিতে বলেন। গোবিন্দবাবু তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়া ছিলেন। আর এক সময়ে গোবিন্দ বাবুর প্রথম জাত পুত্রের দেহান্ত হওয়ার সময় তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। পিতা ঐ নিদারুণ সম্বাদ গোপন রাখিতে বলিলে তিনি প্রসব কালের পর পর্য্যন্ত ঐ কথা প্রকাশ হইতে দেন নাই। তিনি এই ফণ্ড কমিটীর প্রথম সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৫ অব্দে তাঁহার দেহান্ত হওয়ায় ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিতেছেন।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ১৬ই মে তারিখে (বৈশাখ শুক্লা একাদশী) সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয় পরিজন পরিবৃত থাকিয়া ৺ভাগীরথীতীরস্থিত তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীর ঘাটে সজ্ঞানে ভগবানের স্মরণ করিতে করিতে ভূদেব বাবুর পরমগতি লাভ হয়।

ভূদেববাবুর লিখিত পুস্তিকাদি দ্বারা দেশবাসীদিগের উপর তাঁহার প্রভাব বিশেষরূপেই বিস্তারিত হইয়া আছে। তিনি বলিতেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষা না করিলে বিষয় ও বস্তু জ্ঞান দৃঢ় হয় না। এই জন্য ইংরাজিতে কিছু পড়িলেই তাহার বাঙ্গালা তরজমা মনে মনে করিয়া লইতে সকলকে উপদেশ দিতেন। মাতৃভাষাতেই

যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের পুস্তক প্রস্তুত হয়, অপর ভাষার সাহা-য্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র না থাকে, তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশ হিতেচ্ছা প্রণোদিত অন্তঃকরণে ইহা একান্তই অভিলষিত ছিল। নিজে পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক সে জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া গিয়া-ছেন। তাঁহার চিন্তাশক্তি যে কতদিকে পরিচালিত হইত, তাহা তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত নানাবিষয়িণী রচনাবলী হইতেই বুঝিতে পারা যায়—

(১) শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব অর্থাৎ শিক্ষাদানের কৌশল বিজ্ঞাপক স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় পুস্তক এই প্রথম। ভূদেব বাবু অতি সুবিখ্যাত শিক্ষক। বালক শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ এই পুস্তকে নিবদ্ধ আছে।

(২) ঐতিহাসিক উপন্যাস—সর্ব্বপ্রথম রচিত বাঙ্গালা উপন্যাস গ্রন্থ। ইহার নায়ক স্বধর্ম্মানুরাগী মহারাষ্ট্রপতি শিবজী! ইহার অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক গল্পটি বড়ই মনোহর ও পবিত্র।

(৩) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক কথা আছে। উহার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ কথা গুলি অতি সুন্দর প্রণালীতে লিখিত।

(৪) পুরাবৃত্তসার—মিসরীয় প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির বিবরণ ইহাতে আছে।

(৫) (৬) (৭) (৮) গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের ও বাঙ্গালার ইতিহাস—স্কুল পাঠ্য হইলেও ইহাতে কেবল সন তারিখের ছড়াছড়ি নাই। স্বদেশ ভক্তির অঙ্কুর প্রাপ্তি ইহা হইতে সহজলভ্য এবং এ গুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই লিখিত হইয়াছে।

(৯) ক্ষেত্রতত্ত্ব—জ্যামিতির প্রথম তিন অধ্যায়।

(১০) পুষ্পাঞ্জলি—বেদব্যাসের তীর্থভ্রমণ বর্ণনাচ্ছলে আর্য্য-

শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের গূঢ় অর্থ পুষ্পাঞ্জলিতে প্রকটিত। প্রথম সংস্করণ ১৮৭৬ অব্দে মুদ্রিত হয়। ইহাতে আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, বাহান্ন পীট সমন্বিত ভারতভূমিই সতীদেহের আধিভৌতিক রূপ এবং তীর্থদর্শনেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিক্রমণ করা হয়।

এই পুস্তকে একণে ভারতবাসীকে কূর্ম্ম প্রকৃতিক অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের অপরিসীমত্ব অন্তর্বলে বলীয়ান্ থাকিয়া একান্ত সহিষ্ণু হইতে এবং পুরুষানুক্রমে ধর্ম্মসাধন করিতে উপদেশ দেওয়া আছে।—

(ক) "কূর্ম্মই সত্য। অতএব সত্যভ্রষ্ট হইও না; কূর্ম্ম পৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।" (খ) "কষ্ট স্বীকার সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম! সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানা শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।" (গ) "তোমরা আপনাদিগের সন্তানগণের নিমিত্ত সেইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য কর। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফল ভোগ করে না। তাহার পুত্র পৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত সেই স্বয়ং বর লাভ করিত। কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে কেহ তপঃসিদ্ধ হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধির ফললাভ করিতে পায়। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য; কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।"

(ঘ) অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাজ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহাঁর অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইহাঁকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইহাঁর সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে—কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেব দেবী হইতে ইহাঁর বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন।"

(১১) স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভারতের উন্নতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পথ কি তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে যেন মহারাষ্ট্রীয়েরা জয়ী হইয়া ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল এইরূপ কল্পনায় এই গ্রন্থখানি রচিত। হিন্দুয়ানী ত্যাগ না করিয়া, প্রত্যুত প্রকৃত হিন্দুয়ানী বর্দ্ধিত করিয়া কিরূপে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইতে পারে তাহার আভাষ ইহাতে পাওয়া যাইবে। অন্ত্যজ এবং বন্যদিগকে সংযত শিক্ষিত এবং পরিশুদ্ধ (জলাচরণীয়) করিয়া লইয়া ভারত সমাজের পুষ্টি সাধন সম্বন্ধীয় কথাও ইহাতে আছে।

(১২) পারিবারিক প্রবন্ধ—গার্হস্থ্য বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পুস্তক। ইহা গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক পবিত্র সুখোপলব্ধি প্রসূত। ধর্ম্মসূত্রে লক্ষ্য রাখিয়া কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে সকল বিষয়েই পারিবারিক কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইয়া সাচ্ছন্দ্য অধিক হয় এবং সন্তান পালন ভাল হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়।

(১৩) আচার প্রবন্ধ—হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান সমূহ কিরূপ বিজ্ঞানমূলক এবং আমাদের কত উপযোগী এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কত উচ্চ ও উদার তাহার কথা এই পুস্তকে আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল :—

"শুনা গিয়াছে যে, মনুষ্যবুদ্ধিতে চিন্ময় পরব্রহ্মের যত প্রকার রূপ কল্পনা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভগবান বিষ্ণুর রূপই অতি সুসঙ্গত। এস্থলে বিষ্ণুর ধ্যানে যে যে উপাদানের কথা আছে, সে গুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে, বিষ্ণু শ্যামবর্ণ। মেঘশূন্য আকাশের বর্ণও শ্যাম এবং শ্যামবর্ণটী সকল বর্ণের অপেক্ষা প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌দিগের শরীর পোষণে অধিকতর কার্য্যকরী। তদ্ভিন্ন, মেঘ ও সূর্য্যকে ধারণ করত আকাশ বিশ্বপালন কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর চারি হস্ত। তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, অন্য হস্তে চক্র, অপর হস্তে গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। অর্থাৎ বিষ্ণু দেবতা ঐ চারিটী দ্রব্য ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি উহাদিগের আধার উহারা তাঁহার আধেয়। এখন দেখা যাউক ঐ গুলি কি? শঙ্খবস্তুটী শব্দের দ্যোতক এবং শব্দ আকাশের গুণ ‡। অতএব শঙ্খ আকাশের স্থানীয় হইয়াছে। চক্র কালচক্রেরই বোধক। অতএব চক্র অর্থে কাল। গদা * শব্দে প্রকাশ বা দীপ্তি বুঝায়। অতএব গদা অর্থে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে সুপ্রসিদ্ধ লোকাত্মক পদ্ম অর্থাৎ জীব। তবেই দেখা গেল যে, আকাশ বা অনন্ত বিস্তার, অখণ্ড দণ্ডায়মান অনন্ত কাল, জ্ঞান এবং জীবনের যিনি আধার তিনিই বিষ্ণু। মানুষ গুণ মাত্র

---

‡ শব্দ—শব্দ গুণমাকাশং।

* গদ্ ধাতু ভাষণ বা প্রকাশার্থ কর্ত্তৃবাচ্য অচ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ।

জানিতে পারে এবং তাহা জানিয়া গুণের আধার বা গুণীর অনুমান করে। সেইরূপে পরব্রহ্মের অনুভূতি হইয়াছে এবং তাঁহার রূপকল্পনাও হইয়াছে! তৃতীয়তঃ বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড় + শব্দে বাঙ্ময় অর্থাৎ বেদকে বুঝায়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা ঔপনিষদ্ পুরুষ বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। অতএব দেখা গেল যে আকাশ বা বিষ্ণুপদ যাঁহার আধিভৌতিক রূপ, আধিদৈবিক ভাবে তিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং আধ্যাত্মিক ভাবে তিনিই পরমাত্মা।" (আচার প্রবন্ধ ১৯২-১৯৩ পৃঃ)

অন্যান্য দেব দেবীরও মূর্ত্তি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উক্ত হইয়াছে।—

"কাহার কাহার মতে দেবতাদিগের মূর্ত্তির ভৌতিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করায় লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া ধর্ম্মের হানি জন্মিতে পারে। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহারা ভ্রম-সংস্কারের একান্ত অধীন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন, যদি দেবমূর্ত্তির অধিভৌতিক ব্যাখ্যা থাকিল তবে আর উহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন করিয়া থাকিবে। কিন্তু এটী প্রকৃত কথা নয়। সত্যই ব্রহ্ম। সত্য এক হইয়াও অনেক। অজ্ঞতাদি দোষ-নিবন্ধন দেবমূর্ত্ত্যাদির শাস্ত্রসিদ্ধ ত্রিবিধ ব্যাখ্যার অপ্রকাশ হওয়াতেই এই প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে।

আর্য্যশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কস্মিন্ কালেও ওরূপ কথা মনে করেন নাই। তাঁহারা অধিকারী ভেদের তথ্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াও চিরকালই শাস্ত্রার্থে প্রবেশ করিবার পথ দেখাইয়া আসিতেছেন এবং সেই পথে যাইবার জন্য উত্তেজনা করিতেছেন। ঋক্ বেদেই বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির নিদান ব্যক্ত হইয়া আছে যথা—

+ গরুড়—গৄ নিগরণে ধাতু উর প্রত্যয়যোগে গর্ভর বর্ণ সাম্যাৎ গরুড়

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।
যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥

পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নানারূপে প্রকট হইয়াছেন; নানারূপ হইবার কারণ উপাসকের ধ্যানসৌকর্য্য। ভগবানের রূপ অনন্ত; তন্মধ্যে দশটী মুখ্য অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের উপাসনায় গৃহীত।

তাহার পর বেদাঙ্গ মধ্যে অনবগতশাস্ত্রার্থব্যক্তির নিন্দাপূর্ব্বক বলা হইয়াছে—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্যবেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।" যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থ (যেহেতু বৈদিক-কালে বেদের অক্ষরার্থ অধিকারী মাত্রেরই জানা ছিল) পরিজ্ঞাত না হয় সে ভারবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ হইয়া থাকে।

স্মৃতিশাস্ত্রও ঈশ্বরধ্যানের ক্রমপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন—

অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি, তদা পৃথিব্যপ্তেজো-বায়্বাকাশ-মনোবুদ্ধ্যাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং ধ্যাত্বা তত্র তচ্চ-লক্ষ্যং পরিত্যজ্য অপরং অপরং ধ্যায়েৎ এবং পুরুষধ্যানমারভেত।

ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।

ভগবান বলিতেছেন যে, যে যে ব্যক্তি আমার যে যে শরীর শ্রদ্ধায় অর্চ্চনা করিতে চায় আমি তাহাতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি।

ফলতঃ উচ্চাধিকারীর উপযুক্ত কথা শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিতে না পারিলেই যে শ্রদ্ধাপূর্ণ নিম্নাধিকারী আপনার অধি

কারের উপযুক্ত দেবমূর্ত্তিতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া যায় তাহা নহে। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেই এই বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্র বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ এবং অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকের সিদ্ধিসৌকর্য্যার্থ।

অতএব দেবতার রূপ শাস্ত্রকৃতের কল্পনা। সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু সে কল্পনা কাহার যদৃচ্ছাসম্ভূত নয়। ঐ কল্পনার মূলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং "সর্ব্বংসর্ব্বাত্মকং" এই মহাবাক্যদ্বয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে। আচার প্রবন্ধ (২০৪-৫-৬ পৃঃ)

(১১) বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ—উত্তরচরিত মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলী এই তিনখানি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর সমালোচনা এই পুস্তকে করা হইয়াছে। ইহাতেও হিন্দুর উচ্চাদর্শ প্রস্ফুটিত।

(১২) বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ—

এই পুস্তকের শেষভাগে "তন্ত্রের কথা" বলিয়া যে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে, তাহা পাঠে তন্ত্রের সাধনা সম্বন্ধে অনেকটা অভ্যাস হৃদয়ঙ্গম হইয়া উহার উচ্চ উদ্দেশ্য উপলব্ধ হয়। তন্ত্র গুরূপদেশ সাপেক্ষ। এই পুস্তকে ব্রাহ্মদিগকে মহানির্ব্বাণ "তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম পদ্ধতির হিন্দু" নাম লইতে অনুরোধ আছে। সনাতন ধর্ম্মকে মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনুর সহিত তুলনা করিয়া ভূদেব বাবু বলিয়াছেন কামধেনুর অঙ্গপ্রসূত বীরদিগের ন্যায়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ মিশনরি আক্রমণের নিরসন করিয়াছেন। বিরাট সনাতন ধর্ম্মের দেহেই যে ব্রাহ্মদিগেরও পৃথক্ অস্তিত্ব পূর্ণকালে লয় প্রাপ্ত হইবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

পৃথিবীতে ধর্ম্ম বিস্তার কার্য্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণগুণ-

সম্পন্ন (সংযত ও অস্বার্থপর) ভারতবর্ষীয় ভদ্রবংশীয়দিগের কর্ত্তব্য "সমাজ সংস্কার" প্রবন্ধে লিখিত আছে :—

"অতএব ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে সংযমশীল ও বিদ্যাবান করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর, সকল শুভফল ফলিবে এবং হিন্দু সমাজের সম্যক্ বলবত্তা জন্মিবে। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রে বিদ্যাবান করিলেও অনেক দূর হইবে, কিন্তু যদি উভয়, সংস্কৃত দর্শনে এবং ইংরাজী বিজ্ঞানে, দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রগাঢ় বিদ্যাসম্পন্ন করিতে পার তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই। হিন্দু সমাজ যে জন্য এতদিন এত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া সজীবাবস্থ, আছে, সেই উদ্দেশ্য বিনা বিঘ্নে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহা না হইলেই যে পারিবে না এমন নহে। তবে মধ্য পথে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইবে, কখন কখন শত্রুপক্ষীয়েরা হাসিবে, আর মিত্রপক্ষীয়েরা নিরাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সত্য অসত্য হইতে বলবান, অস্বার্থপরতা স্বার্থপরতা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবিশুদ্ধ ভাব মার্গ হইতে উৎকৃষ্ট হয় তবে হিন্দু সমাজ অবশ্যই উহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, ভারতবর্ষীয় অপরাপর সকল সমাজগুলিকে আত্মসাৎ করিবে, এবং ইউরোপ খণ্ডাদি পৃথিবীময় প্রকৃত জ্ঞানের এবং ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করিবে। বেকন ডেকার্ট কাণ্ট প্রভৃতিরা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রের জ্যোতিঃ তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিবে এবং হিন্দু চীন জাপান প্রভৃতি আসিয়াখণ্ডকে যেমন ধর্ম্ম জ্যোতিঃ দিয়াছে তাহা অপেক্ষাও বিশুদ্ধতর, তীব্রতর, রমণীয়তর জ্যোতিঃ ইউরোপে বিকীর্ণ করিবে। জর্ম্মণ দার্শনিক সোপেনহার বলিয়াছেন, "যেমন গ্রীসদেশ হইতে ইউরোপ যত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার ভারতবর্ষ হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাইবে—আমার

জীবনের মূর্ত্ত এবং মৃত্যুর সম্বল যে ভারতবর্ষীয় উপনিষদ গ্রন্থনিচয়, তাহা সত্বর্ধিক কাল মধ্যে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য জাতীয় সকল গ্রন্থের উপরিভাগে অতি গৌরবে আসন পরিগ্রহণ করিবেই করিবে।" (বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ ১৪২-৩ পৃঃ)

এই পুস্তকের "স্বাধীন চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে— "বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন আমাদের নব্য সংস্কারকেরা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার অনুরূপ মত প্রচার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনাদের ন্যায় "স্বাধীন চিন্তাশীল" বলিয়া স্থির করেন এবং আনন্দে অধীর হন। এই জন্য তিনি যে আচার ব্যবহারে নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন, সেটা তাহাদের বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। শেষে তিনি যখন সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে মত দিলেন তখন "কৃতবিদ্যেরা" তাঁহাতে আর স্বাধীন চিন্তার আভাস দেখিতে পাইলেন না। বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তি মার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া ঐ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে "চাঁদে কলঙ্ক" বলিয়া আমি মনে করি; কিন্তু যে জন্যই তাঁহার ঐদিকে প্রবৃত্তি হউক তাঁহার জীবনে অনেকটা একই ভাবের নিয়মানুগামিতা দেখিতে পাই। তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় অন্তঃকরণের পরাধীনতা প্রকাশ করিয়া বৈদেশিক মত প্রচার চেষ্টা করিতেছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা মনে করিয়া সুখী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে পরাশর স্মৃতির অধীনে থাকিয়া আসিয়া কতকটা স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়ও সেই স্বজাতীয় স্মৃতিরই অধীন ছিলেন, সুতরাং সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে ঐ স্মৃতির মতবাদত্যাগ করিয়া ইংরাজী মতের পোষক অন্য কোন কিছু

খুঁজিতে যান নাই এবং ইংরাজের মতগুলি "নিজের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত" বলিয়া খ্যাপনা করিতে যান নাই।

ভূদেববাবুর সংস্কারপূত অতিপবিত্র পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে তাঁহাদের সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বিয়োগের পরেও কেহ কখন পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। সুতরাং তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধী হইবেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ *। ভারত সমাজে দিব্যভাবের সম্বর্দ্ধনা হয় তাদৃশ কার্য্যকেই তিনি সংস্কার বলিয়া মনে করিতেন এবং বিধবার বিবাহ না হইয়া বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের সুচারুরূপে সংরক্ষণ চেষ্টাকেই সমাজের হিতসাধক বলিয়া বুঝিতেন। ভদ্র হিন্দুর গৃহে বিধবার নির্য্যাতনের কথা সাহেবদের কল্পনাপ্রসূত। তবে কোন কোন গৃহস্থঘরে কর্ত্তার অজ্ঞানতানিবন্ধন অথবা কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা না থাকায় বিধবার সুপালনাভাব যে কখন কখন হয় না এমত

---

* যে সন্ন্যাসী হইয়াছে সে কি আর গৃহী হইতে পারে? যদি হয়, তবে সে প্রকৃত আশ্রমভ্রষ্ট। সামান্য যুক্তিমুখেও দেখ, যে গিয়াছে তাহাকে মনে করিতেই হইবে। যদি তাহাকে ভুলিতে পার, তবে না পার কি? আবার যাহাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে বই ত আর কাহাকেও মনে করিতে নাই। তবেই দুইবার বিবাহ করিলে মহা সঙ্কট বাধিল। এক পক্ষে মনে করিতেই হইবে—পক্ষান্তরে মনে করিতেও নাই। ঐ দুয়ের যে পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহাতেই কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, ধ্যানের ব্যাঘাত হইবে, পবিত্রতা নষ্ট হইবে। এই রূপে ভাবিয়া দেখিলে কোমতের মতই ভাল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই একাধিক বার বিবাহ করিবেন না। আমাদের শাস্ত্রেও বলে প্রথম বিবাহই সংস্কার, তাহার পর আর সংস্কার হয় না। (পারিবারিক প্রবন্ধ ১২৫ পৃঃ)

নহে। সেইরূপ কারণে স্ত্রী পুত্রের অপালনও কি কোথাও হয় না? ভূদেব বাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থে "বৈধব্য ব্রত" নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলিকে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার পরিষিক্ত করিয়া যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন তদনুযায়ী বিধবা পালন করিলে সংসার অতি পবিত্র হইয়া উঠে।

(১৩) সামাজিক প্রবন্ধ—সমাজ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধসমূহ। ১২৯৩ সালের ২৪শে পৌষ হইতে সর্ব্বপ্রথম এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার ছোট-লাট বাহাদুর সার চর্ল্স ঈলিয়ট এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসি-ডেণ্ট স্বরূপে সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন ;—

"No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share." অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ নাই, যাহাতে একাধারে এত জ্ঞান ও এতবেশী অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সমভাবে আয়ত্ত থাকিয়া যাঁহার মনকে গঠিত করিয়াছে এমন একজন প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণ সন্তানের ইহা আজীবন অধ্যয়নের ফল।

এই পুস্তকের কর্ত্তব্যনির্ণয়, নেতৃপ্রতীক্ষা, প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা সকল ভারতবাসীরই জানা উচিত। বর্ত্তমান ভারতে এমন কোন কথা উঠিতে পারে না যাহার সম্বন্ধে সুযুক্তিপূর্ণ এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত উপদেশ এই পুস্তকে পাওয়া যায় না। কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

(ক) প্রতিবাসীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষা গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(খ) ভিন্ন দেশীয়দিগের প্রতি সাহায্যদানে ও দয়া প্রদর্শনে ক্রটি করিতে নাই।

(গ) রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত ও সুব্যবস্থিত পরিবারে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না সেইরূপ রাজার প্রতি সম্ভ্রমশীল হইয়া বিবেচনা ও ধীরতা পূর্ব্বক সকল কার্য্য সুচারুরূপে নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়।

(ঘ) রাজপুরুষদের সহিত ব্যবহারে সুনম্র ও সত্যপূত ও নির্ভীক হওয়া আবশ্যক।

(ঙ) রাজার জাতীয় লোকের সহিতও সত্যপূত ও নির্ভীক, সতর্ক ও নম্র হওয়া উচিত।

(চ) দেশীয় রাজপুরুষগণ যাহাতে স্ব স্ব কার্য্য ভালরূপে করিতে পারেন সেজন্য প্রীতিসহ সাহায্য করা আবশ্যক।

(ছ) সন্ন্যাসীদিগের সুশিক্ষিত এবং সংযত হইয়া জ্ঞান এবং সংযম বিস্তারে লিপ্ত হওয়া উচিত।

(জ) দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশপ্রসূত বিলাস দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। স্বদেশজাত বিলাস দ্রব্যও বর্জ্জন করা সঙ্গত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পুস্তকাদি যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায় তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া একান্তই উচিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় উপকরণ ব্যবহার করাই সঙ্গত।

(ঝ) পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার দ্বারা উৎকৃষ্ট পানীয় জলের

সংস্কার এবং দূষিত ভূম্যাদি ভাগের উদ্ধার করা উচিত। "পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা তু লভতে মৌলিকং ফলং।"

(ঞ) যাহাতে দেশীয় লোকদিগের উপকার হয় সেইরূপ কার্য্যই রাজপুরুষদিগের নামে করিয়া তাঁহাদের সম্মান করা উচিত অপব্যয় করিতে নাই। "নাকার্য্যে ধনমুৎসৃজেৎ।"

(ট) বিদ্যা নিজেদের করিয়া লইতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়রা এবং শিখেরা ইউরোপীয় অফিসার রাখিয়াছিল; জাপানীদের ন্যায় নিজেরা ইয়ুরোপে গিয়া অথবা ইয়ুরোপীয় অফিসরদের নিকট এদেশে থাকিয়াই উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ বিদ্যা শিখে নাই। সুতরাং ঐ বিদ্যা নিজেদের হয় নাই। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য দৃঢ় চরিত্র ভাল লোক বাছিয়া বিদেশে প্রেরণ করা উচিত। নির্লোভ পরার্থপ্রাণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী হইতেই ভারতে সকল উন্নতি হইয়াছিল। যুগোচিত কার্য্যের—নূতন তাঁত প্রভৃতি উদ্ভাবনের উপযুক্ত লোকও উহাঁদের ন্যায় গুণসম্পন্ন লোকদিগেরই মধ্য হইতে বাহির হওয়া সম্ভব। উহাঁদের মধ্যে কাহার কাহার শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে ব্রতী হওয়া সঙ্গত। সর্ব্বপ্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের কার্য্য।—বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

(ঠ) বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাংসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্পগুনা হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহা সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে এতদিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কলকারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান ভক্তি সম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন আর্য্যশাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধন চেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, অপরাপর

দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য্যশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিস্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিজ্ঞান আরও অনেকদূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌছিতে পারিবেন। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৯৬ পৃঃ)

(ভ) ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদানকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ প্রমোদ বাতাতুরী সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত যাত্রাসম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ, শিল্পবিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য আগ্রহশীলতা প্রকাশ করেন তাঁহারা যে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না, তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেকস্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও দু একস্থলে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথ বিধি

প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণাচার থাকিবেন।

অতএব যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় এবং আত্মগৌরববিশিষ্ট, সুতরাং

আত্মসমাজত্যাগে অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐরূপেই আসিয়াছিল। ইরান, তাম্বুল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারুকরেরা আসিয়া গালিচা বিদ্রি বন্দুকাদি শিল্প এদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৯৮ পৃঃ)

(চ) ভারতবাসীর যতপ্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় সকলগুলিই সম্মিলন প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারত-বাসী রত্নপ্রসব ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হই-লেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল সম্মিলনে অক্ষমতা। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৬৮ পৃঃ)

কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষকর্ত্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্য করণীয় দুইটী। একটী এই যে, যখন কোন শুভকার্য্য সাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺ জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয় নতুবা রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজা-

তীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। আমরা জাতিতে হিন্দু, আমরা স্বহস্তে মাটী তুলিয়া বাছিয়া ছানিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সেই প্রতিমার পূজা করিতে এবং তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিতে জানি। অতএব প্রকৃতিস্থ থাকিলে আমরা ছোটকেও বড় করিয়া লইতে পারি। বড় দেখিবার এবং বড় করিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমাদের ভাগ্যে প্রকৃত বড় লোক জন্মিয়া যাইতে পারেন। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড় লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড় লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই অতএব ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে না। ফলতঃ অনুবর্ত্তী লোক থাকে বলিয়াই বড় লোকেরা অগ্রণী হইতে পারেন। স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, বৈজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা, ইহাই আমাদিগের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং অধঃপাত ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত। (সামাজিক প্রবন্ধ ২৬৮-৯)

যে প্রকার মহাপুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা হইতে পারিবেন, তাঁহার কয়েকটী লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

[১] তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয়লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন। [২] তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। [৩] তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃবর্গের কিছুমাত্র : : অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মতবাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদত্ত সমুদয় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। [৪] তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতাকাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদি আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্ন মাত্র পাইলেই ভগবদ্ বাক্যের স্মরণ করিবে—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্ভবঃ ॥"

যাহাতে প্রভা শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড়লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।
(সামাজিক প্রবন্ধ ২৭১ পৃঃ)

(খ) একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তি-দিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জন সাধা-রণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষাকার্য্যও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি বাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উহাঁর নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—"সম্ভলগ্রামের" * অর্থ নিশ্চয়া-ত্মকচিত্তসমূহ, "বিষ্ণু যশার' † অর্থ 'ব্যাপক আজ্ঞা', "সুমতির"

* সম্ভলগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি—'ভল' ধাতু নিরূপণার্থে, অৎ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকচিত্ত, গ্রাম অর্থে সমূহ. অতএব সম্ভল-গ্রাম—নিশ্চয়াত্মকচিত্ত সমূহ।

† বিষ্ণুযশা বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা সত্তা, অতএব বিষ্ণুযশা—ব্যাপক আজ্ঞা।

সুমতি— সুন্দর বুদ্ধি।

অর্থ 'সাধুবুদ্ধি' এবং "কল্কির" ‡ অর্থ 'কলহ নাশন"। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে), এবং লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে সুবুদ্ধি হইতে কলহ নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভলগ্রাম, সমস্ত ভারত সমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য্য। কল্কিদেব যে অসি ধারণ করিবেন সেটী জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলন সাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ হয় তাহা হইলে কোন সময়ে য়িহুদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়িহুদীরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়সকৃপাণ হস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ

---

‡ কল্ক—অর্থে কলহ বা পাপ (কলহাৎ কলিরুৎপন্নো যেন ধর্ম্মং বিনশ্যতি) কলি হইতে কণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ। কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহের নাশ করেন এই অর্থে ই প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি=কলহ বা পাপনাশক। কল্কি পুরাণেই কথিত আছে "কল্কি কল্ক বিনাশার্থং আবির্ভূতং বিবুধাঃ।"

বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, তারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

(৩) জাতীয় ভাবটী হৃদয়োন্নতি সোপানের একটী প্রশস্ত ধাপ। [১] নিজের প্রতি অনুরাগ, [২] নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ [৩] বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, [৪] স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, [৫] নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, [৬] স্বজাতি বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে [৭] স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোম্‌টির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। [৮] মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের এই সীমা। [১০] সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ—ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটী আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয়ে নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃপুরুষোত্তমের

প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে কুশিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্র্যতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন এবং আত্মসমাজকেই ধর্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ়ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে, এই স্বজাতি বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর, ধনবৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছুকাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজ, সুবিস্তৃত হইয়া, সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকশিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতম আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পরজাতি বিদ্বেষ এবং পরজাতি পীড়ন তাঁহার স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

(সামাজিক প্রবন্ধ ৩১৩—৩১৪ পৃঃ)

স্বদেশবাসীকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্য সামাজিক প্রবন্ধে লিখিত আরও কয়েকটী সাধারণ উপদেশের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

(১) যুগাবতারের আবির্ভাব নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু কখন কোন পরিবারে ঘটিবে তাহা জানা নাই, সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের আশায় সকল পরিবারেরই শুচি ও সমাহিত হইয়া ধর্ম্ম পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত।

(২) জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং কর্ম্মমার্গ মধ্যে ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ভক্তি জ্ঞান সমন্বিত কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের পূজা করা উচিত। ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ করিতে নাই। জীবনের ছোট বড় সকল কার্য্যই পূজাভাবে করিতে হয়।—"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

(৩) পুত্র যাহাতে নিজের অপেক্ষা [বল বুদ্ধি ও চরিত্রে] উন্নত হয় সেই চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে ও ব্যবহারে করা কর্ত্তব্য। তাহাতেই পারিবারিক কার্য্যে ভগবানের পূজা হয়। উহাতেই মনুষ্য সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং" ইহাই বিধি।

[৪] যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সম্বর্দ্ধিত হয়, কায়, মন, বাক্য এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা।

[৫] সর্ব্বদাই বিচার দ্বারা এবং ভক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতি দ্বারা ভেদ জ্ঞানের ত্যাগ পূর্ব্বক সকল কর্ম্মে এবং সকল সময়ে বিশ্বে এবং বিশ্বাত্মায় প্রীতির বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা অবিচলিত শান্তি ও আনন্দ লাভ চেষ্টা করিবে। সচ্চিদানন্দের সজ্ঞান সভক্তিক ধ্যানলব্ধ সমাধিই চরম লক্ষ্য। উহাতেই জীবন্মুক্তি।

ভূদেব বাবু ১২৭১ অব্দ হইতে "শিক্ষাদর্পণ" নামক এক খানি শিক্ষা বিষয়ক পত্র পাঁচ বৎসর পরিচালিত করেন। ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এডুকেশন গেজেট নামক সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারিত্ব অর্পণ করেন।

১৮৫৬ অব্দে তাঁহার কথাতে মিঃ হজসন প্রাটের উদ্যোগে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এবং প্রজার অভাব পরস্পরকে সহজ ভাবে জ্ঞাপন করা। রাজা প্রজা উভয়েই কতকটা ভুল বুঝাতেই ১৮৫৭-৫৮ অব্দের সিপাহী মিউটিনি হইয়াছিল ভূদেব বাবুর এই বিশ্বাস ছিল।

ভূদেব বাবুর পূর্ব্বে রেভাঃ ওব্রিয়েন স্মিথসাহেব, বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বাবু প্যারীচরণ সরকার মাসিক বেতনে সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। পত্রখানি গবর্ণমেণ্টেরই ছিল। ভূদেব বাবু ভৃতিভুক্ সম্পাদক হইতে স্বীকার না করায় এডুকেশন গেজেটের স্বত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয় এবং শিক্ষা বিভাগ হইতে মাসিক ৩০০৲ গ্রাণ্ট-ইন-এড সাধারণতঃ যেরূপ স্কুল প্রভৃতির সাহায্যে দেওয়া হইয়া থাকে সেইভাবে দেওয়া হয়। ঐ সংবাদ পত্রের স্বত্ব বিশ্বনাথ ফণ্ডে তিনি দান করায় সেই ফণ্ডের সমিতি দ্বারা উহা এক্ষণে পরিচালিত হইতেছে।

অনেক ইংরাজেও ভূদেব বাবুকে ভক্তি করিতেন। দেশীয় লোকের ত কথাই নাই!

স্যর আলফ্রেড ক্রফ্‌ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্বরূপ কনভোকেশনের বক্তৃতা স্থলে [১৮৯৪] ভূদেববাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

A man of wide culture, familiar with all the main developments of European thought and holding liberal views on many social subjects, he was a Hindu of Hindus in all that concerned the regulation of his own life and the doctrines of his religion. In the efficacy of the doctrines of

the Vedantic Philosophy he had a profound belief both as a system of philosophy and as a rule of faith. In it he claimed to find full satisfaction for all his spiritual needs—অর্থাৎ ভূদেব বাবুর পড়াশুনা অনেক ছিল এবং ইউরোপীয় চিন্তাশীলতার ফলস্বরূপ উৎপন্ন প্রধান, প্রধান, বিষয়গুলি সমস্তই তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। অনেক সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে তিনি উদার মতের পরিপোষক ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম এবং দৈনন্দিন জীবনের অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে তিনি একজন খাঁটি হিন্দু ছিলেন—সর্ব্বদা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথানুযায়ী হইয়াই চলিতেন। বেদান্ত দর্শনেই তাঁহার সমধিক বিশ্বাস ছিল। দর্শনশাস্ত্র হিসাবেও তিনি বেদান্তকেই শ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া মান্য করিতেন। আধ্যাত্মিক কোন বিষয় বুঝাইবার আবশ্যক হইলে তিনি ঐ দর্শন সাহায্যেই তাহা বুঝিয়া সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিতেন।

মিঃ সিঃ ই. বকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "বেঙ্গল অণ্ডার দি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরস্" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"সম্পূর্ণ সৌজন্য সহ একান্ত দৃঢ়তার সুমিশ্রণ ভূদেব বাবুর চরিত্রে ছিল। সর্ব্ব বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সহিত যে ভাবে চলিতেন তাহাতেই তাঁহার এইরূপ চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাওয়া যায়।

অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যেমন কড়া, অপর সময়ে আবার সে সকলের প্রতি তেমনি সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন।

প্রতি বৎসর বার্ষিক রিপোর্ট দিবার সময় অধীনস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরগণ ৪।৫ দিনের জন্য সকলেই আসিয়া একত্রিত হইতেন। সকলেই ভূদেব বাবুর বাড়ীতে বাসা পাইতেন। এবং ভূদেব বাবুও সকলকে লইয়া একত্রে আহারাদি ও আমোদআহ্লাদ

করিতেন। সন্তানদের ন্যায় আদর সকলেই পাইতেন। বস্তুতঃ স্বদেশীয় উচ্চতর পদস্থ সহৃদয় ব্যক্তির অধীনে চাকরি করিয়া যে কত সুখ হইতে পারে তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতেন। এক সময়ে একত্রে খাইতে বসিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন "এটা ত আমাদের (মিটিং) কার্য্যের জন্য একত্র সম্মিলন) নয়, এ মিট ইটিং (মাংস ভোজনের বন্দোবস্ত)। সমস্ত-দিন একাগ্রচিত্তে সকালে সরকারী কার্য্য করিয়া সকাল বৈকাল ও রাত্রিতে একত্র মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন।

কোন এক খ্যাপ পাগলা ডেপুটী ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবুর অধীনে আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ডাইরেক্টারের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করেন যে "ভূদেব বাবু ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের সহিত হাস্য পরিহাস দাবা খেলা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, আবার কাজের সম্বন্ধে সেইদিনেই হয়ত সামান্য মাত্র ত্রুটি দেখিলে অত্যন্ত অধিক কড়াকড়ি করিয়া থাকেন। 'তখনই' ভুল শোধরাইয়া দিতে বলেন। তাঁহার মেজাজের ঠিক না পাওয়ায় বড়ই অসুবিধা হয়। ডাইরেক্টার সাহেব সেই দরখাস্ত ভূদেববাবুর নিকট দিয়া লেখেন যে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সহৃদয়তা, উদারতা ও কার্য্য দক্ষতার এরূপ সুন্দর প্রশংসাপত্র লাভ অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।"

তিনি ইউরোপীয়দিগকে যে সকল কথা বলিতেন তাহা গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন ও সরস উপদেশ মূলক এবং নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন ও আলোচনায় মনকে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হইত।

সার লোপার লেথব্রিজ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Vidyasagar was the very ideal of a high mind, benevolent and intellectual Brahmin of the old school—Kristo Das the model of the kindly, clever,

versatile man of the world—but Babu Bhoodeb in his later years seemed to me to combine some of the best qualities of both these great men;" অর্থাৎ ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চাশয়, উপকারক এবং বুদ্ধিমান প্রাচীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের, এবং কৃষ্ণদাস পাল একজন সদয় স্বভাব, সুদক্ষ কাজের লোকের আদর্শ ছিলেন; বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে উল্লিখিত মহাত্মদ্বয়ের প্রধান প্রধান যাবতীয় উৎকৃষ্টগুণ গুলির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়।

ভূদেববাবু সম্বন্ধে কতকগুলি চলিত গল্প একত্র করিয়া দেওয়া যাইতেছে;—

(১) জেলের প্রধান পরিদর্শক মিষ্টার হিল একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যে ভাষায় যে শব্দ নাই, সে জাতির মধ্যে তদনুরূপ ভাবও নাই। যেমন বাঙ্গালা ভাষায় "থ্যাঙ্ক ইউ" (তোমাকে ধন্যবাদ) শব্দের মত কোন কথা প্রচলিত নাই।" ভূদেব বাবু বলেন "এ সূত্র ঠিক। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে গভীর [Too deep for words] কৃতজ্ঞতা আছে। কে তাহার জন্য কি করিল তাহা সে বুঝিতে পারে ও মনে রাখে; মুখে একটা "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিয়া সারিয়া দেয় না। আর দেখুন 'হমবগ' কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দও নাই আর বাঙ্গালীর মধ্যে সেভাবও নাই"।

হঠকারিতাসহ একটা জাতির নিন্দা করিয়া ফেলিয়া সাহেব একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত উত্তরে খুব খুসি হইয়া বলিয়াছিলেন, (yon have served me right অর্থাৎ আমার উচিত হালই করিয়াছ।

(২) অ্যাটকিনসাহেব (ডিরেক্টার) একদিন জিজ্ঞাসা করেন "আপনি মুখোপাধ্যায় না লিখিয়া মুখার্জ্জি লেখেন কেন?" ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর দেন "আপনারা বিদ্যার গৌরব কম করেন;

ধনের গৌরব বেশী করেন। তাই বাঙ্গালায় লিখি মুখোপাধ্যায় আর ইংরাজীতে লিখি মুখার্জ্জি। কোন সুদূর প্রাচীনকালে আমাদের মুখরা গ্রাম জায়গীর ছিল। 'মুখরীয় ইতি খ্যাতো মুখরা গ্রাম বাসতঃ'।"

(৩) কোন সময়ে একজন উচ্চপদস্থ সহৃদয় সাহেবের সহিত রক্ষণশীলনীতি ও অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে ভূদেববাবু বাগানে শিশু পুত্র ক্রোড়ে উপবিষ্ট সাহেবের মেমকে জানলা দিয়া দেখাইয়া বলেন "তোমার জন্ত বিশেষ যত্নে রক্ষণের আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঐ শিশুটীর আছে। ভারতের দুর্ব্বল কারখানা গুলির এখন শৈশব।"

(৪) এক সময়ে অ্যাটকিনসন সাহেব ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ভূদেববাবুকে বলেন "তুমি বা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বা বাবু কৃষ্ণদাস পাল আমাদের সহিত একত্রে খাইলে আমাদের তৃপ্তি হইত, কিন্তু তোমরা খাও না। যাহাদের সহিত খাইতে প্রবৃত্তি হয় না তাহারাই হ্যাট কলার ও নেকটাই সজ্জা পরিয়া আমাদের সহিত খাইতে আইসে।" ভূদেব বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমরা তিন জনে আত্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া আমাদের বেশ ও আহার পরিবর্ত্তন করিলে আমরাও সেই দলে পড়িতাম নাকি? আপনার ভাল লাগে আমাদের সমাজভক্তি। উহা ত্যাগ করিলেই বীরপ্রকৃতিক এবং স্বসমাজ ভক্ত ইংরাজের ঘৃণার উদ্রেক হয়।" অ্যাটকিনসন সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।

(৫) ১৮৭১ অব্দে যখন ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখন তাঁহার ক্লাসের মাষ্টার কথায় কথায় বলেন "তোমাদের বাড়ী এক কৃপণের বাড়ী, দুর্গোৎসব হয় না, অথচ অত টাকা মাহিনা আসিতেছে।" এই কথা পুত্র পিতাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "আমাদের দুর্গোৎ-

শব হয় না কেন ?" ভূদেব বাবু বলেন "ঠাকুর ঘরে চণ্ডীপাঠ, ঘটে পূজা এবং ঐ সময়ে কয়েকটী ব্রাহ্মণভোজন, এ সবই ত হয়। তবে নূতন করিয়া প্রতিমা আনা বা ঢাকঢোল বা যাত্রা গান হয় না বটে। কিন্তু ওগুলি ত পূজার প্রধান অঙ্গ নয়!" তেইশ বৎসর পরে বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের দলিল দস্তখত হইলে ভূদেব বাবু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের দুর্গোৎসবের ঢাকঢোলের যাত্রাগানের টাকা বাঁচানয় একটী স্থায়ী সৎকার্য্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইতে পারিল। একথা যেন পুরুষ পুরুষানুক্রমে স্মরণ থাকে। অপ্রয়োজনীয় বা অল্প প্রয়োজনীয় কার্য্যে ধনের বা শক্তির অপব্যয় করিয়া ফেলিলে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার জন্য ক্ষমতা বাকী থাকে না।"

(৬) ভূদেব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র যখন হাবড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ৺ বঙ্কিম বাবু ও ৺ গৌরদাস বাবুও তথায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কাছারি বন্ধ হইবার পর এক এক করিয়া তিন জনেই ভাড়াটে গাড়ী ডাকাইয়া রওয়ানা হইলেন। ঐ দিন ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুত্র রেভিনিউ বোর্ডে কোন কার্য্যের জন্য গিয়াছিলেন। তথায় অনেকটা দেরী হওয়ায় সময় হিসাবে গাড়িভাড়া ২৷৷৹ পড়ে। মাসের শেষে ভূদেব বাবুর এই পুত্রই তাঁহাকে খরচের খাতার নকল পাঠাইয়া দিতেন। উহা চুঁচুড়ার বাড়ীর সাংসারিক খরচের খাতায় আঁটা হইত। ঐ হিসাবে গাড়ি ভাড়া ২৷৷৹ দেখিয়া ভূদেব বাবু আপত্তি করিলে পুত্র বলিলেন হাঁটিয়া হাবড়ার পুল পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়াই কলিকাতায় কাজে অন্য দিন যাই, কিন্তু ঐ দিন দুইজন ডেপুটী গাড়ী ডাকানয় তাঁহাদের সমক্ষে আমিও গাড়ি ডাকিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভূদেব বাবু তখন আর কিছুই বলিলেন না। পরবারের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতে ফিরিয়া আসার পর যখন পিতাপুত্রে

চুঁচুড়ার বাড়ীতে দেখা হইল তখন জানাইলেন যে সে দিন তিনি সেই বয়সে হাবড়ার পুল হাঁটিয়া পার হইয়া ট্রামওয়ে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে গিয়াছিলেন এবং খরচ বাঁচাইয়াছেন। ভূদেব বাবু বলিলেন "অপ্রয়োজনীয় ব্যয় মাত্রেই অপব্যয়।" পুত্রের ইজ্জত সম্বন্ধে বৃথা ভয় এবং অসঙ্গত সকল ভ্রম কাটিয়া গেল।

ঐ সময়ে তিনি আরও বলেন "নিজের শরীরের উপরে ব্যয় সঙ্কোচ লজ্জার কারণ নাই। সৎপথে—নিবৃত্তির পথে—যখন চলিবে তখন লোক নিন্দার বা লোক লজ্জার ভয় করিতে নাই। সেখানে বরং যাহাতে সাধারণের মত সৎপথে যায় সেজন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি রেলওয়েতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যান কেন?" তিনি উত্তর দান "চতুর্থশ্রেণী নাই বলিয়া।" ঐকথাতে ধনী ইংলণ্ডের অনেক উপকার হইয়াছে—আর আমরা দরিদ্র সাবেক মোটা চাল চলন ছাড়িয়া কাঙ্গালের ঘোঁড়ারোগে পড়িতেছি। চটী পায়ে দোবজা গায়ে পদব্রজে আগত, পবিত্র মহা পণ্ডিত অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পায়ে ধনীর মস্তক অবনত হওয়াই এদেশের আদর্শ ছিল। অর্থাৎ বিদ্যা ও পবিত্র চরিত্রই এদেশে মান্যের স্থান ছিল।"

ভূদেববাবুর বয়স যখন সাত বৎসরেরও কম, তখন একদিন তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মাণিকতলার একটী বাগানে আনিয়া একাকী ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তুমি একেলা এখান হইতে বাড়ী যাও। তাঁহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য বালককে ঐ সময় হইতেই আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দেওয়া! আত্মনির্ভরতা শিখাইবার জন্য তিনি আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। এরূপ পবিত্র স্বভাব, অসাধারণ সংযমশীল শাস্ত্রজ্ঞ স্থিরবুদ্ধি, স্নেহময় পিতার চেষ্টা কখনই বিফল হয় না।

(৭) ভূদেব বাবু বহরমপুরে থাকার সময়ে বঙ্কিমবাবু তথাকার ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি ভূদেব বাবুর বাসায় আসিতেন। বহরমপুরের কলেক্টরীর একজন প্রধান আমলাও মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুর বাসায় আসিয়া কথাবার্ত্তায় সকলের সহিত যোগ দিতেন। একদিন বঙ্কিম বাবু যখন ভূদেব বাবুর নিকট বসিয়া আছেন এমন সময়ে ঐ আমলা আসিয়া সেখানে বসিলে বঙ্কিমবাবু হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন। দুই একদিন পরে আর একদিন বঙ্কিম বাবু আসিয়া দেখিলেন ঐ আমলাটি বসিয়া আছেন, দেখিয়া আর না বসিয়া 'কাজ একটা মনে পড়িল' বলিয়া চলিয়া গেলেন। এরূপ যে ঘটিতেছে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ইহার পরদিন ভূদেব বাবুকে বলেন, "আমলাদের নিয়ে একত্রে বসেন কেন?" তাহাতে ভূদেব বাবু বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, চাকরীর পদমর্য্যাদা শুধু সরকারী কাজ করিবার সময়ে, চব্বিশ ঘণ্টা কেহ চাকরে নয়—সিভিলিয়ান কমিশনর, ইউরোপীয় সব ডেপুটীর সহিতও ক্লবে মিশেন। ঐ আমলাটিও ত ব্রাহ্মণ। এ সকল কথা বঙ্কিমবাবুর মনঃপূত হইল না। "সব ডেপুটীরা আমলা ক্লাসের নয়"—সেদিন একটু ক্ষুণ্ণভাবে ইহা বলিয়াই অন্য কথাবার্ত্তা পাড়িলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে ভূদেব বাবু বলিলেন, "কন্যা বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইতেছে। যাহাদের কুল আছে তাহাদের বিদ্যা নাই, যাহাদের কুল ও বিদ্যা আছে তাহাদের অন্নসংস্থান নাই"—এই কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমার একটি মেয়ের বিবাহের জন্য আমিও বড়ই ভাবনায় পড়িয়াছি," ভূদেব বাবু বলিলেন, "তোমাদেরই ঘর, পুরুষে তোমার চেয়ে কিছু উঁচু একজন আছেন। ছেলে এবারে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ হইয়াছে, ছেলে মাতামহের বিষয় অনেক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে।

বাপ কেরাণীগিরি করে এবং বলে ছেলের বিষয় থেকে খাইব কেন ?" কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করার কোন অসুবিধা নাই যে, উহার বিষয় রক্ষার সাহায্য করাতে নিজে খাটিয়া খাইবার সময় পাইবে না, সে লোকটিকে তুমি জান, এখানকার কলেক্টরীতে কাজ করেন। আমার স্বগোত্র। তোমার কাজে লাগিতে পারে।" বঙ্কিম বাবু আগ্রহ সহকারেই বলিলেন, "কে ? তাঁর ছেলে এত ভাল আর তাঁর মন এত উঁচু এবং কুলেও এরূপ তাহাত জানিতাম না !" তখন ভূদেব বাবুর হাসিমুখ দেখিয়াই বঙ্কিম বাবু সব বুঝিতে পারিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এটা সেদিনকার তর্কের শেষ নিষ্পত্তি হইল। আপনার কাছে আসিয়া যদি সৎশিক্ষা না পাইব ত কোথায় পাইব ? যেখানে কন্যাদানের কথা মনে হইতে পারে সেখানে আর আফিসের বাহিরে আমলা হাকিমের পার্থক্য কোথায় ? এ বিষয়ে আমার বড়ই বিষম ভ্রম ছিল।"

(৮) এক সময়ে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ৺ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ভূদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন নাই, ইহার কারণ কি ?" উত্তরে তিনি বলেন —"গ্রীক রোমীয় এবং ইংরাজ এই তিনটী সুপ্রধান স্বদেশভক্ত জাতির ইতিহাসে ভারতবাসীর শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ত দুইটি প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাস মাত্র।" ভারতবাসীর কি কি পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে জিজ্ঞাসায় ভূদেব বাবু উত্তর দেন, "(১) স্বধর্ম্মীবিদ্বেষ,—হিন্দু তাহার নিম্ন শ্রেণীকে অন্ত্যজ বর্ণ নাম দিয়া পশুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করিয়াছে। একজন ডোম বা মেথর কোন স্থানে বসিলে তথায় গোবর জল দেওয়া হয়—একটা ছাগল আসিয়া তথায় বিষ্ঠাত্যাগ

করিলেও শুধু ঝাড়ু দিলেই চলে। অথচ হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র বলেন, "সর্ব্বঘটে নারায়ণ আছেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে এবং শ্বপাকে" সমদর্শন করিতে হয়। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুর এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের জন্য ভগবান তাঁহার অসীম কৃপায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বধর্ম্মীপ্রেমিক জাতিকে—মুসলমানকে—শাস্তা ও শিক্ষক রূপে ভারতে প্রেরণ করেন। ইঁহারা আহারে ব্যবহারে স্বধর্ম্মীর মধ্যে পণ্ডিতে এবং মূর্খে, সুলতানে এবং ভিক্ষুকে প্রভেদ করেন না। ঈদের দিনে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহস্র সহস্র "একত্র" হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বন্দনা কি সুন্দর দৃশ্য! অন্ত্যজ প্রভৃতি যতক্ষণ হিন্দুয়ানীর ভিতর থাকে ততক্ষণই ঘৃণিত, উহারা যেই মুসলমান হয় অমনি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলেন, "সেলাম মিয়া সাহেব।" তখন উহাদের বসিবার জন্য কাঠের চৌকী দিতে হয়। এই স্বধর্ম্মী বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত বহুশত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজত্বে চলার পরে মহারাষ্ট্রে ও পঞ্জাবে ঐ দোষটা একটু কাটিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়ের মোগলের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধের সময়, বিবাহে ও আহারে বর্ণভেদ রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদিগের মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রাধান্যের পথ উন্মুক্ত পাইয়াছিল। তাহাতেই হোলকার জাতিতে ধাঙ্গড়, গাইকবাড় জাতিতে মেষপালক এবং সিন্ধিয়া জাতিতে কাহার হইলেও আজ রাজতক্তে উপবিষ্ট লক্ষিত হইতেছেন। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও সকল বর্ণের লোকই সিংহপদবীধারী এবং বিবাহ সম্বন্ধে পার্থক্য থাকিলেও সকলে আহার সম্বন্ধে সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। (১) স্বদেশী বিদ্বেষ—ভারতবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, মহারাষ্ট্রীয়, পঞ্জাবী, নেপালী, কাশ্মীরী, হিন্দু, মুসলমান, প্রভৃতির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ। এই পাপের জন্য মহারাষ্ট্রীয় এবং শিখ প্রাদেশিক ভাবের গভীর

বাহির হইতে পারে নাই, সকলেই যে ভারত সন্তান এবং তাহাদের ভালবাসার পাত্র ইহা বুঝিয়া স্বদেশী প্রেমিক হইতে পারে নাই। শিখ সর্হিন্দ প্রভৃতি বড় বড় সহর বিধ্বস্ত করিয়াছিল; মহারাষ্ট্রীয় নির্ম্মমভাবে রাজপুতানা ও বাঙ্গালা লুঠিয়াছিল এবং লুঠেরাই থাকিয়া গিয়াছিল; ভারতে একচ্ছত্র মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অতটা সুবিধা পাইয়াও স্বদেশীপীড়ন পাপ জন্য তাহা করিতে পারিল না। এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের ক্ষালন জন্য ভগবান সমগ্র পৃথিবী মধ্যে স্বদেশ-প্রেমিক-শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ওয়েল্‌শ, স্কচ, আইরিশ, ডিসেণ্টার, প্রোটেষ্টাণ্ট, প্রেসবিটিরিয়ান, রোমান কাথলিক প্রভৃতি ভেদ আছে, কিন্তু সকলেই দেশের কাজে এক জোট। ক্লাইব একজন সামান্য ইংরাজ কেরাণী ছিলেন। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার রাজকোষের ধনে উহাঁকে কেহ স্বদেশীদ্রোহী করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি অনায়াসে মিরজাফর প্রভৃতিকে ভাঙ্গাইয়া লইলেন। কোন একজন ইংরাজকে কিছু পাইতে দেখিলে সমস্ত জাতিই পরিতৃপ্ত হয়। এমন কি সাধারণ ইংরাজ জুরি সময়ে সময়ে ইংরাজ অপরাধীকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাকে অন্যায্যভাবে "নটগিল্টি" (নির্দ্দোষ) বলিয়া নিজেরাই নরকে যাইতে প্রস্তুত! অতটা ভাল নয়—ধর্ম্মই সর্ব্বোপরি—কিন্তু ইহাঁদের আগমনে ও সুদৃঢ় রাজ্যশাসনে সমগ্র ভারত যে একদেশ তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাঁদের প্রদত্ত রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধায় ভারতের আভ্যন্তরিক সম্মিলন সাধন দ্রুতবেগেই হইতেছে এবং ইংরাজরাজ ভারতের একছত্রে সম্মিলন সাধন করিয়া অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হইয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্ম এবং বর্ণ নির্ব্বিশেষে একটা জাতীয় ভাব বা স্বদেশী প্রেম বিধিপ্রেরিত ইংরাজের

আগমনেই সাধারণের মধ্যে সুপরিস্ফুট হইতেছে এবং বহুশত বৎসর ইহাঁদের শাসনে থাকিয়াই ভারতবাসী উহা সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভারতবাসীরই মুসলমানের আদর্শে স্বধর্ম্মী-প্রেম ও ইংরাজের আদর্শে স্বদেশী-প্রেম অনুশীলন করিবার খুবই সুবিধা ইংরাজদের আমলে ঘটিয়াছে। কিন্তু পবিত্র ভারতভূমিতে স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের প্রতি ভক্তি ভালবাসার পোষণ উপলক্ষে অপর ধর্ম্মের বা অপর দেশীয়ের প্রতি বিদ্বেষ করা বা ধর্ম্মপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হওয়া চলিবে না; উহা ভারতবাসীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং তাঁহার পক্ষে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে ভারতবাসী এখনও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার এবং উচ্চ আছেন।"

(৯) দয়ারসাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন সময়ে ক্ষুব্ধ হইয়া কাহাকেও বলিয়াছিলেন "আমি ত উহার কোন উপকার করি নাই, ও কেন আমার নিন্দা করিতেছে?" ভূদেব বাবুকে কখনও এরূপ অকৃতজ্ঞতা জন্য ক্ষোভ করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার সংসৃষ্ট সকলেই তাঁহাকে তাঁহার নিষ্কাম সহায়তার জন্য একান্ত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শিক্ষাদান ক্ষমতায় অনেকটাই ভাল হইয়া যাইতেন। এক সময়ে কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐ উক্তি উল্লেখে লোকের অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে, তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন "কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা করাটাতেই আশাভঙ্গের কারণ নিহিত আছে। তা ছাড়া সকলের প্রতি সব সময়ে এক মাপের দয়ার কার্য্য করাও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। দানটা "দেশে কালে চ পাত্রে চ" হওয়া চাই। যে সকল ভাল লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা উপকার পাইয়াছেন তাঁহারা কি উহাঁর প্রতি একান্তই ভক্তিমান নহেন? সমস্ত বাঙ্গালী জাতিই ত ভাষার উপকার জন্য বিদ্যাসাগরে

ভক্তিমান। তবে, সকল অপাত্রগুলাই তাঁহার দান পাইলে সুপাত্র হইয়া পড়িবে এরূপ দুরাশা করিলে তাহা সফল হইবে কেন ?

ভূদেব বাবু জীবনের সকল কার্য্যই নিখুঁতরূপে শ্রীভগবানের পূজাভাবে করিতেন। "যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল বলিয়াই তাঁহার মনে রাজভক্তি ও দেশভক্তি এবং স্বসমাজভক্তি ও অপর সমাজের প্রতি ভক্তি, এ সমস্তেই সুসামঞ্জস্য ছিল। তাঁহার সমস্তই যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ মাত্র।

তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ আধুনিক বিবিয়ানীর ছাঁচ ছিল না। পুরাকালীন আদর্শ নারী চরিত্রই তাঁহার স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ছিল।

গৃহশিক্ষকের নিকটে এবং তাঁহার নিজের কাছে মেয়েদের সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই মেয়েদের বাটনা-বাটা গৃহমার্জ্জন ও রন্ধন প্রভৃতি নিত্যকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। এবিষয়ে তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রতি-যোগী পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে দিন যাহার রান্না সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে সেই সেদিন বাগানের সবচেয়ে বড় গোলাপ-ফুলটি মাথায় পরিতে পাইবে। বলা বাহুল্য, পরীক্ষক ও পুরস্কার-দাতা তিনি নিজেই। কন্যা এবং নাতিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মত উদার ছিল। আধুনিক সংস্কারকদিগের মত উচ্ছৃ-ঙ্খল সমাজ সংস্কার তাঁহার অভিপ্রেত না থাকিলেও সুদূরদর্শী ধীর জনোচিত ধীরে ধীরে সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর পথে তাঁহার গতিকে চালিত করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হন নাই। এই জন্য মেয়েদের বিবাহে মেলবন্ধন ত্যাগ করিয়া চারি কন্যাকে —তাঁহার নিজের মেল খড়দহ—ভিন্ন ভিন্ন মেলে প্রদান করিয়া

ছিলেন। এবং ধনবান্ পাত্র না খুঁজিয়া বিদ্বান্ দরিদ্রকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বারাসতের বাবু ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২য় বারের বি এ এবং ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট—১৮৭২ অব্দের বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ইহাঁর প্রবন্ধ "প্রিভিলেজড অফেণ্ডার্স" অনেক ইংরাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল) পণ্ডিতরত্নী মেলের, দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়ার বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল (ইনি হাইকোর্টের উকিল এবং উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সম্পাদক ছিলেন, এবং ইহাঁর পুত্র বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুন্সেফ বিশ্বনাথ ট্রষ্টের সভ্য ছিলেন) এবং তৃতীয় জামাতা সুবর্ণপুরের শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বি এল (ভগলপুরের উকিল এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি) দুজনেই ফুলে মেলের এবং ৪র্থ জামাতা বারাসতের বাবু সুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ বি এল (ইনি বাঙ্গালায় সরল বেদান্ত দর্শন প্রণেতা, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন) ভূদেব বাবুর ন্যায় খড়দহ মেলের ছিলেন।

কন্যাপণের সম্বন্ধে যেমন অনেক শিক্ষিত ও ধনিলোকেও আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহার মত সেরূপ ছিল না।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥" এই শাস্ত্রবাক্যের পুরা শ্লোকটিই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন কন্যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে নৈসর্গিক দাবীর টাকাটা ধনরত্নে একেবারে দেওয়ার বিধিই উৎকৃষ্ট বিধি। বিষয়ের অংশ দেওয়াও ভাল নয় এবং তোমার কন্যা পরের বাড়ীতে ভরণ পোষণ জন্য যাওয়ার সময় তাহাদের ভাঁড়ারে উপযুক্তরূপ জমা দেওয়াই সঙ্গত। তিনি পুত্রদিগের বিবাহে কিছু চাহিতেন না। অন্য বিষয়ে মত হইলেই হইত।

যেরূপভাবে শিক্ষা দান করিলে শিশুদিগের চিত্তে সমধিক পরি-

মাণে কার্য্য করিবে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন, এমন যেন আর দেখা যায় না।

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে শুচিভাবে গৃহদেবতার আরাধনার্থ তপোদ্যানে তাঁহার সম্মুখে পুষ্পচয়ন করিয়া সাজি-হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় তাঁহার গৃহশিশুগুলিকে পুণ্য-তপোবনবাসী ঋষির শান্ত ও স্মিতদৃষ্টিপূত তপস্বী কুমার কুমারীরই মতন দেখাইত।

ফুলতোলা হইয়া গেলে সব শিশুগুলি একত্র হইয়া তাঁহার পায়ে প্রণাম করিয়া চুম্বন প্রাপ্তে তাঁহার সম্মুখে সারিবাঁধিয়া নম্রমুখে সেনাপতির আদেশের অপেক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যদলের মত নিঃশব্দে দাঁড়াইত এবং তারপর তিনি আদেশ করিলে সমকণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহার আশ্রমতুল্য গৃহকে কিছু ক্ষণের জন্য গম্ভীর শব্দঝঙ্কারে মুখরিত করিয়া তুলিত। দেবতার সম্মুখে সাধকের মত দাদাবাবুর সম্মুখে দুষ্ট ছেলেটিও অশান্ত হইতে পারিত না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তিতে এমনিই ভক্তি ও বাধ্যতার শক্তি ছিল।

চাণক্যশ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেবদেবী ধ্যান প্রণাম ও গীতা উপনিষদের পর্য্যন্ত সরলার্থ সুমিষ্ট শ্লোক নির্ব্বাচিত ছিল। চাণক্য শ্লোকগুলির মধ্যে যে গুলিতে রাজনৈতিক কৌশল মাত্র আছে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি প্রণোদিত নহে, সেগুলি বাদ দেওয়া ছিল। শ্লোকশিক্ষার সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি শিক্ষিতব্য বিষয়টি কাগজে লিখিয়া দিতেন না, তাহা অপেক্ষাকৃত মেধাবী কোন বালক বা বালিকাকে (যাহার সবচেয়ে শীঘ্র মুখস্থ হয়) শিখাইয়া দিতেন, সে আবার অন্য ছেলেদের শিখাইত। ইহাতে একটি সুফল ফলিত এই যে, সকলেই এই সম্মান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিত। ভূদেব বাবু নিজে হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বে পিতার

নিকট হইতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেইগুলি পিতৃসমীপে আবৃত্তি করিতেন। ঐ শ্লোকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটির অর্থ বুঝাইয়া দিলে তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, এবং সেই শৈশব হইতেই বংশের সুপুত্র হইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

"একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্‌বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।"

সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন ভারতবর্ষের উন্নতি নাই ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি সংস্কৃত শিক্ষাদানের উন্নতিকল্পে অত টাকা দিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজের ঘরেও সেই আদর্শ স্থাপন করিয়া অন্যকে দৃষ্টান্ত লইবার সুযোগ দিবার জন্যও তিনি একান্ত উৎসুক ছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পৌত্রদিগের মধ্যে কোন একটি অর্থকরী রাজবিদ্যার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হইয়া বংশের গৌরব রক্ষা করে, দেশের উপকারে লাগে, এই ইচ্ছা তিনি পুত্রদের কাছে প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের তৃতীয় পুত্র পরম সুন্দর মূর্ত্তি সোমদেব তাহার অত্যন্ত শৈশবেই তাহার পিতামহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি উদ্রেক করিতে সক্ষম হওয়ায় ও তিন বৎসরে তাহাকেই পরমহংস স্বামী ভাস্করানন্দ জীউ বাড়ীর সকল ছেলের মধ্যে এই কার্য্যের জন্য যোগ্যতম বলায় দৈবোদ্দেশে সুগন্ধি পুষ্পটীর মত তাহাকে তাহার দেশের, সমাজের ও বংশের মঙ্গলের জন্য মনে মনে তাহার শৈশবেই উৎসর্গ করিয়া রাখা হইয়াছিল। স্বামীজি বলিয়াছিলেন ইংরাজি শিক্ষার অপেক্ষা প্রকৃত উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সূক্ষ্মতর বুদ্ধির এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের ও সংযত ভাবের একান্তই প্রয়োজন। সোমদেব তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথই যে উচ্চতর পথ তাহা সম্পূর্ণ

রূপে বুঝিয়া তাহার দুর্ব্বল শরীরেই সানন্দে ব্যাকরণের আদ্য পরীক্ষা, এণ্ট্রান্স ও ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করে এবং মধ্যপরীক্ষার এবং সংস্কৃত অনার লইয়া বি এ পরীক্ষার জন্য পড়িতেছিল। মন প্রশস্ত, কার্য্য সুসংযত, ও একান্তই পরার্থজীবন ছিল। রোগের সেবায় এবং অপরের কার্য্যে সোমদেব সকলের অগ্রণী ছিল। রুগ্ন হইয়া পড়ায় স্থান পরিবর্ত্তন ও চিকিৎসা উপলক্ষে সাধুসঙ্গ ও তীর্থদর্শন লাভ হইয়াছিল। ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী, তাঁহার গুরু শ্রীমৎ কেশবা-নন্দ স্বামী, পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামিজীর গুরু 'পণ্ডিত অনন্তরাম, ৺ কাশীর কুরুক্ষেত্র'নবাসী শ্রীমৎ মাগনি রাম, স্বামী ও আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সান্ন্যাল মহাশয় সকলেই বলিয়াছিলেন যে, সংযত, সুশিক্ষিত, একান্ত ধীরস্বভাব ঐরূপ যুবক দলেরই এখন দেশের জন্য প্রয়োজন। সোমদেব নিজের কাজ ঠিক ঠিক করিত। কাহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিত না। ধৃষ্টতায় তাহার একান্তই উপেক্ষা ছিল। কেহ তাহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। কেহ কিছু বলিয়াছে বা কেহ কিছু করিবে শুনিলে সকলকেই উপদেশ দিত "বলুগ্‌গে", "করুগ্‌গে"। জন্ম চুঁচুড়ায় ২৬।১।১৮৯০। দেহত্যাগ ৺ কাশীতে ১।৮।১৯১০ খৃঃ)।

ভাল ভাল হিন্দু পরিবারের মধ্যে উপযুক্ত ছেলে বাছিয়া ঐরূপ আদর্শে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিতে থাকিলেই ভারতে অত্যুচ্চ শিক্ষার ও সংস্কারের বীজ রক্ষিত হইতে পারিবে। সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

তাঁহার দাম্পত্য জীবনের সম্বন্ধে এই খানে সামান্য একটি উদাহরণ দিলেই তাঁহার পিতৃভক্তি ও কর্ত্তব্যশিক্ষাদানপ্রণালী সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

একবার তাঁহার বাড়ীতে কৃষ্ণনগরের 'সরভাজা' আনাইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী হাঁড়ী হইতে তাহা বাহির করিয়া তাঁহাকে জল খাইতে দিলে ভূদেববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাকে দেওয়া হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার জলখাবার সময় তাঁহাকে দিব।" ভূদেব বাবু বলিলেন, "ঠাকুরের জন্য অগ্রে কোন কিছু দ্রব্য তুলিয়া রাখার ন্যায় আমাদিগকে দিবার আগে বাবার জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়াছ কি না?" তাঁহার পত্নী মিথ্যাকথা জানিতেন না; ত্রুটি বুঝিয়া সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন "না, স্বতন্ত্র তাঁহার জন্য রাখা হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া ভূদেব বাবু জল খাবার ফেলিয়া উঠিয়া বলিলেন "এমন যেন আর কখন হয় না"। তিনি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তাঁহার পত্নীও তাঁহার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধে তাঁহার সুখকর গার্হস্থ্য জীবনের অনেক কথাই আছে। একবার ভূদেব বাবু অনেক টাকা কাহাকেও বিনা লেখা পড়ায় ধার দেওয়াতে তৎসম্বন্ধে আপত্তি উঠিলে বলিয়াছিলেন, "যাহা যাহা বলিতেছ সত্য বটে, এরূপ করিয়া ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি যখন বলিয়াছেন তখন ত করিতেই হইবে, তাঁহার কথা মিথ্যা হইবে না।" স্বামীর ধর্ম্ম পালনের সহায়তা করাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য। ভূদেব বাবুর বাড়ীতে তাঁহার অতি সামান্য বিষয়ের অনুজ্ঞাও নিখুঁতরূপে পালিত হইত। "তিনি বলিয়াছেন এখনও হয় নাই!" গৃহিণীর এই রূপ সাগ্রহের ও সযত্নের অনুজ্ঞা পালন চেষ্টা দেখিয়া গৃহের সকলেই সেই ভাবে কাজ করিত।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভূদেব বাবুর জীবন প্রকৃত আদর্শ জীবন। প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতার প্রতি নিয়ত ভক্তি, বাল্যাবস্থায় রুগ্নশরীর হইলেও অসাধারণ অধ্যবসায়সহ অধ্যয়ন,

পরিবার প্রতিপালনে ও তাঁহাদের অন্নসংস্থানে যত্ন, সহধর্ম্মিণীকে আপনার উচ্চ আদর্শে গড়িয়া লওয়া, পুত্রদিগকে সুশিক্ষাদান, কন্যা ও পৌত্রীদিগকে সৎপাত্রে প্রদান, বন্ধুবর্গের সহিত যাবজ্জীবন সমসৌহার্দ্দ্য, আত্মীয় স্বজনের এবং পরিচিতদিগের পীড়ায় চিকিৎসার সাহার্য্য এবং সকলকেই সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান, কর্ত্তব্য বোধে একান্ত দৃঢ়ভাবে স্বদেশী শিল্পের পোষণ, কাহার সহিত কখন বিবাদ না করা, মাতৃভাষায় প্রতি চিরকাল অনুরাগ, পরিশ্রম ও কার্য্যকুশলতায় বিদেশীয় ইংরাজের শ্রদ্ধা উৎপাদন, হৃদয়ে স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপোষণ, আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতীয়দিগের প্রতি একান্ত প্রীতি বশতঃ তাঁহাদের সুশিক্ষার জন্য বাক্য ব্যবহার ও লিপিদ্বারা শেষাবস্থাপর্য্যন্ত অতুলনীয় যত্ন, পত্নীবিয়োগের পর দ্বাবিংশতিবর্ষকাল পুত্র কন্যা বধূ প্রভৃতির প্রতি মাতা পিতা উভয়েরই কার্য্য সুচারুরূপে পালন, নিজ সমাজের প্রাণস্বরূপ অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের রক্ষার জন্য সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দান, কখন অসাধুতার সহিত সংস্রব না রাখা, সকল অবস্থাতেই সুদৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞানপ্রণোদিত থাকা, তাঁহার সুগভীর দেশহিতেচ্ছা প্রণোদিত এবং অচিন্তনীয় দূরদৃষ্টি সংযুক্ত রচনা এবং তাঁহার সর্ব্বতোভাবে নিস্কলঙ্ক চরিত্র এবং ধর্ম্মপ্রাণ জীবন পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, তিনি সংসারের সকল বিষয়েই যথাযথ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং সকল বিষয়েই আমাদের সমাজের অনুকরণীয় পুরুষ।

স্বসমাজের "প্রকৃত" হিত কোথায় তাহা তিনি "জ্ঞানচক্ষে" দেখিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি আধুনিক সকলের অপেক্ষাই বড়। তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ বা যাহাতে সমাজ মধ্যে নূতন নূতন সম্প্রদায় বা দল বাড়িয়া অন্তর্বিচ্ছিন্ন সমাজের বল আরও হ্রাস হইতে পারে এমন কোন কার্য্যকে ভাল মনে করেন নাই। হিন্দু সমাজের

সংস্কার "আমরা অধিকতর হিন্দু অর্থাৎ অধিকতর উদারহৃদয়, সদাচারী, আত্মসংযমশীল এবং স্বসমাজের মুখাপেক্ষী হইলেই সাধিত হইবে" এই মহান্ তথ্য তিনিই বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভারত সমাজের জীবন রক্ষার উপযোগী ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও স্বদেশ বাৎসল্যের মহামন্ত্র প্রচার করিয়া এদেশে "গৃহস্থের আদর্শ চরিত্র" দেখাইয়া গিয়াছেন বলা যাইতে পারে। এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থাবলী এবং জীবনচরিত্র একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে হয়।—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
মহতাং চরিতংতস্মাৎ বেদিতব্যঃ বিশেষতঃ

দলিলদাতা—শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ বাসস্থান—চুঁচুড়া, পরগণে—আর্সা, জেলা—হুগলী।

আমার অর্জ্জিত ধনের মধ্যে যে ১,৫০,০০০ দেড় লক্ষ টাকা এক্ষণে নিম্নলিখিতরূপে নিয়োজিত (ইনভেষ্ট) হইয়াছে অর্থাৎ (১) বাউড়িয়া কটন মিল কোম্পানীর ইং ১৮৯২ সালের ২২শে এপ্রেল তারিখের শতকরা ৫॥০ সুদি ৭ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চর যাহা ইং ১৯০২ সালের ২২শে এপ্রেল তারিখে পরিশোধ্য তাহার ৩৩৭ নং হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৬১ নং পর্য্যন্ত ২৫ খণ্ড ও ৪০১ নং হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০ নং পর্য্যন্ত ১০০ খণ্ড—সর্ব্বশুদ্ধ ১২৫ খণ্ড প্রত্যেক ১০০০৲ এক হাজার টাকা করিয়া, ও (২) কলিকাতা পোর্ট ট্রষ্টের ইং ১৮৮১ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ৮০২।৫৩৯ নম্বরের ২৪ হাজার টাকার ডিবেঞ্চর (ইং ১৮৮১ সালের লোন শতকরা ৪॥০ টাকা সুদি), ১৮৮৩ সালের ১লা এপ্রেল তারিখের ১৮৮৮।১৭৬৭ নং ১০০০ এক হাজার টাকার ডিবেঞ্চর (১৮৮৩ সালের লোন শতকরা ৪॥০ টাকা সুদি) ঐ দেড় লক্ষ টাকা এবং আমার স্থাপিত বুধোদয় যন্ত্র এবং গবর্ণমেণ্ট

হইতে প্রাপ্ত স্বত্ব এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্র এবং ঐ টাকার ও যন্ত্রের এবং সংবাদ-পত্রের বর্ত্তমান ও ভাবী উৎপন্ন ও আমার সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক ও চিকিৎসা পুস্তক, সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষার উন্নতি ও বিনা ব্যয়ে সাধারণের সুচিকি-ৎসা এবং অন্যান্য দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য আমি কয়েকটি ট্রষ্টির হস্তে অর্পণ করিয়াছি। ঐ সম্পত্তির মোট মূল্য এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা। ঐ ট্রষ্টিগণ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী ট্রষ্টীগণ যে যে প্রণালীতে ও নিয়মে নিযুক্ত হইয়াছেন ও হইবেন ও উক্ত ট্রষ্টের কার্য্য সম্পন্ন করিবেন তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি, যথা—

১। ঐ ট্রষ্টফণ্ডের নাম বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড হইবে।

২। ঐ ট্রষ্ট ফণ্ডের টাকা হইতে ট্রষ্টিগণ গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট বা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চর বা পোর্ট ট্রষ্ট ডিবেঞ্চর কিম্বা যে কোন ব্যবসা বা কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট দায়ী থাকিবেন, সেই কার্য্যে বা ব্যবসায়ের সেয়ার কিম্বা ডিবেঞ্চর অথবা সকল ট্রষ্টীর একমত হইলে, কোন ল্যাণ্ডমর্টগেজ লোনের ডিবেঞ্চর এবং যে জমিদারী পত্তনি বিলি থাকিবে, বা যে জমি-দারী ক্রয় করিয়া পত্তনি বিলি করিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্নেই হইয়া যাইবে, বা পত্তনি বা লাখরাজ সম্পত্তি যাহার বিলি (সব লেটের) বন্দোবস্ত তৎকালেই হইয়া যাইবে, ঐরূপ ভূসম্পত্তি ক্রয়

করিতে পারিবেন। অন্য কোনরূপে ঐ টাকা নিয়োজিত (ইনভেষ্ট) হইতে পারিবে না।

৩। ঐ ট্রষ্টফণ্ড সম্বন্ধে সহর কলিকাতার বেঙ্গল-ব্যাঙ্কে অথবা যদি কস্মিনকালে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন তাহাতে বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ড নামে একটি পৃথক করেণ্ট একাউণ্ট হিসাব খুলিতে হইবে, ফণ্ডের সমস্ত আয় ঐ করেণ্ট একাউণ্টে জমা দিতে হইবে ও খরচের জন্য তাহা হইতে চেক দ্বারা টাকা বাহির করা হইবে। ঐ ফণ্ডের মজুত টাকা ঐ ব্যাঙ্কের করেণ্ট বা ডিপজিট একাউণ্টে জমা রাখিতে হইবে। ফণ্ডের গবর্ণমেণ্ট প্রমসারি নোট, ডিবেঞ্চর সেয়ার ও সম্পত্তির দলিলাদি ঐ ব্যাঙ্কে (সেফ কাষ্টডি) নিরাপদার্থ জমা থাকিবে, এবং ট্রষ্ট ফণ্ডের সুদ ডিবিডেণ্ড আদি বাহির করিয়া করেণ্ট একাউণ্টে জমা দিবার জন্য ট্রষ্টীগণ এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ২য় দফার নিয়মানুসারে ফণ্ডের জন্য ভূসম্পত্তি খরিদ হইলে ট্রষ্টিগণ প্রয়োজনমত কারপরদাজ নিযুক্ত করিয়া টাকা আদায়াদি কর্য্য সামান্য ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন অথবা আবশ্যক বোধ হইলে উপরোক্তরূপে ক্রীত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব আদায় ভার গবর্ণমেণ্টের বা কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করিয়া সেই উপস্বত্ব হইতে এই ট্রষ্টের কার্য্য চালাইতে পারিবেন।

৪। ঐ করেণ্ট হিসাব হইতে ঐ ফণ্ডের টাকা বাহির করিতে হইলে ঐ ফণ্ডের ট্রষ্টিদের

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি—উভয়ের স্বাক্ষরিত চেক দ্বারা বাহির করিতে হইবে। যদি কোন সময়ে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি উভয়ের চেক স্বাক্ষর করা সুবিধা না হয় তাহা হইলে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি• ইহাদের উভয়ের মধ্যে একজন এবং ট্রাষ্টীদের অপর একজন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া ঐ টাকা বাহির করিতে পারিবেন। ব্যাঙ্ক হইতে ট্রাষ্টফণ্ডের গচ্ছিত রাখা টাকা, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চর ও দলিল ফেরত লইতে হইলে সমস্ত ট্রাষ্টীদের স্বাক্ষর দ্বারা বাহির করা হইবে।

৫। ঐ ট্রাষ্টফণ্ডের আয় ভবিষ্যতে যাহাতে কমিতে না পায় এবং ট্রাষ্টের কার্য্য ক্রমশঃ বিস্তার হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে এবং হঠাৎ কোন প্রয়োজন হইলে তাঁহা তৎসময়ে নির্ব্বাহ হইবার জন্য ঐ ফণ্ডের উপস্বত্বের এক পঞ্চমাংশ রিজার্ভ ফণ্ডস্বরূপ থাকিবে। রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা দুই বৎসরান্তে মূলধন (ক্যাপিটাল) ভুক্ত হইয়া যাইবে। রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা সম্বন্ধেও এই দলিলের সমস্ত নিয়ম খাটিবে।

৬। উক্ত ফণ্ডের উপস্বত্বের অবশিষ্ট চারিপঞ্চমাংশ হইতে ট্রাষ্টীগণ আমার পিতৃদেবের নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ও মাতৃদেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী ভেষজালয় বজায় রাখিবেন। নিম্নে প্রকাশিত নিয়মমত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বৃত্তি দিবেন।

৭। উক্ত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠিতে মাসিক অন্যূন ২০ টাকা বেতনে একজন অধ্যাপক এবং অন্যূন বার্ষিক ৩০ ত্রিশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিয়া অন্যূন পাঁচটি ছাত্র রাখিতে হইবে এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের থাকিবার জন্য পৃথক বাড়ী দিতে হইবে।

৮। ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ের জন্য ঐরূপ পৃথক বাড়ী দিতে হইবে। তাহার একাংশে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাসিক অন্যূন ১০ টাকা বেতনে রাখিতে হইবে, ও ঔষধাদি ক্রয় জন্য প্রয়োজন মত টাকা দিতে হইবে। এবং অপরাংশে মাসিক অন্যূন ১০ টাকা বেতনে একজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক রাখিতে হইবে এবং ঔষধ ক্রয়, সংগ্রহ ও প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রয়োজন জন্য বার্ষিক অনধিক ২৫০ টাকা করিয়া দিতে হইবে। ঐ ঔষধালয়ে সমাগত রোগীদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ ও ঔষধ বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।

৯। উক্ত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীতে ও ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ে যে অধ্যাপক ও ডাক্তার এবং কবিরাজ ও ঐ ট্রষ্টফণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অন্যান্য যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন বা হইবেন তাঁহারা ট্রষ্টীদের সম্পূর্ণরূপ অধীন থাকিবেন এবং ট্রষ্টীগণ প্রয়োজন মত তাঁহাদের সকলকেই নিয়োগ ও পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

১০। ট্রষ্টিগণ বুধোদয় যন্ত্রের কার্য্য উপযুক্ত বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া চালাইবেন। ঐ যন্ত্রে যে লাভ হইবে তাহার প্রয়োজন মত অংশ এবং আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত বৎসরে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রচার করিবেন। এডুকেশন গেজেটও ঐ যন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবে। তদ্ভিন্ন ঐ ছাপাখানার অপরাপর পুস্তক ছাপা, যব ওয়ার্ক প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য করিয়া ব্যবসায় চলিবে। ট্রষ্টীগণ সুবিধা বিবেচনা করিলে ঐ ছাপাখানার লভ্য হইতে উহার উন্নতি করিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত ছাপাখানা রাখা সুবিধা-জনক না হয় তাহা হইলে ঐ ছাপাখানা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়োৎপন্ন টাকা ট্রষ্টফণ্ডে জমা দিবেন।

১১। ট্রষ্টীগণ এডুকেশন গেজেটের জন্য উপযুক্ত বেতনে একজন সম্পাদক নিযুক্ত করি-বেন, এবং উক্ত সম্পাদক ট্রষ্টীদের অধীনে তাঁহাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। ঐ কাগজ এ পর্য্যন্ত রাজনীতি বিষয়ে যে প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে সেই প্রণালীতেই চলিবে। ঐ কাগজ চালাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ঐ ফণ্ডের উপস্বত্ব হইতে বৎসরে ৮০০ টাকা পর্য্যন্ত ট্রষ্টীগণ দিতে পারিবেন। এক্ষণে ঐ কাগজের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আমি মাসিক ৩০০ ১০০ সাহায্য পাইয়া আসিতেছি। আমি ভরসা করি যে আমার লোকান্তর হইলে ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট

আমার নিযুক্ত ট্রষ্টীদিগকে দিয়া সাহায্য করিবেন। কিন্তু যদি কোন কারণে কোন সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঐ সাহায্য বন্ধ করেন এবং ঐ কাগজের মূল্যদাতা গ্রাহক সংখ্যা ২০০ দুই শতেরও কম হইয়া যায়, তাহা হইলে ট্রষ্টীগণ ঐ কাগজ উঠাইয়া দিতে পারিবেন বা উহার গুড উইল বিক্রয় করিয়া উৎপন্ন টাকা ট্রষ্টফণ্ডে জমা দিবেন।

১২। উক্ত বিশ্বনাথ ট্রষ্টফণ্ডের উপস্বত্ব হইতে বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ও ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়ের ও বুধোদয় যন্ত্রের ও এডুকেশন গেজেটের উল্লিখিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া এবং এই দলিলের ১৪ দফার লিখিত মত এষ্টাবলিসমেণ্ট খরচ ও বাজে খরচ হইয়া যে টাকা থাকিবে তাহা হইতে যে সকল টোলে শ্রুতি, স্মৃতি বা দর্শনশাস্ত্র অধ্যাপিত হয় তাহার অধ্যাপকদিগের মধ্যে মনোনীত করিয়া প্রত্যেককে বর্ষে বর্ষে অন্যূন ৫০ টাকা করিয়া এবং শ্রুতি ও স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নকারী ছাত্রদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া প্রত্যেককে বর্ষে বর্ষে অন্যূন ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতে হইবে। এক্ষণে অধ্যাপকদিগকে আমি ঐরূপ দশটী বৃত্তি দিতেছি। ট্রষ্টিগণ এই ট্রষ্টের নিয়ম অনুসারে ঐ দশটী বৃত্তি দিবেন এবং ফণ্ডের আয় অনুসারে তদতিরিক্ত অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবেন। এই বৃত্তিগুলি বিশ্বনাথ অধ্যাপক বৃত্তি ও বিশ্বনাথ ছাত্রবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইবে। সকল বৃত্তিই এক বৎসরের জন্য দেয়, কিন্তু যে

অধ্যাপক বা ছাত্র এক বৎসর বৃত্তি পাইবেন তাঁহার বিশেষ দোষ না দেখিলে ট্রষ্টীগণ পর-বৎসরও তাঁহাকেই ঐ বৃত্তি দিতে পারিবেন, কিন্তু অধ্যাপক অধ্যাপনা এবং ছাত্র পাঠত্যাগ বা সমাপ্ত করিলে অথবা কোন গুরুতর দোষে দোষী হইলে আর তাঁহাকে বৃত্তি দিতে পারিবেন না। অধ্যাপক টোলে একাকী না পড়াইয়া যদি স্কুলের ন্যায় অপরের সহিত একত্রে অধ্যাপনা করেন, তাহা হইলে বৃত্তি পাইবার পক্ষে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হইবে না। উক্ত বিশ্বনাথ ছাত্রবৃত্তি ভারতবর্ষের যে কোন স্থান নিবাসী ছাত্র পাইতে পারিবেন, কিন্তু ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা কাশীতে বা নাসিক বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থানে বেদান্ত দর্শন শিক্ষা করিবেন, বৃত্তি দিবার সময় ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিবেন। ট্রষ্টিগণ বৃত্তি দিবার জন্য বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে উপযুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্র অনুসন্ধান করিবেন। কোন এক জিলাতে বদ্ধ থাকিবেন না।

১৩। ট্রষ্টিগণ প্রয়োজন বিবেচনা করিলে টোল ও ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান জন্য একজন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ঐ কার্য্য জন্য এই ফণ্ডের উৎপন্ন আয়ের শতকরা পাঁচ টাকার অনধিক ব্যয় করিতে পারিবেন এবং তাদৃশ নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা আবশ্যক মত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর কার্য্যও করাইতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ আবশ্যক মত অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের সাহায্যার্থ সংস্কৃত পুস্তক দান করিতে পারিবেন।

১৪। এই ফণ্ডের উৎপন্ন আয় হইতে ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের আফিস এষ্টাবলিসমেণ্ট খরচ ও অন্যান্য বাজে খরচ করিতে পারিবেন, কিন্তু বার্ষিক আয়ের শতকরা পাঁচ টাকার অধিক ঐ দুই বিষয়ে ব্যয় করিতে পারিবেন না। তাঁহারা প্রথমতঃ ৫ দফার লিখিত মত রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা হইতে যদি কোন বিশেষ কারণে টাকা খরচ হইয়া থাকে তবে সেই টাকার পূরণ করিয়া অবশিষ্ট টাকায় উপরিলিখিত ব্যয় সমস্ত নির্ব্বাহিত করিয়া যদি কোন টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা ঐ ট্রষ্টফণ্ডে জমা করিয়া দিবেন।

১৫। এই দলিল অনুসারে ঐ বিশ্বনাথফণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ (ম্যানেজ) করিবার জন্য আমি আমার পুত্র শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় বি, এল, ও শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় এম, এ, এবং গোঁদলপাড়ানিবাসী ৺ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবর্ণপুর নিবাসী ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ও বারাসত নিবাসী শ্রীকৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এবং উত্তরপাড়া নিবাসী ৺ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কে উক্ত বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের ট্রষ্টী ও উক্ত শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে ট্রষ্টীদিগের সভাপতি ও শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়কে ট্রষ্টীদিগের সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছি।

১৬। উক্ত সভাপতি শ্রীগোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরবর্ত্তী সভাপতি এবং অতিরিক্ত দুইজন টৃষ্টী, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরবর্ত্তী সহকারী সভাপতি এবং অতিরিক্ত দুইজন টৃষ্টী এবং অপর টৃষ্টীগণ স্বীয় স্বীয় পরবর্ত্তী এক একজন টৃষ্টী মনোনীত করিতে পারিবেন। এইরূপে টৃষ্টী সংখ্যা দশজন পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। যদি কেহ কোন নাবালককে তাঁহার পরবর্ত্তী টৃষ্টী মনোনীত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করিতে পারিবেন। যদি কেহ স্বীয় পরবর্ত্তী সভাপতি, কি সহকারী সভাপতি, কি টৃষ্টী মনোনীত না করিয়া লোকান্তরিত হন বা টৃষ্টির কার্য্য হইতে অবসর লয়েন, তাহা হইলে অপর টৃষ্টীগণ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা নূতন সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা নূতন টৃষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি কেহ কোন নাবালককে তাঁহার পরবর্ত্তী সভাপতি বা সহকারী সভাপতি বা টৃষ্টি মনোনীত করিয়া অপসৃত হন তাহা হইলে উক্ত নাবালক যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবে সেই পর্য্যন্ত তাহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্ত অপর টৃষ্টীগণ প্রতিনিধি সভাপতি বা প্রতিনিধি সহকারী সভাপতি বা প্রতিনিধি টৃষ্টি নিযুক্ত করিবেন, পরে উক্ত নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি তৎকালে টৃষ্টিগণ তাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার নির্ব্বাচিত পদাভিষিক্ত হইবেন। টৃষ্টি মনোনীত

করিবার সময় আমার পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সন্তান সন্ততিদিগের বংশে (descendants in the male or female line) যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই অগ্রে মনোনীত করিবেন। উত্তরকালে মনোনীত যে ট্রষ্টি ঐ বংশীয় অর্থাৎ আমার পিতা মহাশয়ের সন্তান সন্ততি বংশীয় (descendants in the male or female line) না হইবেন তিনি বরাবরই অস্থায়ী (temporary) বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ঐ বংশীয় বয়ঃপ্রাপ্ত কেহ ট্রষ্টী হইবার জন্য প্রার্থনা করিলে ট্রষ্টিগণ অধিকাংশের ভোটে যদি উঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে তাৎকালিক অস্থায়ী (temporary) ট্রষ্টির স্থলে তাঁহাকেই ট্রষ্টি নিযুক্ত করিবেন। এই দফার কথিত উপযুক্ততা সম্বন্ধে ট্রষ্টি দিগের মতই চূড়ান্ত হইবে। ট্রষ্টির সংখ্যা ৬ জনের কম বা ১০ জনের অধিক হইবে না। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অপর ধর্ম্মাবলম্বী বা স্ত্রীলোক কেহ ট্রষ্টি হইবেন না ও কোন ট্রষ্টী সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে ট্রষ্টীর পদ হইতে চ্যুত হইবেন।

১৭। ট্রষ্টীগণ সময়ে সভা করিয়া উক্ত ট্রষ্টফণ্ড সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় মীমাংসা করিবেন। ট্রষ্টীদিগের মধ্যে দুইজন উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য চলিবে। অনুপস্থিত সভ্যগণ পত্র দ্বারায় তাঁহাদিগের ভোট দিতে পারিবেন অথবা সভায়

যে সভ্যগণ উপস্থিত হইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দ্বারায় ভোট দিতে পারিবেন। ঐ ট্রষ্টফণ্ড সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই, যাহার সম্বন্ধে সকল ট্রষ্টীর একমত হইবার বিশেষ বিধি নাই, ট্রষ্টীদিগের অধিকাংশ ভোট অনুসারে মীমাংসিত হইবে। এক্ষণকার সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি প্রত্যেকের দুইটী করিয়া ভোট দিবার ও অপর মেম্বরদিগের প্রত্যেকের একটী করিয়া ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু ১৬ দফার নিয়মানুসারে যে সকল সভাপতি, সহকারী সভাপতি বা ট্রষ্টী উত্তরকালে মনোনীত হইবেন তাঁহাদের সকলেরই একটী করিয়া ভোট থাকিবে। মিটিংএ সভাপতি উপস্থিত থাকিলে তিনিই আসন গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত অপর সভ্যগণ তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে সভাপতি নিযুক্ত করিবেন। সভায় যখন যিনি সভাপতি থাকিবেন, ভোটের সংখ্যা উভয়দিগের সমান থাকিলে তাঁহার কাষ্টিং ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। ট্রষ্টীগণ এই ট্রষ্ট ডীডের উদ্দেশ্যের ও ব্যবস্থার সানুকূলে আপনাদিগের কার্য্য চালাইবার উপযোগী নিয়মাবলী (rules of business) প্রস্তুত করিতে এবং প্রয়োজনমত ঐ নিয়মাবলী সকলের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ট্রষ্টীগণ তাঁহাদের মধ্যে একজনকে সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত করিবেন এবং উক্ত সম্পাদক উক্ত ফণ্ডের হিসাব সকল

প্রস্তুত করাইবেন এবং সভা অধিবেশনের সংবাদ দিবেন, এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবেন।

১৮। আমার নিয়োজিত ট্রষ্টিগণ বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী ট্রষ্টিগণের মধ্যে যে কেহ ট্রষ্টির কার্য্য হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা করিবেন তিনি অপর ট্রষ্টিদিগকে জানাইয়া অবসর লইতে পারিবেন।

১৯। এক্ষণকার ট্রষ্টিদিগের পরবর্ত্তী ট্রষ্টি যাহারা হইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্ত্তী ট্রষ্টি উপরিলিখিত নিয়মানুসারে মনোনীত করিবেন। এইরূপে এই ট্রষ্ট ফণ্ড বজায় রাখিয়া চিরকাল ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত হইবেন ও কার্য্য করিবেন ও আমার নিয়োজিত ট্রষ্টী ও তাঁহাদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদিগের যেরূপ ক্ষমতা দিলাম ও তাঁহাদের যেরূপ দায়িত্ব রহিল, ভবিষ্যতে যিনি যখন এই ফণ্ডের ট্রষ্টি বা সভাপতি বা সহকারী সভাপতি হইবেন, তাঁহার ঐরূপ ক্ষমতা থাকিবে ও ঐরূপ দায়িত্ব থাকিবে, কেবল ১৭ দফার নিয়মানুসারে উক্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতি একটি মাত্র করিয়া ভোট দিতে পারিবেন; দুইটি করিয়া ভোট দিতে পারিবেন না; এবং একজন মাত্র করিয়া ট্রষ্টি মনোনীত করিতে পারিবেন; একাধিকজন করিয়া মনোনীত করিতে পারিবেন না। এই দলিলের সমস্ত নিয়ম চিরকাল বলবৎ থাকিবে।

২০। ট্রষ্টিগণ কেহ কখন এই ট্রষ্ট ফণ্ড নষ্ট করিতে বা এই ফণ্ডের সম্পত্তি দান বিক্রয় বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। কিন্তু আবশ্যকমত ২য় দফার নিয়মানুযায়ী এক ইনভেষ্টমেণ্টের পরিবর্ত্তে অন্য ইনভেষ্টমেণ্ট করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য যে বিক্রয়াদি আবশ্যক তাহা করিতে পারিবেন। ঐরূপ হস্তান্তর ট্রষ্টিগণের অধিকাংশের ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে ট্রষ্টিদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে।

২১। যদি কোন সময়ে ট্রষ্টিগণ ট্রষ্টের কার্য্য ত্যাগ করেন বা অন্য কোন কারণে একজনও ট্রষ্টি না থাকে, তাহা হইলে আমার পিতা ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সন্তান সন্ততির বংশে (Descendant in the male or female line) যে কেহ বর্ত্তমান থাকিবেন তাঁহারা এই ট্রষ্ট ডীডের নিয়ম ও কার্য্য বজায় রাখিবার জন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগী না হন তাহা হইলে আমার প্রার্থনা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া এই ট্রষ্টফণ্ড গ্রহণ করিয়া ট্রষ্ট ডীডের নিয়মানুসারে কার্য্য করেন।

২২। যদি কোন কারণে এই ট্রষ্ট অসিদ্ধ হয় বা এই ট্রষ্টের কার্য্য চালান না হয়, তাহা হইলে যে সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটিবে তৎকালে ট্রষ্টফণ্ডে যাহা মজুত থাকিবে তাহা আমার ষ্টেটের সামিল হইবে এবং আমার যে কোন উত্তরাধি-

কারী তৎকালে বর্ত্তমান থাকিবে সে তাহা পাইবে।

ইতি তারিখ ২৩শে পৌষ, সংবৎ ১৯৫০, সন ১৩০০ সাল, ইংরাজী ৬ই জানুয়ারী ১৮৯৪।

সাক্ষিগণ

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
মহেশপুর, জেলা যশোহর, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

শ্রীহরিনাথ স্মৃতিভূষণ ভট্টাচার্য্য
সেনহাটী, জেলা খুলনা, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য্য
নৈহাটী ২৪-পরগণা।

শ্রীনৃত্যগোপাল লাহিড়ী
শান্তিপুর জেলা নদীয়া, হাল সাকিম চুঁচুড়া।

শ্রীঅভয়চরণ সিংহ
খয়রা, জেলা নদীয়া, হাল সাকিম চুঁচুড়া।